হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ২২০/২৫
শ্রেণী সং
কলিকাতা

সপ্তবিংশতি ভাগ—সপ্তবিংশতি বর্ষ

(১৩২৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১৩২৮ সালের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

২৭শে কার্ত্তিক, ১৩২৮

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
জন্মভূমি-কার্য্যালয় হইতে
সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত
ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA
Printed by N. Dutt at the
Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghut Street.
1922.

বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।] [ডাঃ মাঃ ।৶০ ছয় আনা

সপ্তবিংশতি বর্ষের সূচীপত্র।

সংখ্যা	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা।
১।	অশোকা	সাহিত্য রত্ন	শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ	৪২
২।	অনুতাপের সুফল (গল্প)		শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী	৯৭
৩।	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	পণ্ডিত	শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী	১
৪।	আমি (কবিতা)	সঙ্গীতাচার্য্য	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী	১৫২
৫।	আমরা ও আমাদের ভাষা	স্বর্গীয় পণ্ডিত	রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ	৩০৬
৬।	ইন্দুর বর		শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস	৬
৭।	ইষ্ট কবচ (গল্প)	পণ্ডিত	শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ	১৬২
৮।	ঈশ্বর ও পরলোক		শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ কাব্যতীর্থ	২৭৩
৯।	কোষ্ঠী-শিক্ষা		শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার	৫৯, ১৭০, ২৩৭, ৩৬৫
১০।	কাকলী		শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী	১০৯
১১।	কমলা		শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী	১৩৪,১৮৪,৩১৩
১২।	কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী		...	১৯১, ২৪৯
১৩।	কবি	সঙ্গীতাচার্য্য	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী	২৮৬
১৪।	কৌলীন্য		শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায় সিংহ	৩২৪
১৫।	কাবেরীর জলপ্রপাত		শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৩
১৬।	কুলো		শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় BA	২০৯
১৭।	গদা (গল্প)	সাহিত্য-রত্ন	শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ	২৫৫
১৮।	গীত	পণ্ডিত	শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	৩৬৫
১৯।	গুপ্ত কবির কাহিনী		শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায়	৩৭৫
২০।	জ্যোতিষ দর্শন		শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু	৬৬

সংখ্যা	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা।
২১।	জ্যোতিশ্চন্দ্র		শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় (প্রফেসার স্কটীশচার্চ্জেস্ কলেজ)	১২৮
২২।	ঝাঁটামঙ্গল		শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় B A	১৬
২৩।	ঠাকুর-দা (গল্প)	সাহিত্য-রত্ন	শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ	২২৫
২৪।	তরুর তেজ	কবিবর	শ্রীযুক্ত রসময় লাহা	৩২
২৫।	তাইভালো	ডাক্তার	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য M B	৩৩
২৬।	তারকেশ্বরে হত্যা (গল্প)		শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী	৫০
২৭।	দুঃখাভিসার	ডাক্তার	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য M B	২৮০
২৮।	দুইটী গান		স্বর্গীয়া সুশীলা বালা দেবী	৩০৩
২৯।	দুহুঁ	সঙ্গীতাচার্য্য	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী	৩১২
৩০।	দেবীস্তুতি		শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ সরকার বিরচিত	৪১
৩১।	প্রায়শ্চিত্ত		শ্রীযুক্ত অসিতমোহন হাজরা B A	২২
৩২।	পাগলিনী	মহাকবি	স্বর্গীয় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত	৭৩
৩৩।	প্রার্থনা		শ্রীযুক্ত রসময় লাহা	১৩৩
৩৪।	প্রত্যক্ষ দেবতা		শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪০
৩৫।	প্রার্থনা-গীতি		শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ সরকার	১৭০
৩৬।	প্রাচীন	সঙ্গীতাচার্য্য	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী	২৭২
৩৭।	প্রাপ্তি স্বীকার	...	...	২৭২
৩৮।	প্রার্থিনী (গল্প)	সাহিত্য-রত্ন	শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ	২৮৭
৩৯।	প্রেম	ডাক্তার	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য M B	৩৪২
৪০।	পতিব্রতা (গল্প)		শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী	৩৪৩
৪১।	বিবাহপণ	সাহিত্য-রত্ন	শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ	১১৩,১৭৭
৪২।	বিষাদ	ডাক্তার	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য M B	২৪৭
৪৩।	বাণী-বন্দনা		শ্রীমতী হরিরমা সিংহ	৩২৩
৪৪।	ভূত	সাহিত্য রত্ন	শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ	৩৫

সংখ্যা।	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
৪৫।	মুস্কিল আসান	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত	৬৬
৪৬।	মনের অসত্তা প্রতিপাদন	ডাঃ শ্রীযুক্ত জীবনবিহারী সিংহ L H M S	১৪৫
৪৭।	মৃত শিশু	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য M B	১৪৭
৪৮।	মিলন বৈচিত্র	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য M B	৩০৫
৪৯।	যৌবন	সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী	৩০
৫০।	যাহার কিছু নাই,—সেই সুখী	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ	১৪৮
৫১।	রমণী হৃদয়	সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী	৭২
৫২।	রূপসী	সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী	৩৭৭
৫৩।	রহস্য যবনিকা	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ	৩৮৩
৫৪।	শৈশব	সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী	১৪০
৫৫।	সমর্পণ	শ্রীমতী চারুলতা দেবী	৩১
৫৬।	সাধক-সঙ্গীত	শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ ৩৭, ১০৯, ১৬১, ২৫৩	
৫৭।	সম বেদনা	ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য M B	২২৪
৫৮।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬৮, ৯০, ১৫৩, ২১৭, ২৪১, ২৮১, ৩৩৭, ৩৬৯	
৫৯।	সমালোচনা	১১০, ১৪৪, ১৭৬, ২৪০, ৩০৪, ৩৩৬, ৩৯৫	

জন্মভূমি।

২৭শ বর্ষ, } ১৩২৮ সাল, বৈশাখ। { ১ম, সংখ্যা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

(লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী)

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রের নাম জনপ্রিয় অধ্যাপক এবং ভারতের নব নব শিল্পকলার উদ্ভাবক বলিয়া দেশবাসীর মনে চির জাগরুক থাকিবে। তিনি তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদের অকিঞ্চিৎকরতার দ্বারা Plain living ও High thinking কথার যাথার্থ্য রক্ষা করিয়াছেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র বিবাহ করেন নাই, তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন, তৎসমস্তই অপরের সাহায্যার্থে ব্যয় করেন। কয়েকখানি পুস্তক রাখিবার তাক, অতি জীর্ণ একখানি চৌকি, অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানা নিতান্ত সেকেলে ধরণের একটি টেবিল ও কয়েকখানা চেয়ারই তাঁহার পার্থিব সম্পত্তি—যথাসর্ব্বস্ব। ডাক্তার রায় যদিও কয়েকবার ইংলণ্ডে গিয়াছেন এবং তাঁহার পাঠ্যজীবন ইংলণ্ডেই অতিবাহিত হইয়াছে, তথাচ তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ এরূপ আড়ম্বরশূন্য যে, যাঁহারা তাঁহাকে ব্যক্তিগত-ভাবে জানেন, তাঁহারা তাঁহাকে একজন সামান্য ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিতে পারেন না।

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলার অন্তর্গত বারুলি কাঠি-পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই দানে, বদান্যতায় ও অতিথিসেবায় চিরপ্রসিদ্ধ। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় Captain D. L. Richardsonএর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তিনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সাদি ও হাফেজের কবিতার অত্যন্ত পক্ষপাতী

ছিলেন। পিতার মহান্ চরিত্রের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন প্রফুল্লচন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র আপন গ্রামে একটি মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ডাক্তার রায়ের চেষ্টায় এই বিদ্যালয়টী এক্ষণে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এখনও ডাক্তার রায় এই বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। পিতার নিকট প্রফুল্লচন্দ্র বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বগ্রাম হইতে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন। তথায় কিছুদিন অধ্যয়ন করিবার পর প্রফুল্লচন্দ্র আলবার্ট স্কুলে প্রবেশ করেন এবং এখান হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন কলেজে প্রবেশ করেন। চারি বৎসরকাল তিনি এই কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের বৈজ্ঞানিক বিভাগেও বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। তখন Sir John Eliot ও Sir Alexandar Pedlar প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের বক্তৃতা করিতেন। প্রফুল্লচন্দ্র ইঁহাদের উপদেশে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে ডাঃ রায়—আরও উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে যাইতে কৃত-সংকল্প হন। কিন্তু ইত্যবসরে তাঁহার পিতার প্রভূত পরিমাণে পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় তিনি স্বীয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া বড়ই মনোদুঃখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। অবশেষে ভাগ্যদেবী তাঁহার উপর সুপ্রসন্ন হইলেন, তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে Gilchrist বৃত্তি লাভ করিলেন এবং ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। ছয় বৎসর কাল ইংলণ্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া তিনি রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি Hope Prize Scholarship ও Doctor of Science উপাধি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার লাভ করিলেন। এই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন বিখ্যাত শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। Doctor of Science (D. Sc.) ডিগ্রী লাভ করিয়াই প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসেন নাই, পরন্তু স্বাধীন গবেষণার জন্য তিনি আরও একবৎসর কাল ইংলণ্ডে অবস্থান করেন।

ডাঃ রায় শুধুই যে একজন শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক তাহা নহে, দেশের রাজ-নৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারেও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তিনি ইচ্ছা করিলে হিন্দুসমাজ হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে পারিতেন। কিন্তু কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম, কি মুসলমান, কি খৃষ্টীয়ান

সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রকেই তিনি সমভাবে দেখেন ও ভালবাসেন। তিনি একবার Indian National Social Conferenceএর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। যদিও হিন্দুসমাজ ডাক্তার রায়ের সিদ্ধান্ত নতমস্তকে গ্রহণ করে নাই, তথাপি তিনি যে বাল্যবিবাহ রহিত, নীচজাতির উন্নতি প্রভৃতি সংস্কার কার্য্যে বিশেষ যত্ন করেন, তজ্জন্য আপামর সাধারণ তাঁহার নিকট ভক্তি ও শ্রদ্ধার শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ডাঃ রায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি পঁচিশ বৎসরেরও অধিক কাল উক্ত কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ডাক্তার রায়ের এই অলৌকিক গুণ ও ক্ষমতা দেশের উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। যাঁহারা তাঁহার অধস্তন অধ্যাপক, তাঁহারা Provincial Service হইতে Imperial Serviceএ উন্নীত হইয়াছেন, কিন্তু ডাঃ রায়কে চিরদিনই সামান্য বেতনে Provincial Serviceএ কাটাইতে হইয়াছে। অবশ্য মহাত্যাগী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কোনদিন আপন পদোন্নতির চেষ্টাও করেন নাই, কিংবা অর্থ লাভের দ্বারা ধনী হইবারও তাঁহার বাসনা নাই। সে যাহা হউক, প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনাকালে ডাঃ রায়কে এইরূপ হীন-পদবীতেই কার্য্য করিতে হইয়াছে।

ডাঃ রায় রসায়নশাস্ত্রে ভারতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তিনি একদিন বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রায় শত করা ৯৯জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নশাস্ত্রে উপাধি লইয়াই তাহা ভুলিয়া যায়।" কিন্তু ডাঃ রায় নিজের জীবনে এ কথার বিপরীত ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি রসায়ন সম্বন্ধে যে নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দর্শনে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জগৎ বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছে। Mercurous Nitrite নামে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধটী Asiatic Society of Bengalএ প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধে স্বাধীন গবেষণা দেখিয়া ইউরোপের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী তাঁহাকে সহস্র সহস্র সহানুভূতিপূর্ণ পত্র দ্বারা উৎসাহিত ও সম্মানিত করেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ তিনি রসায়নের উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ রায় Silver Mercuroso-Mercuric Oxynitrate শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বঙ্গদেশের Asiatic Societyর সম্মুখে পাঠ করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আরও একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ডাঃ

রায় রসায়ন সম্বন্ধে এমন অনেক সারগর্ভ সন্দর্ভাদি পাঠ করিয়াছেন, যাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিয়াছে।

ডাক্তার রায়ের মহৎ উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক বিজ্ঞানে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে এদেশে ও বিদেশে অনেক কলেজে যোগ্যতা ও কৃতীত্বের সহিত অধ্যাপনা করিতেছেন। তাঁহার একজন ছাত্র বিষাক্ত গ্যাসের বিরুদ্ধে গবেষণা করিতে সাহায্য পাইবার জন্য আমেরিকা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বৃত্তিলাভ করিয়াছেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রায় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইউরোপের প্রধান প্রধান রসায়নাগার পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হন। ডাক্তার রায় সেই সময় ইউরোপের প্রায় সমগ্র রসায়নাগার দর্শন করিয়া ফরাসীদেশে উপনীত হন। তথায়ও তিনি সাদরে অভ্যর্থিত হন।

বঙ্গদেশবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম অন্য প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানের কথা শুনিয়া তাঁহাকে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন। ডাঃ রায় বক্তৃতালব্ধ অর্থ স্বয়ং না লইয়া সেই টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করেন।

ডাঃ রায়, স্যার দেবপ্রসাদের সমভিব্যাহারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ইউরোপে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় মহাসভায় যাইয়া অতি যোগ্যতার সহিত আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলে প্রেসিডেন্সী-কলেজের ছাত্রগণ তাঁহাকে সান্ধ্যভোজনে আমন্ত্রিত করেন। সেই সভায় Principal James ডাঃ রায়ের অনেক সুখ্যাতি করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রায় প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকতা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, ঐ কলেজে তিনি দীর্ঘ ষষ্ঠবিংশ বৎসর বিশেষ কৃতীত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার বিদায়-অভিনন্দন দিবার প্রসঙ্গে ছাত্রগণ বলিয়াছিলেন—

"আপনার জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে প্রাচীন যুগের ঋষি, মুনিদের চিত্র চিত্তে জাগরুক হয়। আপনার সরলতা, অকৃত্রিম স্বদেশ-বাৎসল্য এবং দরিদ্র ছাত্রদের অকাতরে সাহায্যদান স্মরণ করিলে প্রাচীন গুরুর ন্যায় আপনাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি করিতে ইচ্ছা হয়।"

হিন্দু রসায়নের ইতিহাস (History of Hindu Chemistry) ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রের অক্ষয় কীর্ত্তি।

মাতৃভাষার সেবা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রের আজীবন লক্ষ্য। যদিও বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীকে ভারতের মহিমা জ্ঞাপন করিবার জন্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র অধিকাংশ প্রবন্ধ ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছেন, তথাচ তিনি মাতৃভাষাকে একেবারে বিস্মৃত হন নাই। 'আধুনিক রসায়নের উৎপত্তি' নামধেয় একখানি পুস্তক তিনি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া, "মানসী" ও "প্রবাসী" মাসিক পত্রেও তাঁহার অনেক বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" নামক মৌলিক প্রবন্ধ লইয়া বঙ্গদেশে কিরূপ হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। বঙ্গভাষার প্রতি প্রগাঢ় আনুরক্তির জন্যই তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির আসনে আহূত হইয়াছিলেন। তিনি কলেজে অধ্যাপকতাকালে প্রায়ই বাঙ্গালা ভাষায় ছাত্রগণের নিকট বক্তৃতা করিতেন; বলা বাহুল্য, ইংরাজী বক্তৃতা অপেক্ষা তাঁহার বাঙ্গালা বক্তৃতা ছাত্রেরা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত।

Bengal Chemical and Pharmaceutical Works ডাক্তার রায়ের ব্যবসায়-বুদ্ধি ও আবিষ্কার-শক্তির জাজ্বল্যমান নিদর্শন। বাঙ্গালী যে পাশ্চাত্য-চিকিৎসকমণ্ডলীর ন্যায় নূতন নূতন অমোঘ ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারে, বেঙ্গল কেমিকেলের কৃতকার্য্যতার দ্বারা ডাক্তার রায় তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

ডাক্তার রায়ের বদান্যতার কথা আর কি বলিব? তিনি যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহার অধিকাংশ জাতিবর্গনির্ব্বিশেষে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের সাহায্যকল্পে ব্যয়িত হয়।

ডাঃ রায় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। নিপীড়িত ও নিগৃহীত জাতিদিগকে উন্নত করাই ডাঃ রায়ের সামাজিক আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। ভারতীয় সামাজিক কন্‌ফারেন্সে ডাঃ রায় যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার সমাজ-সংস্কার-পদ্ধতির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। ডাক্তার রায় বলিয়াছিলেন,—"জগতের সম্মুখে ভারত এক সময়ে উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতেই পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রাচীন ইতিহাসের সেই সুপ্রভাতে সমাজসংস্কার, সভ্যতা, উচ্চ চিন্তা, বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি শিখিবার জন্য উদ্‌গ্রীবনেত্রে ভারতের দিকে

তাকাইয়া থাকিত। কিন্তু আজ কি দুঃখ-পরিতাপের বিষয় যে, ভারতবর্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য জগতের পদানত! ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ, গোঁড়া ও অগোঁড়া একত্র মিলিয়া যদি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে যে এদেশ অচিরাৎ উন্নত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হেয়, অবজ্ঞাত, নিপীড়িত জাতির সহিত বংশমর্য্যাদায় দৃপ্ত ব্রাহ্মণ একাসনে বসিবেন কি?"

বলা বাহুল্য, সমাজের নিম্নতরস্থ জাতিদিগকে উন্নত করাই ডাক্তার রায়ের সামাজিক আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভগবান করুন, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র—বাঙ্গালার নীল আকাশের প্রফুল্লচন্দ্র দীর্ঘজীবী হইয়া বাঙ্গালার ঘনঘটাচ্ছন্ন মুখ উজ্জ্বল করুন।

ইন্দুর বর।

(লেখক—শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস।)

(১)

কেহ কেহ বলেন, পুত্র অপেক্ষা পৌত্র সমধিক ভালবাসার পাত্র; কেন না,—টাকা অপেক্ষা তাহার সুদই বেশী মিষ্টি। ঈশ্বরেচ্ছায় অনেকগুলি পৌত্র ও পৌত্রীর পিতামহ হইয়াও কথাটা ঠিক কি না, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তবে পুত্র অপেক্ষা পৌত্র যে সমধিক আদরের পাত্র—তাহা সুনিশ্চিত।

আমার পিতৃদেব পৌত্র-মুখাবলোকন জন্য সত্যই বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার সে বাসনা পূর্ণ করা অভিপ্রেত ছিল না বলিয়া, তিনি পৌত্র জন্মিবার পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করেন। আমার সেই স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই, আর সেই জন্য হয় ত পৌত্রদের প্রতি সমধিক স্নেহশীল। তাহারা কোন দোষ করিলেও, তাহা চাপা দিই, অধিক কি,

পুত্রদের শাসনাধিকারটুকুও অপহরণ করিয়াছি। এত করিয়াও বুঝিয়াছি, পুত্র যত আপনার, পৌত্র তত হইতে পারে না। আমরা সোপানের যত নিম্নস্তরে যাই, ততই ঘনিষ্ঠতা কমিয়া যায়। তাই শাস্ত্রকার মনুষ্যের সপ্তম সোপান অতিক্রমণের পর, জলপিণ্ড দানের ব্যবস্থা রহিত করিয়াছেন।

আমার প্রথম পৌত্র জন্মিবার এক বৎসর পরে তাহার পিতা-মাতাকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে নিজের কাছে রাখি। এটা নিতান্ত স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতার চিহ্ন হইলেও আমি সেই মহাপাপ করিয়াছি। সে যখন সামান্য কথা কহিতে পারে, তখন হইতে সে আমাকে জুজুর ভয় দেখাইত। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে, সর্ব্বদা তাহার মন যোগাইতাম; কিন্তু একটু ত্রুটি হইলেই সে মুখখানা ভার করিয়া বলিত,—"আমি মার কাছে যা'ব।"

আমি একদিন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলাম,—"যা তুই মার কাছে, আমি একটা বাঁদর কিনিয়া আনিয়া, তাহাকে জরির পোষাক পরাইয়া, ভাল ভাল খাবার খাওয়াইব।"

কথাটা আমার মনে না থাকিলেও নাতি-বাবুর মনে ছিল, তাই তিনি একদিন রফানামা দিয়া বলিলেন,—"তবে আর বাঁদর কিনিও না, আমিই খাবার খাব, আর মার কাছে যাব না।"

শুধু হাসির কথা নয়, ইহার মধ্যে একটু বিস্ময়ের কথাও আছে। আর একদিন আমার পৌত্রটি তাহার পিতার ঘরে যাইয়া বিরক্ত করিতেছিল। পিতা হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল,—"তুই আমাদের ঘরে কেন, ঠাকুরমার ঘরে যা।"

দুষ্ট উত্তর দিয়াছিল, "আমি ত তোমাদেরই, ঠাকুরমার কাছে থাকি বৈ ত নয়!"

তাই বলি, পিণ্ডটার দৌড় সাত পুরুষ পর্য্যন্ত যাওয়াও যেন কিছু বেশী ঠেকিতেছে।

এখন আর তাহাকে কাছে রাখিতে পারি না, লেখা-পড়ার জন্য সে থাকে কলিকাতায়; আর আমি থাকি স্বাস্থ্যনিবাস ঘাটশীলায়। মনকে খুব শাসনে রাখি—কিন্তু ঐ "কিন্তুই" কিছু বিব্রত করে।

ইন্দু আমার টাকার প্রথম সুদ, সুতরাং বড় মিষ্টি। যখন তাহার জন্মের প্রথম সংবাদ পরামাণিক মহাশয় প্রদান করেন, তখন কিন্তু মনে

হইয়াছিল—মেয়ে! গৃহিণী কিন্তু এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "ভালই হয়েছে, প্রথম মেয়ে হলে বাপের পরমায়ু বৃদ্ধি পায়।" ইহার উপর আর কথা কি?

ইন্দু যখন ঘরে আসিল, তখন দেখিলাম, তাহার মুখটী বেশ ফুট্‌ফুটে হইয়াছে, কিন্তু বর্ণটি টুক্‌টুকে নয়। ভাবিলাম, ইহাও হয় ত শুধু পিতার নয়, পিতামহিক পরমায়ু বৃদ্ধির অন্য উপাদান।

কালে আর ইন্দুর বর্ণ মনের বিবর্ণতা সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইল না, আদরের ইন্দু হৃদয়ের আদর আপনা হইতে চুরি করিতে লাগিল। তাহার মধুর হাসি, মিঠে কথা সত্যই যেন হৃদয়ে নূতন সৃষ্টির রেখাপাত করিতে আরম্ভ করিল। শেষে এতদূর গড়াইল যে, আমি ইন্দুর বর পর্য্যন্ত হইতে চাহিলাম। গৃহিণী স-সতীন গৃহবাসেও রাজী হইল, মিস্ ইন্দু সোল্লাসে তাহাতে সম্মতিদান করিয়াছিল, কিন্তু এত সুবিধা সত্বেও ইন্দুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। আজকালকার দিন কাল বড় কঠিন, জানি না, এত কথা বলায় নাৎজামাই বাবু আমার নামে মানহানির মামলা রুজু করিবেন কি না?

(২)

ইন্দুর বয়স যখন দুই বৎসর, তখন সে মধ্যে মধ্যে আমার আফিসে যাইয়া টেবিলের উপর বসিয়া থাকিত, কালি ফেলিত, কলম ভাঙ্গিত, কাগজ ছিঁড়িত। আবার কখন কখন বা গড়ের মাঠে ট্রামে চড়িয়া হাওয়া খাইতে যাইত। একদিন ইন্দু মাধার কোলে চাপিয়া ঘাড় নাড়িয়া, হাত নাড়িয়া, মুখ নাড়িয়া নানাপ্রকার বোধ্য ও অবোধ্য কথা কহিয়া এক মানুষিক ও অমানুষিক ভাষা-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছে। ইচ্ছা, আমার ক্রোড়ে উঠিয়া ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া তুলে, কিন্তু না পারিয়া মাধার কোলই অধিকার করিয়া আছে, আর মাধা তাহার সব কথার যথা-অযথা উত্তর দিতেছে। মাধার সে ক্ষমতা ছিল।

যখন কথাটা উঠিল, তখন মাধার একটু পরিচয় দিলে বোধ হয় পাঠকের বিরক্তি সম্পাদিত হইবে না। মাধব হিন্দুস্থানি, তাহার এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আপনার বলিতে কেহ ছিল না। মাধব যখন আমার সংস্রবে আসে, তখন তাহার বয়স পঞ্চান্নর উপর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, সে বিশ বছরের, চুল পাকার জন্য কবিরাজী পাক-তেলের দোষ দিত, আর দিত কবিরাজ মহাশয়ের। এটায় মাধার দোষ তত দিই না, কারণ অনেক

চাকুরে বাবুও পঞ্চান্ন বছরে মাত্র চল্লিশে পদার্পণ করিয়া মারকুলি ও পাক-তৈলকে তাঁহাদের অকাল-বার্দ্ধক্যের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আইনের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করেন। হাইকোর্টের বুঝি কাজ কম, তাই আজ ৪।৫ বৎসর হইল, কতকগুলি পক্ককেশ সব্‌জজ ও মুন্‌সেফকে খাতায় বয়স থাকিতেও অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। তাহার কারণ—এখনকার ন্যায় পূর্ব্বেও কেহ ষোল বৎসরের পূর্ব্বে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে পারিত না; কিন্তু তাঁহাদের বয়স হিসাব করিলে দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ৯।১০ বৎসর বয়সে এণ্ট্রেন্স দিয়াছিলেন। তাই দায়ে পড়িয়া, ঐ সকল ধর্ম্মাধিকরণরা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে আর হাইকোর্টের এই অবিমিশ্রকারিতার নিন্দা করিতে করিতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু মাধার দোষ দিলাম না কেন, তাহা শুনুন;—মাধার বিশ্বাস, সে নাবালক, তাহার বিবাহ দিলেই হয়, কিন্তু হয় না কেবল তাহার অভিভাবক কেহ নাই বলিয়া। আমি প্রায়ই মাধার বিবাহ দিবার প্রতিশ্রুতি করিতাম—(নবীন যুবক সম্প্রদায় এই মিথ্যা কথার জন্য আমায় দোষ দিবেন না)। যে দিন বিবাহের কথা হইত, সে দিন মাধার আহ্লাদ আর ধরিত না; সে ঘন ঘন তামাক সাজিয়া আমার সরকারী কার্য্যের ব্যাঘাত সম্পাদন করিত।

মাধা ছিল শিয়ালদহ রেজেষ্ট্রী আফিসের একটী বাজে বেহারা। তাহার কাজ ছিল আমার এজ্‌লাস আর খাস্ কামরা পরিষ্কার করা, গড়্‌গড়ায় জল ফেরান আর তামাক সাজা। সরকারী কাজের মধ্যে এজলাসে বসিয়া দলিলে মোহর দিত।

একবার সুঁড়ার কয়েকজন বারবিলাসিনীর নামে মারপিটের সমন হয়। সমন জাল, মদ খাইয়া মাতলামীর অভিযোগে একটী পুরুষ তাহাদের নামে নালিশ করিব বলিয়া ভয় দেখায়, তাহারা আরও বিদ্রুপ টিট্‌কারী দেয়, তাই ফৌজদারী আদালতের সমন কোনরূপে সংগ্রহ করিয়া আমার আফিসের মোহর সংযোগে তাহাদের নামে সমনজারী হয়। বাবুটী ভাবিয়াছিলেন, সমন পাইয়া তাহারা গড়াইয়া পড়িবে, আর সব মিটিয়া যাইবে; কিন্তু চোরা ধর্ম্মের কাহিনী শুনিল না। ধার্য্য দিনে তাহারা অর্দ্ধাবগুণ্ঠন দিয়া আমার নিকট হাজির হইয়া সমন দেখাইল, আমি আমার মোহরের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহাদিগকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির হইতে বলিলাম। সেখানে উকীল মোক্তারের সাহায্যে ব্যাপার গুরুতর হইয়া

উঠিল। রহস্যভেদের জন্য সুযোগ্য ইন্‌স্পেক্টার বৈদ্যনাথ বাবু নিযুক্ত হইলেন।

একদিন বৈদ্যনাথ বাবু আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে আমি পূর্ব্ব হইতেই চিনিতাম। তিনি একবার খাস্ কামরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। সেখানে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার দলিলাদিতে কে মোহর দেয়? মূর্ত্তিমান মাধব তখন কলিকায় ফুঁ দিতেছিল, অগ্নিদেবের বিকাশে তাহার কৃষ্ণ-বদনখানি বেশ উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। আমি এ হেন মাধবকে দেখাইয়া দিলাম। তখন বৈদ্যনাথ বাবু সমন তিনখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "এই সমনে তুই মোহর দিয়েছিলি?"

মাধা। হাঁ—দিয়া—।

মাধা আধা হিন্দি আধা বাঙ্গলা কহিত।

বৈদ্য। কেন দিলি?

"একটা লোক আমাকে ৵০ আনা পয়সা দিল, আর বলিল, চারিটা ছাঁপ দিতে, আমি পয়সা নিলাম আর ছাপ দিলাম।"

আমরা ত অবাক! মাধা বলে কি?

বৈদ্যনাথ বাবু বলিলেন, "তুই যার কথায় মোহর দিয়েছিলি, তাকে চিন্‌তে পার্‌বি?"

"হাঁ, তাকে ২।৩ রোজ দেখেছি।"

লোকটীকে ডাকিবামাত্র মাধা তাহাকে চিনিল। কিন্তু মাধা যে গায়! বৈদ্যনাথ বাবু তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহার জেল হইবে। মাধা বলিল, "হামি কি এত জানে।" মাধা আদালতে বন্দীভাবে গেল। মোক্তাররা দেখি, ইতিমধ্যে তাহাকে সত্য কথা গোপন করিতে বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু মাধা কি সেই লোক যে মিথ্যা বলিবে!

(৩)

আফিসের কাজ সারিয়া আমি পুলিশ আদালতে গেলাম। তখন চণ্ডী বাবু শিয়ালদহের S. D. O. আমাকে দেখিয়া চণ্ডী বাবু খাস-কামরায় আসিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

আমি মাধার সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম। মাধা বাহিরে বসিয়াছিল, তাহাকে ডাকান হইল। চণ্ডী বাবু তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "বিশ বৎসর।"

আমি পূর্ণ সাতটী বৎসর শিয়ালদহে ছিলাম, কিন্তু পাঠককে জানাইয়া রাখি যে, দীর্ঘকাল মধ্যে মাধার একটী বৎসরও বয়স বাড়ে নাই।

চণ্ডী বাবু আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "Idiot."

আমি বলিলাম, "পূরা।"

তখন চণ্ডী বাবু মাধাকে বলিলেন, "তুই মোহর দিলি কেন?"

"দু-আনা পয়সা পেলাম যে।"

"পয়সা কেন নিলি?"

"সব কই বাবু লোক লেতা আর আমি নিলাম ব'লে দোষ হলো?"

একটা খুব হাসি পড়িয়া গেল। তখন চণ্ডী বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মোহর দিয়েছিস ব'লে তোর জেল হবে।"

মাধা গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাম ঝুট নেহি বোলে গা।"

মাধা সে দিন জামিনে খালাস হইল, কিন্তু চণ্ডী বাবুর কৃপায় তাহাকে আর আদালতে হাজির হইতে হয় নাই।

জানি না—তথা-কথিত ভদ্রলোকের মধ্যে আজ-কাল কয়জন মাধার মত সত্যবাদী আছেন!

(৪)

এ হেন মাধার কোলে ইন্দুকে দিয়া আমি প্রিন্সেপঘাটে উপস্থিত। তখন পশ্চিম-গগনে রবির শেষ কিরণশোভা পাইয়া ধীরে ধীরে অনন্তে মিশিতেছে। জাহ্নবী শ্বেতাম্বরা সুন্দরীর ন্যায় শোভা পাইয়া পালতোলা তরণী আর ধূমোদ্গীরণকারী ষ্টিমলঞ্চ বুকে ধরিয়া বীর-গমনে "নদীর জল অবিরল সাগরেতে যায়" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

আমরা চলিয়া আসিব, এমন সময় একজন সাধু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার পরণে গৌরিক বসন, কিন্তু গলায় তুলসীর মালা, মাথায় জটা নাই, কিন্তু ললাটে ত্রিপুণ্ড্র শোভা পাইতেছে। দুটি গালে ছোট ছোট শ্মশ্রু, কিন্তু তাহা যত্নের সহিত ছাঁটা। নগ্ন পদ।

তিনি একবার আমার দিকে চাহিয়া, ইন্দুর দিকে চাহিলেন, পরে তাহার চিবুকদেশ ঈষৎ স্পন্দিত করিয়া, মুখের সম্মুখে স্বীয় বদনখানি ঊর্দ্ধ আর অধঃদিকে নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "কিরে পাগ্‌লি!"

পাগ্‌লি তখন তাঁহার সঙ্গে নানা কথা, কতক ভাষায়, কতক বা ইঙ্গিতে

কহিয়া ফেলিল। আমি তাহার রঙ্গ দেখিয়া বলিলাম,—"এমন মেয়ে ত দেখিনি, কাকেও ভয় নেই!"

সাধু হাসিয়া কহিলেন,—'ভয় করিলে চলিবে কেন, ওর যে গোরা বর হবে।'

আমি সবিস্ময়ে সাধুর দিকে চাহিলাম। তিনি আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "নাতনির বিয়ে গোরার সঙ্গেই যদি হয় তাতে আপনার দুঃখ কি?"

আমিও হাসিয়া বলিলাম, "বিন্দুমাত্র না।"

সাধু। আপনি কি মনে করিতেছেন, আমি বিদ্রূপ করিতেছি।

আমি। তা নয় ত কি?

সাধু। না—আমি সত্য বলিতেছি।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাও কি হয়!"

সাধু। ফরাসী গোলন্দাজ সেনার সঙ্গে ওর বিবাহ হবে।

আমি একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম, "মাধা, আমরা যাই চ।"

মাধা সাগ্রহে বলিল, "চল বাবু চল, আবার যদি গোরা এসে দিদিকে কেড়ে নেয়।"

সাধু তখন সহাস্যে বলিলেন, "আপনি যেটা অসম্ভব মনে করিতেছেন, আমি তা ধ্রুব সত্য বলে জানি।"

আমি। অসম্ভব কথা।

সাধু। আকবর হিন্দু-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন, সেটা সম্ভব হতে পেরেছে কিন্তু এটা সম্ভব নয় কেন?

আমি। তিনি রাজা ছিলেন।

সাধু। যা তাঁর ইচ্ছায় হ'ত, সেটা না হয় বলপ্রকাশে হবে।

আমি। বল প্রকাশে—

তিনি সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "কিরূপে হবে তা জানি না, কিন্তু ওর বিধি-লিপি যে, গোরা ওর বর।"

আমি বিদ্রূপের সহিত বলিলাম, "আর আট দশ বৎসর পরেই তা দেখা যাবে। আশা করি, বিবাহ-উৎসবে আপনি যোগদান করবেন।"

সাধু। যদি ততদিন বেঁচে থাকি, নিশ্চয় করবো।

আমি। তবে নিজে বাঁচবেন কি না তা জানেন না, কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালিকার কে বর, তা সুনিশ্চিতভাবে বলে দিচ্চেন।

সাধু। তবে দেখুন।

এই বলিয়া তিনি আমার মাথায় একটী ফুল ফেলিয়া দিলেন, আমি দেখিলাম, পশ্চিম-গগনে একটি আলোক-চক্র দেখা দিল, তাহা ক্রমে ঘুরিতে লাগিল, সেই চক্র-মধ্যে দেখিলাম, একটি প্রকাণ্ড কামান, আর তাহারই পার্শ্বে একজন ফরাসী গোলন্দাজ।

সাধু। কি দেখিলেন?

আমি সহাস্যে কহিলাম, "দেখিতেছি, আপনি বেশ Hipnotize করিতে পারেন।"

সাধু। আপনাকে এত শীঘ্র Hipnotize করিলাম!

আমি। করিলেন বই কি?

সাধু। স্বচক্ষে দেখিয়াও বিশ্বাস নাই?

আমি। এটা এক রকম Optical delusion.

সাধু। তবে আরও কিছু দেখুন।

দেখিলাম, ধূমরাশিতে সে স্থান পূর্ণ হইতেছে আর বজ্র-নিনাদে গোলা-গুলী চলিতেছে। ভাবিলাম, 'এ কি!' মাধাকে বলিলাম, 'তুই কিছু দেখ্‌লি?'

"কুছু না—বাবু।"

সাধু বলিলেন, 'এটা কি?'

আমি। Oricular Delusion.

সাধু বলিলেন, 'যাহা দেখিলেন, মনে রাখিবেন।'

আমি সহাস্যে বলিলাম, 'চেষ্টা করিব।'

সাধুটীও হাসিতে হাসিতে ভাগীরথীর তীর দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেলেন।

মাধা বলিল, 'খুকী! চল, তোকে গোরা পাকড়াবে।'

খুকী বলিল, 'আমি তাকে মাব্বো।'

আমি। পার্‌বি ত?

খুকী। পাব্বো।

জানি না—ইন্দু এখন তার গোরা-বরকে মারে কি না?

(৫)

ভাবিয়াছিলাম, কথাটা চাপিয়াই রাখিব, কিন্তু শেষে ভাবিলাম, গৃহিণীকে

না বলি কেন? তর্ক-বিতর্কের পর মন বলিতেই রাজি হইল। তাই বলিলাম, 'আর শুনেছ, ইন্দুর গোরা বর হবে।'

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, 'বেশ ত, তোমার টক্‌টকে নাৎজামাই হবে।'

আমি। তা ত হবে, কিন্তু তুমি বরণ কর্‌তে পার্‌বে ত?

গৃহিণী। কেন পার্‌বো না, তুমি যদি গোরার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে পার, তা হলে আর আমি বরণ কর্‌তে পারবো না,—নিশ্চয় পারবো; হয় ত কাণও ম'লে দেবো।

আমি। এ রহস্য নয়।

গৃহিণী। আমারই কি রহস্য! মেনকা শাশুড়ী হয়ে ভুজঙ্গভূষণকে সহস্র ফণার ফোঁস্‌ফোঁসানি সত্বেও বরণ করেছিলেন, আর আমি দিদি-শাশুড়ী হয়ে একটী নাৎজামাই গোরার কাণ মল্‌তে পারলো না?

ইন্দু তখন কাছে দাঁড়াইয়া। গৃহিণী তাহাকে বলিলেন, 'কিলো, গোরা বিয়ে কর্‌বি।'

ইন্দু বলিল, 'আমি গোলা বিয়ে কব্বো।'

এই ত কনেও রাজি। আমি তখন সেই সাধু-ঘটিত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। দেখিলাম, এইবার তাহার মুখখানি শুকাইয়াছে। আর সে স্ফূর্ত্তি নাই, বলিলেন, "কি সর্ব্বনেশে কথা গো।"

"কেন, বরণ কর্‌বে না?"

"বাপ্‌রে!"

যাহা হউক, তাঁহার ইচ্ছামত কথাটা আর অপর কাহাকেও বলা হইল না।

(৬)

দিনকয়েক পরে কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। ক্রমে ইন্দুর বরের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। মাসের পর মাস চলিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু বর আর মিলে না। যদিও মিলে তাহা পছন্দ মত হয় না।

একদিন দেখি, ইন্দুর পিতা একখানি ভারতবর্ষ আনিয়া আমায় একটী চিত্র দেখাইলেন। দেখিলাম, একটী প্রকাণ্ড কামানের পার্শ্বে একটি গোরা দাঁড়াইয়া, আর তাহার নীচে লেখা—'গোলন্দাজ সন্তোষকুমার সরকার।'

বলিলাম, 'এটি কে?'

"ইহারা ফরাসীদের প্রথম বাঙ্গালী পল্টন। এই ছেলেটী খুব দক্ষতার

সহিত কার্য্য ক'রে অনেক প্রশংসাপত্র পেয়েছে। আমাদের স্বজাতি, ইন্দুর সঙ্গে এর বিয়ে দিলে হয় না?"

সহসা সেই সাধুর কথা মনে পড়িল। বলিলাম, 'আমার কিছুমাত্র অমত নাই।'

সুতরাং শীঘ্রই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল।

বিবাহরাত্রে কতিপয় ইংরাজ-পুরুষ ও মহিলা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চার্চ্চসাহেব সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। ইনি মার্টিন কোম্পানীর বীমা-বিভাগের সেক্রেটারী। চার্চ্চ সাহেব রূপে-গুণে সমান। আমি তাঁহার সহিত কথা কহিতেছি, এমন সময় সেই জনতা-মধ্যে দেখিলাম, সেই সাধুটী আমার দিকে চাহিয়া মৃদু-হাস্য করিতেছেন। আমি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া চার্চ্চ সাহেবকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐটীই কি আপনার নাৎজামাই?"

তখন কিসের একটা চর্ব্বণ-কার্য্য শেষ করিয়া চার্চ্চ সাহেব শ্যাম্পেন দিয়া গলাটা ভিজাইয়া লইতেছিলেন।

আমি সাধুকে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিতে বলিয়া ছুটিয়া গিয়া গৃহিণীকে বলিলাম, 'একটা কথা শুনে যাও ত।'

তিনি বিরক্তি-স্বরে বলিলেন, 'এখন আমার কথা শোন্‌বারই সময় বটে!'

রাজাদের হাতি প্রোশেসনে বাহির করিবার পূর্ব্বে তাহার শুণ্ড ও কপালটা যেরূপ বিচিত্রভাবে চিত্রিত করে, নাৎনীর কপাল ও নাসিকাও তিনি তখন সেইভাবে চন্দন-সাহায্যে চিত্রন-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

আমি বলিলাম, 'সেই সাধু এসেছেন।'

তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, 'কে গা?'

'যিনি ইন্দুর গোরা বর হবে বলেছিলেন!'

কথাটা অনেকের কাণে গেল। একা ইন্দু ব্যতীত সকলেই সাধুকে দেখিতে গেলেন। সংবাদ বাহিরেও প্রকাশ হইয়া পড়িল। ছোক্‌রার দল তখন তাঁহাকে ঘিরিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "বন্দে মাতরম্।"

গোরা বরের অভ্যর্থনার জন্য ছেলেরা রহস্যছলে কয়েকটা 'বোমা' কিনিয়া আনিয়াছিল, এই সময়ে তাহাতে আগুন দিল। সেগুলি দুম্‌-দাম্‌ শব্দে কামানের মত গর্জ্জিয়া উঠিল। ভাবিলাম, 'বিবাহ মন্দ হইল না।'

ঝাঁটামঙ্গল।

(অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীকালিপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ বিরচিত।)

(১)

কত গুণ ধর ঝাঁটা বলিহারি যাই,
জগতে তোমার জুটী বুঝি কেহ নাই।
ব্রহ্মকুলে* জন্ম তব বড় তব মান,
শীতলা-দেবীর করে তাই পেলে স্থান।

(২)

তাপশান্তি হেতু মাতা অমৃত-সলিলে,
তোমার সাহায্যে রোগি-অঙ্গে নিক্ষেপিলে,
বিস্ফোটক-জ্বালা তার কোথায় পালায়,
সুস্থদেহে ক্লিষ্ট নর সুখে নিদ্রা যায়।

(৩)

বারাণসীধামে কালভৈরব-মন্দিরে,
পাণ্ডা-করে বিরাজিত সজ্জিত শরীরে ;
তীর্থযাত্রি-পৃষ্ঠে পড়ি কর আশীর্ব্বাদ
সুফল লভিয়ে তার পূরে মনোসাধ।

(৪)

রূপান্তরে পুরীধামে পাণ্ডার শ্রীকরে
আছ তুমি সদাকাল বহু মানভরে।
পাপরাশি বিনাশিয়া পরশে তোমার
দেখাও যাত্রীরে তুমি মূর্ত্তি দেবতার।

(৫)

বিবাহ-নিশায় ঢাকা ঘোমটায় মুখ
দোরেতে দাঁড়িয়ে থাক—সে এক কৌতুক।

* নারিকেল বৃক্ষ—ব্রাহ্মণ।

বর এলে কুতূহলে রমণীরা বলে,
দোরষষ্ঠী—গড় কর ও পদ-কমলে।

(৬)

ভাবিনী বধূর হাতে না জানি কি ঘটে,
ভাবিয়া রসিকবর আসিয়া নিকটে,
মনে মনে প্রণমিয়া মাগে এই বর,
মম পত্নী-হাতে হ'ও—কুসুম সোসর।

(৭)

কে না জানে এ সংসারে প্রতাপ তোমার,
ভূত ঝাড়াইতে শক্তি আছে হেন কার ?
ঝাঁটা-মন্ত্র পড়ি যবে প্রহারে ওঝায়,
বাপ বাপ করি ভূত কোথায় পালায়।

(৮)

গৃহিণীর করে উঠি গৃহাঙ্গনে গিয়ে
আবর্জ্জনা কর মুক্ত যতন করিয়ে।
প্রভাতে মার্জ্জন-শোভা করিয়ে ধারণ
হাসে সে চত্বরভূমি নয়নরঞ্জন।

(৯)

শয্যা সাফ করি কর শোভার বর্দ্ধন,
যুবতীর করে তুমি তাই সে ঝাড়ন।।
যতনে তোমারে রাখে আল্‌নার কানে,
অথবা দে(ও)য়াল গায়ে অতি সাবধানে।

(১০)

ঝাঁটা দিয়ে পাট কর তাই তুমি ঝাঁটা,
লক্‌ল'কে আগা, গোড়া রজ্জুহারে আঁটা।
আগা কাটা—মুড়ো নাম শক্ত সব কাটি—
খণ্ডিতার* করে তুমি অস্ত্র পরিপাটী।

* যাহার পতি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত।

(১১)

মার্জ্জনেতে পটীয়সী কে তব সমান,
তাই তব সম্মার্জ্জনী সাধু অভিধান।
ডাবের কাটীতে তব কুল-পরিচয়,
পূর্ব্ববঙ্গ বরিশালে পিছা সবে কয়।

(১২)

কলিকাতা রাঢ়ে খ্যাংরা নামটী তোমার,
শাশুড়ীর করে কর বোয়ের খোয়ার।
বাঘিনী ননদী-হাতে দেখিয়া তোমায়,
কাঁপে বধূ ভাবে পাছে বিষ ঝেড়ে দেয়।

(১৩)

কত দেশে কত নাম বলিতে কে পারে,
পশ্চিমেতে ঝাড়ু নামে ডাকে যে তোমারে।
বাড়ন তোমার শিশু কোঁস্তা নাম তার,
নানারূপে আছ তুমি ব্যাপিয়ে সংসার।

(১৪)

সব্যসাচী মেথুয়ার করেতে থাকিয়া,
কর শত্রুধূলি নাশ দু'বেলা ধরিয়া।
কতক তোমার ভয়ে শূন্যে উঠে যায়,
নীচেতে চাহিতে তারা সাহস না পায়।

(১৫)

রাজার ঘরণী হ'তে দরিদ্র কামিনী,
সব ঠাঁই থাক ঝাঁটা তুমি আদরিণী।
ছোট বড় ভেদ নাহি সর্ব্বত্র সমান,
ঝাঁটা তুমি লভিয়াছ সত্য ব্রহ্মজ্ঞান।

(১৬)

মাড়োয়ারী বর্ষীয়সী নারী একজন,
তার হাতে দেখেছিনু তোমার বিক্রম।
টেক্স তরে বক্সু মিঞা ধরে অস্থাবর,
তোমার প্রহারে শেষে হইল কাতর।

(১৭)

মার খেয়ে মিঞা ভায়া করে পলায়ন,
অবশেষে আদালতে লইল শরণ।
হাকিমের কাছে কেস করিল দায়ের,
হাকিম হুকুম দিল যাও তুমি ফের।

(১৮)

তোবা তোবা বলি মিঞা দাড়ি নাড়া দিল,
তব ডরে যেতে নাহি স্বীকার করিল।
লাজ-ভয়ে অপমান পকেটে করিয়া,
ছল ছল চক্ষে গেল ঘরেতে ফিরিয়া।*

(১৯)

দশমুণ্ড মহাবীর নিকষা-নন্দন,
সংগ্রামে রামের সনে পাইল নিধন।
শতমুণ্ড-ধরা তুমি শতমুখী সতী,
তোমারে আঁটিতে নাহি কাহার শকতি।

(২০)

কোমরে কাপড় বেঁধে কুপিতা রমণী,
তোমারে ধরিয়া করে দাঁড়ায় যখনি,—
মনে হয় দণ্ডপাণি ভূভার হরিতে
নারীরূপ ধরি অবতীর্ণ অবনীতে।

(২১)

দিন যত কাছে আসে শারদী-পূজার,
বারাঙ্গনা-গৃহে রঙ্গ বাড়ে যে তোমার।
মিন্‌সে যদি ফরমাস্ কুলাইতে নারে,
পৃষ্ঠমাংস উঠে যায় তোমার প্রহারে।

(২২)

বেহায়া পুরুষ তবু বিড়ালের প্রায়,
লাজ ভয় নাহি মানে শুঁকে শুঁকে যায়।

* মিউনিসিপ্যালিটির একজন পিওনের সহিত এই ব্যাপার ঘটায়, আদালতে মোকদ্দমা হয়।

শুধুই তোমারে সেথা দেখি পরাজিত,
তোমার ভয়েতে তারা নহে বড় ভীত।

(২৩)

বৃদ্ধের তরুণী-ভার্য্যা-করেতে উঠিয়া,
অস্থি তার ভঙ্গ কর থাকিয়া থাকিয়া।
বুড়ো ভাবে মনে মনে লীলা যুবতীর,
এক চক্ষে হাসে অন্য চক্ষে বহে নীর।

(২৪)

হাসি-কান্না রোদ-বৃষ্টি করিয়া সৃজন,
লীলাময়ি কত লীলা কর প্রদর্শন।
গুণজ্ঞান জানে যারা তোমারে লইয়া,
তে-মাথায় রাখে ফেলে হাঁড়ি চাপা দিয়া।

(২৫)

কাঠ-খোলা বালি-খোলা সকল খোলায়,
খই মুড়ি ভাজিবারে তুমিই সহায়।
ভাজা ডাল নাড়ে নারী ঝাঁঝরে ফেলিয়া,
ঝাঁঝিকাটা* নাম তাই বাঙ্গালা জুড়িয়া।

(২৬)

যেই নর যেবা নারী ত্যজি ধর্ম্মপথ,
চলে সদা পুরাইতে পাপ মনোরথ।
শুনে না ধর্ম্মের বাণী বুঝে না বুঝালে,
ঝাঁটা তুমি উঠ গিয়া তাদের কপালে।

(২৭)

হায় ঝাঁটা, শৈশব কি ফিরিবে আবার,
চিন্তাশূন্য খেলা-ধূলা আনন্দ অপার!
পিত্তরাজ ফল তব কাটিতে বিঁধিয়া,
কি আনন্দে ছুড়িতাম সকলে মিলিয়া।

* ঝাঁঝি-কাটী, খোলা-কাটী ও কুচি-কাটী এই তিন নাম।

(২৮)

শীতকালে বড় বড় জেলো-হাড়ী থেকে,
তোমার কাটীতে ভূষো আনিতাম কেঁকে,
কালী ক'রে সরা ভ'রে কালিতে মাখিয়ে,
কাটী তব দিয়ে দ'তে দিতাম পুরিয়ে।

(২৯)

বাঁশের কলম ফেলি তব কাটীমুখে,
কালী দিয়ে তালপাতে লিখিতাম সুখে।
পুণ্যফলে পেলে জন্ম 'ষ্টাইলো' আকারে,
বাবুর পকেটে থাক বুকের মাঝারে।

(৩০)

ছোট মেয়ে সেজেগুজে বসিত বিকালে,
কাটী দিয়ে তুমি টিপ পরাতে কপালে।
বৃদ্ধের হুঁকার পঙ্ক করিয়া উদ্ধার,
জন্মান্তরে শিকরূপ হইল তোমার।

(৩১)

মার্জ্জার দংশনে কিম্বা নখাঘাতে তার,
তোমার কৃপায় লোক পায় যে নিস্তার।
মহাপ্রাণ তুমি নিজ অঙ্গ দগ্ধ করি,
ক্ষতস্থান পরশিয়া লহ বিষ হরি।*

(৩২)

এত গুণ তব তবু লাগ যদি গায়,
পায় ফেলি লোকে দেখি তোমারে মাড়ায়।
ঈশ্বরের সৃষ্টরাজ্যে এ কি অত্যাচার,
অনুমানে বুঝি দৈত্যরচনা সংসার।

(৩৩)

ধন্য তুমি ধন্য হেরি তব কর্ম্মযোগ,
ধূমকেতু-পুচ্ছরূপে কর স্বর্গভোগ।

* বিড়ালে আঁচড়াইলে বা কামড়াইলে ঝাঁটার কাটী পোড়াইয়া দিলে বিষ নষ্ট হয়।

অকৃতজ্ঞ মানবের শিক্ষাদান তরে,
মাঝে মাঝে দেখা দাও সুনিল অম্বরে ;—

(৩৪)

মহামারি অন্নাভাব করিয়া সৃজন,
অন্ধ-চক্ষু ফুটাইতে করহ যতন।
তবু ত গম্ভীর বেদী মাতঙ্গের প্রায়,
বুঝে না মানব থাকে বিভোর নিদ্রায়।

(৩৫)

জগতে বিবিধরূপে কর উপকার,
সাধিয়া লভেছ তুমি স্বর্গে অধিকার।
অক্ষয় হউক স্বর্গ প্রার্থনা কেবল,
গাইল এ দীনজনে শ্রীঝাঁটা মঙ্গল।

প্রায়শ্চিত্ত।

(লেখক, শ্রীযুক্ত অসিতমোহন ঘোষ হাজরা বি-এ।)

কি একটা সামান্য কথা লইয়া উচ্চশিক্ষিত যুবক পরিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার শ্বশুর রাধিকাবাবুর বিষম বিবাদ হয়। বিবাদের পরিণাম ফল যে অবশেষে ভীষণাকার ধারণ করিবে, তাহা রাধিকা বাবুর ধারণা ছিল না; তাহা হইলে তিনি কন্যার পিতা হইয়া সে কাজ কখনই করিতেন না। সামান্য ব্যাপার লইয়া জামাতার সহিত বিবাদ করা অবশ্য রাধিকাবাবুর অন্যায় হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু পরিমলকুমার শিক্ষিত হইয়া তাহার যে প্রতিদান দিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত নিন্দনীয়, গর্হিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্বশুরের সহিত বিবাদ করিয়া পরিমলকুমার তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্না পত্নী কমলাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া, দাম্ভিক শ্বশুরকে শাস্তি দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। এক দুই করিয়া তিন বৎসর অতিবাহিত হইল, পরিমলকুমার তথাপি পত্নীকে স্বগৃহে আনিলেন না বা তাহার

কোন সংবাদও লইলেন না। সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল কমলা স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইল। এই তিন বৎসরের ভিতর সে স্বামীকে অনেকগুলি পত্র দিয়াছে, কিন্তু কোনখানিরই উত্তর পায় নাই। দুর্জ্জয় অভিমানের বলে রাধিকা বাবুও জামাতাকে কোন পত্রাদি দিতেন না বা তাহার সংবাদ লইতেন না, সে কারণ পরিমলের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার সমস্ত আক্রোশ শ্বশুরের উপর পতিত না হইয়া তাহার অসহায়া নিরপরাধিনী পত্নীর উপর পতিত হইল; একজনের অপরাধে অন্যকে তাহার ফলভোগ করিতে হইল। এইরূপে আরও এক বৎসর অতীত হইল, কমলার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, সে তখন মাতার নিকট কান্নাকাটি করিয়া বলিল, "আমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও, নইলে আমি বিষ খা'ব।" কমলার মা কন্যার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইয়াছিলেন। তিনি মেয়েমানুষ, কমলার অন্তরের ব্যথা তিনি যতটা অনুভব করিতে পারিতেন, কমলার পিতা তাহা পারিতেন না, কিন্তু তিনি কর্ত্তার স্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন, তাই তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না। যাহা হউক, অবশেষে কমলা উপায়ান্তর না দেখিয়া, পিতার অমতে একজন দাসী সঙ্গে লইয়া শ্বশুরগৃহে চলিয়া গেল। রাধিকাবাবু কন্যার তাদৃশ ব্যবহারে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া পত্নীকে বলিলেন, "জীবন থাক্‌তে আর কমলার মুখ দেখ্‌ব না।"

দীর্ঘ চারিবৎসর পরে নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে কম্পিত-বক্ষে কমলা ধীরে ধীরে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিল। চারি বৎসর পরে সহসা কমলাকে নিজে হইতে শ্বশুরবাড়ী আসিতে দেখিয়া বাটীস্থ সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে পরিমলের পিতামাতা কমলার সঙ্গের ঝিকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রুপের সহিত বলিলেন, "বলি, তোদের বাবুর যদি এতই তেজ, তবে সেধে কেন মেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে! বেটা এত নবাব যে, নিজে না এসে একটা ঝির সঙ্গে মেয়ে পাঠিয়েছে! তুই সে বেটা চণ্ডালের মেয়েকে নিয়ে এখনই আমার বাড়ী হ'তে দূর হ', নইলে ঝাঁটাপেটা করে দূর করে দেব।"

কর্ত্তা-গৃহিণীর এতাদৃশ কথায় ও কমলার ইঙ্গিতে দাসী তৎক্ষণাৎ বাটীর বাহির হইয়া গেল। কমলা তাহাকে খরচপত্র দিয়া রাখিয়াছিল। সে গ্রামের কোন গৃহস্থের বাটীতে সেদিন অবস্থান করিয়া বাটী ফিরিয়া গেল। কমলা শ্বশুর-শাশুড়ীর শত অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া স্বামীর ঘরে পড়িয়া রহিল।

শত চেষ্টা করিয়াও কমলা স্বামীর সাক্ষাৎ পাইত না। পরিমল ইচ্ছা করিয়াই নিজেকে সর্ব্বদা তফাৎ রাখিত। শ্বশুরের দাম্ভিক ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া পরিমল কমলাকে আন্তরিক ঘৃণা করিত, সে কারণ কমলার সংস্রব তাহার সুখকর না হইয়া বরং অধিক মাত্রায় ক্রোধ বৃদ্ধির হেতু হইয়াছিল। শ্বশুর শাশুড়ী, এমন কি, দেবরেরা পর্য্যন্ত কমলার উপর অকথ্য অত্যাচার করিত এবং সময়ে সময়ে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কমলা অম্লানবদনে এ সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করিত। তাহার একমাত্র আশা, যদি তাহার হৃদয়-দেবতা কোন দিন তাহার প্রতি প্রসন্ন হ'ন, কিন্তু এক দুই করিয়া ছয়মাস চলিয়া গেল, তথাপি কমলার পাষাণ-দেবতার কৃপা হইল না।

এদিকে কমলাকে দূর করিবার জন্য বাটীস্থ সকল লোকই তাহার উপর যথোচিত অত্যাচার আরম্ভ করিল। প্রহার খাইতে খাইতে এক একদিন কমলার সংজ্ঞা লোপ পাইত, তথাপি সে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিতে চাহিত না।

একদিন কমলা সাহস করিয়া, রাত্রিকালে স্বামী যে ঘরে একাকী শয়ন করিতেন, সে ঘরে গমন করিয়া একেবারে পরিমলের পদতলে গিয়া বসিয়া পড়িল। পরিমল মুদ্রিত-নেত্রে কি চিন্তা করিতেছিলেন, সহসা নয়ন মেলিয়া কমলাকে দেখিয়া তিনি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "যদি ভাল চাও ত এখনি ঘর হ'তে বে'র হ'য়ে যাও, নতুবা গলায় হাত দিয়ে দূর করে দেব।"

কমলার দুই চক্ষু দিয়া দরদরধারায় জল পড়িতেছিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছ? ভগবান সাক্ষী, তোমার বিরহে চারি বৎসর যে আমার কি ভাবে কেটেছে, তাহা যদি তুমি জান্‌তে, তাহলে আমার উপর তোমার দয়া হ'ত। আমি জ্ঞানহীনা বালিকা, তোমার দুটি পায়ে ধর্‌ছি, আমাকে তোমার চরণ-সেবার অধিকার হ'তে বঞ্চিত ক'রো না।"

কিছুক্ষণের জন্য পরিমলের হৃদয় যেন কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই দুর্জ্জয় ক্রোধ আসিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় দখল করিয়া বসিল। তখন পরিমল কর্কশকণ্ঠে বলিল, "পা ছেড়ে দিয়ে চলে যাও, আমি তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না, যখন তোমায় পরিত্যাগ করেছি, তখন কোনমতেই গ্রহণ কর্‌বো না। যদি ইহার কারণ জান্‌তে চাও, তবে তোমার দাম্ভিক

পিতার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, ভাল চাও ত দূর হও, নতুবা সমুচিত ফলভোগ করতে হবে।"

কমলা তথাপি স্বামীর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। পরিমল বড়ই কোপন-স্বভাব ছিলেন, সহজেই চটিয়া যাইতেন; একে তাঁহার কমলার উপর আন্তরিক ঘৃণা, তাহার উপর কমলার অবাধ্যতা, উভয় কারণে তিনি কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া নবনীতদেহা কমলার কোমল পৃষ্ঠদেশে এমন বেত্রাঘাত করিলেন যে, তাহার পিঠ কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। কমলা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় পরিমল তাহাকে একখানি গাড়ী করিয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

(২)

উচ্চশিক্ষিত যুবক পরিমলকুমার পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিতে কোন দ্বিধা করিলেন না। আজকাল সমাজে কন্যার অভাব নাই, তাই প্রথমা পত্নী বর্ত্তমান সত্ত্বেও পরিমলকুমার অনায়াসেই নিমাই বাবুর কন্যা সুধামুখীকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইলেন। বিবাহের পর হইতেই শ্বশুর শাশুড়ীর আদেশে পরিমলকে শ্বশুরালয়েই থাকিতে হইত। পরিমলের ইহাতে কোন প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা ছিল না, কারণ তাঁহার শ্বশুর অবস্থাপন্ন। তিনি যাহা আদেশ করিতেন, পরিমলকে অবনতমস্তকে তাহাই করিতে হইত। ভাল-মন্দ বিচার করিবার তাঁহার অধিকার ছিল না। এইরূপে পরিমলকুমার শ্বশুর শাশুড়ীর ইচ্ছানুসারে সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইয়া শ্বশুর-বাটীতে থাকিয়া স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। পিতা-মাতার সহিত তাঁহার সমস্ত সম্পর্ক অচিরে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইহাতে পরিমলের কোনই দুঃখ হইত না, যদি তাঁহার পত্নী সুধামুখী কমলার শতাংশের একাংশ গুণের অধিকারিণী হইত। সুধামুখী নিমাইবাবুর একমাত্র কন্যা। সে ছেলেবেলায় যখন যাহা ইচ্ছা হইয়াছে করিয়াছে, তাহার পিতা-মাতা তাহার জন্য তাহাকে কখনও শাসন বা তিরস্কার করিতেন না। সে কারণ, সুধামুখী শৈশব হইতেই কোন সৎশিক্ষা পায় নাই বরং অসৎ শিক্ষাই পাইয়াছিল। স্বামী যে স্ত্রীলোকের একমাত্র আরাধ্যদেবতা, সে জ্ঞান তাহার কখনই ছিল না। সে জানিত, সে বড়লোকের মেয়ে, যখন যাহা ইচ্ছা করিবে, তখনই তাহার স্বামীকে অবনতমস্তকে তাহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। যে আদেশ করিবে, পরিমলকে তাহা পালন করিতে হইবে। পরিমল আদেশ করিলে তাহাকে যে তাহা পালন

করিতে হইবে, এ জ্ঞান তাহার ছিল না। সে কারণ, সুধামুখীর সহিত পরিমলের মধ্যে মধ্যে কলহ হইত। সুধামুখী সেই সমস্ত ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়া মাতার নিকট বর্ণনা করিত। ইহাতে পরিমলের শ্বশুর-শাশুরী জামাতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। পরিমল সমস্তই বুঝিতেন কিন্তু প্রতিকারের উপায় ছিল না বলিয়া, মুখ বুজিয়া সমস্ত সহ্য করিতে বাধ্য হইতেন।

এদিকে পরিমলের পিতা-মাতা স্নেহের তনয়কে আঁচল ছাড়া করিয়া চক্ষের জলে দিন কাটাইতে ছিলেন। শ্বশুর শাশুড়ীর হুকুমানুসারে পরিমল কুমার পিতামাতাকে একখানি পত্র পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। যাহা হউক, অবশেষে পত্নীর অনুরোধে লজ্জার মাথা খাইয়া পরিমলের পিতা এক দিন পুত্রের সংবাদ লইবার জন্য বেহাই বাড়ী যাইতে বাধ্য হইলেন। সে দিন রবিবার, সূর্য্য তখন মাথার উপর প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় পরিমলের বৃদ্ধ পিতা বেহাই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি চাকরকে ডাকিয়া অন্দরমধ্যে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। পরিমলের শ্বশুর একটি ঘরে বসিয়া জমাখরচ নকল করিতে ছিলেন এবং পরিমল তাহাই বলিয়া দিতেছিলেন। চাকরের মুখে পরিমলের পিতার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিমাইবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া জামাতাকে কর্কশ-কণ্ঠে বলিলেন, "আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে পিতা-মাতার সংবাদ রাখা হয় দেখ্‌ছি! আমাদের যদি কোন কথা না রাখ, তুমি অনায়াসে এখান হ'তে যেতে পার। সুধামুখী আমার একমাত্র মেয়ে, তার খাওয়া-পরার এখানে কোন অভাব হবে না।"

জামাতা বিনিতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি ত আপনাদের কথামত সমস্তই কাজ করি।"

নিমাইবাবু ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, "যদি আমাদেরই কথামত কাজ কর, তবে তোমার পিতাটী এমন অসময়ে এখানে এলেন কিরূপে? ভিতরে ভিতরে বাপ্-বেটায় নিশ্চয় কোন ষড়যন্ত্র চল্‌ছে। তা চলুক, তাহাতে আমি ভয় করি না। ষড়যন্ত্র করিয়া যে আমার মেয়েকে নিয়ে যাবে তা কিছুতেই হবে না।"

শ্বশুর ও জামাতায় এইরূপ তর্কবিতর্ক হইতেছিল, এমন সময় পরিমলের পিতা অন্দরে আসিয়া "পরিমল" বলিয়া ডাকিলেন। শ্বশুরের সম্মুখে পরিমল পিতার আহ্বানে উত্তর দিতে পারিলেন না।

নিমাইবাবু অপ্রসন্নমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া ঈষৎ বিদ্রূপের সহিত বলিলেন, "কে, বেহাই মহাশয়! বিনা নিমন্ত্রণেই যে কুটুম্ববাড়ী এসেছেন? আপনাদের দেশের লোকগুলির কি মান-অপমান জ্ঞান নাই?"

প্রথম কুটুম্ববাড়ী আসিয়া এইরূপ সম্ভাষণে পরিমলের পিতা যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু তিনি বড় আশা করিয়া, একমাত্র স্নেহের তনয় পরিমলকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেই কারণ, বৃথা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "অনেক দিন পরিমলকে দেখি নাই, তাই তাহাকে দেখিবার জন্য এসেছি। আর তাহার মায়েরও ইচ্ছা যে, একবার দেখা দিয়া আসে।" এই কথায় নিমাইবাবু ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কহিলেন, "আমি আপনার ছেলেকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি, তাহার উপর আপনার কি এমন দাবী আছে যে, আপনার ইচ্ছামাত্র তাহাকে সে স্থানে যেতে হবে! যখন এসেছেন, তখন খাওয়া-দাওয়া ক'রে, বাড়ী যান, আর গিন্নীকে বল্‌বেন যে, তাঁর ছেলেকে যদি দেখ্‌বার সাধ হয়ে থাকে, তবে এখানে এসে দেখে যেতে পারেন।"

এই সমস্ত কর্কশকথা শ্রবণ করিয়া, পরিমলের পিতার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখন তাঁহার মনের মধ্যে কমলা-সংক্রান্ত সমস্ত অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "ভগবান আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন।"

পিতাকে চক্ষের সম্মুখে এরূপভাবে অপমানিত হইতে দেখিয়াও পরিমল চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি অন্তরের মধ্যে শত বৃশ্চিকের দংশন-জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হইয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। স্নানাহার না করিয়াই পরিমলের পিতা পুত্রকে দূর হইতে দেখিয়া প্রস্থান করিলেন। পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া পরিমলের কান্না আসিবার উপক্রম হইল, কিন্তু শ্বশুরের সম্মুখে তাহার কাঁদিবারও শক্তি ছিল না।

পিতা চলিয়া গেলে, পরিমল ছোট একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনার অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার কাতরতা-পূর্ণ কমলার ম্লানমুখছবি হৃদয় মধ্যে ধীরে ধীরে উদিত হইল। কেবল মাত্র তাঁহার চরণ-সেবার অধিকার পাইবার জন্য কমলা কত অসহ্য অত্যাচার, কুসুম-কোমল নবনীত পৃষ্ঠে প্রহারের কত নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করিয়াছিল, তথাপি পরিমলের পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয় নাই। বিদায়ের রাত্রে অশ্রুমুখী সরলা-বালিকা তাঁহার দুটী পায়ে ধরিয়া কত সাধিয়াছিল, কত কাঁদিয়ছিল, বিনিময়ে কেবল লাঞ্ছিতা

ও নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃতা হইয়া অবশেষে গৃহ হইতে বল পূর্ব্বক বহিষ্কৃতা হইয়াছিল। এখন সেই সকল অতীত স্মৃতি মনের মধ্যে উদিত হইয়া তাঁহাকে অনুক্ষণ দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি মনে মনে কেবল চিন্তা করিতেন, "যদি আর একবার কমলার দেখা পাইতাম।"

(৩)

স্কুল হইতে আসিয়া পরিমল একদিন নির্জ্জনে বসিয়া আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় পিয়ন আসিয়া তাঁহাকে একটা তার দিয়া গেল। সংবাদ দেখিয়াই তাঁহার প্রাণ একেবারে আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার পিতা তার করিয়াছেন, "তোমার মাতার কলেরা হয়েছে, একবার তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।"

পরিমল তৎক্ষণাৎ সুধামুখীকে ডাকিয়া মাতার অসুখের কথা বলিয়া সাত দিনের জন্য ছুটী চাহিলেন। সুধামুখী একটুখানি উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "ও সব মিছে কথা, তোমাকে কৌশলে নিয়ে যাবার ফিকির।"

এত বড় একটা দুঃখ সংবাদ লইয়া, নিজের অতি নিকট-আত্মীয়ও যে কেহ কখনও হাসিতে পারে বা উপহাস করিতে পারে, এ ধারণা পরিমলের ছিল না। তিনি সুধামুখীর ব্যবহারে যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন, নিজেকে সংযত করিয়া তিনি বলিলেন, "সুধা! তুমি জান না, পিতা আমার মিথ্যা কথা বলেন না। মায়ের নিশ্চয় অসুখ হইয়াছে, দোহাই তোমার, আমাকে সাতদিনের জন্য বিদায় দাও। আর যদি মিথ্যাই হয়, আমি ২।৩ দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।"

স্বামীকে আজ প্রথম তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে দেখিয়া, সুধামুখী রাগিয়া বলিল, "যাহা ভাল হয় কর গে, আমি কিছুই জানি না" এই বলিয়া সে মাতার নিকট গিয়া সমস্ত কথা সবিস্তারে বলিল। শ্বশুর-শাশুড়ী রাগিয়া জামাতাকে যারপরনাই অপমানিত করিলেন। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পরিমল যেমন বেড়াইতে যাইত, তেমনই বেড়াইতে বাহির হইল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পরিমল যখন বাড়ী ফিরিল না, তখন সকলেই ভাবিল যে, সে বাড়ী পলাইয়া গিয়াছে। সুধামুখী শয়নঘরে বালিশের নীচে একখানি পত্র পাইয়া পড়িয়া দেখিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল:—"সুধা, আমি জীবন থাকিতে আর এখানে আসিব না। কমলার প্রতি যে পাশবিক অত্যাচার করেছি, ভগবান তার উপযুক্ত শাস্তি দিতেছেন। তোমার কোন দোষ নাই। আশা ত্যাগ করো।"—ইতি "পরিমল।"

সুধামুখী পত্রখানি মাকে দেখাইল, মা আবার কর্ত্তাকে দেখাইলেন। কর্ত্তা-গিন্নী উভয়েই জামাতার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন।

আকুল আগ্রহে পরিমল বাড়ী গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, তাঁহার বহুপূর্ব্বে লোকমুখে সংবাদ পাইয়া তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা কমলা আপনা হইতে আসিয়া শাশুড়ীর পরিচর্য্যা করিতেছিল, দেবী-প্রতিমা কমলার এই অলৌকিক ব্যবহারে পরিমল একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

কমলা সহসা স্বামীকে দেখিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। পরিমলের মাতা তখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলেন। বধূমাতার সেবা ও যত্নে তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। পরিমল মাতার কাছে অনেক কথাই বলিলেন, চোখের জলে ভাসিয়া অনেক অনুতাপ করিলেন। এইরূপে বহুদিন পরে মাতা-পুত্রের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল।

সেদিন পরিমলের মাতা অনেকটা সুস্থ ছিলেন বলিয়া, বধূমাতাকে পরিমলের শয়নঘরে গিয়া নিদ্রা যাইতে আদেশ করিলেন। শাশুড়ীর আদেশে দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে কমলা তাহার একমাত্র অন্তরের দেবতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তখন তাহার হৃদয় মধ্যে কিরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা বর্ণনার অতীত।

পরিমল নয়ন মুদ্রিত করিয়া কত কি ভাবিতেছিলেন; কমলা আস্তে আস্তে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহার পদতলে বসিল। আর একদিন এমনি সময়ে, এমনি ভাবে সে কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছিল, তাহাই মনে করিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। পরিমল দ্রুত উঠিয়া একেবারে কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন। দুই জনেই কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর পরিমল বলিলেন, "আমি নিতান্ত অধম, নিতান্ত পাষণ্ড। আমি তোমার ক্ষমার যোগ্য নহি, তবে যদি তুমি দয়া করিয়া ক্ষমা কর, তাহা হইলে ধন্য হ'ব।"

কমলা উত্তর করিল "আমি তোমার চরণের দাসী মাত্র, আমার কাছে তোমার অপরাধ কি? তুমি যে দয়া ক'রে আমায় চরণ-সেবার অধিকার দিলে, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য।"

কমলার ঈদৃশী পতিভক্তি দেখিয়া পরিমল অবাক্ হইয়া গেলেন। অনেক সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তার পর উভয়েই নিদ্রিত হইলেন। সেই শেষ রাত্রে পরিমল

কলেরায় আক্রান্ত হইলেন। কমলা অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ডাক্তার আসিয়া অবস্থা বড়ই শোচনীয় দেখিলেন। ঔষধ, শুশ্রূষা রীতিমত চলিতে লাগিল। কমলা একান্ত ভক্তির সহিত কালীর চরণে বার বার নমস্কার করিয়া মনে মনে বলিল, "মা, আমি তোমার নিতান্ত জ্ঞানহীনা কন্যা, যদি তোমার পায়ে কোন অপরাধ হয়ে থাকে, তবে ক্ষমা করো। আমি চির অভাগিনী। বহু কষ্টে স্বামীর কৃপা লাভ করেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হারাতে বসেছি। দেখো মা, তোমার দুঃখিনী কন্যার হাতের নোয়া যেন বজায় থাকে।"

স্বামীর মঙ্গল কামনায় কমলা যখন একমনে মা কালীকে ডাকিতেছিল, তখন সুধামুখী পিতার সহিত আসিয়া বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইল। পরিমলের পিতা নিমাই বাবুকে দেখিয়াই বলিলেন, "নিমাই বাবু যে? কি মনে ক'রে এ ধারে এসেছেন?"

নিমাই বাবু নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "জামাতা বাবাজীবনের অসুখ শুনে এসেছি। পরিমল কেমন আছে, একবার তাকে দেখ্‌বো।"

পরিমলের পিতা উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কিছুতেই তা হবে না, আমার ছেলে মরে যায় সেও ভাল, তবুও আপনার মত অভদ্রের সহিত দেখা-শুনা কোন মতেই হবে না।"

নিমাই বাবু উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ ও ভগ্নহৃদয়ে কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

যৌবন।

(লেখক—শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী।)

হে যৌবন! এক দিন আমার এ গেহ
করিলে উজ্জ্বল তুমি দিয়া প্রেম-প্রীতি—
সাজা'লে ভূষণে তা'রে করি কত স্নেহ,
অকারণে ভালবাসি অজ্ঞাত অতিথি!
দেখিতে দেখিতে হাসি এল ঋতুরাজ—
কুঞ্জে কুহরিল পিক—গুঞ্জরিল অলি!

ধরিত্রী পরিল ক'নে-দেখানোর সাজ—
মধু-বাসে ঢল ঢল—ফুটি চিত-কলি!
মধুর পরশে তব একি ইন্দ্রজাল!
উথলিল বিশ্বমাঝে কি সুধা-তরঙ্গ—
অন্তরে বাহিরে যেন সব মাতোয়াল—
কাহার পরশ-আশে মত্ত প্রতি-অঙ্গ!
যৌবনের যত ব্যথা—যত অশ্রুরাশি
মধুর এ সুখ হ'তে—হ'তে এই হাসি।

সমর্পণ।

(শ্রীমতী চারুলতা দেবী বিরচিতা।)

স্তিমিত আলোকে ঘেরা সন্ধ্যার আকাশ,
নিবিড় কুহেলীরাশি, পূরবে ঘিরেছে আসি,
বহিতেছে ধীরে ধীরে শীতল বাতাস।

বিমুক্ত গগন-তলে আছি দাঁড়াইয়া,
পশ্চিম আকাশে বসি, মৃদু মৃদু হাসে শশী,
দু' চারিটি তারা হাসে আমারে চাহিয়া।

ফুরায়েছে দিবসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ,
নাই জন-কলরোল, নাই কিছু কোলাহল,
বিজনে এসেছি তাই ওগো বিশ্বরাজ!

ধর তুমি দিবসের অবসাদ মোর,
বহিতে এ গুরুভার, আমি তো পারি না আর,
এখন হইতে চাই তোমাতে বিভোর।

লও কাজগুলি নাথ, আমাকেও লও,
তোমার চরণ-তলে, সকলি দিতেছি ঢেলে,
স্নেহময়, স্নেহভরে আঁখি তুলে চাও।

তরুর তেজ।

(শ্রীযুক্ত রসময় লাহা বিরচিত।)

(১)

কোথায় যাচ্ছ তরুবালা, দেখ্‌তে তোমায় বেড়ে!
"দুধ জুগিয়ে আস্‌ছি ফিরে, দেখ্‌ছ না এই কেঁড়ে।"
সঙ্গে কোরে নিয়ে আমায় যাবে তোমার ঘর?
"দয়া ক'রে এস যদি আমার প্রিয় বর।"
তোমার বাপের বিষয় কত বর যে হব তরু?
"মরাই ভরা ধান আছে আর গোয়াল-ভরা গরু।"

(২)

তোমার কি বর হব শেষে দিয়ে বি-এ পাশ।
"ভুলে গেলে বিনা পণে পর্‌বে বিয়ের ফাঁস?"
গ্রাজুয়েট কি হয়ে শেষে বিয়ে কর্‌বো ফাঁকা?
"রূপের চেয়ে হল বুঝি বড় রূপার টাকা?"
আমি এখন এন্ ঘোষ যে বুঝ্‌তে পাচ্চ তরু?
"বুঝ্‌বো কিসে?—আমাদের যে গোয়াল-ভরা গরু।"

(৩)

বিনা টাকায় তোমায় বিয়ে কর্ল্লে কি আর সুখ?
"কেন—অবাক্ হয়ে শুধু দেখ্‌বে আমার মুখ।"
রূপের সঙ্গে রূপার মিলন বাড়ায় ভালবাসা,
"বেশ ত—টাকা উপায় ক'রে মিটিয়ো মনের আশা।"
মোটা টাকা যৌতুক নৈলে বিয়ে কি হয় তরু?
"কারণ এখন এন্ ঘোষ যে—নও ত আর সে নরু।"

(৪)

তোমায় বিয়ে কর্ল্লে পরে লাভ কি বল শুনি?
"এই রূপের লোভে এখনো যে হচ্চ খুনোখুনি।"
কিন্তু টাকা নৈলে বিয়ে করি কেমন করে?
"না কর্ল্লেও বয়ে গেল কাঁদ্‌ছে কে পায় ধরে।"
চোট না—এই বিদ্যা-জোরেই বুদ্ধি হল সরু,
"থুব্‌ড়ি থাকি সেও ভাল—চাই না অমন গরু।"

তাই ভালো।

(লেখক—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,)

(১)

তাই ভালো তাই ভালো
আরো ঢালো আরো ঢালো
দুঃখ-হলাহল তীব্র হৃদয়ে আমার।
যত মোর হৃদ্-ক্ষত
বৃশ্চিক-দংশন মত
জ্বলে যাক্ দহনেতে ভীম যাতনার॥

(২)

বিঁধ যদি বজ্রবাণে
তবুও নয়ন-কোণে
দেখিবে না অশ্রু-বারি হইতে উদয়।
মুখেতে তবুও মোর
শুনিবে না আর্ত্তস্বর
মরমে মরিব তবু না ক'ব কথায়॥

(৩)

সমুদ্রে বসতি যার,
জলবিম্বে ভয় তার?
নদী-মাঝে বাস করি কুমীরের ভয়?
যা হবার হয়ে গেছে
আর কিবা বাকি আছে
ভাঙ্গা বুক ভেঙ্গে গেছে নিরাশার ঘায়॥

(৪)

তাহে কিবা আপশোষ
তাহে কেন অসন্তোষ
বিধির বিধান বল কে করে খণ্ডন।

অদৃষ্টের লিপি যাহা
অবশ্য ফলিবে তাহা
তা বলে কি হবে বল করিলে রোদন ॥

(৫)

শত মর্ম্ম-যাতনায়
হৃদি যার ভেঙ্গে যায়
সে জন কি করে কভু সুখের প্রয়াস ?
বেঁচে কিবা ফল আর
মরণ মঙ্গল তার
মরণ পূরায় তার জীবনের আশ ॥

(৬)

আমারো হৃদয় হায়
ভেঙ্গে গেছে নিরাশায়
বুকেতে নিরাশা ঢেউ বহে দিনরাত ।
মৃত্যু ভালে লেখা নাই
আমার কপালে ছাই
যমও আমারে হায় সাধিতেছে বাদ ॥

(৭)

না না —
আর অশ্রু ফেলিব না
আর আমি কাঁদিব না
আর না করিব আমি লোক জানাজানি ।
কর্ম্মফল মোর যাহা
আমিই সহিব তাহা—
পরে কেন শুনিবে সে বিষাদের বাণী ॥

(৮)

বিভো !
যাহা দেবে তাই নে'ব
তাই পেয়ে সুখী হব
"আশা না পূরিল মোর" বলিব না আর ।

তুমি আছ প্রাণে যার
অপূরণ কিবা তার—
মরতে স্বরগ লাভ হাতে হাতে তার ॥

ভূত।

(লেখক—শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন ।)

পুরাকালে, পাশ্চাত্যদেশে সকলেই ভূত বিশ্বাস করিতেন। শুধু বিশ্বাস নহে, অনেকে ভূত দেখিতেও পাইতেন। ব্রিটন জাতির মধ্যে যে সব প্রবাদ প্রকাশিত ছিল, সেগুলির মধ্যে ঐ বিশ্বাসের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া, সেক্ষপীয়র প্রভৃতি কবির কাব্যে, রেণল্ডস্ প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের উপন্যাসেও ভূতের কথা দেখা যায়; তার পর ভূত-বিশ্বাস একেবারে উড়িয়া যায়। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-জগতে যদি কেহ 'ভূত বিশ্বাস করি বা ভূত দেখিয়াছি' এমন কথা বলিত, তাহা হইলে তাহার উপর অজস্রধারায় বিদ্রূপ-বাণ বর্ষিত হইত। তাহাকে সকলেই ঘোর মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিম্ভূত-জীব বলিয়া ধরিয়া লইত। আবার এই ৫০।৬০ বৎসর যাবৎ ইউরোপ, আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মনীষিগণ সমিতি সঙ্ঘ করিয়া বিজ্ঞানের পথে ভূতের খোঁজ-খবর লইতেছেন। তাঁহারা এই অনুসন্ধানের ফলে ভূত দেখিয়াছেন, ভূতের কথা শুনিয়াছেন, ভূতের ফটো তুলিয়াছেন, ভূতকে ওজন করিয়াছেন ও ভূতের শরীর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ভূত সম্বন্ধে, সূক্ষ্ম-জগৎ সম্বন্ধে, আত্মা, চিন্তা-মূর্ত্তি, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বিষয়ের এখন তীব্র অনুসন্ধান চলিতেছে; এখন শতকরা ৯৯ জন পাশ্চাত্য-জগতে ভূত বিশ্বাস করে। শুধু বিশ্বাস নহে;—বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে যাকে-তাকে যখন-তখন ভূত দেখান চলে। পাশ্চাত্য-জগৎ এখন ভূতের আলোচনায় আলোড়িত বিলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে।

আমি ভূতের কথা লিখিতে বসিয়া পাশ্চাত্য-জগতের কথা প্রথমেই পাড়িলাম কেন? কারণ, আমরা এখন পদে পদে পাশ্চাত্যদের অনুসরণ করিয়া চলি। পাশ্চাত্যেরা যদি বলে, ভূত নাই—অমনি আমরাও তারস্বরে

চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠি—ভূত নাই! সাহেবরা যদি বলে, ভূত আছে, অম্‌নি আমরাও বলিয়া উঠি, ভূত আছে বই কি, আছে বই কি, নইলে কথাটি আসিল কোথা থেকে? মেরুদণ্ডহীন জীব আমরা, আমাদের এথন এই অধোগতি, এই দুর্দ্দশা, এই বানর-প্রকৃতি।

আমাদের পদ্ম-পুরাণে ভূতের কথা আছে। পুরাণ খাঁটি সত্য জিনিস। আমরা বুঝি না বলিয়া পুরাণের কথাগুলি গাঁজাখুরী মনে করি। "Puranas in the light of Science" নামক গ্রন্থে পুরাণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে পুরাণের মাহাত্ম্য ও আমাদের মূর্খত্ব, অসারত্ব বুঝা যায়। মনীষী শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তদীয় দেবতত্ত্ব নামক পুস্তকের এক স্থানে বলিয়াছেন যে, সূক্ষ্ম-জগতের ব্যাপার পুরাণে বর্ণিত আছে, অতএব পুরাণই খাঁটি সত্য, তাহার ছায়া বাস্তব বা স্থূল-জগতে প্রকটিত হইতেছে। তিনি বলেন, পুরাণ কায়া, এ জগৎ ছায়া; পুরাণ প্রকৃত ব্যাপার, এ জগৎ তাহার প্রতিবিম্ব। তবেই দেখা গেল, পুরাণ কতই সত্য, কতই মহান্। আর যদি পুরাণ না মান, তবে বেদ, উপনিষৎ, গীতা এগুলি তো মানিতেই হইবে। বেদ, উপনিষৎ ভগবানের মুখ-নিঃসৃত অভ্রান্ত সত্য, ইহা জার্ম্মাণ দেশের বড় বড় ধুরন্ধর পণ্ডিতরাও স্বীকার করিয়াছেন। সেই উপনিষৎ সমুদ্র মন্থন করিয়া সারাৎসার গীতার উদ্ভব হইয়াছে। সেই গীতাতেও ভূতের কথা আছে। আমি পুরাণ বা গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কর্ণপীড়া ঘটাইতে চাহি না। ভূতের পূজা প্রভৃতির কথা যে গীতায় আছে তাহা গীতা যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন। এমন যে অভ্রান্ত গীতা তাহাতেও ভূতের কথা আছে। তুমি ক্ষুদ্র জীব; ভূত মানি না, ভূত বিশ্বাস করি না, এ কথা বলিবার তোমার কি অধিকার আছে? হইতে পারে—তুমি পাশ্চাত্য-বিদ্যায় কিয়ৎপরিমাণে পারদর্শী হইয়াছ, হইতে পারে—তুমি কেম্ব্রিজ, অকস্‌ফোর্ডে কিছুদিন পড়িয়া অথাদ্যে পরিপুষ্ট হইয়াছ, হইতে পারে—অনুকরণবিদ্যায় তুমি শাখামৃগের অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছ,—তাহাতে কি তোমাকে ব্যাস বশিষ্ঠের আসন দিব? পাশ্চাত্য-দেশের যাঁহারা মনীষী—সেই জগদ্বিখ্যাত অলিভার লজ, সেই স্বনামধন্য ক্রুক্‌স্ ষ্টেড্, ওয়ালেস্ প্রভৃতির তুলনায় তোমার বিদ্যা কতটুকু; তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা, তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমা সমুদ্রতুল্য, আর তোমার বিদ্যা ও জ্ঞান গোষ্পদ বলিলেও চলে। তাঁহারা যখন গীতা উপনিষদের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,

তুমি কে হে বাপু, যে গীতা মানি না, উপনিষৎ মানি না, বলিয়া নিস্তার পাইবে? অতএব তোমার উপাস্য যে ইংরেজ, ফরাসী, তাঁহারাও গীতার কথা, পরলোকের কথা, দেহাতিরিক্ত আত্মার কথা, ভূতের কথা, চিন্তা-মূর্ত্তির কথা, পিণ্ডদেহ প্রভৃতির কথা, সাগ্রহে সোৎসাহে বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে, পুলক-স্ফুরিত নয়নে, আনতশিরে স্বীকার করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। তুমি জ্ঞান-গোষ্পদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শফরী, তুমি স্বীকার না করিবে কেন?

তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইলাম, তুমি চর্ম্মচক্ষে যাহা দেখিবে, তাহাই মানিবে; তা ছাড়া আর কিছু মানিবে না। ভাল, অল্‌কট সাহেব যে সেদিন মজ্‌লিসের মধ্যে জেণ্ট্ নাম্নী একটি প্রেত্‌নীকে ওজন করিলেন, তা কি মানিতে চাও না? মজলিসের মধ্যে দিনে-দুপুরে ঘরের মধ্যে বিলাতে জাপানের প্রকাণ্ড একটি ফুলের গাছ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মাকারে আনিয়া ফুটাইয়া তুলিল, এ কথা কি মানিতে চাও না? শুধু ফুটান নহে, সকলে সেই গাছ স্থূলহাতে স্পর্শ করিয়া দেখিল, অনেক দিন কাছে রাখিল, কা'র বাগানের গাছ তাহা টেলিগ্রাফ করিয়া জানিল, এ সব ব্যাপারের সন তারিখ দিয়া হিসাব রাখা হইয়াছে। এ সব না মানিবে কেন? একজন লোকের দৃষ্টিভ্রম ঘটিতে পারে, একটা মজলিস শুদ্ধ লোকেরই দৃষ্টিভ্রম হইল, ইহা কি সম্ভব? অলিভার, লজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ কি মিথ্যাবাদী? তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব কি তোমার আমার অপেক্ষা কম, তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তুমি এত স্পর্দ্ধা কি রাখ যে, তাহা মিথ্যা বলিয়া মানিতে চাও না? এরূপ ক্ষেত্রে তোমার বুদ্ধির হীনতা স্বীকার করাই কি সমীচীন নহে?

পাশ্চাত্য মনীষীদিগের কথা ছাড়িয়া দিলাম। আমাদের অভেদানন্দ স্বামী Spiritualism and Vedanta পুস্তকে বলিয়াছেন,—"ভূত বাস্তবিকই আছে; আমি আধ ঘণ্টা ধরিয়া ভূতের সঙ্গে গল্প করিয়াছি; তাহারা অধিকাংশই অজ্ঞান, খল ও নিষ্ঠুর।" অভেদানন্দ এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার জ্ঞান-গরিমার মহিমা তুমি আমি না বুঝিলেও সভ্যতার লীলাক্ষেত্র আমেরিকা তাহা বুঝিয়াছেন। আমেরিকায় তিনি দৃপ্ত রবি; তাঁহার বেদান্ত ব্যাখ্যায় সেখানকার নর-নারী মুগ্ধ। সেই জীবিত জ্ঞান-গুরুর কথা কি মানিয়া লইবে না? আচ্ছা, তাও যদি না মানিয়া লও, যদি প্রত্যক্ষদৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই মানিতে না চাও, তবে সেই প্রত্যক্ষের পথেই চলো। পণ্ডিতপ্রবর

ষ্টেড্ বলিয়াছেন,—যাহারা ভূতের অস্তিত্বে সন্দহীন, তাহারা অশিক্ষিত। তোমাকে এ গালাগালি মাথায় করিয়া লইতে বলি না। তুমি সুবোধ ছেলের মত ভূত প্রত্যক্ষ করিতে প্রস্তুত হও। লেড্ বিটার একজন যোগী; তিনি বলিয়াছেন,—সন্ধ্যাকালে একপায়াবিশিষ্ট একটি গোল টেবিলের উপর একটা শোলার টুপী চীৎ করিয়া রাখিয়া তিন জনে আল্‌গাভাবে সেই টুপীটির উপর হাত রাখিয়া কোন একটা মরা মানুষের কথা ভাবিও;—আধ ঘণ্টার মধ্যেই ব্যাপার বুঝিতে পারিবে। এ ত শক্ত কার্য্য নহে, যে সে যখন-তখন ইহা করিতে পারে। ভূত মানি না বলিয়া বৃথা মূর্খতা প্রকাশ না করিয়া লেড্ বিটারের উপদেশ মত কাজ করিয়া দেখ, তাহা হইলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিয়া যাইবে। যদি এত অলস হও যে, ঐটুকুও করিতে না পার, তবে দু' পা সরিয়া বিজ্ঞানের আচার্য্যদিগের কাছে গুটী-সুটী হইয়া যাইয়া দাঁড়াও। তাঁহাদের কাছে নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে জীবাত্মার মূর্ত্তি চর্ম্ম-চক্ষে দেখিয়া আইস। রাত্রিকালে যে সকল প্রাণীর চক্ষু জ্বলে, বৈজ্ঞানিকরা তাহাদের চক্ষু হইতে একটি তরল পদার্থ লইয়া একটি ফলকের উপর মাখাইয়া সেই ফলকে দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার ফটো তুলিতেছেন। ঐ তরল পদার্থের নাম Rhodopsin। যিনি যত বড় অবিশ্বাসীই হউন, এখন হেটমুণ্ডে তাঁহাকে পিণ্ডদেহ—লিঙ্গ-শরীর চর্ম্ম-চক্ষে দেখিয়া মানিতে হইতেছে। বিজ্ঞান চোখে আঙ্গুল দিয়া সূক্ষ্ম-দেহ দেখাইয়া দিতেছে, ভূতের ফটো তুলিয়া লইতেছে; এখন আর ফাঁক করিয়া, ভূত নাই—ভূত মানি না, বলিবার যো নাই। ভূত এখন বিশ্বাসের বস্তু নহে, তর্কের জিনিস নহে, নাস্তিকের উপহাসের বিষয় নহে, ভূত এখন বিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু, শিক্ষিতের আদরের দ্রব্য। রোডোপ্‌সিনের যন্ত্রে যে সূক্ষ্মদেহ দৃষ্ট হইতেছে, উহাই ভূত। স্থূলদেহাতিরিক্ত যে জীবাত্মা, তাহাই ভূত। ভূত এখন প্রত্যক্ষের বিষয়।

ক্রমবিকাশের নিয়মাধীন হইয়া বিজ্ঞান এখন যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভূত চর্ম্ম-চক্ষে দেখা দিতেছে। আশা করা যায়, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভূতের সঙ্গে মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধ, সামাজিক সম্বন্ধ, বন্ধুত্ব, মিলা-মিশা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। কালে স্থূল-জগৎ ও সূক্ষ্ম-জগতের উপাদেয় সংশ্লেষ ফুটিয়া উঠিবে। অন্ততঃ যোগী-প্রবর লেড্‌বিটার এরূপ সুখের কল্পনা বা আশা করিয়াছেন।

বিজ্ঞানের পথে ভূতের তথ্য কতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে শুন।

১। বায়ু-মণ্ডলে অসংখ্য ভূত-যোনি বিদ্যমান আছে।

২। উহারা মানুষের নিকট উপকার পাইবার আশায় আসে; কিন্তু মানুষ উহাদিগকে দেখিবামাত্র ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, সুতরাং উহাদের মনের কথা বলা হয় না; কাজে কাজেই উহারা দুঃখিত হইয়া চলিয়া যায়।

৩। উহারা কখন কখন অত্যাচার করিতেও আইসে; অনেককে মারিয়া বসে, ঘরের জিনিস-পত্র নষ্ট করিয়া দেয়। আবার কখন কখন নিঃস্বার্থভাবে উপকারও করে; বিপদ থেকে রক্ষা করে। মানুষের মধ্যে যেমন ভাল মন্দ আছে, উহাদের মধ্যেও সেইরূপ ভাল মন্দ আছে। খুব বেশী ভূতই অনুতপ্ত, দুঃখিত, উপকার প্রার্থী।

৪। উহারা খুব বেশী সময় স্বপ্নে দেখা দেয়। সেইরূপ দেখা দেওয়াই উহাদের পক্ষে সহজ। যখন তাহাতে কাজ হইল না বুঝে, তখন শব্দ করিয়া নিজেদের আগমন জ্ঞাপন করে। তখনও যদি কেহ উহাদের কথা বুঝিয়া উঠিতে না পারে, তখন মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়।

৫। ভূত মূর্ত্তি ধরিলে, সে মূর্ত্তি স্বচ্ছ হয়। উহাদের দেহ স্বচ্ছ। যে মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে, তাহা ধূঁয়ার মত কোমল, কেবল হাতের খানিকটা বা কথা কহিবার জন্য গলার খানিকটা স্থূল ও শক্ত করিয়া তুলে। সমগ্র শরীরটা শক্ত করিয়া তোলা উহাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর।

৬। মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেওয়া ভূতের পক্ষে বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। যে দেহ ধরিয়া দেখা দেয়, তাহাও বেশীক্ষণ থাকে না। আলোকরশ্মির ঘাত-প্রতিঘাতে উহার জমাট ভাঙ্গিয়া যায়। প্রখর আলোকের সময় স্থূল দেহের জমাট মোটেই বাঁধিতে চায় না। সেই জন্য আলো-আঁধারের মধ্যেই উহা জমে ভাল। তবে প্রখর দিনের আলোতেও স্থূল-দেহ ধরিয়া দেখা দেওয়ার কথা জানা গিয়াছে। সেরূপ ঘটনা খুবই বিরল। সেটা বিশেষ শক্তিরই পরিচয়।

৭। ভূত কখন কখন আলো হইয়া দেখা দেয়। এই আলোক জোনাকী পোকার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকটুক্‌রার মত। কিন্তু কখন কখন খুব তীব্রভাবেও দেখা দেয়; এত তীব্র যে, তাহাতে গাছ ঝল্‌সিয়া যায়, আর এত বেগে আসে যে, তাহাতে টেবিলের উপর হইতে ফুলের টব উল্টাইয়া পড়ে।

৮। ভূত স্থূল হইয়া আসিলে বিশ্রী শক্তিসম্পন্ন হয়—একদিন লেড্

বিটার সাহেবের হাত ধরিয়া টানিয়া উঁহাকে ছাদে তুলিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতবর্ষে শুনা যায়, ভূতে বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এ কথা একটুও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে।

৯। মানুষ ছাড়া অন্য জীবও ভূত হইয়া থাকে। কুকুর ভূত, পাখী ভূত, ঘোড়া ভূত প্রভৃতির কথা শুনা গিয়াছে। শুধু শুনা নহে, বিলাতে এরূপ ব্যাপার ভাল ভাল লোক চর্ম্ম-চক্ষে দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের দেশে গরু ভূতের কথা খুবই চল্‌তি আছে।

১০। বিজ্ঞান বলেন, বায়ু-মণ্ডলে ভূত ছাড়া আরও দেহ-বিশিষ্ট জীব দেখা যায়। সেগুলি সূক্ষ্ম-দেহী হইলেও ভূত নহে। তাহার অনেকগুলি চিন্তা মূর্ত্তি, অনেকগুলি নিম্নশ্রেণীর দেবযোনি। উহারা ভূতের মত হইলেও উহাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। চিন্তা-মূর্ত্তি স্থূল মূর্ত্তিতে দেখা দেয় বটে কিন্তু অপকার বা উপকার করে না; কালে নষ্ট হইয়া যায়। নিম্ন শ্রেণীর দেবযোনীরা নিভৃত বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্ব্বতে, নদী সৈকতে অবস্থান করে। কখন কখন মানুষের কাছে আসিয়া, মানুষকে একটু জ্বালাতন করিয়া আমোদ উপভোগ করে। আবার অনেকে মানুষের উপকার করিয়াছে, এমনও দেখা গিয়াছে।

১১। সাধারণ লোকে কোন্‌টি ভূত, কোন্‌টি নিম্নশ্রেণীর দেবযোনী আর কোন্‌টিই বা চিন্তা-মূর্ত্তি, তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা ঐ সব বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহারা উহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারেন। আবার এমন সব জটিল ঘটনা আছে যাহাতে লেড্‌ বিটার সাহেবের মত যোগীও ঐ পার্থক্য বুঝিতে পারেন না। যাহা হউক, বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইতেছে, তাহাতে অচিরাৎ সূক্ষ্ম-জগতের অনেক তথ্যই প্রকাশ পাইবে।

১২। প্ল্যান্‌চেট্‌ নামক যন্ত্রেও অনেক সময় ভূত আসিয়া থাকে। অনেকে ঐ যন্ত্রটি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু লেড্‌ বিটার উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমি নিজে ধরিয়া উহার সত্যতা বুঝিয়াছি। তা ছাড়া, অল্প দিন আগে প্ল্যান্‌চেটে আমাদের স্কুলে কয়টি পাশ করিবে তাহা লিখিয়া দিয়াছিল।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল বলিয়া আমি এখানেই উপসংহার করিলাম। আমার শেষ কথা, ভূত আছে এবং তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। তা ছাড়া যন্ত্রেও ভূত দেখা যাইতেছে।

তাই ভালো।

(লেখক—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,)

(১)

তাই ভালো তাই ভালো
আরো ঢালো আরো ঢালো
দুঃখ-হলাহল তীব্র হৃদয়ে আমার।
যত মোর হৃদ্‌-ক্ষত
বৃশ্চিক-দংশন মত
জ্বলে যাক্‌ দহনেতে ভীম যাতনার॥

(২)

বিঁধ যদি বজ্রবাণে
তবুও নয়ন-কোণে
দেখিবে না অশ্রু-বারি হইতে উদয়।
মুখেতে তবুও মোর
শুনিবে না আর্ত্তস্বর
মরমে মরিব তবু না ক'ব কথায়॥

(৩)

সমুদ্রে বসতি যার,
জলবিম্বে ভয় তার?
নদী-মাঝে বাস করি কুমীরের ভয়?
যা হবার হয়ে গেছে
আর কিবা বাকি আছে
ভাঙ্গা বুক ভেঙ্গে গেছে নিরাশার ঘায়॥

(৪)

তাহে কিবা আপশোষ
তাহে কেন অসন্তোষ
বিধির বিধান বল কে করে খণ্ডন।

বিটার সাহেবের হাত ধরিয়া টানিয়া উঁহাকে ছাদে তুলিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতবর্ষে শুনা যায়, ভূতে বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এ কথা একটুও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে।

৯। মানুষ ছাড়া অন্য জীবও ভূত হইয়া থাকে। কুকুর ভূত, পাখী ভূত, ঘোড়া ভূত প্রভৃতির কথা শুনা গিয়াছে। শুধু শুনা নহে, বিলাতে এরূপ ব্যাপার ভাল ভাল লোক চর্ম্ম-চক্ষে দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের দেশে গরু ভূতের কথা খুবই চল্‌তি আছে।

১০। বিজ্ঞান বলেন, বায়ু-মণ্ডলে ভূত ছাড়া আরও দেহ-বিশিষ্ট জীব দেখা যায়। সেগুলি সূক্ষ্ম-দেহী হইলেও ভূত নহে। তাহার অনেকগুলি চিন্তা মূর্ত্তি, অনেকগুলি নিম্নশ্রেণীর দেবযোনি। উহারা ভূতের মত হইলেও উহাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। চিন্তা-মূর্ত্তি স্থূল মূর্ত্তিতে দেখা দেয় বটে কিন্তু অপকার বা উপকার করে না; কালে নষ্ট হইয়া যায়। নিম্ন শ্রেণীর দেবযোনীরা নিভৃত বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্ব্বতে, নদী সৈকতে অবস্থান করে। কখন কখন মানুষের কাছে আসিয়া, মানুষকে একটু জ্বালাতন করিয়া আমোদ উপভোগ করে। আবার অনেকে মানুষের উপকার করিয়াছে, এমনও দেখা গিয়াছে।

১১। সাধারণ লোকে কোন্‌টি ভূত, কোন্‌টি নিম্নশ্রেণীর দেবযোনী আর কোন্‌টিই বা চিন্তা-মূর্ত্তি, তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা ঐ সব বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহারা উহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারেন। আবার এমন সব জটিল ঘটনা আছে যাহাতে লেড্ বিটার সাহেবের মত যোগীও ঐ পার্থক্য বুঝিতে পারেন না। যাহা হউক, বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইতেছে, তাহাতে অচিরাৎ সূক্ষ্ম-জগতের অনেক তথ্যই প্রকাশ পাইবে।

১২। প্ল্যান্‌চেট্ নামক যন্ত্রেও অনেক সময় ভূত আসিয়া থাকে। অনেকে ঐ যন্ত্রটি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু লেড্ বিটার উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমি নিজে ধরিয়া উহার সত্যতা বুঝিয়াছি। তা ছাড়া, অল্প দিন আগে প্ল্যানচেটে আমাদের স্কুলে কয়টি পাশ করিবে তাহা লিখিয়া দিয়াছিল।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল বলিয়া আমি এখানেই উপসংহার করিলাম। আমার শেষ কথা, ভূত আছে এবং তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। তা ছাড়া, যন্ত্রেও ভূত দেখা যাইতেছে।

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৭শ, বর্ষ। | ১৩২৮ সাল, জ্যৈষ্ঠ। | ২য়, সংখ্যা

দেবী-স্তুতি।

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ সরকার বিরচিত।

সিন্ধু—মধ্যমান।

(মা!) নিরবধি আমারে—
আর ভাসাস্ নে দুখ সাগরে।
(আমি) প'ড়েছি ঘোর বিপাকে—
(আমায়) তুলে দে মা ভব পারে॥
ভবের যন্ত্রণা যত,
স'য়েছি স'তেছি কত,
দে'ছ দুখ বিধিমত—
ডুবাস্ নে মা এ পাথারে॥
আমি অতি মূঢ় মতি,
না জানি ভকতি স্তুতি,
চরণ-তরী দিয়ে গো মা—
অঘোরে তার' এ ঘোরে॥

অশোকা।

সাহিত্য-রত্ন—শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে সাধারণতঃ "সাধু" বলা হইয়া থাকে। অশোকা এই শ্রেণীর স্ত্রী-সাধু। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ইহাঁর অতীন্দ্রিয় শক্তির আলোচনা করিব। ইনি কোন্ সনের কোন্ তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর কোন্ বৎসরের কোন্ তারিখের বেলা কতটা কত মিনিটের সময় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, ঘড়ি ধরিয়া তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি। কেননা, ঐরূপ অনাবশ্যক ব্যাপার লইয়া কালি, কাগজ, সময়, উৎসাহ, উদ্যম; পরিশেষে পাঠক পাঠিকার অমূল্য ধৈর্য্য ও শ্রদ্ধা নষ্ট করা ভারতীয় আর্য্য শিক্ষার প্রকৃতি নহে। সেরূপ ব্যাপারে ব্যাপৃত হওয়া পাশ্চাত্য রীতি। আমরা অধ্যাত্মবাদী, পাশ্চাত্যেরা জড়বাদী। আমাদের চিন্তা অন্তর্মুখী, উহাদের চিন্তা বহির্মুখী। আমরা পরকাল আত্মা, সূক্ষ্ম-জগৎ লইয়া আলোচনা করিতে ভাল বাসি; উহারা ইহকাল, স্থূল জগৎ, প্রত্যক্ষ ব্যাপারের বিশ্লেষণে প্রীতি অনুভব করে। আমরা কল্পনা কুশল; পরোক্ষ অনুমান লইয়া ব্যস্ত; উহারা জল্পনা কল্পনার বড় একটা ধার ধারে না, প্রত্যক্ষের ভক্ত। আমরা অত্যুচ্চ পর্ব্বত দেখিলে তাহাতে ভগবৎ সত্তার অনুভব করি, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ভিতরে নারায়ণের মূর্ত্তির উপলব্ধি করিয়া ভক্তি গদ্‌গদ চিত্তে তাঁহাকেই জগৎ প্রসবিতা, যাবতীয় বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান চৈতন্যের বিধাতা নিয়ন্তা মনে করিয়া গায়ত্রীরূপে প্রত্যহ তাঁহার বন্দনা করি। আবার পাশ্চাত্যেরা পর্ব্বত দেখিলে ত্রিগনোমেট্রির সহায়ে তাহার উচ্চতা মাপিতে বসেন; সূর্য্যের মধ্যে নারায়ণ না দেখিয়া জড়মূর্ত্তিই দেখেন, তার ব্যাস কত কত দূরে অবস্থান; কিসে গঠিত ইত্যাদি বাহ্য বিষয় লইয়াই তাঁরা ঘোর ব্যস্ত।*

* শ্রীযুত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় আমাদের সহিত পাশ্চাত্যদিগের পার্থক্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—The European mind, even in our own day, is, thus, more prone to define and differentiate than to combine and integrate, more able to analyse than to synthesise, it is more formal than transcendental, more scientific, than mate physical, more objective than subjective, more positive than inaginative, more ralistic than idealistic.

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন :—The European scientist studies the physical features of our land, when he mensurates our fields, trigonometrates our altitudes and undulations, investisgates our anamal, or our vegetable or our mineral kingdoms.

—"The Soul of India" By Bipin Chandra Paul,

তাই বলিতেছিলাম, সাধু অশোকার অধ্যাত্ম বিষয়েরই আলোচনা করিব; তার জন্ম নক্ষত্র প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের আলোচনা এ প্রবন্ধে থাকিবে না।

আমরা যখন এই সাধুকে দেখিয়াছি, তখন তাঁর বয়স অনুমান ৫০।৫৫ বিঘা, ভোর ৪টা হইতেই খুব চীৎকার ধ্বনি শুনিতাম, "জয় রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে গোবিন্দ।" এ চীৎকার সোজা চীৎকার নহে! এ চীৎকারে রকমারি ছিল। উচ্চ কণ্ঠ তো বটেই তার মধ্যে প্লুত-স্বরের বেশ একটা সাধা রকমের টান—একটা আলাপ—একটা আরোহণ অবরোহণ—একটা মধুর ভঙ্গি, প্রকাশ পাইত। অক্লান্ত ভাবে ঐ "জয় রাধের" স্বর বায়ু মণ্ডলে পরিস্পন্দ ছুটাইয়া বেলা ১১টা পর্য্যন্ত চলিয়াছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা, ইতর ভদ্র, দেশী বিদেশী সকলেই উহা শুনিত। সাধুর তাহাতে কিছু মাত্র লজ্জা নাই; লোকে বিরক্ত হইবে বলিয়া তার ভয়ও নাই: লোকের নিকটে মানের লাঘব হইবে মনে করিয়া দৃক্‌পাতও নাই। সাধুদের ও সব চিন্তা থাকে না। কথায় বলে, "মান, লজ্জা, ভয় তিন থাকিতে নয়।" লজ্জা ভয় প্রভৃতি পার্থিব চিন্তা থাকিলে মানুষ সাধু হইতেই পারে না। তাই বোধ হয় তাঁর ঐ সব চিন্তা ছিল না। লোকে বিরক্তও হইত না; শুনিয়া শুনিয়া আমাদেরও একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলেই যেমন দোয়েলের ডাক, কোকিলের ঝঙ্কার, পাপিয়ার সুমধুর পিয়া পিয়া তান শুনা অভ্যাস ছিল। তেমনি "জয় রাধে গোবিন্দ" এই বাক্যাংশের গগন ভেদী ভেরী নিনাদেও আবাল্য অভ্যস্ত ছিলাম। আবার শেষ বয়সে কলিকাতায় আসিয়া ভোরে জঞ্জাল ফেলা গাড়ীগুলার ঘড় ঘড় শব্দ শুনিয়া শুনিয়া এই নাগরিক জীবনের একটা অদ্ভুত কৃত্রিম বিলাসে অভ্যস্ত হইতেছি। তাই মনে হয়, কোথায় সেই দোয়েল পাপিয়া। আর কোথায় এই ময়লা গাড়ীর চক্র-নিনাদ! কোথায় সেই বৈকালিক বিহঙ্গ-কাকলি, আর কোথায় এই

অৰ্দ্ধ-উলঙ্গ ফেরীওয়ালার মোটা-মিহি অস্ফুট অবোধ্য মধুর-ভৈরব মিশ্র চীৎকার। ভগবান্ মানব জীবনের কখন্ যে অভিজ্ঞতার কোন্ অধ্যায় সম্মুখে খুলিয়া ধরেন, তাহা কে জানে? তাই বলিতেছিলাম, সাধু অশোকার "জয় রাধে গোবিন্দ" চীৎকারে বেশ বে মালুম অভ্যস্ত হইয়াছিলাম।

সাধু ঘর গৃহস্থালীর কাজ করিতেন। কিন্তু চীৎকারের বিরাম-বিরতি ছিল না। গোবর-ঝাঁট দিতেন; ঘর-দ্বার স্বহস্তে ধুইতেন, তুলসী মন্দিরে নূতন মৃত্তিকা দিয়া প্রলেপ দিতেন; আহারান্তে পিতলের বোগ্ন মাজিতেন, তাহাতে কিছুমাত্র অপমান বোধ ছিল না। পল্লীগ্রামে নাগরিক জীবনের বিলাস, অকর্ম্মণ্যতা, বাঁদরামি, জ্যেঠামি এখনও অনেক স্থানে প্রবেশ করে নাই। পল্লীগ্রামের ভদ্র মহিলারা এখনও স্বহস্তে ঘর গৃহস্থালীর কাজ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন।• সুতরাং অশোকার অপমান বোধ হইবার কোন হেতুই ছিল না।

তাই বলিতেছিলাম, অশোকা ঘর কন্নার কাজ কর্ম্ম করিতে করিতেও "জয় রাধে গোবিন্দ" চীৎকার করিতেন। কাজ কর্ম্ম আর ঐ চীৎকার এ দুইটা ব্যাপারের মধ্যে একটু লক্ষ্য করিবার ছিল। দেখা যাইত, অশোকার সমস্ত সম্বিৎটুকু যেন কি একটা অজানা দেশের মধ্যে নিবদ্ধ; স্থূল জগতে মাত্র কাঠামটী কলের পুতুলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মানুষটা যেন স্বপ্নে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চোখের ভাবটীও যেন শ্রীমদ্ রা[illegible]র মত, শ্রীগৌরাঙ্গের মত বা সমুদ্র নারীর মত যেন একটা উদাস চাহনি মাখান।

সাধু অশোকার চাহনি ঐরূপ। মানুষটা একটু অন্যমনস্ক। বেশের কথা বলিতে হইবে কেন? হিন্দু বিধবা, আধ ময়লা একখানা মলিন বস্ত্র পরণে।

আহারান্তে অশোকা জপে বসিতেন। নাগায়েদ বৈকাল জপ চলিত। আবার সন্ধ্যার পর জপ আরম্ভ হইয়া রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্ত সে জপ

• Most people remained satisied with simple food, simple clothes and solid house hold furniture. Thay needed no hired ooks to spoil their meals, + + the ladies of the house, young and old, never looks upon the performanec of domestic duties as humiliating and derogatory to their dignity.

——"Marriagedowry" By Rai Chuni Lal Bose Bahadur M, B, F. C. S.

চলিত। এইরূপ ব্যাপার অনুমান ত্রিশ পয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া চলে।

এইরূপ প্রাত্যহিক জপের ফলে তাঁহার দিব্যদৃষ্টির ও দিব্যশক্তির বিকাশ ঘটে। শাস্ত্রেও জপের এ মহিমার কথা স্বীকৃত হইয়াছে। মেঘমন্দ্রে শাস্ত্র ঘোষণা করিতেছেন—"জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি জপাৎ সিদ্ধি ন সংশয়ঃ।" জপে যে সিদ্ধি লাভ হয় কিনা, অতীন্দ্রিয় শক্তি ফুটিয়া উঠে—তিন সত্য করিয়া শাস্ত্র তাহা স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং অশোকারই বা সে শক্তির উন্মেষ না হইবে কেন?

আমরা দেখিয়াছি, কাহারও ছেলে প্রবাসে আছে, পত্র না পাইয়া মাতা পাগলিনী হইয়া সাধু অশোকার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িত। কবে পত্র আসিবে, ছেলে কেমন আছে, এই তার প্রশ্ন। সাধু হয় তো পথে ঘাটে অন্য কাজে ব্যাপৃতা; যেই প্রশ্ন, সাধু অমনি স্থির হইয়া দাড়াইলেন চোখ বুজিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া, মাথা নাড়িয়া যেন কাহার সহিত একটা কথাবার্ত্তা বলিলেন, তার পরই প্রশ্ন কর্ত্রীকে বলিলেন,—"ভয় নাই, তোমার পুত্র ভাল আছে, আজই ডাকে পত্র আসিবে," বলিতে না বলিতে দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই ডাকে শুভ সংবাদ বাহী পত্র আসিয়া উপস্থিত। এইরূপ কত লোকের কত শুভ অশুভ সংবাদ অভ্রান্তভাবে অশোকা ঠাকুরাণী বলিয়া দিতেন। ত্রিশ পয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া অগণ্য অসংখ্য লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বলিয়া তিনি বিস্তর লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। সে উপকারের তালিকা রাখা নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁর এই শক্তি লাভ লইয়া আমাদিগকে একটু যোগের ব্যাপার বুঝিয়া লইতে হইবে।

অশোকার ঐরূপ শক্তি লাভে আমরা বুঝিলাম যে, যোগ-শক্তি স্ত্রী পুরুষ সকলেরই আয়ত্ত, আর সত্য ত্রেতা দ্বাপরের মত উহা এখনও—এই আচার ভ্রষ্ট, অনাচার দুষ্ট অবিশ্বাসের যুগেও লাভ করা যাইতে পারে। এই শক্তি লাভ করিতে হইলে প্রথম ও প্রধান কার্য্য: স্বার্থত্যাগী আর নিরহঙ্কার হওয়া। স্বার্থের লেশ থাকিতেও যোগ শক্তি আসিবে না। তাই আমরা দেখিয়াছি, অশোকা কখনও কাহারও নিকট হইতে উপকারের বিনিময়ে আধ পয়সার দ্রব্যও লয়েন নাই। অশোকা নিঃস্বার্থ গুণের প্রকট মূর্ত্তি। তুমি আমি স্বার্থের শুভঙ্করী গলায় বাঁধিয়া সংসার অরণ্যে বিচরণ করিতেছি, সেই জন্য ক্ষেমঙ্করী যোগ শক্তির সাক্ষাৎকার না পাইয়া ভয়ঙ্করী জ্বালা রাক্ষসীর সম্মুখে যাইয়া উঠিতেছি। তাই বলিতেছি, যোগের বিভূতি লাভেচ্ছু হইলে আমাদিগকে প্রথমেই নিঃস্বার্থ হইতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এটী অবিশ্বাসের যুগ তাই বাল্যকালে যখন দেখিতাম, সাধু প্রশ্ন কর্ত্তার বা কর্ত্রীর অনুরোধে গণনায় নিযুক্তা হইয়া চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতেছেন বা তাহারা কোন সূক্ষ্ম দেহীর কথা শুনিয়া লইতেছেন, তখন আমাদের হাসি রাখিবার স্থান পাইতাম না। ভাবিতাম লোকটার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। রেলে ছুটিবার সময় মনে হয় মাঠ ঘাট দৌড়িতেছে। আমাদেরও সেই দশা। অবিশ্বাসের যুগে আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে, আমরা কিন্তু বিপরীত ধারণাই করিয়া বসি। তাছাড়া দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশ্রুতির কথা তখন শুনি নাই, কাজে কাজেই আমরা ঐ সাধুর যোগ বিভূতির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। তারপর বহু দিন অতীত হইয়া গেল। কালক্রমে জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা যখন অধ্যাত্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যখন তাঁদের একটা ভ্রম-প্রমাদশূন্য গবেষণার ফল সাধারণে প্রচণ্ড মন্ত্রে মস্ত্রিত হইয়া তন্দ্রিত নাস্তিক গুলিকে একটা তীব্র ঝাঁকি দিয়া দিল, তখন বুঝিলাম, অশোকা কম মেয়ে নয়, বরং একটা বড় রকমের কিছু।

লেড্ বিটার, গুজ, টেনিসন প্রভৃতি পৃথিবী—প্রথিত পণ্ডিতরা বলিলেন, Clairhxvoyance আর Clair audience অর্থাৎ দিব্য দৃষ্টি আর দিব্যশ্রুতি বলিয়া ব্যাপার আছে। তখন আর হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। বৈজ্ঞানিকের সেই হুঙ্কারে ভীত, স্তম্ভিত, শঙ্কিত হই। অবনত মস্তকে উহা মানিয়া লইলাম। বিজ্ঞানের কষাঘাত না হইলে আমাদের অবিশ্বাসের কণ্ডুয়ন নিবৃত্ত হয় না।

দিব্য দৃষ্টি লাভ, দিব্য-শক্তির উন্মেষ-সাধন সম্বন্ধে লেড্ বিটার সাহেব তাঁর On the other Side of Death নামক পুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহার কিছু অংশ এখানে অনুবাদ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি। তাঁর কথা এই :—

"লর্ড টেনিসন বলিয়াছেন, তিনি নিজের নামটা ঘন ঘন জপ করিয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি "ফেয়ারিং ফোর্ড, ফ্রেশ ওয়াটার, ওয়াইট দ্বীপ" নামক স্থান হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে স্বহস্তে ঐ ব্যাপার লিখিয়া গিয়াছেন। একজন ভদ্রলোক সংজ্ঞা নাশক দ্রব্য ব্যবহার করায় অলৌকিক কাণ্ড কারখানা অনুভব করিয়া ছিলেন, বলিয়া তাঁকে পত্র লেখেন। তাই টেনিসন প্রত্যুত্তরে তাঁকে ঐ পত্র লিখিয়া ছিলেন। টেনিসন্ প্রদত্ত বিবরণটী এই :—

"সংজ্ঞা-নাশক ঔষধ-প্রভাবে মানুষ অজ্ঞান হইয়া গেলে তাহার অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ হয়, শুনিয়াছি। আমার কিন্তু ওরূপ জ্ঞান লাভের সুযোগ কখন ঘটে নাই। অন্যভাবে আমি ঐ জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়াছি। বাল্যকাল হইতেই আমি দিব্য-দৃষ্টির ব্যাপার জানি। আমি একা হইলেই নিজের নামটা মনে মনে খুব একাগ্রতার সঙ্গে ঘন ঘন জপ করিতাম, ফলে মনটা সব দিক্ থেকে গুটাইয়া আমার মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইত, তারপর আমার জ্ঞানটী অন্য জগতের অসীম সত্তায় যাইয়া মিশিয়া পড়িত। সে এক অপূর্ব্ব, মহান্ সত্য, মহাসুস্পষ্ট অবস্থা, ভাষায় সে অবস্থাটী একেবারেই বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। মরণ বলিতে সেখানে কিছু নাই, মরণ কথাটীও সেখানে যেন উপহাসের কথা; ব্যক্তিগত অবস্থার নাশ বলিতে ব্যক্তিগত জীবনের অবসান বুঝিতে হইবে না, ঐটীই প্রকৃত জীবন—জীবনের প্রকৃত অবস্থা। আমি বুঝাইতে গিয়া বুঝাইতে পারিতেছি না। পারিতেছি না বলিয়া লজ্জা আসিতেছে। কি করিব? ভাষায় উহা বুঝান যায় না। আসল কথা এই যে পৃথিবী ছাড়া অন্য জগৎ আছে, মানুষ চেষ্টা করিলে সে জগৎ এই দেহেই দেখিতে পারে; শুধু তাই নহে, সে জগৎ অতি ধ্রুব, অতি সত্য, অতীব মহীয়ান্ ও শাশ্বৎ।"

লেড্ বিটার অন্যত্র এইরূপ বলিয়াছেন :—

"তোমার যদি দিব্যদৃষ্টি লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে উহাদের মত কার্য্য আরম্ভ কর। প্রথমে মনের বল ও নৈতিক বলের সঞ্চয় করিয়া লও! সাধনার পথে গেলে যদি তুমি অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়া বস, তখন সেই শক্তির অপব্যবহার না ঘটে, এই জন্যই নৈতিক বলের সঞ্চয় পূর্ব্ব হইতেই আবশ্যক। মনের বল আয়ত্ত না করিয়া যদি তুমি অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভ করিয়া ফেল, তবে হয় তো কোন দিন উহার অপব্যবহারও করিতে পার। ঐরূপ দশায় শক্তি লাভ করা অপেক্ষা শক্তিহীন হইয়া থাকাই অধিকতর শ্রেয়ঃ। যখন দেখিবে যে মনের বল আয়ত্ত হইয়াছে, যেরূপ অবস্থাই দাঁড়াক পরোপকার করিতে পারিবে, শত্রুরও উপকার করিতে পারিবে, যখন দেখিবে যে প্রাণে একটা নিঃস্বার্থভাব সম্পূর্ণভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, তোমার প্রাণের ভিতর থেকে একটা প্রেমের মন্দাকিনী স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে, আর সেটা জগৎকে প্লাবিত করিতে চাহিতেছে, যখন দেখিবে পরের মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিবার বাসনা হইতেছে, তখনই বুঝিবে, তুমি দিব্যদৃষ্টি লাভের অধিকারী হইয়াছ।"

দিব্যদৃষ্টি যে অভ্রান্ত, এখন তাহা বুঝা গেল। সূক্ষ্ম জগৎ যে খাঁটী সত্য তাহারও প্রমাণ সাহেবের মুখে শুনা গেল। দেহেই যে সূক্ষ্ম জগৎ দেখা যায়, তাহাও জানিলাম। সেই ব্যাপারটীকেই দিব্যদৃষ্টি বলে! যখন আমাদের চৈতন্য সূক্ষ্ম জগতে যাইয়া ফুটিয়া উঠে, তখন আমরা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া এমন অনেক বিষয় জানিতে পারি যাহা স্থূল জগতে সাধারণ অবস্থায় জানিবার কোন উপায়ই নাই। আবার হয় তো সূক্ষ্ম-জগৎ বিহারী কোন সূক্ষ্ম শরীরীর উপদেশ শুনিতে পাই—যাহা অন্য উপায়ে শুনিবার উপায় নাই। এইরূপ শুনাকেই দিব্যশ্রুতি। অশোকার দিব্যশ্রুতি ও দিব্যজ্ঞান দুটাই ফুটিয়াছিল। তাই যে কোন শ্রষ্টা শ্রষ্ট্রীর কথার উত্তর করিয়া দিতেন।

ঐ দিব্যদৃষ্টি লাভের অনেক প্রকার উপায় আছে। নেশা করিয়া, খুব পাক খাইয়া শরীরকে অবসন্ন করিয়া, বিষাক্ত গ্যাসে অচেতন হইয়া, ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসন করিয়া, জপ করিয়া এরূপ শক্তি লাভ করা যায়। আমাদের অশোকা ঠাকুরাণী শেষোক্ত উপায়ে সাফল্য লাভ করিয়া ছিলেন। চীৎকার করিয়া "জয় রাধে গোবিন্দ" পুনঃ পুনঃ বলাও জপ, আবার ঐরূপ কথা বা অন্য কোন কথা মনে মনে পুনঃ পুনঃ বলাও জপ। অশোকার প্রধান কার্য্যই ছিল জপ। ইহাতেই তাঁর সিদ্ধি কিনা,—অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ।

জপে কিরূপ করিয়া ঐ শক্তি লাভ হয়, তাহার একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেই যুক্তি সম্বন্ধে লেড বিটারের কথাগুলি এই:—

"কোন সাঙ্কেতিক কথা জপ করিয়াও অনেককে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে দেখা যায়। ইহারও কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রকার। জপ করা অর্থ পুনঃ পুনঃ একটা কথা মনে মনে উচ্চারণ করা। এইরূপ করিতে করিতে মনের বৃত্তি অসাড় হইয়া উঠে। উজ্জ্বল বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যেমন মস্তিষ্ক অসাড় হয়, মনের আলোড়ন করিতে করিতে মনের শক্তিও সেইরূপ বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন লিঙ্গ দেহ-ভূত চৈতন্য ভূবর্লোকের অতীন্দ্রিয় ব্যাপার জ্ঞাত হইতে পারে।"

জপের বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখা গেল। মালাজপ করিতে করিতেও ঐ ব্যাপার হইতে পারে। ঠাকুর দেবতার নামই হউক, ইষ্ট মন্ত্রই হউক, বা যে কোন সার্থক বা নিরর্থক শব্দই হউক পুনঃ পুনঃ বলিতে বলিতে মস্তিষ্কের ঐ অসাড়ত্ব ঘটিতে পারে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান আয়ত্ত হইতে থাকে। তাই যবন হরিদাস দিনে লক্ষ হরিনাম জপ করিয়া সিদ্ধ হইয়া ছিলেন, তাই

ান একটা ভক্ত শিষ্য এক মূর্খ গুরু প্রদত্ত একটা অদ্ভুত মন্ত্র জপ করিয়া কিমান্ হইয়া ছিলেন। মন্ত্রটি এই—"আয় ছাগ্‌লা পাতা খেসে।" চমৎার দীক্ষা বীজ! তাই কবি টেনিসন্ নিজের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দ্ধ হইয়া ছিলেন। যে কথাই বলো না কেন, পুনঃ পুনঃ একাগ্রতার সঙ্গে া চাই। তাহাতেই সিদ্ধি। এইটা আজ কালকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি। তএব আমাদের অশোকা ঠাকুরাণী পুনঃ পুনঃ "জয় রাধে গোবিন্দ" বলিয়া লিয়া সিদ্ধি লাভ করিবেন সেটা আর আশ্চর্য্য কি?

তবে "টেনিসন্ টেনিসন" বলিয়া বা "ছাগ্‌লা পাতা খেসে" বলিয়া বা এরূপ একটা বাজে কথা বলিয়া সিদ্ধ হওয়া অপেক্ষা তন্ত্রোক্ত বীজ বা গুরু প্রদত্ত শাস্ত্র সম্মত মন্ত্র জপ করিলে আরও শীঘ্র ও সহজে সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা। কেননা ঐ বীজের সংশ্লেষের সহিত ব্যোম সমুদ্রে অতি সহজে অনুকূল পরিস্পন্দের সঞ্চার হয়, আর তাহাতে সম্ভবতঃ অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে। মনে হয়, স্বর-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যেরা এই তথ্য পরিস্ফুট ভাবে অবগত হইতে পারিবেন। এক্ষণে মিশেস হগের পাঁচিশ বৎসর ব্যাপী পরিশ্রমের ফলে কথঞ্চিৎ আভাস পাইতেছেন।

আমরা সাধু অশোকার কথা মোটা মুটি আলোচনা করিলাম। এত কথা শুনিবার পর পাঠক পাঠিকার কৌতূহল হইতে পারে যে, এই মহীয়সী নারী কোন্ কুলে জন্মিয়া কোন্ স্থানকে ধন্য করিয়াছিলেন। তাই তাঁদের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য অতি সংক্ষেপে নিম্নে তাঁর পরিচয় প্রদত্ত হইল।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী সুবিখ্যাত সারস্বত ক্ষেত্র, গণ্ডগ্রামের শ্রেষ্ঠ, গোস্বামী দুর্গাপুরে উদয়াস্ত তপস্যা-নিরত, মহাপুণ্যবান, সাধক-শ্রেষ্ঠ, অবসথী রবিকরের বংশে অশোকার জন্ম হয়। এই বংশে আরও অনেক অনেক মহাত্মার জপ-তপের বিবরণ প্রখ্যাত আছে। ঐ গ্রামে ঐ বংশ এখনও তেজস্বিতা, সত্যবাদিতা, উদারতা, দানশীলতা ও বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত। মুখুজ্যে বংশে অশোকার বিবাহ হইয়া ছিল। দুই চারিটি সন্তান জন্মিবার পর তাঁহার বৈধব্য ঘটে। স্বামী নিঃস্ব ছিলেন; অগত্যা অশোকা পিতৃগৃহেই জীবনাতিবাহিত করেন। আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

—•—

তারকেশ্বরে হত্যা।

লেখিকা—শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী।

(গল্প।)

১।

ইন্দুমতী। অত বিষয় সম্পত্তি কি পরে খাবে? তুই ত ছেলে মানুষ, আমি বল্‌ছি আবার বিয়ে কর, তাও কর্‌বি না?

অমরেন্দ্র। বিয়ে কর্‌লেই যে ছেলে হবে, তা ত নয়? তারও যদি না হয়, তবে ওকে কেন মিছি মিছি মনে কষ্ট দেবো? ও বাড়ীর দাদা বল্‌ছিলেন যে, তিনি দুই তিন জনকে দুবার বিয়ে কর্‌তে দেখেছেন, অথচ কাহারও ছেলে হয় নাই। কেবল অশান্তি কলহ! মানুষ ভাবে এক, বিধাতা গড়েন আর—"শতাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র।" বিয়ের ফলে কোথায় হবে ছেলে পুলে, না হ'ল আস্তি কলহ! দেখ মাসীমা! ডেকে আর কেন অশান্তি নিয়ে আসি? ও তো বন্ধ্যা নয়, একটি সন্তান-সম্ভাবনাও তো হয়েছিল।

ইন্দুমতী। তোর দাদা ত ঐরূপই বল্‌বে। বৈমাত্রেয় ভাই যে! তোর ছেলে না হলে, তোর বংশ লোপ হলে, তার বংশই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হবে। সকলেই নিজের দিকে টেনে কথা বলে। আর বৌমার কথা বল্‌ছিস্ যে বন্ধ্যা নয়, উহাকেই কাক-বন্ধ্যা বলে। এই যে পণ্ডিত মশায় আস্‌ছেন—আচ্ছা আপনি বলুন দেখি, অমরের পুনরায় বিয়ে করা কর্ত্তব্য কিনা?

পণ্ডিত। নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য! শাস্ত্রে আছে—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্।" বিবাহের যাহা উদ্দেশ্য, অমরের তাহা সিদ্ধ হয় নাই; পিতৃলোক যাহাতে এক গণ্ডূষ জল পায় সে ব্যবস্থা করা চাই বই কি! পুত্র না হইলে পিতৃ-ঋণ শোধ হয় না।

ইন্দুমতী। ঐ শোন্ অমর উনি ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, কি বল্‌লেন শুন্‌লি ত? আমি না হয় মেয়ে মানুষ, আমার কথা না হয় বিশ্বাস করিস্ না।

অমর। বিয়ে কর্‌লেও য'দ ছেলে না হয়?

ইন্দুমতী। আমার শ্বশুর বাড়ীর পাশে এক জনের ছেলে হল না, তারপর আবার বিয়ে কর্‌লে দিব্য সোনার চাঁদ একটী ছেলে ও একটী মেয়ে হয়েছে।

অমর। আচ্ছা, মাসীমা, তোমাদের যখন একান্ত ইচ্ছা, তখন না হয় বিয়ে কর্‌ব।

২।

বিজুলির কিসের অভাব? দাস-দাসী, অট্টালিকা, ঐশ্বর্য্য সবই ত আছে? তথাচ তার মুখে বিষাদের কালিমছায়া কেন? নিজের সংসারে নিজেই কর্ত্রী, তবে সকল কাজে উদাসীন কেন? তার প্রাণে কিসের এমন গুরুভার যে সে সকল সুখ তুচ্ছ মনে করিতেছে?

স্ত্রীলোক স্বামী ব্যতীত সবই দিতে পারে। হাসিমুখে গায়ের অলঙ্কার খুলে দিতে পারে কিন্তু "সপত্নী" সহ্য করিতে পারে না।

বিজুলী সর্ব্ববিষয়ে স্বামীকে সুখী করেছে; সন্তান স্বামীর কোলে দিতে পারে নাই। তাই অমরেন্দ্র আবার বিয়ে কর্‌বে স্থির করেছে। সেই চিন্তাতেই বিজুলি কাতরা।

সে ভাবে—ভগবান্ আমায় একটি রত্ন দিয়ে আবার কেন কেড়ে নিলেন; আমার আর কোন বাসনা নাই, মাত্র একটি সন্তান যদি দিতে পার্‌তেম তবে নারী জন্ম সার্থক হত।

বাতায়ন সন্নিধানে বসে' বিজুলি এইরূপ নানা বিষয়ের চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় অমরেন্দ্র আস্তে আস্তে এসে তাহার নিকট দাঁড়াইল। বিজুলি তাহা জানিতে পারে নাই। তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানি দেখে অমরেন্দ্রের প্রাণে লাগিল। সস্নেহে ডাকিল—"বিজুলি! কি এত চিন্তা কর্‌ছ যে আমি এসেছি তাও ঠিক পেলে না? তোমার বিষাদ মাখা মুখ দেখ্‌লে যে আমার কষ্ট হয়! তা তো তুমি জানো! তবে কেন এমন করে বসে আছ?"

বিজুলি। তোমার কোলে যদি একটি ছেলে দিতে পার্‌তেম তবে এক দিনের জন্যও কেহ বিজুলির মুখ ম্লান দেখ্‌তে পেত না। আচ্ছা, তুমি তো আবার বিয়ে কর্‌তে চাচ্ছ, তবে কেন বল্‌ছ বলো দেখি যে—তোমার মুখ ম্লান দেখ্‌তে পারি না? তুমি যদি আবার বিয়ে করো তবে কি আমার মুখ খুব প্রফুল্ল হবে?

অমরেন্দ্র। আমি যদি আবার বিয়ে করি, তবে সেটা তো স্ত্রীর অভাবে নয়, বংশরক্ষার জন্য। বিয়ে কর্‌লেও আমার হৃদয়ে বিজুলি ভিন্ন অন্য কাহারও স্থান হবে না। তবে কেন তোমার মুখ বিষাদ মাখা হবে? তোমার ছেলে হয় নাই বলে, কেন দুঃখিত হয়ে বসে আছ? ভগবানের কৃপায় অভাব নাই! ছেলে তো হয়েছিল; গর্ভে যদি মারা না যেত তবে আজ ছয় সাত বৎসরের হত।

বিজুলি। তুমি একজনকে বিয়ে করে এনে কেবল যে আমাকেই স্ত্রী বলে

ভাববে তাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখবে, সে হতে পারে না। সুখ-দুঃখ সকলেরই আছে। সে পরে আসবে বলে যে তার কষ্ট হবে না, এমন তো নয়! আর যেখানে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক সেখানে কি ভালবাসা—একটা প্রাণের টান না হয়ে যায়? আর তুমি আমারই প্রিয়তম হয়ে থাকবে, আর একটা স্ত্রী উপেক্ষিতা হবে, সে ইচ্ছা আমার নাই। আমি অত সঙ্কীর্ণ হৃদয় নহি।

অমরেন্দ্র। তুমি তো সংকীর্ণ-হৃদয়া নও বলছ, তবে কেন এখনই অশান্তি ডেকে আনছ? আমি তো বিয়ে করিনি—করব; যখন করি, তখন দেখা যাবে কারো দুঃখ হয় কিনা। সে ভাবনা এখন কেন? এ বংশটী তো রক্ষা করা চাই। যদি বিয়ে না করি, তার বংশ লোপ হয়! তোমারও তো শ্বশুরের বংশ, যাহাতে থাকে তাহা করা উচিত। শুধু নিজের সুখ দুঃখ দেখলে তো হবে না। আমি কি খুব আনন্দের সহিত বিয়ে করতে চাচ্ছি? শুধু নির্জ্জলা কর্ত্তব্যের অনুরোধে এ বিষয়ে মত দিয়াছি।

বিজুলি। আগে ভেবে কাজ করলে, ঠকতে হয় না! শ্বশুরের বংশ যাহাতে রক্ষা হয়, আমি সে বিষয়ে ষোল-আনা যত্নবতী। আমার ইচ্ছা তুমি এত তাড়াতাড়ি বিয়ে না করে ছ'মাস পরে করো।

অমরেন্দ্র। ছ'মাসের জন্য কি আসে যায়? ছ'মাসের মধ্যে যদি আমাদের দুঃখ দূর হয়, ভগবান্ যদি কৃপা করেন, তবে কি সুখই হয়!

বিজুলি। সে ভাগ্য আমার নাই; তবে একবার আমি করুণাময়ের করুণার উপর নির্ভর করে দেখব। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় সবই হতে পারে!

৩।

বিজুলি কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। অমরেন্দ্রের মত ধনী জামাতা আনিবার তাঁর কোন ক্ষমতা ছিল না! তবে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকিলে সবই হয়।

বিজুলি পিতার একমাত্র কন্যা। বিজুলি বিজুলির মতই সুন্দরী—যেন স্থির সৌদামিনী! মুখখানি ডিম্বাকৃতি; আকর্ণ-বিস্তৃত মৃগ-নেত্র; ভ্রূযুগল যেন তুলিদ্বারা অঙ্কিত, দিব্য সুঠাম ও সুবঙ্কিম; কপোল প্রদেশ নিটোল; তিল-ফুল-জিনি নাসা; অধরটী ফোলাল ফোলাল গোলাপের পাপড়ীর ন্যায় ক্ষুদ্র ও রক্তিম; দশনপাতি শিখরসদৃশ; চিবুক ছোট; আগুল্ফলম্বিত নিবিড় কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশের ভিতর অপ্রশস্ত সুন্দর ললাট; বাহুযুগল সুন্দর সুগোল

সুঠাম মৃণালবৎ; চম্পক-কলির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র রক্তাভ পদ্ম পুষ্পের মত করপল্লব; বক্ষ সুপ্রশস্ত; কটিদেশ ক্ষীণ, পদযুগল সুগঠিত ও রক্তাভ, দেহের বর্ণ গৌর তার মধ্যে ঈষৎ লোহিত রাগ।

বিজুলিকে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা দেখে অমরেন্দ্রের পিতা রজনীকান্ত বাবু কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের নিকটে পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করেন। কালিদাস এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে আনন্দে অধীর হইয়া পড়েন, পরক্ষণেই একটু সঙ্কুচিত হয়ে বল্লেন,—"আমি অতি নিঃস্ব, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত আপনার ন্যায় মহানুভব মহাত্মার কুটুম্বিতা কি সম্ভবপর হইতে পারে? আমি কি সকল সময় কুটুম্বিতা করে আপনার সম্মান রক্ষা করতে পারব?

রজনী বাবু উত্তর করলেন,—"সে কি? আপনি ত আমার পালটা ঘর। অর্থই তো দুনিয়ার সার বস্তু নহে। কর্ম্মফল অনুসারে কাহারও ভাগ্যে কিছু অধিক অর্থাগম হয়, কাহারও বা কিছু কম হয়। তাহাতে কি? বংশগৌরব আগে দেখা চাই। কুটুম্বিতার কথা কি বলছেন? যে সমর্থ হইবে, সেই কুটুম্বিতা করবে। আপনি মূল্যবান জিনিষ না দিলে আমার কি সম্মানের কিছু লাঘব হইবে? এমন উদ্ভট সিদ্ধান্ত করছেন কেন? আমার কিছুরই অভাব নাই। মা লক্ষ্মী গিয়ে আমার ঘর আলো করবেন, আমি তাতেই সুখী।

এই কথার অল্প দিন পরেই রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ভাবী বৈবাহিক কালিদাসের নিকটে নিজের সম্মানোপযোগী ব্যয় করিবার নিমিত্ত এক হাজার টাকা গোপনে পাঠিয়ে ছিলেন।

শুভদিনে খুব ঘোর ঘটার সঙ্গে, বাজী বাজানা ও মিছিল করে, বিস্তর জড়োয়া গহনা পরিয়ে রজনীকান্ত বাবু তাঁর মা লক্ষ্মীকে ঘরে এনেছিলেন। বলা বাহুল্য কালিদাস মুখুজ্যে বৈবাহিক-প্রদত্ত টাকা ছাড়াও নিজে তিন চারি শত টাকা ব্যয় করেন।

ইদানীং এই পণ প্রথার দারুণ শোষণের দিনে সাধারণে রজনীকান্ত বাবুর এই উদাররা, ভদ্রতা ও সৌজন্যের উপলব্ধি করিতে না পারিলেও বস্তুতঃ ঐরূপ ঘটনা হইয়াছিল এবং আমাদের মনে হয় এখনও উহাঁর ন্যায় হৃদয়বান ব্যক্তি দুই চারি জন আছেন।

৪।

বিজুলিকে ঘরে আনিয়া রজনীকান্ত বাবু বেশ সুখী হয়েছিলেন। বাড়ীর

সকলেই বিজুলির ব্যবহারে মুগ্ধ। কিন্তু পুত্রবধু লইয়া সংসারে বাস করা রজনী বাবুর ভাগ্যে অধিক দিন ঘটে নাই। অমরের বিবাহের তিন বৎসর পরেই তিনি মারা যান!

অমরেন্দ্রের বাল্যকালেই মাতা ইহলোক ত্যাগ করেন। অমর পিতৃ-স্নেহে মায়ের অভাব বুঝিতে পারিত না। যখন পিতা মারা গেলেন তখন বিপুল সংসারের ভার হাতে পড়ায় অমর বিব্রত হয়ে পড়িল পিতার অভাব তখন ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল এবং তখন পিতৃশোকে আরও কাতর হয়ে উঠিল।

বিজুলি তখন স্বামীকে বলিল—তুমি এখন শোকে কাতর হলে চল্‌বে কেন? তোমার ঘাড়ে মস্ত সংসারের ভার—তুমি এ রকম ভাবে সকল কাজে উদাসীন থাক্‌লে সকলেরই কষ্ট হবে—পিতামাতা কাহারও চিরদিন থাকে না—পিতা মাতার আদর্শ ধরিয়া তাঁদের আচরিত কাজ করিলেই পুত্রের কর্ত্তব্য পালন হয়।

অমরেন্দ্রের এই কথাগুলিতে চৈতন্য হইল। তখন সে ক্রমে ক্রমে সংসারের কাজ-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া শোকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাইল।

৫।

রজনীবাবু যখন মারা যান তখন বিজুলির পঞ্চম মাস গর্ভাবস্থা। শোকে অধীরা হয়ে আছাড়ি-পিড়াছি করে' কাঁদায়, অসাবধানে থাকায় গর্ভস্রাব হয়। তারপর আরও সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—তাহার সন্তানাদি হয় নাই।

প্রভাতে উঠিয়াই একদিন বিজুলি অমরেন্দ্রকে বলিল—"আমি তারকেশ্বরে যাইব, যাইবার ব্যবস্থা করে দাও।

অমরেন্দ্র। আমার হাতে উপস্থিত কাজ-কর্ম্ম নাই, চল আমিও সঙ্গে যাইব।

অল্প সময়ের মধ্যেই যাইবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। একজন ঝি, একজন সরকার, একটী পাচিকাও সঙ্গে চলিল।

যথা সময়ে তাহারা তারকেশ্বরে পঁহুছিল। যেখানে দেবতা জাগ্রৎ, সেখানে গেলেই মানুষের মনের ভাব যেন অন্যরূপ হইয়া যায়। সংসারের চিন্তা-ধারায় যেন সহসা বাধা পড়ে—যেন দেব মাহাত্ম্যের একটা ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে সমস্ত প্রাণটা একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে—প্রাণের অশান্তি দূরে চলিয়া যায়! তাই বুঝি কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বলে বীরকেশরী

অর্জ্জুনের প্রতিহিংসা বৃত্তিও নিভে গিয়েছিল। তীর্থের মাহাত্ম্য বাস্তবিকই অদ্ভুত! বিজুলিরা দেখিল—কত শত লোক ছিন্ন বল্লরীর মত, একান্ত আশ্রিতার মত, বাবা তারকনাথের সম্মুখে ধরাশায়নী হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতা, সংজ্ঞা নাই, সম্বিত নাই! যেন সকল প্রকার ঐহিক হিসাব-নিকাশ পরিত্যাগ করিয়া জীবনের পরপারে গিয়ে বাবার কৃপার পাত্রী হয়েছে। কি চমৎকার নির্ভর! চমৎকার ত্যাগ! চমৎকার ঐশী হত্যা—ঐশী মিলন—ঐশী জাগরণ—ঐশী নিদ্রা হত্যার প্রণালী দেখিয়া বিজুলির প্রাণেও যেন একটা ঐশী পরিস্পন্দ সাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। বাবার ভাবী করুণার স্নিগ্ধ ছায়া যেন তার প্রাণে এসে পড়িল, তাই—বলিতেছি, তারকেশ্বরের কি মাহাত্ম্য! স্থূল-কায় বৃষটী কেমন সুমন্থর গতিতে মৃদুমধুর পদসঞ্চারে অচেতন ধরা শায়িনী ভক্তবৃন্দের ধরাস্তীর্ণ হস্তপদাদির মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে কাহারও অঙ্গে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিতেছে না, এখানেও বাবার মহিমা সুপরিস্ফুট। তারকেশ্বরের প্রত্যেক তরুটি পর্য্যন্ত যেন পবিত্র ঐশী করুণায় সুমধুর হইয়া শোভা পাইতেছে।

স্নান করিয়া শুদ্ধাচারে, পূত মনে বিজুলি বাবার দরজায় "হত্যা" দিল। মনে মনে প্রার্থনা করিল,—"বাবা! আমায় সকল সুখে সুখিনী করে, এক বিষয়ে কেন বঞ্চিত করেছ? বাবা আমাদের সংসারে একটী পুত্র দান কর, নচেৎ রোমার দ্বারে এই হত্যা হইব।"

তিন দিন, তিন রাত্রি বিজুলি একই ভাবে পড়িয়া রহিল। তার সংজ্ঞা নাই—সম্বিৎ নাই—একেবারেই নিস্পন্দ।

বিজুলির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অমরেন্দ্র কাতর হইয়া বলিল,—"তুমি উঠ তোমার এত কষ্ট আমি দেখতে পারছি না—আমি আর বিয়ে কর্‌ব না।"

অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও অমরেন্দ্র বিজুলির মন আকর্ষণ করতে পারিল না।

বিজুলির নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় বাবার দয়া হইল। তিনি স্বপ্ন যোগে ঔষধ দিলেন। বিজুলির চৈতন্য হইল। চেতন হইয়াই দেখিল—হাতের মধ্যে ঔষধ।

মহা আনন্দে বিজুলি উঠিয়া বসিল। তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে থাকিলে সাধারণতঃ মানুষ দুর্ব্বল হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু বাবার কি মাহাত্ম্য! বিজুলির দেহে যেন নবশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে—সে মহা আনন্দে,

নবীন শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া স্নান করিয়া আসিল, তার পর একান্ত ভক্তি ভরে পূজা দিয়া সেই খানেই ঔষধ সেবন করিল। পরে যথা সময়ে আহারাদি শেষ করিয়া স্বামী ও লোকজনের সঙ্গে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিল।

৬।

তারকেশ্বর হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিবার দু'মাস পরে বিজুলির গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ক্রমে দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুলক্ষণযুক্ত একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। বাড়ীতে আর আনন্দ ধরে না, অমরেন্দ্র বংশধরের আবির্ভাবে ব্রাহ্মণ ও গরীব দুঃখীকে বিস্তর অর্থ ও বস্ত্র দান করিলেন।

ষষ্ঠী পূজার পর বিজুলি ও অমরেন্দ্র ক্ষুদ্র শিশুটিকে লইয়া পরমানন্দে মুগ্ধ হইল এবং ভগবানের নিকটে কায়মনোবাক্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। তাহাদের প্রাণের সে বিপুল আনন্দ যাহাদের সন্তানাদির অভাব এবং ভগবৎ কৃপায় সন্তানাদি লাভ করিলে পর তাহারাই এই সুখানুভব করিয়া থাকেন।

অমরেন্দ্রের বাসভবন সুপ্রশস্ত, চারি প্রকোষ্ঠ। সম্মুখেই পুতুল বসান নাতি উচ্চ প্রাকার। প্রাকারের মধ্যে সুগঠিত লৌহ তোরণ, তৎপরেই সুন্দর পুষ্পোদ্যান, উদ্যানে নানাজাতীয় দেশী-বিলাতী সুন্দর সুগন্ধ, ক্ষুদ্র বৃহৎ পুষ্প শোভিত কেয়ারিতে বিভক্ত পুষ্প বৃক্ষ। উদ্যানের ভিতর সুরকির লোহিত রাগ রঞ্জিত প্রোথিত ইষ্টক কোণের সুন্দর শ্রেণীতে সজ্জিত অলি ও গলি। মধ্যে মধ্যে লতা বিতান, তাহার নিম্নে কোথাও বা প্রস্তর-বেদী, কোথাও বা প্রস্তর নির্ম্মিত বেঞ্চ, মধ্যে মধ্যে প্রস্তর-গঠিত অর্দ্ধ-উলঙ্গ জল-দেবীর মূর্ত্তি, অসংখ্য প্রকার ক্রোটনে উদ্যানের সৌন্দর্য্য নিরন্তরই সংরক্ষিত হইতেছে। এক কথায় উদ্যানটীকে যেন নন্দন-কানন বলিয়া মনে হয়!

উদ্যানের পরই মর্ম্মর-প্রস্তর-খচিত সুবৃহৎ অট্টালিকা। সম্মুখে সুন্দর বারাণ্ডা, বারাণ্ডার সংলগ্ন সুসজ্জিত বৈঠকখানা। বৈঠকখানার পেছনে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের পর চণ্ডী-মণ্ডপ, চণ্ডী মণ্ডপের থামগুলি দশটি সরু সরু স্তম্ভের উচ্চ সে দৃশ্য অতীব মনোহর। ভিতরের দেওয়ালে বড় বড় দেব দেবীর প্রতিকৃতি! বাহিরের দেওয়ালে নানাবিধ লতা, পুষ্প, পক্ষী প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত।

দ্বিতলে চক্ ঘুরাইয়া মণ্ডপের সহিত সংলগ্ন করিয়া সুন্দর সৌধাবলী

বারাণ্ডা, রেলিং, সার্শি, খড়খড় প্রভৃতিতে ভবনটী বেশ সুচারুরূপে গঠিত। এই চকের পেছনে একটী স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে রন্ধন-শালা।

সাত আট বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকাণ্ড বাস-ভবন অসংখ্য পরিচারক পরিচারিকা কর্ম্মচারী লোকজন থাকা সত্ত্বেও কেমন-যেন একরূপ নিরানন্দ বলিয়া বোধ হইত! কেমন-যেন এক প্রকার বিষণ্ণ ভাব বাড়ী খানির সঙ্গে মাখান ছিল। ছোট ছোট ছেলে পুলের অভাবই সে ভাবের কারণ। কথায় বলে—"এই ধন যার ঘরে নাই, তার বৃথাই জীবন" ছেলে পুলেই গৃহকে গৃহ করিয়া আনন্দ নিকেতন করিয়া তুলে।

এখন আর ঐ বাড়ীতে সে ভাব নাই। এখন অমরেন্দ্রের তিনটী পুত্র ও তিনটী কন্যা। এ বালক, বালিকার আনন্দ কোলাহলে সর্ব্বক্ষণই বাড়ীখানি মুখরিত। অমরেন্দ্র ভাবে—এই আনন্দ ধারা চিরদিনই অব্যাহত থাকিয়া যাইবে। নির্ব্বোধ! জগৎ-প্রপঞ্চের কুত্রাপি নিরবচ্ছিন্ন সুখ থাকিতে পারে না! অমর! তোমার এই সুখও চিরদিনের জন্য নহে। চির সুখ, চির শান্তি বিধাতার নিয়ম নহে।

৭।

শরত কালের সুনির্ম্মল গগন পটে যেমন সহসা মেঘের কালিম ছায়া পতিত হইয়া হাস্যময়ী নিসর্গ সুন্দরীকে বিষণ্ণ করিয়া তোলে সেইরূপ অমরেন্দ্রের সুখের সংসারে অকস্মাৎ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা অশান্তি ও দুর্ভাবনার ছায়া আসিয়া পড়িল।

আজ বিজুলি "ইরিসিপিলস্" পীড়ায় শয্যাশায়িনী! সারা রজনী জাগরণ করিয়া অমরেন্দ্রের দুটি চক্ষু জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। দাসদাসীগণ ইতস্তত ব্যস্ত ত্রস্ত ভাবে ছুটাছুটী করিতেছে। দলে দলে সুনামলব্ধ সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ গমনাগমন করিতেছেন।

এ কয় দিন চিকিৎসকেরা আশা-ভরসা দিয়া ছিল, কিন্তু আজ সকলেই এক মত হয়ে বলিল,—"রোগীর অবস্থা ভাল নহে। কি হয় বলা যায় না। হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলে বাঁচলেও বাঁচতে পারেন।

অমর বলিল,—"আমার প্রাণ থাকতেও হাঁসপাতালে পাঠাইতে পারিব না—যত টাকা ব্যয় হয় হউক, কলেজের সর্ব্বপ্রধান ডাক্তারকে আনিবার জন্য ব্যবস্থা করুন।"

যথা সময়ে মেডিকেল কলেজের সর্ব্বপ্রধান ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও আসিয়া বলিলেন,—"আসন্ন সময় উপস্থিত এখন স্ক্যাপুলা নামক কাঁধের হাড়টীতে পচন-ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। অপারেশনের আর সময় নাই। রোগীকে রক্ষা করা যাইবে না। একদিন পূর্ব্বে হইলেও চেষ্টা করা যেত।" উপযুক্ত ফীস ও পাথেয় লইয়া চিকিৎসকগণ চলিয়া গেল।

হা হুতাশে অমরেন্দ্র কাঁদিয়া আকুল হইল।

অপরাহ্নে বিজুলি ক্ষীণকণ্ঠে অমরেন্দ্রকে বলিল,—"তুমি অত কাতর হইওনা, আমার আর সময় নাই—তুমি ধৈর্য্য ধর, তোমায় অমন করে কাঁদ্‌তে দেখ্‌লে আমার বুক ভেঙ্গে যায়। যতক্ষণ থাকি, তোমার শান্ত মুর্ত্তি দেখে যাই। তুমি অমন করে কাঁদ্‌লে আমি পর-লোকে বড় অশান্তি ভোগ কর্‌ব। এ সংসার চিরদিনের জন্য নহে—এই খানেই আমাদের সম্বন্ধ শেষ হবে না,—আমার কাজ ফুরিয়েছে, আমি চলিলাম, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব, তোমার কাজ শেষ হইলে পরলোকে আবার দুজনের মিলন হবে।"

বিজুলির কথায় অমর আরও কাঁদিয়া উঠিল। বলিল,—"তোমায় না দেখ্‌লে এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে পারি না, এতদিন কি করে থাক্‌ব? বিয়ে কর্‌তে চেয়ে ছিলাম,—তোমার মনে কষ্ট দিয়ে ছিলাম,—সেই অপরাধে রাগ করে আমায় ছেড়ে যেও না।"

বিজুলি বলিল,—"ধৈর্য্য ধর। আমি কখনই তোমার উপর রাগ করি নাই। অত অধীর হইওনা, তোমায় ছেড়ে যেতে কি আমারই সাধ? ছেলে পুলে গুলিকে মানুষ করো—উহাদের নিয়ে শোক ভুলিবার চেষ্টা করো—ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক—আমাকে হাসিমুখে আপাতত বিদায় দাও,—মরণের পর আবার আমায় পাইবে,—কেঁদে কেঁদে আমায় আর কাঁদিওনা।"

বিজুলি যত উপদেশ দেয়, অমরের কান্না ততই বেড়ে উঠে। তার শোকোচ্ছ্বাসের কথা কে বর্ণনা কর্‌বে? লেখনীর সে শক্তি নাই। তার কান্নায় পশুপক্ষী পর্য্যন্ত কাঁদিল। কাঁদিলে কি হইবে? সময় পূর্ণ হইলে কেহ কাহাকেও রাখিতে পারে না। বিজুলির সময় পূর্ণ হইল, সে নশ্বর দেহ রেখে চলিয়া গেল। নির্ব্বোধ অমরেন্দ্র নাথের সুখের সংসার শোকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইল।

৮।

তারকেশ্বরে হত্যা দিয়া ঔষধ পাওয়া ব্যাপারটী অলীক নহে। বিজ্ঞান বলে এটী খাঁটী সত্য বলিয়া অধুনা প্রমাণিত হইতেছে। থিওসফিষ্টগণ বলেন

—"যখন উপবাস ও একাগ্রতায় মানুষের বাহ্য জ্ঞান ক্ষীণ হইয়া আসে, তখন তার দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়া উঠে, সে তখন সুক্ষ্ম-জগৎ দেখ্‌তে পায়। সুক্ষ্ম-জগতে বিস্তর দেবযোনি ও অদৃশ্য সহায় আছেন। তাঁরা নিরন্তরই আমাদের উপকার করিতে ইচ্ছুক। আমরা বিপন্ন হইয়া তাঁহাদের উপর নির্ভর করিলে তাঁরা মূর্ত্তি ধরে দেখা দিয়ে কখনও বা উপদেশ দ্বারা কখনও বা ঔষধ প্রভৃতি আনিয়া হাতের মধ্যে দিয়া আমাদের উপকার করেন। কোন্ গাছের কোন্ অংশে বন্ধ্যা নারীর সন্তান প্রসবের ক্ষমতা জন্মে, আর সেই গাছ পৃথিবীর কোন্ প্রদেশে, পর্ব্বতের কোন্ দুর্গম স্থানে উহা বিদ্যমান আছে তাহা তাঁহারা দিব্য শক্তি-প্রভাবে পরিজ্ঞাত আছেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই গাছের স্থূল অংশকে পরমাণু-অবস্থায় বিশ্লিষ্ট করিয়া তড়িৎ-গতিতে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া হত্যা দাত্রীর হাতের মধ্যে আনিয়া আবার সেই বিশ্লিষ্ট পরমাণু পুঞ্জকে সংশ্লিষ্ট করিয়া স্থূল শিকড় আকারে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন। ইহা বিচিত্র ব্যাপার নহে। এ বিষয়ে পাঠকদের যদি আরও জানিবার কৌতুহল হয় তবে লেড বিটার সাহেবের পুস্তক পড়িয়া দেখিবেন।

পাঠক! তারকেশ্বরে হত্যা দেওয়া নিরর্থক নহে।

কোষ্ঠী-শিক্ষা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কেন্দ্র ও তাহার গ্রহস্থিতির ফল।

জাতকের জন্মলগ্ন ও তথা হইতে গণনা করিয়া চতুর্থ সপ্তম এবং দশম এই চারি স্থানকে কেন্দ্র কহে। গ্রহগণ কেন্দ্রস্থানে থাকিলে তাহাদিগকে কেন্দ্রস্থ বা কেন্দ্রীগ্রহ বলা যায়।

রবি কেন্দ্র স্থানে থাকিলে জাতক ক্রূর, অত্যন্ত হিংস্র, রক্তবর্ণবিশিষ্ট, মূর্খ, ক্ষুধার্ত্ত, দন্তক ও চক্ষুরোগাক্রান্ত, দেশান্তরীয়ত ও প্রবাসী হয়।

চন্দ্র কেন্দ্রস্থানে থাকিলে জাতক মিত্রোপকারী, বিভব সম্পন্ন, বিনীত মূর্ত্তি, স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ, ও ভূম্যাধিকারী সুন্দর শরীর বিশিষ্ট ও দীর্ঘায়ু হয়।

মঙ্গল কেন্দ্রস্থানে থাকিলে জাতক কদাকার, মন্দ চরিত্রবিশিষ্ট, বাসনাশক্ত, কুকার্য্যে দানশীল, বহু জীবনাশের হেতু স্বরূপ ও চিররোগী হয়।

বুধ কেন্দ্রস্থানে থাকিলে জাতক বুদ্ধিমান, সম্মানিত, বিদ্বান, ভোগী, গুরুভক্ত, সুশীলা রমণী যুক্ত, মিত্র ও সাধুগণের অনুরাগী হয়।

বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থানে থাকিলে জাতক ধার্ম্মিক, রাজা অথবা রাজকর্ম্মচারী ধর্ম্মার্থকামের মহা অভিলাষী সুন্দরী স্ত্রীযুক্ত ও সুন্দর দেহবিশিষ্ট হয়।

শুক্র কেন্দ্রস্থানে থাকিলে জাতক সুখী, সুবেশধারী স্বজনানুরাগী, সুন্দরী পত্নীযুক্ত, গুণবান, ধনবান, সুশীল, চরিত্রবান, কুলের প্রদীপ স্বরূপ ও দীর্ঘজীবী হয়।

শনি কেন্দ্রস্থানে থাকিলে জাতক দরিদ্র, রোগী কুৎসিৎ দেহযুক্ত, বাল স্বভাব সম্পন্ন ও পরের অনিষ্টকারী হয়।

রাহু কেন্দ্রস্থানে থাকিলে জাতক ক্রুর, মন্দগঠনযুক্ত, কুকর্ম্মে পটু, অপকারী পরভাগ্যভোগী, রোগী, বেশ্যাসক্ত, পরকার্য্যে দানশীল ও মন্দবুদ্ধিযুক্ত হয়।

কেতু কেন্দ্রস্থানে থাকিলে জাতক রাহু কেন্দ্রের ন্যায় ফললাভ করে। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের মতে কেতু কেন্দ্রস্থানে প্রশস্ত যথা বহু বৃত্তি বুদ্ধিযুক্ত, লাভবান, বিদ্যাবিনোদ, যশস্বী, স্বস্থানে স্থিত ও ধনবান হয়।

৫ম অধ্যায়।

জন্ম কুণ্ডলীচক্রে নানাবিধ যোগ ও তাহার ফল। জন্মকুণ্ডলী চক্রে গ্রহদিগের মধ্যে নানাবিধ যোগ হয়। এই যোগের ফলে জাতক রাজা বা তৎসদৃশ কিম্বা নানাপ্রকার ধনরত্ন লাভ করে। এবং সুখী হয়, নিম্নে কয়েক প্রকার যোগের কথা লেখা যাইতেছে।

সিংহ, ধনু, মীন কর্কট বা বৃশ্চিক রাশিতে রবি মঙ্গল এক থাকিলে সেই জাতক অনেক ধনরত্ন লাভ করে। নবমাধিপতি যদি নবম স্থানে বা কেন্দ্রে থাকেন তবে চন্দ্র প্রভা নামে যোগ হয়। এই যোগে জাতক রাজা বা রাজতুল্য গুণবান ও বিলাসী হয় এবং জাতকের গঙ্গাজলে মৃত্যু হয়।

দশমাধিপতি যদি কেন্দ্রে ত্রিকোণ (নবম পঞ্চম) বা স্বস্থানে থাকেন তাহা

হইলে ক্ষেত্র সিংহাসন নামে যোগ হয়। এই যোগে জাতক নরনাম কীর্ত্তিমান ও হস্তীবাহনযুক্ত হয়।

নবমাধিপতি ও দশমাধিপতি যদি একত্রে অবস্থান করেন বা পরস্পর স্থান বিনিময় করেন তাহা হইলে নবম দশম পতিযোগ নামে প্রবল রাজযোগ হয়। এই যোগে জাতক নৃপতি বা তৎসদৃশ ফললাভ করে।

রাহু কিম্বা কেতু যদি কেন্দ্র স্থানে অবস্থান করিয়া ত্রিকোনাধিপতির সহিত সম্বন্ধ (স্থানবিনিময়, পরস্পর দৃষ্টি, এক অপরের প্রতি দৃষ্টি, একত্র অবস্থান) করেন তবে রাহু কেতুর সহিত ত্রিকোণ পতির সম্বন্ধ নবমে রাজযোগ হয়। এই যোগে জাতক বিখ্যাত নৃপতুল্য ও প্রচুর ধনরত্নের অধিপতি হয়।

বৃহস্পতির সপ্তমে চন্দ্র বা চন্দ্র বৃহস্পতি একত্র থাকিলে জীবযোগ নামে যোগ হয়। এই যোগে জাতক দাতা ও সুখী হয়।

ভাগ্যপতি তুঙ্গী হইয়া কেন্দ্র বা মূল ত্রিকোণে থাকিলেও লগ্নপতি বলবান হইলেও লক্ষ্মীযোগ হয়। এই যোগে জাতক বহুবিদ্যা, ধন পুত্র ও কীর্ত্তি-লাভ করে।

সপ্তম পতি কর্ম্মস্থানে তুঙ্গী এবং কর্ম্মাধিপ ভাগ্যপতি সংযুক্ত হইলে স্ত্রীনাথ যোগ হয়। এই যোগে জাতক পরাক্রমশালী ও নৃপতি সদৃশ হয়।

বৃহস্পতি কেন্দ্র স্থানে চন্দ্রলগ্নে বা সপ্তমে পঞ্চমে বুধের দৃষ্টি ও চন্দ্র নীচ বা অস্তাদি দোষ শূন্য হইলে গজ কেশরী যোগ হয়। এই যোগে জাতক তেজস্বী, ধনবান, মেধাবী, রাজপ্রিয় ও গুণবান হয়।

লগ্ন অথবা রাশির দশমে শুভগ্রহ বা শুভ সংযুক্ত হইলে অমলা যোগ হয়। এই যোগে জাতক কীর্ত্তিমান, ভোগী, দাতা, পরোপকারী ও বন্ধুজন প্রিয় হয়।

চতুর্থ ও দশম পতি যদি পরস্পর স্থান বিনিময় করেন এবং লগ্নপতি বলবান থাকেন তাহা হইলে কাহল যোগ হয়। এই যোগ জাতক তেজস্বী গুণবান গ্রামপতি বা প্রধান হয়।

রবির গৃহে বুধ ও বুধের গৃহে রবি থাকিলে কিম্বা যদি উঁহারা একত্র অবস্থান করেন, তবে বুধাদিত্য যোগ হয়। এই যোগে জাতক সুখী ধনবান ও যশস্বী হয়।

পঞ্চম বা নবম পতি যদি একত্র কিম্বা সম সপ্তমে থাকেন, তবে নবম পঞ্চম পতি যোগ হয়। এই যোগে জাতক পুত্রবান, ভাগ্যবান ও ধার্ম্মিক হয়।

জন্মকালে যদি ছয়টী গৃহে গ্রহগণ থাকেন, তাহা হইলে ষটশূন্য যোগ হয়।

এই যোগে জাতক নৃপতুল্য, গোযান ও অশ্বের অধিপতি, ধার্ম্মিক, ধনবান, কুলশ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত ও গুণী হয়।

জন্মলগ্ন বা জন্ম রাশি ভিন্ন অন্য কোন স্থানে যদি তিনটী গ্রহ একত্রে অবস্থান করেন তবে ত্রয়োগ্রহ যোগ হয়। এই যোগে জাতক বিবিধ দ্রব্য ভোগ করিয়া শেষে গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করে।

রবি চন্দ্র, মঙ্গল বুধ শুক্র ও শনি যদি বৃহস্পতিকে দৃষ্টি করেন তাহা হইলে নিশাশঙ্কা যোগ হয়। এই যোগে জাতক নৃপতুল্য কুলশ্রেষ্ঠ, কীর্ত্তিমান ও ধনবান হয়।

লগ্নের চতুর্থ কিম্বা অষ্টম স্থানে যদি বৃহস্পতি কিম্বা শুক্র অবস্থান করেন তবে হেমচত্র যোগ হয়। এই যোগে জাতক সুখী, ধনী ও যশস্বী হয়।

উপরে যে সমস্ত যোগের কথা বলা হইল নিম্নলিখিত যোগের দ্বারা সেই সমস্ত যোগ ভঙ্গ বা নষ্ট হয়।

অতএব জাতকের জন্মকুণ্ডলী চক্রে নিম্নলিখিত যোগ হইয়াছে কিনা বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক।

কোন শুভগ্রহ কেন্দ্রে না থাকিলে অথবা লগ্ন রাশি ও দশম স্থানে কোন গ্রহের দৃষ্টি না থাকিলে উক্ত যোগ ভঙ্গ হয়।

তিনটী গ্রহ বিশেষতঃ রবি চন্দ্র, মঙ্গল, নীচস্থ হইলে শুভ যোগ ভঙ্গ হয়, অপিচ জাতকের নানা কষ্ট উপস্থিত হয়।

অষ্টম ও নবমে কিম্বা দশম বা একাদশ গৃহে এক অধিপতি হইলে শুভযোগ ভঙ্গ হয়।

দশমাধিপতিপতি নীচস্থ ও লগ্নে শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকিলে রাজযোগ ভঙ্গ হয়।

বৃহস্পতি, রাহু কিম্বা কেতুযুক্ত হইলে শুভযোগ ভঙ্গ হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পাতকী চক্র।

ঊর্দ্ধ ও তাহার বিপরীত দিকে সমান্তর ভাবে তিনটী রেখাপাত করিয়া তাহার উপর সমান্তর ভাবে আরও ছয়টী করিয়া রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। পরে উক্ত দিকের দক্ষিণের রেখা হইতে বামাবর্ত্তে মেষাদি দ্বাদশ রাশিকে

স্থাপন করিয়া কর্কটে ৫ সিংহে ৮, রকন্যায় ২, তুলাতে ২০ বৃশ্চিকে ৬,ধনুতে ১০, মকরে ১৪, কুম্ভে ৩, মীনে ৪, এইরূপে অঙ্ক স্থাপন করিবেন। এখন জাতকের জন্মকুণ্ডলী চক্রের ন্যায় পাতকীচক্রে গ্রহচক্র স্থাপন করিয়া জাতকের শুভাশুভ ফল বিচার করিতে হইবে। যদি জাতক শুভগ্রহের দণ্ডে জন্মগ্রহণ করে এবং শুভগ্রহ বেধে থাকেন, তবে বালকের রিষ্টি হয় না, আর যদি জাতক অশুভগ্রহের দণ্ডে জন্ম গ্রহণ করে এবং অশুভগ্রহ বেধে থাকেন তবে রাশির অঙ্ক পরিমাণ দিন মাস ও বৎসরের সময় রিষ্টি হইবে।

বেধের নিয়ম।

মিথুন, মীন ও ধনুর সহিত কর্কটের বেধ, বৃষ কুম্ভ ও বৃশ্চিকের সহিত সিংহের, মেষ, মকর ও তুলার সহিত কন্যার বেধ হয়।

পূর্ব্বোক্ত জাতকের বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম, ইহার সহিত বৃষ কুম্ভ ও সিংহের বেধ। এবং লগ্নের দক্ষিণ বেধে রাহু সুতরাং ৩×৬×৮ পরিমাণ দিন মাস বৎসরে রিষ্টি সম্ভব।

নর চক্র।

একটি মনুষ্যের আকৃতি অঙ্কিত করিয়া তাহার মস্তক প্রভৃতি অঙ্গে নক্ষত্রের অঙ্ক রাখিয়া জন্ম নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে জাতকের শুভাশুভ ফল অবগত হইতে হয়। জাতকের জন্ম কালিন রবি যে নক্ষত্রে থাকেন, সেই নক্ষত্র হইতে তিনটী নক্ষত্র ঐ অঙ্কনের মস্তকে, পাঁচটী নক্ষত্র মুখে, দুইটী নক্ষত্র স্কন্ধে দুইটী নক্ষত্র বাহুতে, দুইটী নক্ষত্র হস্তে, পাঁচটী নক্ষত্র হৃদয়ে, একটী নক্ষত্র নাভিতে একটী নক্ষত্র গুহ্যে, দুইটী নক্ষত্র জানুদ্বয়ে, চারিটী নক্ষত্রে পদদ্বয়ে স্থাপন করিতে হয়।

ফল।

জাতকের জন্ম নক্ষত্র মস্তকে পড়িলে নৃপতি সদৃশ ও পরমায়ু একশত বৎসর হয়। মুখে জন্ম নক্ষত্র পড়িলে জাতক ধার্ম্মিক, ধনবান ও পরমায়ু একশত বৎসর বিশিষ্ট হয়। জন্ম নক্ষত্র স্কন্ধে পড়িলে জাতক ভোগবান ও পরমায়ু একশত বৎসর বিশিষ্ট হয়, জন্ম নক্ষত্র বাহুতে পড়িলে জাতক দুঃখী ও পরমায়ু ৬৬ বৎসর বিশিষ্ট হয়। জন্ম নক্ষত্র হৃদয়ে পড়িলে জাতক ধনবান ও ৮৫ বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট হয়। জন্ম নক্ষত্র হস্তে পড়িলে জাতক চোর, পরমায়ু ৭০ বৎসর বিশিষ্ট হয়। জন্ম নক্ষত্র গুহ্যে পড়িলে জাতক পরদারাসক্ত ও ৬৬ বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট হয়। জন্ম নক্ষত্র নাভিতে পড়িলে জাতক অল্প ধনী ও

৮০ বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট হয়। জন্ম নক্ষত্র জানুতে পড়িলে জাতক পর্য্যটন শীল ও ৫০ বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট হয়। জন্ম নক্ষত্র চরণে পড়িলে নির্ধনী ও অল্পায়ু হয়।

নারী চক্র।

একটী নারীর আকৃতি অঙ্কিত করিয়া তাহার মস্তক মুখ প্রভৃতি অঙ্গে নক্ষত্রের অঙ্ক সন্নিবেশ করিয়া জন্ম নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে জাতকের শুভাশুভ ফল অবগত হইতে হয়। জাতিকার জন্ম কালীন রবি যে নক্ষত্রে অবস্থান করেন, সেই নক্ষত্র হইতে তিনটী নক্ষত্র মস্তকে সাতটী নক্ষত্র মুখে আটটী নক্ষত্র স্তনে তিনটি নক্ষত্র হৃদয়ে তিনটি নক্ষত্র নাভিতে তিনটি নক্ষত্র নারীচক্রের গুহ্যে স্থাপন করিয়া নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে ফল নির্ণয় করিতে হয়।

ফল।

জাতিকার জন্ম নক্ষত্র মস্তকে পড়িলে জাতিকা সন্তাপিতা হয়। জন্ম নক্ষত্র মুখে পড়িলে সুখবতী ও মিষ্টান্নভোজী হয়। জন্ম নক্ষত্র স্তনে পড়িলে জাতিকা পতির প্রেম ভাগিনী হয়। জন্ম নক্ষত্র হৃদয়ে পড়িলে জাতিকা সদানন্দময়ী হয়। জন্ম নক্ষত্র নাভিতে পড়িলে জাতিকা পতির আনন্দ বর্দ্ধনকারিণী হয়। এবং জন্ম নক্ষত্র গুহ্যে পড়িলে জাতিকা কামাতুরা হয়।

দৃষ্টিভাব চক্র।

জাতকের জন্মকুণ্ডলী চক্রে গ্রহগণ যে স্থানে অবস্থান করেন সেই স্থান হইতে তদ্ধন প্রভৃতি দ্বাদশ স্থানে কি পরিমাণে দৃষ্টি করেন তাহা দেখিয়া জাতকের শুভাশুভ ফল নিরূপন করিতে হয়। কোন গ্রহ শুভগ্রহের কি মিত্রগ্রহের দৃষ্টি পাইলে কিঞ্চিৎ বলবান হয়েন। পাপ গ্রহের কি শত্রুগ্রহের দৃষ্টি পাইলে কিঞ্চিৎ হীনবল হইয়া থাকে।

দৃষ্টির নিয়ম।

গ্রহগণ যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থান হইতে তৃতীয় ও দশম স্থানে পদ দৃষ্টি নবম ও পঞ্চম স্থানে অর্দ্ধদৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে ত্রিপাদদৃষ্টি এবং সপ্তম স্থানে পূর্ণ দৃষ্টি করেন। কিন্তু বিশেষত্ব এই শনি তৃতীয় ও দশম স্থানে পাদ দৃষ্টি না করিয়া পূর্ণ দৃষ্টি করেন। বৃহস্পতি নবম ও পঞ্চম স্থানে অর্দ্ধ দৃষ্টি না করিয়া পূর্ণ দৃষ্টি করেন। মঙ্গল চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে ত্রিপাদ দৃষ্টি না করিয়া পূর্ণ দৃষ্টি করেন।

গ্রহগণ যে স্থানে অবস্থান করেন তথা হইতে দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে আদৌ দৃষ্টি করেন না।

রাহু পঞ্চম সপ্তম নবম ও দ্বাদশ স্থানে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন। দ্বিতীয় ও দশম স্থানে ত্রিপাদ দৃষ্টি করেন। তৃতীয়, ষষ্ঠ, চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে অর্দ্ধ দৃষ্টি করেন। এবং যে স্থানে অবস্থান করেন সেই স্থানে ও একাদশ স্থানে আদৌ দৃষ্টি করেন না।

ত্রিপাপ চক্র।

কেতু পতাকী, কেতু কুণ্ডলী ও গুরুকুণ্ডলীকে একত্র করিয়া জাতকের ত্রিপাপ বর্ষ দ্বিপাপ বর্ষ অবগত হইতে হয়। জাতকের বয়সের প্রত্যেক বৎসরে কেতু পতাকী মতে একটি গ্রহ, কেতু কুণ্ডলী মতে একটি গ্রহ এবং গুরুকুণ্ডলী ১ মতে একটি গ্রহ এই তিনটী গ্রহ বর্ষাধিপতি হন। জাতকের কোন বৎসর বয়সে কোন্ তিনটী গ্রহ বর্ষাধিপতি হইবেন, এই চক্রে তাহা নির্ণয় হইয়া থাকে, তিনটী পাপগ্রহ একবৎসরের অধিপতি হইলে তাহা ত্রিপাপ বর্ষ কহে। এক পাপ যুক্ত বৎসরে কষ্ট, দুইটী পাপ গ্রহযুক্ত বৎসরে পীড়া, তিনটী পাপ গ্রহযুক্ত বৎসরে কঠিন পীড়া, অথবা জাতকের প্রাণহানি হইবার সম্ভব, তিনটী শুভগ্রহ যে বৎসরের অধিপতি হন, সেই বৎসর জাতক শুভ ফললাভ করিয়া থাকে!

কেতু পতাকী।

নয়টী ঘর যুক্ত একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ শনি, বৃহস্পতি, রাহু, কেতু ও শুক্র এই নয়টী গ্রহ পর পর নয়টী ঘরে স্থাপন করিতে হয়। পরে রবির ঘরে ৩, ১৩, ২১, চন্দ্রের ঘরে ৪, ১৩, ২২ মঙ্গলের ঘরে ৫, ১৪, ২৩, বুধের ঘরে ১, ১৫, ২৪ শনির ঘরে ৭, ১৬, ২৫ বৃহস্পতির ঘরে ৮, ১৭, ২৬ রাহুর ঘরে ৯, ১৮, ২৭ কেতুর ঘরে ১০, ১৯, ১ শুক্রের ঘরে ১১, ২০, ২ নক্ষত্র স্থাপন করিয়া জাতকের জন্ম নক্ষত্র অনুসারে কেতু পতাকী মতে বর্ষাধিপতি স্থির করিয়া লইতে হয়। ৩, ১২, ২১ নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বৎসর রবি, ৪, ১৩, ২২ নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষ চন্দ্র, ৫, ১৪, ২৩ নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষ মঙ্গল, ৬, ১৫, ২৪ নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষ বুধ, ৭, ১৬, ২৫ নক্ষত্রে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষ শনি, ৮, ১৭, ২৬ নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষ বৃহস্পতি, ৯, ১৮, ২৭ নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষ রাহু, ১০, ১৯, ১ নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষ শুভ বর্ষাধিপতি হইবেন।

মুস্কিল আসান।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত।

ইয়া পীর মৌলা মুস্কিল আসান!
দরগাতে পীর, দোরে ফকীর, দোজকে সয়তান।
(ও ভাই) দিন-দুনিয়া পয়দা করে আল্লা দিল কয়ে,
হাঁদু মোচল্‌মানে মেলে থাক্‌বা এক হয়ে;
(ও ভাই) হাঁদুর বেদে য্যামন আছে কোরাণেতে কয় তা,
সত্যপীরের সিনী মেনে দুর্গায় দেবা ফয়তা;
জরু ছাওয়াল জিন্দা রবে, সুখের হাবিলি হবে,
আলা বিবি দোলায় শুয়ে খাবে সাঁচি পান—
আর বাবুজী ব্যাহেস্তে গিয়ে বানাবে দালান।
(ও ভাই) নাস্তা করে খাস্তা খাবা সস্তা দরে কিনে,
আল্লা রসুলউল্লা নাম নেবা রাতি দিনে;
মোল্লায়ে ভাই গোল্লা দেবা পুরুতরে কাঁচকলা,
আর, মোচল্‌মানে রাখ্‌বা নুর হাঁদু আর্কফলা;
বিচের করে নর কি নাদি, কল্‌মা পড়ে করবা সাদি,
ল্যাড়কা লেড়কী পয়দা করে ফুর্ত্তি রাখ্‌বা জান,
আর, সাঁজের বেলা ফকির এলে পয়সা দেবা দান।

জ্যোতিষ বচন।

ভালাই যদি চাও—
মুখটি বুজে, ঘাড়টি গুঁজে জ্যোতিষ বচন মেনে নাও
অশ্লেষা মঘা, এড়াবি ক' ঘা,
জামাই গেলে শ্বশুর বাড়ী খাওয়ায় পুঁই ডগা;
দেখ যদি বারবেলা, দিক্‌শূল, নোড় না এক চুল,
লাগ্‌লে পিছে তেরস্পর্শ কিছু না হয় হবে অর্শ,
আর্য্য—প্রয়োগ-নয় ত সে ত ভুল;

বিধান দেছে গন্নাখাঁদা—হাঁচি টিক্‌টিকীর বাধা,
পেছু ডাকা না মানে তার সাত পুরুষ গাধা;
কেবল স্থান বিশেষে জেঠীর পতন—
হয় ত ফলে মনের মতন,
নয় ত দেখে বৈতরনীর সদর ঘাটে বাঁধা নাও॥

সাধক-সঙ্গীত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ।

বারোয়াঁ—যৎ।

তারা তোমার অন্ত পাওয়া ভার।
(তোমার) ভাব সাগরের পারে যেতে
বেদ বেদান্ত মানে হার॥
তোমার কান্না তোমার হাসি
(কেবল) বুঝেছেন ঐ শিব সন্ন্যাসী,—
তাইতে হয়ে কাশীবাসী
করেছেন গো আপ্তসার॥
(তুমি) কল্পরূপে কেউটে হয়ে
ছোব্‌লাও জীবে ফোঁস্ ফোঁসিয়ে,
(আবার) দুর্গা রূপের রোজা সেজে মা,
নামিয়ে নাও তার বিষের ভার॥
(তোমার) লুকোচুরী কথায় কথায়,
নর কি নারী বোঝা যে দায়,
তালঠুকে তাই শ্রীপদ কয়
জন্মে গোল আছে তোমার॥
(তোমার) পদে পদে দণ্ডবৎ
যাচি দিয়ে নাকে খৎ,
কেন গাল্ খাবে মা দাও গো ধরা,
(মিছে) হায়রাণী ক'রনা আর॥

সাধক কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কমলাকান্তের ভক্তি কুসুম বিকাশ উন্মুক্ত সংসারে বৈরাগ্য বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগ, পরমাবিদ্যার উপাসনায় বিভোর। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, কি যেন কি এক চিন্তায় রত, অথচ প্রসন্ন বদন! কালী নামানুকীর্ত্তান পরমানন্দ, সন্ধ্যার পর সঙ্গীতালয়ে যান, ব্যক্তি বিচার, স্থান বিচার না করিয়া শ্যামা সঙ্গীত ভক্তির উচ্ছ্বাস, প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখাইয়া ঘোর বিষয়ীরও ক্ষণেকের জন্য বিকার উপস্থিত করেন। নূতন নূতন গীত রচনা করিয়া গুণগ্রাহী লোকদিগকে আনন্দিত করেন। গঙ্গার ঘাটে, কালীমন্দিরে, যেখানে বিরাগী ভক্তিমান লোকের সমাগম হয়, সেই স্থানেই অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করেন। শিষ্যগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার মানসিক বিকাশ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অম্বিকায় আর বেশী দিন রাখা নিরাপদ নয় বিবেচনা করিলেন। তাঁহার মাতার নিকট গুরুপুত্রের মানসিক অবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে চান্নায় পাঠাইয়া দিলেন!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধকের মাতুলালয় চান্না। এই চান্নাগ্রাম বর্দ্ধমানের পশ্চিম। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের খানা জংসন নামক ষ্টেশনের এক ক্রোশ উত্তরে। মাতুলের নাম নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। চান্না তৎকালে বিশেষ গণ্ডগ্রাম না থাকিলেও তথায় অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাস ছিল। একটী টোল, সঙ্গীতের স্থান, বাজার হাট, দেবালয়, গণ্ডগ্রামের সব সৌষ্ঠব ছিল। বড় পুষ্করিণী, সুন্দর ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট, ঘাটের দুই পার্শ্বে শিব মন্দির তৎকালিক গণ্ডগ্রাম সকল পুণ্যবান ধার্ম্মিক সঙ্গতিশালী লোকের অবস্থানের পরিচয় দিত। এখনও অনেক পুরাতন গ্রামে ঐ সকল সম্পত্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণী পঙ্কিল, পঙ্কজজালে পরিপূর্ণ! ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট, ভগ্ন বিচ্ছিন্ন শৈবাল মণ্ডিত। মন্দির ইষ্টকের চূর্ণস্তূপ রূপে পরিণত। সাধারণ মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ পরিবার বর্গের ভরণ পোষণ পীড়িত, ধনাঢ্য গুণগ্রাহী ধার্ম্মিক লোকের অভাব, এই সকল কারণে অনেক গণ্ডগ্রাম শ্রীহীন হইয়াছে। বর্ত্তমান চান্নারও সেই অবস্থা। এই স্থানে মহাত্মা কমলাকান্তের একটী আসন আছে। বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি বিদ্বান্ গুণগ্রাহী ধার্ম্মিক, ভারত-সম্রাট কর্ত্তৃক বিবিধরূপে সম্মানিত মহারাজাধিরাজ বিজয় চাঁদ বাহাদুর সেই স্থানটী বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

সকল রসের সার ভক্তিরস। ভক্তিরস অমৃত, বর্গে দেবলোক অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন, মর্ত্তে মানবগণ ভক্তিরসে অমরত্ব লাভে সমর্থ হন। সেই ভক্তিরস মানবের হৃদয় প্রস্রবণ হইতে উৎপন্ন হইয়া জগৎ প্লাবিত করিয়া ফেলে। ভক্ত জগৎকে অমৃতময় দেখেন, রস সাগর সচ্চিদানন্দের পদপ্রান্ত ধরিয়া প্রেম সাগরে ভাসিতে থাকেন। সুকৃতি ফলে যিনি একবার সেই রসের আস্বাদন করিতে সমর্থ হন, তাহার আর সংসারে কোন বস্তুই স্পৃহনীয় হয় না। সংসারের কোন প্রলোভনই তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে না। পিপীলিকাগণ যেমন মধুভাণ্ডে, ভক্তগণও তেমনি পরম অমৃত সাগর সর্ব্ব শক্তিমানে দৃষ্টি রাখেন। ভক্তগণ সংসারের প্রলোভন সকলের বহুরূপী ভাব, তাহাদের কুটিলতা, অস্থিরতা ক্ষণস্থায়িতা দেখিয়া হাসা করেন। সাধকরূপ পত্র কাণ্ডের সেই ভাব। সর্ব্বদাই ভাব, বয়স অতি অল্প হইলেও জনকাদি মহর্ষির ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে থাকিবার তাঁহার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। কমলাকান্ত চান্নায় আসিলেন। জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। জননী পুত্রমুখ দেখিয়া সুখী হইলেন কিন্তু অম্বিকার শিষ্যগণের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইলেন। কমলাকান্ত স্নানাহার করিয়া সুস্থ হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে একান্তে ডাকিলেন, কাছে বসাইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিয়া মাতার মর্ম্মভেদী নয়নধারা পতিত হইল। কমলাকান্ত মায়ের ভাবান্তর দৃষ্টি করিয়া চঞ্চল হইলেন, চক্ষের জল পড়িল, অতি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা কি হইয়াছে? জননী উত্তর করিলেন, কমলাকান্ত তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তোমার পিতার মৃত্যুর পর আমি তোমাদিগকে আশ্রয় করিয়া সংসারে আছি। তুমি বিদ্বান হইবে, ধনবান হইবে, লোকের নিকট মাননীয় হইবে, আমার স্বামী বিয়োগ দুঃখ দূর করিবে, আমি এই ইচ্ছা করি, কিন্তু শিষ্যগণের দ্বারা তোমার মনের অবস্থা জানিয়া আমার বড় দুঃখ হইয়াছে। তুমি আশা অবধি আমি তোমার প্রতি নজর রাখিয়াছি। তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার গেরুয়াবাস, তোমার অন্যমনস্কভাব দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইতেছে! কমলাকান্ত কহিলেন, কেন মা! আমি ত কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই, আমাদের টোলে সকলেই গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। আমি মাঝে মাঝে সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া থাকি তাহা কি মন্দ, জগদম্বার নাম করিয়া, গুণ গাহিয়া নিজে সুখী হই, দশজনকে সুখী করিতে পারি, তাহা কি মন্দ? আমি পড়ায় অবহেলা করি, নাই, প্রায় ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়াছি। পূজা পদ্ধতিও

কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছি। মা আপনার নিকট কিছু অপলাপ করিব না, আমার বিষয় বৈভব অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। ভুবনেশ্বরীর গুণানুকীর্ত্তন করিলে সব ভুলিয়া যাই। সেই হাস্যময়ী প্রসন্নমূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিতে পাই, জগতের প্রত্যেক বস্তুতে সেই প্রসন্নময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। মা তুমি সেই আনন্দময়ী। আমি তাহাকে ও তোমাকে ভিন্ন ভাবে দেখি না। আমি তোমারই চরণ ভিন্ন কিছু চিন্তা করি না। মা নামই আমার মহামন্ত্র, মা আমার উপাস্য দেবতা। মা নাম উচ্চারণ করিলেই আমার সকল সন্তাপ সকল যন্ত্রণা দুর হয়। আমি জানি, আমার মা আছেন, আমি রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও সম্পদশালী, সন্ন্যাসী অপেক্ষাও সুখী, বালক অপেক্ষাও চিন্তাহীন। জগৎ আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু মা আমার আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। মা আমার মনের বল, হৃদয়ের শক্তি। এ দুস্তর সংসার সাগর মায়ের কৃপাই তরণী. একমাত্র উদ্ধারের উপায়। মা তুমি প্রসন্ন হও, কৃপানয়নে চাও, তোমার সন্তানের অভাব কিসের, তোমার চিন্তাই পরম বিত্ত, তোমার অনুগ্রহই সংসারের সকল সম্পত্তি। যে ব্যক্তি মায়ের চরণ চিন্তা না করিয়া নয়ন মুদ্রিত করে, মায়ের চরণ চিন্তা না করিয়া শয্যাত্যাগ করে সে ব্যক্তি ভ্রমে পতিত। মা শব্দই দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। দারুন শারীরিক ও মানসিক কষ্টে জীব মাত্রেই মা শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। মা আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, অনুমতি কর, কিঙ্করের কর্ত্তব্য কি? মহাত্মার জননী কিয়ৎক্ষণ পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, ভাবিলেন, আমার সুসন্তান, অল্প বয়সে ভক্তি উপার্জ্জন করিয়াছে। সংসারের সুখ দুঃখের বিধাতার নিতান্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, শান্তির সাগরে ডুবিয়াছে, ইহার সৎ কর্ম্মে বাধা দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন, বাবা তুমি এত অল্প বয়সে ভক্তি উপার্জ্জন করিয়াছ, আমি সুসন্তান পাইয়াছি বলিয়া অলঙ্কার করিতেছি। তোমার ধর্ম্ম কর্ম্মে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। তোমার মনের উৎদ্বেগ দেখিয়া চিন্তা হইতেছে পাছে তুমি গৃহত্যাগী, দেশত্যাগী হও। তোমার মুখ না দেখিয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব। তুমি সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম অর্থ উপার্জ্জন কর, এই আমার ইচ্ছা। এই বলিয়া জননীর নয়নে জলকণা দৃষ্ট হইল। মহাত্মার হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল, তিনি জননীর মুখ পানে চাহিয়া পাদস্পর্শ পূর্ব্বক গদগদ্ স্বরে বলিলেন, কিঙ্করকে যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই করির। "মা হওয়া কি মুখের কথা—শুধু প্রসব করে হয় না মাতা।" জননী বিশেষ

চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম কর। দেশত্যাগ, গৃহত্যাগ করিও না। তুমি জগন্মাতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নিত্য সেবা করিবে, বিবাহ করিবে। মহাত্মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, গৃহত্যাগ, দেশত্যাগ করিব না যাহা অনুমতি করিতেছেন, তাহাই করিব। জননী কহিলেন, সংসারার অর্থ চিন্তা প্রয়োজন। সংসারীর সংসারীর ধর্ম্ম কর্ম্ম অর্থ সাপেক্ষ। অতিথি সৎকার পূজা পার্ব্বণ সকল কর্ম্মেই অর্থ প্রয়োজন। গৃহে থাকিলে বিবাহ করা কর্ত্তব্য। তোমাকে অবশ্যই অর্থ চিন্তা করিতে হইবে। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। সাধক কহিলেন, আপনার আশীর্ব্বাদই অমূল্য রত্ন, আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে কোন বস্তুরই অভাব থাকিবে না। সংসারে সুখ দুঃখে রাখিবার কর্ত্তা একজন। যদি আমরা তাঁর নিতান্ত শরণাপন্ন হই, তিনিই আমাদিগকে সকল সময়ে, সকল অবস্থায় রক্ষা করিবেন। আপনার কথা কখন অবহেলা করিব না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। আমি অম্বিকায় অর্থ চিন্তায় অবহেলা করি নাই। শিষ্যগণের মাঙ্গলিক সমুদয় কর্ম্মেই ব্রতী থাকিতাম। জননী গুণবান পুত্রের প্রিয়বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

মহাত্মার জননী পুত্রকে সংসারী করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মানবের সংসারে দুইটী বন্ধন। প্রথম স্নেহময়ী জননী. দ্বিতীয় চারুভাষিণী দুঃখের দুঃখিনী সহধর্ম্মিণী। মায়ের বন্ধন অদৃশ্য। বন্ধনে যন্ত্রণা নাই। পরম স্বর্গীয় স্নেহে ও যত্নে মানুষকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। ভাল না বাসিলেও ভালবাসা, যত্ন না করিলেও যত্ন করা, ভক্তি না করিলেও শ্রদ্ধা করা এই সকল গুণ কেবল জননীতেই বর্ত্তমান। ভক্তি না করিলে দেবতার কৃপাদৃষ্টি হয় না। জননী দেবতা অপেক্ষাও উচ্চ স্থানের। এমন দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য দেবতার অনুসন্ধানে মানব কি সহজে সংসার পরিত্যাগ করিতে পারে, মাতৃস্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন, তাহা ছিন্ন করা অতি অসাধারণ। সংসারে মানব যত্ন ও ভালবাসার প্রয়াসী। সে যত্ন ও ভালবাসা পাইলে সব ভুলিয়া যায়, সংসারের গুরুভার মস্তকে করিয়া হাস্যমুখে বিচরণ করিতে পারে। সেরূপ যত্ন ও স্নেহ মানব কেবল জননীর নিকট প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বন্ধন সহধর্ম্মিণী। রোগ, শোক, ভয়, দুঃখ কম্পিত সংসার একমাত্র চারুশীলা রমণীর বলে দণ্ডায়মান। প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক প্রাসাদ, প্রত্যেক কুটীর

রমণীর প্রেম ও ভালবাসার কীর্ত্তিস্তম্ভ। চারুশীলা প্রিয়ভাষিণা রমণীই সংসার স্থাপনে বিধির যন্ত্র স্বরূপ। “বহুত যতনে বিধি করি অনুমানা—নাগর নাগরী কৈল নিরমানা।” এই রমণী রত্ন সৃষ্টি করিবার জন্য বিধিকে অনেক যত্ন করিতে হইয়াছিল। সংসার মরুভূমিতে রমণীই উৎস। তাহার ভালবাসা প্রেম, যত্ন সংসারে অমৃত। যিনি এরূপ রমণী লাভ করিতে পারেন, তিনি কি সহজে সংসার পরিত্যাগ করিতে পারেন। একথা মহাত্মার জননী উত্তম রূপে বুঝিতেন। তিনি ভাবিলেন, আমি মায়ের মত মা হইব, সৎবংশজাতা পুত্রের অনুগামিনী সহধর্ম্মিণী সন্ধান এখন অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে।

হৃদয়-গীমর

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী।

হৃদয় পাইতে তার বাড়াইনু বাহু—
বুকের মাঝারে তার লুকাল যে চাঁদ
তারে কি গ্রাসিতে পারে এই বাহু রাহু?
নিস্ফল প্রয়াসে হায় হইনু উন্মাদ!
অধরে চুমিয়া শুষে লব তার প্রাণ
ভাবিয়া অধরে কত করিনু চুম্বন
আকুল আবেগে!—করিল সে প্রতিদান
মুখ-মধু—মিলিল না পরাণ-রতন!
সাজায়ে রূপের ফুলে যৌবনের ডালা
দিল সে আদরে কত মোরে উপহার!
সুধাহীন চাঁদের সে চাঁদিনীর আলা
হৃদয় পরাণ হীন রূপের বাহার!
নারীর হৃদয় প্রাণ অমূল্য বৈভব—
সহজে পায়না কেহ—আর পায় সব।

জন্মভূমি

“জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”

২৭শ, বর্ষ। ১৩২৮ সাল, আষাঢ়। ৩য়, সংখ্যা।

পাগলিনী।

লেখক,—৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত।

১

ওই দেখ, আসিতেছে পাগলিনী বালা!
লতাপাতা গলে দোলে করে বনমালা।
অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল আকাশে ছড়ায়ে,
কভু হেসে ছোটে, কভু কাঁদিয়া দাঁড়ায়।
এক মুখ, আর খাদ, আর এক তান,
হাসিয়া কাঁদিয়া গায় আর এক গান।
কত কি যে কথা কয় অর্থ না জুয়ায়,
কভু উর্দ্ধে, কভু নিম্নে কভু পার্শ্বে চায়।

---

* Copied from the original by Dhirendra Nath Haldar.
“পাগলিনী” হারাইয়া যাওয়ায় তজ্জন্যে তৎকালে বন্ধুবিয়োগ কাব্যের যথাস্থানে ছাপাইতে পারি নাই। পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা উক্ত কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইবে।

২

এই বালা বিহ্বলা সামান্য লোক নয়,
মহা মাননীয় এঁর পিতা মহাশয়।
তাঁহার ইনিই মাত্র সবে কন্যাধন,
প্রাণতুল্য দেখে তারে যত পরিজন।
কেনই না সে কন্যারে বাসিবেন ভাল,
যাঁর রূপে গুণে কুল হ'য়ে আছে আল।
যেমন চরিত্র ধর্ম্ম স্বভাব বিমল
তেমনি হৃদয় শোভা সরস সরল
যেমন সৌজন্য দয়া, তেমনি বিনয়,
তেমনি যতনে দেন অনাথে আশ্রয়।
যেমন শোভন রূপ, তেমনি মাধুরী ;
তেমনি বিদ্যার প্রভা, শিল্পের চাতুরী।
একাধারে সুসদৃশ সকল সংযোগ,
কদাচ করেন বিধি এ হেন প্রয়োগ।

৩

কিন্তু যে নলিনী নদী আলো করে রয়,
সেই যেন আগে বেগে ছিন্ন ভিন্ন হয়।
এই যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি সৃষ্টির গরিমা,
ইহার উপর হ'ল জাতির মহিমা।
সবে বালা গৃহসুখে প্রবেশিতে চায়,
অমনি আকাশ ভেঙে পড়িল মাথায়।
না পূরিতে বিবাহের পঞ্চম বৎসর,
রূপে গুণে যোগ্য পতি গেল লোকান্তর।

৪

কোনক্রমে ধৈর্য্যশীল সহিয়ে ব্যথায়,
কাটাতে ছিলেন কাল বিদ্যালোচনায়।
সমবয় নারীদের শিক্ষার কারণ,
প্রাণপণে করিতেন সর্ব্বদা যতন।

পূজা করি পিতা মাতা দেবতা অতিথী,
পাইতেন মনে মনে কতই পিরিতি।
করিতে পারিলে কারো দুখ বিমোচন,
একেবারে মহানন্দে হ'তেন মগন।
যাহা হোক্ এক অংশে এত মন্দ নয়,
হ'তেছিল কোনরূপে সময় সদয়।
শোচনীয়া হইয়াও জননী জনকে,
রাখিয়া ছিলেন তবু অনেক পুলকে।

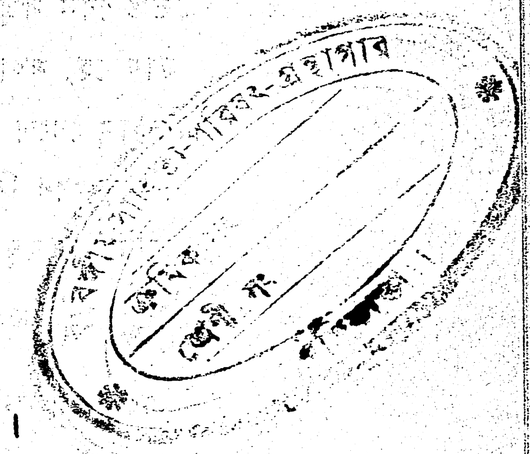

৫

প্রণয়ের সাংঘাতিক সম্মোহন বাণ,
কোমল হৃদয়ে যদি না পাইত স্থান,
তাহ'লে ইহার দশা হ'তনা এমন ;
পারিতেন নিরুদ্বেগে কাটাতে জীবন।
হায় যে নিকুঞ্জ শোভে ফলফুল ভরে,
দাবানল বেগে ধায় তাহারি উপরে !
প্রতিদিন দিনকর পাইবে প্রকাশ ?
করিবে কি রাহুকেতু কভু তারে গ্রাস ?
যারে না নাচাবে হেন সুকুমারী ভেলা,
তবে আর কারে বলে সাগরের খেলা ?

৬

আমাদের সমপাঠী বন্ধু একজন,
প্রতিবেশী গৃহস্থের সুমতি নন্দন।
অহো, কি অন্তর তাঁর সরল সবল,
ঢল ঢল বিশদ স্ফটিক গঙ্গাজল !
কেমন সে জ্যোতিষ্মান্ উদার ললাট,
কেমন সে দৃঢ়বদ্ধ শরীরের ঠাট,
কেমন সে হাস্যময় কপোল অধর,
বিদ্যুত বিভূতি ভরা লোচন সুন্দর !

৭

কেমন মধুর ভাব সকলের প্রতি,
গুরুজন প্রতি সদা অচলা ভকতি,
কিবা প্রেম রস আর্দ্র মধুর হৃদয়,
কিবা প্রিয়জন সহ মধুর প্রণয়।
যত তাঁর গুণাবলী মনে করি ধ্যান,
তত যেন সম্মুখেতে হন উদীয়ান,
হায় হে, মহান্ মিত্র, কোথায় এখন,
কোন্ বেশে কোন্ দেশে করিছ ভ্রমণ,
কি কুক্ষণে বিধবা বিবাহ এল মনে,
ভ্রমিছেন রঘুবীর দণ্ডক গহনে।

৮

এই পাগলিনী সনে সেই বান্ধবের,
আশৈশব প্রীতিভাব ছিল উভয়ের।
বড় প্রীতি ইঁহাদের মাতায় মাতায়,
পরিবারে পরিবারে, পিতায় পিতায়।
পাশাপাশি বাড়ী ছিল, মধ্যে ছিল পথ,
দুবাড়ীর মেয়েরা করিত যাতায়াত।
পরস্পরে ছিল হেন আচার ব্যভার,
দুই পরিবার যেন এক পরিবার।
দুবাড়ীর দুই ... ... র,
সম্পর্কও ছিল সাত পুরুষ অন্তর,
কিন্তু উহাদের ছিল এমনি ব্যভার,
পরস্পরে যেন তাঁরা ভগ্নী আপনার।

৯

আমাদের সেই মিত্র জন্মেন্ যে মাসে,
এ বালাও সেইমাসে ধরাতলে আসে।
যদিও একের পুত্র, অন্যের নন্দিনী,
প্রণয়ে লভিলা যুগ্ম প্রত্যেক জননী।

এঁর কন্যা নাই, নাই তাহাতে বিষাদ,
ওঁর কন্যারত্ন হেরে পূরিল সে সাধ।
ওঁরও ছিল না পুত্র, ছিল দুঃখ প্রাণে,
এঁর পুত্রে ভাবিতেন নিজ পুত্রস্থানে।
যুগল গৃহিণী ভগ্নী সসন্তোষ মনে,
স্নিগ্ধ নেত্রে দেখিতেন নন্দিনী নন্দনে।
ওঁর ... উ ... লইয়ে সন্তান,
করাতেন সস্নেহে সাদরে দুগ্ধপান।

১০

সে অবধি এই দুটী বালক বালিকায়,
বড় ভাল বাসিত দুজনে দুজনায়।
একত্রে রাখিলে শুয়ে হাসিত কৌতুকে,
স্বতন্ত্র রাখিলে বড় থাকিত অসুখে।
একজন কেঁদে যবে হইত আকুল,
জননী থামাতে, ভেবে না পেতেন কুল,
লয়ে গিয়ে অন্য জনে দিতেন দেখিয়ে,
অমনি সকল ভুলে উঠিত হাসিয়ে।

১১

হইতে লাগিল যত বয়সে বর্দ্ধিত,
ক্রমে ক্রমে তত আরো স্নেহ উপজিত।
কেহ পেলে কোন বস্তু মনের মতন,
রাখিত অন্যের তরে করিয়া যতন।
খাইতে খাইতে মুখে মেটো যা লাগিত,
ল'য়ে গিয়ে অপরের মুখে তুলে দিত,
একত্রে থাকিত সদা একত্রে খেলিত,
একত্রে হাসিত ব'সে একত্রে,
একত্রে শিখিত শিল্প, একত্রে পড়িত,
এক প্রাণ পরস্পরে ছাড়া না থাকিত,
উঠে গিয়ে নিজ নিজ শুইত ভবনে,
প্রভাত না হ'তে আসি মিলিত দুজনে।

এ বলিত 'দাদা' আর সে বলিত 'ভাই'
ছেলে বেলা এত ভাব কারো দেখি নাই।

১২

পরস্পরে জননীকে 'মা' ব'লে ডাকিত,
গলা ধোরে 'মা মা' ব'লে সোহাগ করিত।
স্নেহাশ্রুতে ভেসে যেত তাঁদের নয়ন,
কোলে ল'য়ে করিতেন মুখেতে চুম্বন।
এইরূপে একত্রেতে এগার বৎসর,
নির্বিঘ্নে কাটায়ে ছিল সুখে পরস্পর।
তদন্তর উপস্থিত দুরন্ত সময়,
বিয়োজিত সরল শৈশব বন্ধুদ্বয়।

১৩

শিশুদের উভয়ের উভয়ের প্রতি,
দিন দিন উপজিত দেখে স্নেহরতি,
পূর্ব্বাবধি ভাবিতেন জননী যুগলে,
"বড় ভাল হয় পরস্পরে বিয়ে হ'লে।"
কিন্তু দেখে বয়সের বিষম সমতা,
সাহস হ'ত না কারো ফুটিতে এ কথা।
তাঁদের মনের কথা মনেই রহিল,
বিধির যা মনে ছিল তাহাই ঘটিল।

১৪

এদেশের পিতারাই সাক্ষাৎ বিধাতা,
কন্যা তাঁর, ইচ্ছা তাঁর, তিনি নিজে দাতা।
কন্যার বয়স হ'ল এগার বৎসর,
পিতা শশব্যস্তে স্থির করিলেন বর।
এ বর মহৎ বর, যথাযোগ্য লোক,
রূপে গুণে ধনে মানে উজ্জ্বল ভূলোক।
বটে পূর্ণশশী পূর্ণ ষোড়শ কলায়,
ভানু প্রণয়িণী কমলিনী কি তা চায়?

মহাধুম প'ড়ে গেল বিবাহ বাসরে,
কনে কিন্তু ম'রে গেল গুমুরে গুমুরে।

১৫

এতদিন দাদা বই কারেও না জানে,
দাদাই সর্ব্বস্ব তার ভালবাসে প্রাণে।
আর সে দাদার কাছে থাকিতে পাবে না,
আর সে দাদার সঙ্গে খেলে বেড়াবে না।
আর সুখে সাঁৎরাবে না সরোবর জলে,
আর উঠে দাঁড়াবেনা তীর তরুতলে।
আর প্রাতে মাঠে সকাল বেলায়,
ছুটে ছুটে বেড়াবেনা হেথায় হোথায়।
দূর্ব্বাদলে যেন আছে মুকুতা ছড়িয়ে,
তুলা দিয়ে সে শিশির নেবেনা তুলিয়ে।
খই মুড়কি ছড়িয়ে আছে শিউলির তলে,
দাদা আর আঁচলা কোরে দিবে না আঁচলে।
আর তারা ছুটে এসে মায়ের সদনে,
বসিবেনা গলা ধোরে দুকোলে দুজনে।
আর কভু একত্তরে খাবার খাবে না,
হাতেও নেবেনা, মুখে তুলেও দেবে না।
আর তারা সেঁচিবেনা ফুলগাছে জল,
আর তারা তুলিবেনা নব দূর্ব্বাদল।
বেড়াবেনা বাগানেতে বিকেল বেলায়,
সাজাবেনা পরস্পরে ফুলের মালায়।
আর তারা দেখা হ'লে উঠিবে না হেসে,
আলিঙ্গন দিবেনা উল্লাসে ছুটে এসে।
সদাই থাকিতে সাধ যে দাদার পাশে,
যে দাদার হাসিমুখ বড় ভালবাসে,
একটুও দেখিলে যার বিরস বয়ান,
অমি যেন একেবারে ফেটে যায় প্রাণ,

বিষণ্ণ দেখিতে তারে হবে চিরকাল,
এর চেয়ে তার পক্ষে কি আছে ভয়াল।

১৬

কন্যাদান করিলেন পিতা যেই বরে,
কনে লয়ে বর গেল আপনার ঘরে।
তরুলতা পরস্পরে সুখ আলিঙ্গনে,
কেমন বাড়িতেছিল কুসুম কাননে।
নধর বিটপ মাঝে ঢাকি কলেবর,
দিনে দিনে হ'তেছিল কেমন সুন্দর,
মুকুল ধরিবে কত কুসুম ফুটিবে,
সৌরভ ছুটিবে কত আনন্দ জন্মিবে;
অকস্মাৎ কোথা থেকে বুনো হাতী এল,
তরু কোল শোভা লতা ছিঁড়ে লয়ে গেল!

১৭

বালার বিবাহোদ্যোগ হয় যে সময়,
বান্ধব গেলেন চ'লে মাতুল আলয়।
কিছুদিন পরে যবে এলেন আগারে,
কি মালিন্যই দেখিলাম তাঁহার আকারে।
অঙ্গ ক্ষীণ, দীপ্তি হীন, বিষণ্ণ বদন,
কোটরে বসিয়া গেছে বিরক্ত নয়ন।
দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস, প্রশ্বাস, ঘন ঘন,
তৃপ্তি যেন একেবারে ত্যজে গেছে মন।

১৮

হইতে লাগিল ক্রমে দিন যত গত,
এ অবস্থা বাড়িতে লাগিল আরো তত।
পড়াশুনা, ছুটাছুটি, প্রান্তর ভ্রমণ,
বাড়ীর গাছের প্রতি দুবেলা যতন,
হারাম কাহিনী শুনা ব'সে মার কাছে,
ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া দাঁড়াইয়া কাছে,

ইত্যাদি যা কিছু তাঁর মহা বিনোদন,
একেবারে করিলেন সব বিসর্জ্জন।

১৯

সর্ব্বদাই বিরলেতে থাকিতেন বোসে,
ম্লান ম্লান হাসিতেন, জ্বলিতেন রোষে,
কি জানি কি বকিতেন, ভাবিতেন মনে,
কথা শুদ্ধ কহিতেন জননীর সনে॥

২০

ভুলেও না যাইতেন বালাদের বাড়ী,
সে এলে বাড়াতে পালাতেন তাড়াতাড়ি।
চোকে চোকে সম্মুখেতে পড়িতেন যবে,
দাঁড়াতেন স্তব্ধ হ'য়ে চাহিয়া নীরবে।

২১

শুধাইলে কেন মুখে নাই সম্ভাষণ,
কি কারণ ততদূর ভাব—বিবর্ত্তন,
হাসিতেন হো হো ক'রে বেতর বদনে,
ফেটে বাহিরিত অগ্নি যুগল নয়নে।
কভু স্নেহভরে গলা করিয়া ধারণ,
হেঁসে কেঁদে করিতেন ললাট চুম্বন।
সহসা ছাড়িয়া যদি পালাতেন দূরে,
বালার আনত দুটী চক্ষু জলে পূরে।

২২

দুবেলা যেতেম আমি দেখিতে তাঁহারে,
বুঝাতেম আপনার বোধ অনুসারে।
কিন্তু তিনি দিতেন না প্রত্যুত্তর তায়,
বরঞ্চ হ'তেন আরো বিরক্তের প্রায়।
বাঁকা মুখ চিরকালই বিষ লাগে যেন,
কে জানে সে বিষাদেতে চিত নাই কেন।
বোধ হয় বান্ধবের নয়নের জল,
আনায় সে অভিমান কোরে দিত জল।

২৩

বুঝায়ে বুঝায়ে শেষে সবে বলে গেনু,
সুধরিয়া দিতে তাঁরে প্রায় হেরে এনু,
তখন আপনি ক্ষান্ত দিলাম বুঝান,
কাছে বোসে খেলিতেম, গাহিতেম গান।
কভু কভু ... তাগণের পুঁথি নিয়ে,
গল্প কোরে তাঁরে সব দিতেম দেখিয়ে!
কভু বা ভারত কভু রামায়ণ খুলে,
আপন করুণ স্বরে আপনিই ভুলে।
মগ্ন হ'য়ে পড়িতাম যুদ্ধ বনবাস;
আকুল হতেম কেঁদে সরিত না ভাষ।
তিনিও আমার সঙ্গে কাঁদিতেন বোসে,
শুনিতেন সে সকল মনের সন্তোষে।
সুধাতেন প্রাসঙ্গিক কথা কতমত,
আমিও তা বলিতাম বিস্তারিয়ে তত।
এইরূপ পূর্ব্বগাথা পড়ায় শুনায়,
পূর্ব্বাপেক্ষা বহু সুস্থ দেখিনু তাঁহায়।

২৪

সুস্থ দেখে, শুনাবারে রামায়ণ গান,
তাঁরে নিয়ে করিতাম আসরে পয়ান।
করুণা রসের সিন্ধু রাম—বিবরণ,
কবে না জুড়ায় কার সন্তাপিত মন।
তাতে সে সাগর 'গেনে' গাহিত রসাল,
তাই আমাদের আরো লেগেছিল ভাল;
এত ভাল,—সেরে গেল বন্ধুর বিকৃতি,
পাইলেন পুনর্ব্বার আপন প্রকৃতি।

২৫

সে অবধি আর তাঁরে দেখিনি তেমন,
বিরলে থাকিতে কিম্বা করিতে ক্রন্দন।

কেবল হ'তেন অন্যমনা মাঝে মাঝে,
তাও পুন চট্‌কা ভেঙে হাসিতেন লাজে।

২৬

ক্রমেতে হ'লেন রত বিদ্যা উপার্জ্জনে,
নূতন উৎসাহ সহ একতান মনে।
শাস্ত্রের প্রসঙ্গ বই কথা নাই আর,
সর্ব্বদাই শাস্ত্রালাপ, শাস্ত্রের বিচার।
শাস্ত্র ল'য়ে এইরূপ নিমগ্ন যখন,
প্রতিভা-প্রভায় নব বিভাসিত মন।
সম্মুখে রয়েছে খোলা জ্ঞানের ভাণ্ডার,
হ'য়েছে প্রবেশ পথ বেশ পরিষ্কার,
হটাৎ এ বালা এল এমন সময়ে,
বিধবা বিধুরা হ'য়ে পিতার আলয়ে।

২৭

হা দগ্ধবিধাত! তব এ কেমন মতি;
যুবতী সতীর কেন কেড়ে নাও পতি!
অকালে আশ্রয় তরু কেন ভাঙে ঝড়ে,
আশ্রিতা লতিকা হায় ভূমে লুটে পড়ে!
রে নির্দ্দয়, এ কেমন তোর ক্রুর মতি,
যুবতী সতীর কেন কেড়ে নাও পতি!
গৃহের মঙ্গলা যাঁরা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী,
কেন কর তাদের অনাথা কাঙালিনী!
আমোদিনী এয়দের মাঝে চুপ্ করে,
বসে আছে বিষাদিনী সাদা ঠেঁটী পরে;
দেখিলে কাহার নাহি ফেটে যায় প্রাণ,
কেবল বিধাতা তোর হৃদয় পাষাণ!

২৮

বিধবা হেরিয়া এঁরে বান্ধব সুজন,
হইলেন বিষম বিষাদে নিমগন।

আজি নিজ সুখময় শান্ত আলোচনা,
করিতেন নিরন্তর ইহারে সান্ত্বনা।
যাতে এ'র ভাল হবে শান্ত রবে মন,
একমনে করিতেন তাহাতে যতন।
তাঁহার সরল স্নেহে এই রমণীর,
ক্রমে ক্রমে হ'এল অন্তর সুস্থির।
ক্রমে ক্রমে শৈশবের সরল প্রণয়,
আপনা আপনি আসি হইল উদয়।
স'রে গেল তমোময় গাঢ় মেঘরাশি,
প্রকাশিল অরুণের অপরূপ হাসি।
দিগঙ্গনা বিষণ্ণ হইয়া নাহি আর,
ধরিয়াছে আপনার সুন্দর আকার।
ভাই বোনে পুনরায় হইল মিলন,
পাইল দুজনে পুন হারানো রতন।

২৯

প্রতিবাসী দুঃখীদের দুঃখ বিমোচনে,
নিয়ত নিযুক্ত এরা থাকিত দুজনে।
অতিথি আইলে ঘরে পরম আদরে,
সেবিত মনের সাধে প্রফুল্ল অন্তরে।
আপনার অন্তঃপুরে স্থাপি পাঠশালা,
পাড়ার যুবতীগণে পড়াইত বালা।
বাহিরে স্থাপিয়া এক নৈশ বিদ্যালয়,
যুবাদের পড়াতেন বন্ধু সদাশয়।
ধন দান, বিদ্যাদান, উপদেশ দান,
অকাতরে ক'রেছেন যতদূর প্রাণ।
এ পাড়ার যাহা কিছু হয়েছে মঙ্গল,
সকলেরি ইহারাই পত্তনের স্থল।

৩০

অয়ি পাগলিনী, আহা তখন তোমার,
হ'য়েছিল কি মধুর উদার আকার।

যেদিন দাদার সনে সদর দর্জায়,
দাঁড়াইতে করিবারে কাঙ্গালী বিদায়।
পাড়ার অনাথগণ পুরোভাগে আসি,
আর্দ্র হ'য়ে ঊর্দ্ধমুখে অশ্রুজলে ভাসি,
চাহিয়া থাকিত তারা তোমাদের পানে;
না জানি কতই তৃপ্তি পাইত পরাণে।
যেন স্বর্গ হ'তে কোন দেবতা দম্পতি,—
এসেছেন ঘুচাইতে তাদের দুর্গতি!
নিশান্তের শান্তিময় তারার মতন,
তোমাদের সমুজ্জ্বল চারিটী নয়ন,
তখন কেমন আহা স্নেহরস ভরে,
বিতরিতে দয়ামায়া তাদের উপরে।

৩১

এখন কেন গো বালা হ'য়েছ এমন,
ছিলগো তোমার ভাগ্যে এই কি লিখন।
পবিত্র প্রণয়ময় হৃদয় তোমার,
স্নেহ দয়া করুণায় পূর্ণ অনিবার,
আজ তায় উঠিয়াছে কি এক তুফান!
বুঝি সব শেষ হবে লইয়া পরাণ!
হায় যে বিনোদ-বীণা সুমধুর স্বরে,
জাগাইত মৃতপ্রাণ সুধার লহরে,
কেন গো সে বীণা আজি হ'য়েছে বেসুর,
করিছে কর্কশ রব হৃদয় বিধুর।

৩২

ওগো তরুলতাগণ নিকুঞ্জ সকল,
ধরণী, সলিল, ব্যোম, অনিল, অনল,
এই পাগলিনী বালা নির্ভয়ে এখন,
তোমাদের কাছে দেখ করিছে ভ্রমণ!
যখন যা মনে আসে কোরে বসে তাই;
মরিবার বাঁচিবার কোন জ্ঞান নাই;

সকলে সদয় হ'য়ে কর আশীর্ব্বাদ!
ল'য়োনা কখন এর কোন অপরাধ!
এর মত অমায়িক মেয়ে নাই আর!
হায়ো শেষে এই দশা হইল তোমার!

৩৩

আজি কেন হেরি হেন পাগলিনী বেশ,
পূর্ব্বের সে পরিচ্ছন্ন বেশে কেন দ্বেষ?
খসন অঞ্চল-ভাগ কাঁকালে জড়ানো,
হেলোগুছো এলচুল জড়ানো, ছড়ানো,
মাথায় জড়ানো রাঙা নেকড়ার কোলে,
কত কি মুকুলময় লতা পাতা দোলে;
পড়িয়াছে বুক মুখ ঢাকা সমুদয়,
কুঞ্জের আড়ালে যেন চাঁদের উদয়।

৩৪

বিভ্রান্ত নয়ন দুই জলে কভু তিতে,
কভু চমকিত হ'য়ে ধায় চারিভিতে।
কভু মুখে মৃদু গান, কভু অট্টহাস,
উল্লাসে আকুল কভু বা উদাস।
যেন আজি বনদেবী আসি লোকালয়ে,
ভ্রমিছেন ভ্রান্ত মনে উদাস হৃদয়ে।
যেন কিছু হেরিবারে চারিদিকে চান,
কিন্তু তাহা কোন খানে দেখিতে না পান;
হটাৎ হইয়া যায় হৃদয় বিকল,
সাগর-তরঙ্গ প্রায় তরল চপল।

৩৫

পবিত্র প্রণয়ময় হৃদয় তোমার,
স্নেহ দয়া করুণায় পূর্ণ অনিবার;
ছারখার হ'য়ে গেছে তাহার ভিতর,
মরু-মরু-ধূ ধূ করে মরু বরাবর।

কোথাও তাহার আর জলবিন্দু নাই,
কিন্তু মেঘে অন্ধকার র'য়েছে সদাই;
অন্ধকার—অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার,
চারিদিকে ঘেরা যেন লোহার প্রাকার।
এক আধ বার মাত্র বিদ্যুত ঝলকে,
তখনি মিলায়ে যায় চোখের পলকে,
গগড়্ ককড়্ শব্দ ঘোরতর,
ভিতরে হ'তেছে যেন কাণ্ড ভয়ঙ্কর;
কিছুই না বুঝা যায়, দেখা যায় চোকে,
বিকট নরক যেন গর্জ্জে যমলোকে।
এমন দশায় এই বিষম দশায়,
হেরিতে হইল সখি আমায় তোমায়।

৩৬

প্রেমের নিরাশ চিন্তা দুর্ব্বহ পাষাণ,
সহসা মনের গলে হ'লে গলমান্;
বাহিরের কিছু আর ভাল নাহি লাগে,
নয়ন নিদ্রিত হয়, মন সুদু জাগে।
চাঁদের মধুর ছটা বিমল গগণে,
ফুলের প্রফুল্ল ভাতি কুসুম কাননে,
প্রভাতের অরুণের শান্তিময় আলো,
কিছুই তখন প্রাণে নাহি লাগে ভাল।
কত কি যাইছে হ'য়ে চোকের উপর,
কত কি আসিছে শব্দ কাণের ভিতর,
কিছুই করিনে আমি শ্রবণ, দর্শন,
কেবল মনেরে নিয়ে ভাবিতেছে মন।
যে দিন যেমনতর হ'য়েছে আমোদ,
সবগুলি হ'য়ে আসে বর্ত্তমান বোধ।
ঠিক যেন তারি সনে সেই সব স্থানে,
ভোর হ'য়ে বসে আছি সেই খোলা প্রাণে।

সেই ভালবাসাবাসি, সেই হাসি খেলি,
সেই মান অভিমান, সেই মেলামেশি ;
সেই প্রেম স্নেহময় ললিত লোচন,
সেই গদগদ হ'য়ে অধরে চুম্বন।
এমন সময় সেই তন্দ্রা ছুটে যায়,
সাধের স্বপন হায় উবিয়ে পালায় ;
ভাসায় নয়ন-নীরে, কাঁদায় অন্তরে,
চাপিয়া চুপিয়া ধরে বিষাদ সাগরে।
অমনি জনমে আসি ঘোর অভিমান,
একেবারে দিগ্বিদিক্ থাকে নাকো জ্ঞান।
পলাতক প্রণয়ীর পাছু পাছু ধাই,
ধ'রে আনি জোর কোরে যেথা দেখা পাই।
জোর কোরে বসাইয়ে সম্মুখে তাহাকে,
খুব ঝাল ঝেড়ে যাই যত মনে থাকে।
লাঞ্ছনায় গঞ্জনায় তাহার যখন,
মুখশশী ম্লান হয়, ভাসে দুনয়ন।
অমনি গড়িয়ে গিয়ে ধরি তার হাতে,
সজল নয়নে যাই নয়ন মুছাতে।
হায় একি সর্ব্বনাশ, কেহ নাই কাছে,
কেবল আমার কর শূন্যে উঠে আছে ;
এই করে মুছাইব যাহার নয়ন,
সে হৃদিরতন কোথা লুকাল এখন!
এইরূপে ক্ষুব্ধাকুলা কল্পনার সনে,
হাসি কাঁদি গান গাই আপনার মনে।
বাহিরে কি কাণ্ড হয় কিছুই জানি না,
সকলি সমান মোর দিবস যামিনী।

৩৭

কলের পুতুল মত ঘোরিয়ে বেড়াই,
কলের পুতুল মত চারিদিকে চাই।

ক্রমে মন হ'য়ে যায় ঘোর গোলমাল,
বেধে যায় হৃদি রাজ্যে বিদ্রোহ জঞ্জাল।
মোহের তরঙ্গ তোড়ে ঘুরায় পরাণে,
হাল-হারা তরী যেন লুটায় তুফানে।

৩৮

কে আমি, কোথায় ব'সে কাহারে ধেয়াই,
কি করিব, কোথা যাব, কিছু স্থির নাই।
থাই তায় পাই পাই, হারাই আবার,
আবার হইয়া যায় সব একাকার।
একেবারে ঘেরে ফেলে ঘোরান্ধ গর্জ্জন,
তড়িৎ ঘর্ষণ, কিম্বা বজ্রের পতন।
আলো নাই, বায়ু নাই, দেহে মন নাই,
ঘ্রাণ নাই, প্রাণ নাই, নাই কিছু নাই।
কেবল নিস্তব্ধ এক তিমির সাগর,
ডুবায়ে রেখেছে ধরা, পাতাল, অম্বর।
এ ঘোর তিমির মাঝে ডুবাইয়ে দিয়ে,
কোথায়—কোথা হে ভায়া গিয়েছ চলিয়ে।
কিছুই জানিনি আমি কি তোমার ভাগ্যে হ'ল,
তোমার বিরহে তোমার পাগলিনী ম'ল ম'ল!

পাগলিনীর মুখের গান।

সিন্ধু—মধ্যমান।

(সুর "কেও রণসাজে কার কুল-কামিনী" ইহার মতন।)

অবোধ অবলা প্রেমজ্বালা তুমি জান না,
যে অনলে প্রাণজ্বলে আহা, জ্বেলে তাহা দিও না!
মনের খেদে, বেড়াই কেঁদে ওগো মোরে হেরে হেসো না!
ভালবাসা কি নিরাশা! প্রাণনাশা বাসা বেসো না!
থাক থাক সুখে থাক, দুখ নাই, দুখ পেয়ো না!

জরজর, মরমর, সরসর কর ধোরো না!
হায় একি, একি দেখি ম্লানমুখী তুমি হোয়ো না!
আচম্বিতে যেন শীতে কাঁপিতেছ কেন বলো না!
থাকি থাকি ঝরে আঁখি প্রাণসখী আর কেঁদো না!
পাব ফিরে প্রেয়সীরে আমি তোরে মনে ছিল না!
এই এল, কোথা গেল! স্বপ্নে দেখা, দেখা হ'লো না।*

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সংসারে কোন লোককেই সর্ব্ব প্রকারে সুখী, কোন বস্তুকেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বরাজ্যে উত্তম অধম, উচ্চ নীচের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার কাননে চারুশীলা মধুর ভাষিণী, ভর্ত্তার অনুগামিনী রমণীগণ সৌরভ জাল জড়িতা কুসুমিতা লতা, তাহার সৌরভে বন আমোদিত হয়, কিন্তু সে বনে শিয়াকুল ও আলাকুষা কাঁটা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের খোলা প্রখর। কর্কষ ভাষিণী, কলহপ্রিয়া, ভর্ত্তার বিরুদ্ধাচারিণী রমণীগণ সেই আলাকুষা ও শিয়াকুল কাঁটা। পুরুষ পথিক অনেক সময় তাহাদের ভয়ে সংসার কাননে প্রবেশ করিতে ভীত হয়। মহাত্মার জননী এই জন্য চিন্তা করিতেছেন, কিরূপে সদ্বংশজাতা, ভর্ত্তার অনুগামিনী বধূ পাইবেন। তিনি পুত্রের মনের অবস্থা উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, ইহাও বুঝিয়াছেন, সংসারের বহু প্রলোভন ছিন্ন করিবার ক্ষমতা পুত্রের জন্মিয়াছে।

* স্বর্গীয় মহাকবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত "পাগলিনী" খণ্ড কাব্য খানি অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল, তাঁহার দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের যত্নে রক্ষিত হয় এবং স্বর্গীয় মহাকবির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি জন্মভূমির পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম

জন্মভূমি সম্পাদক।

যদি কুটিল কলহপ্রিয়া বধু দুর্ভাগ্য বশতঃ আসিয়া জোটে, পুত্রের হৃদয় নিহিত বৈরাগ্যবীজ প্রকৃতির আনুকুল্য প্রাপ্ত হইবে, সত্বরে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইবে, তাঁহাকে সংসারে রাখা কঠিন হইবে। তিনি ইহাও সুন্দররূপে জানিতেন, পুত্রের মনের মত পত্নীলাভ জন্মান্তরের সুকৃতি সাধ্য। এই জন্য তাঁহার মন আশা ভরসা ও নিরাশায় যুগপৎ বিচলিত হইতে লাগিল। তিনি নিজ ভ্রাতার নিকট গমন করিয়া, পুত্রের মনের অবস্থা জানাইয়া, পুত্রকে শীঘ্র সংসারী করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

পরিবর্ত্তন সংসারের নিয়ম। এ জগতে কিছুই একভাবে থাকিবে না। সকলই ক্ষয়, বৃদ্ধি ও ধ্বংশের বশীভূত। নূতন নব ঐশ্বর্য্যের সহ উদিত হয়, নয়নানন্দ বর্দ্ধন করে, ক্রমে পুরাতনের ভাবে পশ্চাৎ পথ অবলম্বন করিয়া অদৃশ্য হয়। মানব মন নূতন প্রয়াসী, নূতন প্রিয়, পুরাতন সারগর্ভ হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন অবলম্বন করে। সেই জন্য মানব সমাজ উদ্ভিদ ও অন্য সমাজ হইতে অধিক পরিবর্ত্তন শীল। একশত বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গ সমাজ ও বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজে বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে নর নারী নাই, সে ভাবের সুখ সম্পদ নাই, সে কথা কল্পনা নাই, সকলিই নূতন। নূতনের আতিশয্যে মানবের মনও নূতন হইয়াছে। স্বজন, সৌহৃদ্য ভাবের ও ভাবান্তর ঘটিয়াছে। পুরাতন ভাল কি নূতন ভাল, একথা বিচার করা বড় কঠিন। নূতন আস্বাদন করিয়া, পুরাতনকে নবরসে আপ্লুত বিবেচনা করিয়া পুরাতনের প্রশংসা করা মানবের স্বভাব, কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত, "পুরাণ মাত্রেন ন সাধু সর্ব্বং।" নূতনে কি ভাল নাই, অবশ্যই আছে, কিন্তু বঙ্গ সমাজে নূতনে অনেক নিন্দনীয় পদ্ধতির প্রকটন দেখিতে পাওয়া যায়। একান্নবর্ত্তী সংসারের সুখ প্রায় উঠিয়া গেল। ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহানুভূতির শৈথিল্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না তখন অনেকেই মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতেন, মাতুলই প্রধান অভিভাবক বলিয়া গণ্য হইতেন, ভ্রাতা ভগিনীর অভাব ও দুঃখের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন, প্রয়োজন হইলে ভগিনীর অন্ন সংস্থান অতি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন, এখন সে ভাবের বিলক্ষণ শৈথিল্য ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব প্রথা অনুসারে মহাত্মা কমলাকান্তের মাতুল তাঁহার ভগিনীর যথা সাধ্য অন্ন সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন, এবং ভাগিনেয়-গণের পিতৃস্থানীয় ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভগিনীর মুখে সমুদয় শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমিও কমলাকান্ত সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতেছি, তাহাকে শীঘ্র সংসারী করা

বিবেচনা করিতেছি। কমলাকান্তের অতি অল্প বয়সে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। কালী নামে উন্মত্ত, অনন্ত সুখ সংগ্রহ পথের পথিক হইয়াছে। কাহারও সৎকর্ম্মে বাধা দেওয়া উচিত না হইলেও তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র সংসারী হইয়া তোমার দুঃখ দূর করিবে, আমি ইহাই ইচ্ছা করি। আমি ইতি পূর্ব্বে পুত্র বধুর সন্ধান করিয়াছি, এখন তোমার মনোনীত হইলে, আমি কন্যার পিতার নিকট কমলাকান্তের বিবাহের কথা উত্থাপন করি।" ভগিনী ব্যস্ত হইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "ভাই! তুমি যাহা করিবে, তাহাতে কি আমার অমত আছে! কমলাকান্তের মনের অবস্থা ভাবিয়া ভগবানের নিকট সদ্বংশজাতা ভর্ত্তার মনোমত বধুর প্রার্থনা করিতেছি।" ভ্রাতা কহিলেন, "লাকুড্ডীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটী কন্যা আছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রামেই বিবাহ করেন, কন্যাটিকেও তুমি দেখিয়াছ, কন্যার মাকেও তুমি বেশ জান। লাকুড্ডী এখান হইতে সাত আট ক্রোশ হইবে, বর্দ্ধমানের অতি সন্নিকট।" মাতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "লাকুড্ডীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা! অতি ভাল বংশ, বাপ মাটীর মানুষ, মা,লক্ষ্মী, মেয়েটীও সুন্দরী, হর-গৌরীর মিলন হইবে, আমার কপালে কি তাহা ঘটিবে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি আমার পুত্রকে কন্যাদান করিতে স্বীকার করিবেন।" ভ্রাতা কহিলেন, স্বীকার না করিবার কারণ ত কিছু দেখি না, আমি ত পতিত নহি, আমার করণীয় ঘর। পাত্র দেখে কন্যা দান। কমলাকান্তের মধুর কণ্ঠরবে কালীনাম অমৃতরসে এই চান্নাগ্রাম টলমল। এই গ্রামে কোন ঘরে দিনান্তে একবার কমলাকান্তের নাম না হয়। কমলাকান্ত রমণীগণের প্রিয়, কমলাকান্ত বৃদ্ধগণের প্রিয়, কমলাকান্ত সর্ব্বজন প্রিয়। আমাদের গ্রামের দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে অনেক ভক্ত ও সন্ন্যাসী সময়ে সময়ে উপস্থিত হন। আমি শুনিয়াছি, তাঁহারা কমলাকান্তের মুখে মধুর কালী সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হন, বলেন, বালক মহাপুরুষ, ইহা কি আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা। পাত্র সর্ব্বগুণ সম্পন্ন। মতামতের জন্য তুমি চিন্তা করিও না। তুমি বলিতেছ, কমলাকান্ত তোমার পদস্পর্শ করিয়া বলিয়াছে, দেশত্যাগ করিবে না, গৃহে বাস করিবে, কিন্তু ভগিনী আসক্তি ও নদীর বেগ ধারণ করা বড় শক্ত, তাহারা লক্ষ বাধা অতিক্রম করিয়া ছুটিতে থাকে। কমলাকান্তের হৃদয় ভরা প্রেম, অপার উদ্বেগ, পাছে জগৎ জননী কমলের সব বাধা ঘুচাইয়া দেন, তাহাই আমার ভাবনা হয়। আমাদের বাধা ত বাহিরের, কালী নাম রসে তাহার বুক ভরা।

সে রসের উচ্ছ্বাসে বাধা মহামায়া ভিন্ন আর কাহারও দিবার ক্ষমতা নাই! যাহা হউক, আমোদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমরা করিব। জননী কহিলেন, "কমলাকান্ত আজ পর্য্যন্ত আমার কোন কথাই অবহেলা করে নাই, সে নিশ্চয়ই গৃহ ত্যাগ করিবে না, তুমি কালই লাকুড্ডীতে গিয়া বিবাহের প্রস্তাব কর।" ভ্রাতা কহিলেন, "আমার তথায় যাইবার প্রয়োজন নাই। লাকুড্ডীর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী কাল চান্নায় আসিবেন, আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিব, তুমিও তাহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের কথা উত্থাপন করিবে। বিবাহ কার্য্যে স্ত্রীলোক দিগের মত লওয়া কর্ত্তব্য। আমাকে কোন কথাই বলিতে হইবে না, আমি কমলাকান্তকে নিজ পুত্র অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিয়া থাকি।" ইহা বলিয়া ভ্রাতা কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

বিবাহ মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতম সংস্কার। সমাজের শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবস্রোত সঞ্চালন বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। জীবন সংগ্রামে পত্নীই শক্তি স্বরূপিণী, প্রধানা সহায়। মানব তাহার প্রধান শত্রু রিপুগণকে লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। কাল প্রভাবে তাহারা প্রবল ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। জন্মান্তরের কর্ম্মফল বশতঃ মানবকে দেহ আশ্রয়ী রিপুগণ ব্যতীত আরও অনেক শত্রুজালে জড়ীভূত হইতে হয়। মনুষ্যকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বহুবিধ শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। ঘটনা চক্রে সংসারের আলোড়ন বিলোড়নে, ঘূর্ণবায়ুর মধ্যস্থিত তৃণ খণ্ডের ন্যায় তাড়িত, লাঞ্ছিত ও বিমর্দ্দিত হইতে হয়। দুঃখের দুঃখিনী, প্রিয়ভাষিণী, শক্তি সঞ্চারিণী সহধর্ম্মিণী সহ মানব সেই সকল শত্রুগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াও দুর্গম সংসার ক্ষেত্রে হাস্যমুখে অবস্থান করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, বিবাহ না করিলে শত্রুগণের পরাজয় সুখসাধ্য হয়, পরম পথ প্রশস্ত হয়। পরমেশ্বরের পদপ্রান্ত নিরন্তর দৃষ্টি রাখিয়া, সংসার ধর্ম্ম করিলে, পত্নী পরম পথের কণ্টক হইতে পারে না, অধিকন্তু পরম পথ পরিষ্কার করে। মনুষ্য প্রাণ অন্নগত, দেহ ব্যাধি মন্দির, অন্ন মুষ্টির জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয়, অতএব পত্নীগ্রহণ ও সংসার ধর্ম্ম উত্তম। কেবল মাত্র মায়াকে অবলম্বন না করিয়া ধর্ম্মকে আশ্রয় ও ঈশ্বরের নিতান্ত শরণাগত হইয়া চলিলে সংসার হইতেই স্বর্গ পথের দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়, তবে যাহার সুখে দুঃখে সম বোধ, হৃদয়ে অপার প্রেম, যাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা বর্জ্জিত, তাঁহার পক্ষে অন্য ব্যবস্থা, তাঁহার নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মই কি, সংসার ধর্ম্মই কি, সকল ধর্ম্মই এক। যে পত্নী সংসারের ও জীবনের

এরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করে, তাহার জীবনধারণে কূটিলতা, শঠতা, ধৃষ্টতা থাকিলেও পবিত্রতা না থাকিলে বড় দুঃখের হয়।

বিবাহ ব্যবসা, বৃত্তির অন্তর্গত হওয়া বড় দূষনীয়, বিবাহে লোকবল বন্ধন অপেক্ষা ধর্ম্মবল বন্ধন প্রশস্ত, কারণ লোকবল বন্ধন সূত্র ক্রমে শিথিল হয়, কিন্তু ধর্ম্মবল বন্ধন জীবনে শিথিল হইবার নহে। ব্যভিচার দ্বারা সে বন্ধন শিথিল করিলে শাস্তি অদৃশ্য, অনিশ্চিত, অতএব ভীষণ। বিবাহে পবিত্রতা থাকা প্রয়োজন, তাহাতে কোন প্রকার কুপ্রথা থাকিলে সমাজ দূষিত হয়, জাতীয় শক্তি নষ্ট হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালার উচ্চ জাতিগণের মধ্যে অর্থগ্রহণ অতি কুপ্রথা। তৎকালের বিবাহে অর্থগ্রহণ প্রথা ছিল না। কন্যা বিক্রয়, পুত্র বিক্রয়, উভয়েই শুক্র বিক্রয় বলিয়া পরিণত হইত। শুক্র বিক্রয়ীর গৃহে জল গ্রহণ ঘৃণিত ও অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত, একারণ নিতান্ত অর্থ লোভীও বিবাহে অযথা অর্থগ্রহণে সাহসী হইত না। বিবাহের ব্যয় তাদৃশ কিছুই ছিল না। অবশ্য বিশেষে যৎসামান্য রৌপ্য কি স্বর্ণ অলঙ্কার, আত্মীয় স্বজনের অভ্যর্থনা ইহাতেই যাহা কিছু ব্যয় হইত, তাহাও কন্যাকর্ত্তার [illegible]নুযায়ী, অবস্থানুযায়ী, পীড়ন কিছু ছিল না। আত্মীয় স্বজনের [illegible] ভোজন ও অভ্যর্থনার জন্য কন্যাকর্ত্তাকে বর্ত্তমানের ন্যায় চিন্তিত ও কুণ্ঠি[illegible] হইত না, প্রতিবেশীরা তৎবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। [illegible] কপটতা ছিলনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যৌতুক গ্রহণ [illegible] ছিল না। বরকর্ত্তা কুল মর্য্যাদা স্বরূপ সামান্য দান করিতেন। [illegible]সারে কেহবা ভূমিখণ্ড, কেহবা স্বর্ণখণ্ড, কেহবা গুটীকত রৌপ্য মুদ্রা [illegible] প্রদান করিতেন। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তাকে অর্থ ও অলঙ্কার প্রদানের প্রস্তাব করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। করণীয় ঘর হইলে বিবাহের জল্পনা ছিল না। কন্যা কুৎসিতা হইলেও গ্রহিত হইত। বিবাহের পূর্ব্বে আড়ম্বর বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ভয়াবহ ছিল না। তখন হাস্যমুখে বর ও কন্যা কর্ত্তা সম্মিলিত হইতেন। বর্ত্তমান কালের ন্যায় কন্যাকর্ত্তা একদিকে পরম যত্নে লালিতা পালিতা কন্যার মুখ, অন্যদিকে বরকর্ত্তার ভীষণ বেগে প্রবাহিত, হৃদয় নিহিত অর্থ লালসা স্মরণ করিয়া দুঃখিত, বিবর্ণ, মৃতপ্রায় হইতেন না। কন্যা কাল, কি তাদৃশ সুন্দরী না হইলেও বরকর্ত্তা হাস্যমুখে বলিতেন, "আমাদের গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, পরমা সুন্দরীর প্রয়োজন নাই। অন্ন জল গ্রহণের উপযুক্ত ও কর্ম্মিষ্ঠা হইলেই হবে।" বধু দর্শন কালে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, কি মা আমাদের অন্নজল দিতে পারিবে ত, তোমার ঘর কন্না দেখিয়া লইতে পারিবে ত। বর্ত্তমান সময়ের মত অলঙ্কার অবতারের সহস্র নাম তখন সৃষ্টি হয় নাই। বিবাহের সময়ে অলঙ্কারের কথার উল্লেখই হইত না। বরকর্ত্তা জানিতেন, কন্যাকর্ত্তা সালঙ্কারা কন্যা দান করিবেন, তাঁহার যাহা জুটিবে তাহাই দিবেন, আমার বলা ধৃষ্টতা মাত্র, অলঙ্কার প্রার্থনা করিলে আত্মীয় স্বজনের নিকট অপদস্থ হইতে হইবে, আমার বধু, আমি তাঁহার নিকট অলঙ্কার চাহিব কেন, আমার ক্ষমতা থাকে আমি দিব। ঘটকগণ কুল নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। তৎকালের রমণী মণ্ডলও সেইরূপ ছিলেন, পেড়ে কাপড়, মাথায় সিঁদুর, মুখে পান, কোলে ছেলে পাইলেই পরম সুখী হইতেন। হায়, হায়, কি ভীষণ পরিবর্ত্তন, এখন কন্যা প্রসব হইবামাত্র গৃহস্থের মধ্যে দুঃখ স্রোত পড়িয়া যায়। জননী দুঃসহ যন্ত্রণায় প্রসব করিয়া সুখী হইতে পারেন না। পিতা দুহিতার কেবলমাত্র বিবাহের বিষয় চিন্তা করিয়া বিষন্ন হয়েন। কন্যা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার চিন্তাস্রোত ভীষণ ভাব ধারণ করিতে থাকে। সমাজের ঘৃণিত প্রথার মুখপানে চাহিয়া কন্যার বিবাহের জন্য সংসারের অনেক সুখ ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হয়। একদিকে বহুকষ্টে লালিতা পালিতা কন্যার মুখ, অন্যদিকে অর্থ প্রয়াসী পুত্রবানের ব্যবহার চিন্তা করিয়া বড়ই বিষন্ন হইতে হয়। [illegible] বহুকষ্টে পাত্রের অনুসন্ধান পাইলেও, নিজের অবস্থা ও পুত্রবানের লালসা ও সমাজের কুপ্রথা, চিন্তা করিয়া পুত্রবানের নিকট কন্যার পিতা বিবাহের প্রস্তাব করিতেও ভীত হয়েন। কন্যাকর্ত্তাকে পুত্রবানের গৃহে চোরের ন্যায় প্রবেশ করিতে হয়। পুত্রের পিতা কিরূপ প্রস্তাব করিবেন, এই চিন্তাতেই জড়ীভূত। আদর সম্ভাষণ, অর্থ লালসার দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে। বিবাহের কথায় উত্থাপনের প্রারম্ভেই অর্থ ও অলঙ্কারের স্তব স্তুতি ও মঙ্গলাচরণ আরম্ভ হয়। পুত্রবান সমাজের নিম্ন, মধ্য, উচ্চলোক সকলের বিবাহ প্রথা, সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কারের উল্লেখ, জানিত, অজানিত, কল্পিত বহুশ্রেণীর বহুসন্ধানের বিবাহ প্রদত্ত অর্থ ও অলঙ্কারের প্রশংসা আরম্ভ করিয়া কন্যাকর্ত্তার হৃদয় শুষ্ক করিতে আরম্ভ করেন, দরিদ্র হইয়াও ধনাঢ্য প্রদত্ত অর্থ ও অলঙ্কার চাহিয়া বসেন। ছি ছি, এই কুপ্রথার নিবারণ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহা সমাজকে দূষিত করে, তাহার উন্নতির কণ্টক স্বরূপ হয়। পূর্ব্বে এই সকল কুপ্রথার প্রাবল্য ছিল না, বিবাহের তাদৃশ ব্যয়ভার ছিল, সেই জন্য কমলাকান্ত পিতৃহীন হইলেও তাঁহার বিবাহ সহজেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

লাকুড্ডার ভট্টাচার্য্য মহাশয় চাত্রায় আসিলে বিবাহের প্রস্তাব হইল, তিনি যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া, কমলাকান্তকে কন্যাদানে স্বীকৃত হইলেন. আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন! কন্যা সৎপাত্রে সমর্পিত হইবে ভাবিয়া ভট্টাচার্য্য ঠাকুরাণীর সুখের সীমা রহিল না। কমলাকান্তের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পদস্পর্শ পুর্ব্বক বেহান বলিয়া সম্বোধন করিলেন। উভয়ের হৃদয়ের আনন্দ প্রবাহ, বদনে মৃদুহাস্য রূপে ও নয়ন নদীতে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। খাদ্যদ্রব্যের আদান প্রদান চলিতে লাগিল। ক্রমে বিবাহের দিন স্থির হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ নিবাস লাকুড্ডীতে গিয়া কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা কমলাকান্ত সময়ের সৌন্দর্য্য অবলম্বন করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। অঙ্গের সৌষ্ঠব অতসী কুসুমের ন্যায় দর্শনীয় হইয়াছে। বদন স্বভাবতই হাস্যময়, আঁখি যুগল প্রফুল্ল। হস্ত, পদ, বক্ষ, উরু সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের শুভদৃষ্টি পরিলক্ষিত হইতেছে। বিবাহের পাত্র কন্যা সকলের দর্শনীয় হয়, তাহাতে কমলাকান্ত সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন, যাহার সহিত দেখা হয়, সেই তাহার বিবাহের কথা উল্লেখ করে। এত অল্প বয়সে সাধারণ লোক বিবাহের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু কমলাকান্তের বয়স অল্প হইলেও তিনি জ্ঞান বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার কিরূপ সময় উপস্থিত, তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন। একদিকে সংসার মায়াজাল তাঁহাকে বদ্ধ করিতে উদ্যত, অন্য দিকে মহামায়ার প্রসন্নময়ী মূর্ত্তি পরমানন্দ, প্রেম, তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। একদিকে সংসারের শোক, দুঃখ, অভাব, ব্যাধি তাঁহার দিকে কুৎসিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, অন্যদিকে মুক্ত পুরুষগণ কালী নামামৃত পানে অনিত্য ধরা মণ্ডলে নিত্যের আবির্ভাব করিয়া নৃত্য করিতেছেন। কমলাকান্তের মনপ্রাণ শেষোক্ত দিকে। সংসার কানন কণ্টকময় জানিয়াও প্রবেশ করিতে হইবে, না করিলে অধর্ম্ম আছে। মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বৈরাগ্য আনন্দ কাননে প্রবেশ করিয়াও সুখী হইতে পারিব না ইহাই বিশ্বাস। ভাবিলেন, মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধরিয়া, হৃদয়ে অভয়া বরদাকে সর্ব্বদা রাখিয়া সংসার কাননে প্রবেশ করিব, অভয়ার নিতান্ত শরণাপন্ন হইব, দেহ মন একেবারে তাঁহাকে সমর্পণ করিব, তথাপি যদি সংসার কাননের কণ্টকজাল দেহ স্পর্শ করিতে উদ্যত হয়, দয়াময়ীই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আবার ভাবিলেন, সংসার কি এতই কুৎসিত স্থল, কেবল মাত্র পাপের আবাস, কখনই নয়। সংসার দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি স্বর্গীয়

গুণ সকলের প্রদর্শিনী স্থল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রম, কর্ম্মকাণ্ড সেই আশ্রমের পুষ্প লতিকা, পুরুষ আশ্রমের রক্ষক, রমণী সেই আশ্রমের রস ও সাধন, পুণ্যই তাহার ফলপুষ্প। পত্নীর নাম সহধর্ম্মিণী। অর্থ ব্যতীত সংসার ধর্ম্ম হয় না, এ কথা সত্য, অর্থই দোষাকর তাহাও সত্য, অযথা অর্থের জন্য লালায়িত না হইয়া, সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন, সেই অর্থের উপযুক্ত ব্যয় করিয়া কি সংসার ধর্ম্ম হয় না? আবার মনে হইল, আমি ত মনের মত মন লইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে পারিব না। আমাকে অন্যের সহিত মন মিশাইয়া থাকিতে হইবে, আমার আমিত্ব থাকিবে কি! আবার ভাবিলেন, মাতৃ আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপাল্য। জগদম্বার মনে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে, আমাকে অবশ্য বিবাহ করিতে হইবে। কমলাকান্তের বিবাহে সকলেই আনন্দিত, কেবল মাত্র বিষাদের ছায়া কমলাকান্তের বদনে মধ্যে মধ্যে পড়িতে লাগিল, তাহা তিনি অতি সাবধানে গোপন করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহার জননী তাঁহার মুখের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। ক্রমশঃ

অনুতাপের সুফল।

লেখিকা,—শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী।

(গল্প।)

(১)

আজ দুই বৎসর হইল, সুধীর কুমার এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। যদিও সংসারে অভাব কিছুই নাই, তথাপি এ পর্য্যন্ত তার কোন চাকুরী হয় নাই বলিয়া সে মহা ক্ষুণ্ণ।

কালমাহাত্ম্য এখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই চাকর হইতে ভাল বাসে। ভাবে—ফিন্‌ফিনে ধূতি, মিহি পাঞ্জাবী, ক্রোম্ লেদারের জুতা পরিয়া চাকুরী করিলে বাবু হওয়া যায়। চাকুরে বাবু হইলেই মহা আনন্দ! চাকুরী করি—বলিতে কাহারও লজ্জা নাই; ব্যবসা করি—বলিতেই যত লজ্জা। চাকুরী করি অর্থাৎ আমি পরের দাস, ইহা কেহ বুঝিয়াও বুঝে না

যদি কাহারও চাকুরী না হইল, তবে সে মনে করে—হা হতোস্মি! আমার লেখাপড়া সব পণ্ডশ্রম। ধন্য কাল-মাহাত্ম্য—কাল ধর্ম্মে লোকের এমন বুদ্ধি-ভ্রংশ, এমন আত্ম-প্রতারণাও ঘটে! ব্যবসায়ের নামে শিহরিয়া উঠে; মনে করে আমি এত বড় বিদ্বান্ হইয়া, শেষে কিনা ব্যবসা করি!

বেলা নয়টার সময় সুধীর কুমার প্রফুল্ল মুখে পোষ্ট আফিস হইতে একখানি এন্‌ভেলপ হাতে করিয়া বাড়ি আসিল। আসিয়া দেখিল—পিতা গৃহে নাই। তখন ধীরে ধীরে রন্ধন শালার কাছে গিয়া ডাকিল—মলিনা!

স্বামীর চিরপরিচিত মিষ্ট স্বর শুনিবা মাত্র মলিনা ঘরের বাহিরে আসিল। সুধীর বলিল,—এই দেখ আমার "নিয়োগ-পত্র" আসিয়াছে। আগামী ইংরেজী মাসের ১লা হইতে আমাকে কাজ করিতে হইবে। আর চারি দিন পরেই আমি রওনা হইব।

মলিনা। ভারি যে আনন্দ দেখ্‌ছি! বিদেশে গিয়ে চাকুরী করাই কি ভাল? কাল বাবা বল্‌ছিলেন,—কাপড়ের একখানি দোকান করে দিবেন, লোকে বিক্রয় করবে, তুমি কেবল বসে দেখ্‌বে, আর তহবিল রাখ্‌বে।

সুধীর। বাঃ, চাকুরী হয়েছে, এই সুসংবাদ দিতে এলাম, কোথায় তুমি এতে আনন্দ করবে, তা না, কেবল কতকগুলি অবান্তর কথা নিয়ে এলে? দেখ্‌ছ—আজ দুটী দীর্ঘ বৎসর চুপ ক'রে ব'সে আছি। তুমি নেহাত ছেলে মানুষের মত কথা বল্‌ছ।

মলিনা। আমি মেয়ে মানুষ; তাহাতে বয়েসও কম। আমি কি বুঝি? রাগ ক'র না। যাহা ভাল হয় কর; তবে, তোমাকে না দেখ্‌তে পেলে বড় কষ্ট হবে।

সুধীর। কষ্ট কিসের? আমি তো আর একেবারে যাচ্ছি না! মাঝে মাঝে বাড়ী আস্‌ব ত! আমি যেখানেই থাকি, তোমার সুধীর তোমারই থাক্‌বে।

মলিনা। চুপ কর; বাবা আস্‌ছেন।

(২)

নিঃশব্দে নীরবে ১লা জুলাই তারিখটী আসিয়া হাজির হইল। সুধীর কুমার আজ কলিকাতায় আসিয়া কাজে বাহাল হইয়াছে। চাকুরী হওয়ায় তার মনে আনন্দের সীমা নাই। নয়টার সময় আফিসে গিয়া, সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত আফিসে পরিশ্রম করিয়া, যখন মেসে আসিয়া সুধীর কুমার বসিত, তখন তার বাড়ীর কথা মনে পড়িত। মনে হইত—যখন বেড়িয়ে আস্‌তাম,

তখন মলিনা হাসিমুখে কাছে আসিয়া বসিত, আস্তে আস্তে বাতাস কর্‌ত, একটু পরে জলখাবার আনিয়া দিত, হেসে হেসে গল্প কর্‌ত।

আর মনে হইল,—আসিবার সময় বিদায়ের সেই প্রেম-বিহ্বল ছল-ছল আঁখি।

বাড়ীর স্মৃতি মনে ফুটিয়া উঠায় সুধীর কুমারের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। মন বড়ই চঞ্চল হ'ল। তখন একটু শান্তি পাইবার আশায় সুধীর ছাদের উপর গিয়া বসিল। খোলা বাতাসে প্রাণের বেগ অনেকটা উপশমিত হইল,—সুধীর একটু শান্তি বোধ করিতে লাগিল। তার মনশ্চক্ষু তখন প্রকৃতির নৈশ সৌন্দর্য্যের উপর নিপতিত হইল। সে দেখিল,—মাথার উপরে বিশাল বিরাট নভোমণ্ডল চন্দ্রাপতের মত শোভা পাচ্ছে, অসংখ্য অগণ্য নক্ষত্রনিকর মণি-মাণিক্যের মত উহাতে খচিত রহিয়াছে; তাহাতে দশমীর চাঁদের কৌমুদীরাশি ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া ধরণীতলে পড়িতেছে,—সেই সুখের প্লাবনে সকলেই প্লাবিত! সে এক মধুর অনুভূতি। আবার মাঝে মাঝে পাতলা-পাতলা নীরদ খণ্ড এসে চন্দ্রমাকে আবৃত করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যেই পরিত্যাগ করিতেছে। চাঁদ যেন মাথার উপরে বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌ছে।

মাথার উপরে চাঁদের ঐরূপ খেলা। নিম্নে সহরের আলোক দৃশ্য। সুধীর দেখিল,—অসংখ্য অট্টালিকার গবাক্ষ হইতে বৈদ্যুতিক আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; রাস্তায় গ্যাসের আলোকগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিন্যস্ত হওয়ায় আলোক-মালা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

গগনপটের প্রাকৃতিক সুষমা এবং নিম্নে প্রাসাদ পুরীর কৃত্রিম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে সুধীর কুমার বাড়ীর ভাবনা অনেকটা ভুলিল।

পরদিন যথারীতি কাজে বাহির হইল। এইরূপে দুইটী মাস কেটে গেল। আফিস থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে মেসে আসিলেই তার বাড়ীর কথা মনে হইত। আর তখন বিষাদের একটা ছায়া তার মুখের উপর ফুটিয়া উঠ্‌ত। বাড়ীর সুখ, মলিনার অনাবিল প্রণয়—মধুর সোহাগ-আদর, আর বিদেশের কঠোর কর্ম্ম-জীবন যুগপৎ মনে পড়িত। তাই, সুধীর দিন দিন স্ফূর্ত্তি হীন হইতে লাগিল।

মেসের সকলেই সুধীরকে ভালবাসে। তার পাশের ঘরের জনৈক ভদ্র লোক একদিন তাকে বলিলেন,—সুধীর বাবু! আপনাকে অত ম্লান স্ফূর্ত্তি-শূন্য দেখি কেন? একটুও গল্প-স্বল্প করেন না,—আফিস থেকে এসেই মুখ

বুঁজে থাকেন,—যেন কত কি ভাবেন! কেন, কি হয়েছে?

সুধীর। কিছুই হয় নি। কই, ভাবিব আর কি? তবে কখন কখন বাড়ীর কথা মনে হয়। মনোহর বাবু। বাড়ী বড়ই মধুর স্থান।

মনোহর। কেন হে আমাদের কি বাড়ী নাই? আমাদেরও ছেলেপিলে আছে, আমাদেরও স্ত্রী পরিবার আছে; আমরা অতশত ভাবিনা; আপনি মোটেই স্ফূর্ত্তি করেন না, তাই যত ভাবনা আপনাকেই চেপে ধরে।

সুধীর। স্ফূর্ত্তি আর কি ক'রে কর্ব্ব?

মনোহর। একটু একটু গান বাজনা কর্‌লেই ত পারেন। তা হইলে শরীর ও মন বেশ ভাল থাকে।

সুধীর। আচ্ছা ব্যবস্থা দিয়েছেন। ও-রসে আমি একেবারেই বঞ্চিত। আমি আদৌ গান-বাজনা জানি না।

মনোহর। সে কি। জানেন না—আমি শিখিয়ে দেবো; রোজ আমার সহিত বেড়িয়ে আস্‌বেন; দেখ্‌বেন—এদের অবস্থা কত ভাল হয়ে উঠ্‌বে।

আরও চারি মাস অতীত হইয়া গেল। সুধীর কুমার এখন মনোহরের ঘোর ইয়ার্ হইয়া পড়েছে। ভুলেনেই এক সাজে বেড়োয়। সুধীর সন্ধ্যার পর আর বাসায় থাকেনা। বাড়ীর জন্য তার মন আর ব্যাকুল হয় না। মন কেমন করা পরের কথা, বাড়ীর স্মৃতিও মনে পড়ে না।

মনোহর "মিডিয়ম্" দিয়া সুধীর দ্রুত গতিতে অধঃপতনের শেষধাপে গিয়া উপনীত হয়েছে। বার-বধূর প্রেম-মধুতে সুধীর মধুপ এখন প্রমত্ত। শ্যাম্পেন সেরী এখন তার প্রেম-পিয়াসী; সুরা-দেবীর পূরা ভক্ত। মেসের টাকা বাকী পড়িল,—সে দিকে লক্ষ্য নাই। লাবণ্যময়ীর রূপের জৌলুসে মলিনার রূপ মলিন হয়ে গিয়েছে। লাবণ্যকে নিয়েই সে এখন উন্মত্ত—লাবণ্যের পাপাগারেই নিশা অতিবাহিত করে, মলিনার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত তার মন থেকে মুছে গিয়েছে।

সেই সুধীর— আর এই সুধীর। সেই নির্ম্মল চরিত্র, মহানুভব, স্নেহপরায়ণ শান্ত শিষ্ট-ভব্য-সভ্য, বিনয়-নম্র দেব-কুমার—আর এই গণিকা-সেবী ক্ষুদ্রাশয়, নিষ্ঠুর, চঞ্চল মতি, সুরাসক্ত, অসভ্য, আরক্ত-চক্ষু পিশাচ। ভাগ্যের কি পরিহাস! মানুষের যে এমন অধঃপতন—এমন পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কু-সঙ্গের পরিণাম যে, এমন ভয়াবহ হইয়াও উঠ্‌তে পারে, তাহাই আশ্চর্য্য। সুধীরের অধঃপতনের মাত্রা এখন ষোল কলায় পূর্ণ।

(৪)

মলিনা অনেক দিন স্বামীর পত্র পায় নাই। তার মনে কত কি উদয় হয়। সুধীর কলিকাতায় এসে প্রথম প্রথম তাকে কত আদর ভালবাসা-সিক্ত পত্র লিখ্‌তো। তারপর অনেক দিন অন্তর অন্তর এক এক খানা পত্র মলিনা পাইতে লাগিল, আর সে পত্রের মধ্যে যেন তাচ্ছিল্য মাথা উঁচু ক'রে রয়েছে। পত্রের মধ্যে যেন কেমন একরূপ অনাদর অবজ্ঞার ভাব বয়ে যাচ্ছে— প্রাণের টানে যেন তাহা লেখা নহে—যেন বেগার শোধ দেওয়া।

মলিনা ভাবিল,—আমার স্বামী নিষ্কলঙ্ক দেবতা। তাঁর এমন ভাব হইলকেন? তবে কি তাঁর পদস্খলন হইল? অসম্ভবই বা কি, শুনেছি, কলিকাতায় বারবনিতারা রাক্ষসীর মত কৃত্রিম রূপের জাল ছড়িয়ে দিয়ে, নিরীহ দেব চরিত্র যুবকগুলিকে ধরে, আর অল্প দিনেই তাদের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ, আর স্বাস্থ্য-সুনাম-জীবনী শক্তি সবই সুরার সঙ্গে চাট্ করিয়া খেয়ে ফেলে। তা যদি সত্যি হয়—সত্যিই তিনি যদি ঐ রাক্ষসীর মায়াপুরীতে গিয়ে ঐ রূপ ফাঁদে আট্‌কিয়ে যান, তবেই হয়েছে! দাসীকে কেন ভুল্‌লেন, বুঝতে পাচ্ছিনা। তাঁর পদস্খলন! না—না,—তা ভাব্‌ব না—তিনি দেবতার চেয়েও পবিত্র। দেবতারও খুঁত আছে, তিনি নিখুঁত। সে চন্দ্রকে কলঙ্ক রাহু স্পর্শ কর্‌তেও পারে না। স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করা অপেক্ষা স্ত্রীর পক্ষে বড় পাপ আর নাই। না—আমি সন্দেহ কর্‌ব না—তিনি পুণ্যশ্লোক। কাজের ঝঞ্ঝাটেই বোধ হয়, তিনি দাসীকে পত্র লিখ্‌বার অবসর পান না। এইটাই ঠিক কথা। ঈশ্বর তাঁকে সুস্থ রাখুন—তাঁর সকল অসুখ অশান্তি তাঁর এই দাসীর উপরে রাখুন। আহা! বিদেশে তাঁর কত কষ্টই হচ্ছে। বিদেশ—সেখানে তাঁর সুখের দিকে চাহিবার কেহই নাই; পরিশ্রান্ত হয়ে এলে, শুশ্রূষা করিবার সেখানে কেহই নাই! এ সব ভাবনা ভেবেই বা কি কর্‌ব? পত্র না পেলে অভিমান আসে—মনে হয়, একটী পঙ্‌ক্তি লিখেও কি দাসীর সংবাদ নিবার ইচ্ছে হয় না? ততটুকু অবসরও কি হয় না? তাঁর সংবাদ না পেলে আমি পাগলিনী হয়ে উঠি, তা তো তিনি জানেন, জেনেও কেন নিষ্ঠুর হন? তবে কি তাঁর অসুখ করেছে? ঈশ্বর না করুন, যদি তাই হয়, তবে বাড়ী চলে আসেন্ না কেন? আমাদের কিসের অভাব? যদি শরীর ভাল না থাকে, তবে কাজ কর্‌বার দরকার কি?

(৫)

সুধীর কুমারের পিতা অশিত কুমার বকিতে বকিতে বাড়ীর ভিতর এলেন। নির্ব্বংশের বেটা—ফুল পাংশুল—কুপিণ্ডে। বল্লাম—দোকান করে দিই, বাড়ী বসে তাই দ্যাখ—শোন; তা নয় চাকুরী ক'রে রাজা হবে। আরে গর্ভস্রাব। তুই চাকুরী কর্‌ছিস্ আজ ছ'মাস, এ পর্য্যন্ত আধ পয়সা বাড়ী দিলিনে, উপরন্ত মাসে মাসে কুড়ি পঁচিশ টাকা চেয়ে বস্‌ছিস্। তোকে যদি টাকাই দেবো, তবে চাকুরী ক'রে কাজ কি? আমি বলি,—ও সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বাড়ী আয়। তাও আস্‌বেনা। করিই বা কি? তার গর্ভধারিণী ত নাই; বুঝিয়ে বলে কে? বৌমা ছেলে মানুষ, দু'কথা বল্‌তে পারেন না। আমি করি কি? একা মানুষ, কোন্ দিক্ যে দেখি, তার ঠিক নাই। এত দিন খরচ পত্র ক'রে পড়ালেম, মনে করেছিলাম, এখন একটু নিশ্চিন্ত হব,—তা হবার যো নেই—এখনও টাকা—টাকা—টাকা! টাকা আর পাঠাচ্ছিনা। সে একা, অত টাকা তার কিসে লাগে? বেতনও তো পায় শুনিছি ৬০।৭০ টাকা। পাজি! হারামজাদা। নির্ব্বংশের বেটা। নিশ্চয় তার অধঃপতন হয়েছে। এ দিকে ভাবনায় বৌমা আমার সোণার প্রতিমা, কালী হয়ে যাচ্ছেন, আমি হরদম্ টাকা পাঠাচ্ছি, আর তিনি স্ফূর্ত্তি কর্‌ছেন। এক পয়সাও দেবো না। না কুলায় বাড়ী চলে আসুক।

তিনি মুখেও যাহা বলিলেন,—কাজেও তাই করিলেন। সুধীরকে আর আধ পয়সাও পাঠাইলেন না। ও দিকে সুধীর ঘোর মাতাল হয়ে পড়্‌ল। ২৪ ঘণ্টা মদ চায়; মদ না পেলে অবসাদ ধরে—মরার মত হয়ে পড়ে। মেসে অনেক টাকা বাকী—উঠ্‌তে বস্‌তে ম্যানেজার তাগাদা আরম্ভ করিল। আজ দিব, কাল দিব, ক'রে আর ক'দিন চলে? শেষে মেসের লোকেরা দুর্ব্বাক্য বলিয়া সুধীরকে অপমানিত করিতে লাগিল।

সুরাসক্ত সুধীর সুরাদেবীর প্রসাদাৎ এখন মান-অপমান-দ্বন্দের অতীত—শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান, চন্দন-পঙ্কে সমদৃষ্টি। সে নীরবে সকল অপমানই মাথা পাতিয়া লইতেছে। অধঃপতনের চমৎকার প্রায়শ্চিত্ত।

এক দিন মাতাল অবস্থায় সুধীর কুমার মেসের "ঝি"র নিকটে কু-অভিপ্রায় প্রকাশ করে। ঝি গুলো যৌবনে অনেকেই দুশ্চরিত্রা থাকে, বুড়ো হয়ে সতী হয়, আর ঝি-গিরিতে লেগে যায়—এইরূপ একটা ভুল ধারণা সুধীরের ছিল। তাই সে সাহস করিয়া অতটা দুর্বৃত্ত গিরি করিয়া বসিল।

ঝি অধিকাংশ যৌবনে-কলঙ্কিনী হইলেও অনেকে ভালও আছে। পেটের দায়েও অনেকে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়। পোড়া অদৃষ্ট যে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে।

আমাদের এই ঝিও সৎস্বভাবা। বেশী বেতনের আশায় ঐ ভদ্র লোকের মেসে এসেছিল। মেয়েটী অল্প বয়স্কা, শান্ত, সুশীলা। বেশ ধীর নম্রভাবে কাজ কর্ম্ম করিত। মেসের বাবুরা সকলেই তাহাকে মেয়ের মত স্নেহ যত্ন করিত।

যা হউক, সুরাপানোন্মত্ত হইয়া সুধীর যখন ঝি য়ের নিকটে অসৎ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ছিল, তখন মেসের কয়েকজন ভদ্রলোক সে কথা শ্রবণ করিয়া ছিল। তাহারা রাগান্ধ হইয়া সুধীরকে উত্তম-মধ্যম দিয়া মেসের গণ্ডী হইতে তাকে বহিস্কৃত কোরে দিল। আর বলিল,—"পাজী! নচ্ছার! জুয়াচোর! বদ্‌মাস্ বেল্লিক! তোর মা-ভগিনী বোধ নেই? ভদ্রলোকের মেয়ে পেটের দায়ে আমাদের ভগিনীর স্থানীয়া হয়ে আমাদের আশ্রয়ে এসে রয়েছে, তুই পাজী তার উপর অত্যাচার কর্‌তে উদ্যত! ফের যদি মেসের সীমানায় পা দিবি, তবে সেই দিন তোর হাড় চুর্ণ ক'রে দেবো। সুধীর রাস্তায়; মেসের সদর কপাট বন্ধ।

প্রহৃত হইবার পর সুধীর লাবণ্যের আশ্রয়ে গিয়া উঠিল। বেতনের যে কয়টী মুদ্রা হাতে ছিল, তাহা সুরাদেবীর অর্চ্চনায় অচিরাৎ ব্যয়িত হইল।

লাবণ্যময়ী উপযুক্ত অবসর পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহারে মন দিল। মিষ্ট হাসি—মিষ্ট চাহনি—মিষ্ট তোষামোদ—মিষ্ট আধ-আধ বুলি—মিষ্ট আবদার—মিষ্ট অভিমান—মিষ্ট যত্ন—সবই করিল। মিহি সুরে—কাপড়ের বায়না—গহনার বায়না—টাকার বায়না—জিনিষের বায়না করিয়া বসিল।

লাবণ্যের বায়না—আবদার পূর্ণ করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। কোথায় অর্থ? সুধীর অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। লাবণ্যকে বলিল,—"সুধীর না কর্‌তে পারে এমন কাজই নাই; টাকার জন্য—সে সবই পারে।" মনে মনে ভাবিলেন,—বাবা আর টাকা কড়ি দিবেন না; মলিনার গহনাগুলি আন্‌তে পার্‌লে দিন কতক স্ফুর্ত্তি করা যায়। এই ভেবে মলিনাকে পত্র লিখিল—বাড়ী যাইতেছি।

(৬)

আজ মলিনার বড় আনন্দ। সে সকাল করে সমস্ত কাজ সেরে নানাবিধ রান্না কর্‌ছে। স্বামী বাড়ী আস্‌বেন—অনেক দিন তাঁকে হাতে করে খাওয়ায় নি।

বিদেশে তাঁর খাওয়া দাওয়া ভাল হয় না, এই ভেবে সে কত কি রাঁধ্‌বে ভেবে কুল পাচ্ছে না।

রান্না বান্না সেরে গা-হাত ধুয়ে সন্ধ্যার দীপ ধূপ দিয়ে মলিনা সতৃষ্ণ নয়নে বসিয়া সদরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতেছে। ঠিক সাতটার সময় সুধীর বাড়ী আসিল।

অশিত বাবু সুধীরের উপর বড়ই চটিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাকে দেখিবামাত্র রাগ পড়িয়া গেল। পুত্র-স্নেহের এমনই প্রভাব যে যত রাগই থাকুক, সন্তানকে দেখিবামাত্র সব ভুলে যেতে হয়। সংসারে অপত্য স্নেহ একটি স্বর্গীয় জিনিষ।

সুধীরের মুখ দেখিবামাত্র অশিত কুমারের হৃদয় স্নেহে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। তখন তিনি তাকে নিকটে বসিয়ে কত গল্প করতে লাগ্‌লেন। শেষে মলিনাকে বলিলেন,—বৌমা! আমাদের দুজনকেই আজ এক সঙ্গেই খেতে দাও; আজ সকালেই খাই, সুধীরের খিদে পেয়েছে।

শ্বশুরের আদেশ মত মলিনা দুজনকে খেতে দিয়ে একটু দূরে বসিয়া অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে স্বামীকে দেখিতে ছিল। মলিনা সরলা হইলেও চতুরা। অতি অল্প সময়েই সে স্বামীর শোচনীয় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। মনে মনে ভাবিল,—এখন সে ভাব নেই—সে সরল প্রফুল্ল মুখচ্ছবি নেই—সে চোখে চোকে মনের ভাব প্রকাশ করা নেই—সেই আগেকার যেন কিছুই নেই। এখন ঘোর পরিবর্ত্তন। এক কথায় সে সুধীরই নাই।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে মলিনা শয়ন করিতে গেল। স্বামীর মুখ-নিঃসৃত মদের গন্ধে তার অন্নপ্রাশনের ভাত বমি হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল।

সুধীরের অধঃপতনের কথা ভেবে মলিনার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইল। অতি কষ্টে শয্যার উপরে গিয়া বসিল; বলিল,—তোমার পায়ে ধরি, তোমার নির্ম্মল চরিত্রে নেশার কলঙ্ক লেপিয়া দিওনা—তোমার এই অবনতি দেখে আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে—তুমি আর সেখানে যেওনা, নেশাও আর ক'রনা।

সুধীর বলিল,—আরে গেল যা। সব তাতেই বাড়াবাড়ি। আমি ছুঁয়েছি কি যে ন্যাকামি হচ্ছে? কই, লাবণ্য ত অমনটী করে না। তার জন্য আমার প্রাণ অস্থির হচ্ছে, তার হাসি মুখ সর্ব্বদাই দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। বাড়ী এসেছি না নরকে এসেছি। এখন প্যান্ প্যানানি, ঘ্যান্-ঘ্যানানি আরম্ভ কর্‌লে। আমি কচি খোকা কিনা আমায় যেতে দেবে না।

মলিনা কি বলিবে ভেবে স্থির কর্‌তে না পেরে শয়ন করিল। শয়ন করিয়া মনে মনে কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌ল। মনে মনে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল,—হে ভগবন্! কেন এমন করিলে? আমার দেব-চরিত্র স্বামী কেন এমন হইলেন? ওঁকে সুমতি দাও।

এইরূপ কত কি ভাবিতে ভাবিতে মলিনার একটু তন্দ্রাবেশ হইল।

সুধীর দেখিল,—উপযুক্ত অবসর। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া মলিনার গায়ের গহনাগুলি খুলিতে আরম্ভ করিল।

মলিনার তন্দ্রা সহজেই ভেঙ্গে গেল। বলিল,—"ওকি? গহনা লই-তেছ কেন?"

সুধীর। চুপ কর চেঁচাইও না। গহনা গুলি আমায় দাও।

মলিনা। তোমাকে অ-দেয় আমার কিছুই নাই। কিন্তু এ সময় আমি দিতে পার্‌ব না। তোমার মাথার ঠিক নাই। তোমার হাতে পড়িলে উহা পাপ কাজে নষ্ট হবে। আমি দিব না।

"দিবে না?" বলিয়াই সুধীর বজ্রমুষ্টিতে মলিনার হাত ধরিয়া গহনা ছিনা-ইয়া লইতে লাগিল।

মলিনা বাধা দেওয়ায় তাহাকে পদাঘাতে ভূ-পাতিতা করিয়া, গহনা গুলি লইয়া, সুধীর চম্পট্ দিল।

সহসা পতন-শব্দ শুনিয়া অশিত কুমার আসিয়া দেখিলেন,—ঘর খোলা, ঘরে পুত্র-রত্ন নাই, পুত্রবধু ভূমিতলে পতিতা। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে তিনি প্রবেশ করিয়া দেখ্‌লেন,—মলিনার সংজ্ঞা নাই। তখন তিনি অতি সত্বর তার চোখে মুখে জল দিতে লাগলেন,—সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাক্‌তে লোক পাঠাইলেন এবং অবস্থাটা নখ-দর্পণে দেখ্‌লেন ও বুঝ্‌লেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই ডাক্তার আসিলেন। তিনি বলিলেন,—মাথায় গুরুতর আঘাত লেগে এরূপ অবস্থা ঘটেছে, বিশেষ যত্ন কর্‌লে জ্ঞান হতে পারে।

অশিত বাবু ও ডাক্তার বাবু দু'জনেই সারারাত্রি মলিনার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল তবুও জ্ঞান হইল না। পরে বেলা সাতটার সময় মলিনার চৈতন্য-সঞ্চার হইল।

ডাক্তার সারারাত্রি জেগে ছিলেন। না জাগিবেন কেন? অশিত বাবু তাঁকে এনেই বলেছিলেন,—দেখুন, ডাক্তার বাবু, বৌমাকে শীঘ্র ভাল করে দিন, যত টাকা লাগে দিব—বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী! মার মুখের কথাটি পর্য্যন্ত কেহ শুন্‌তে পায় না,—মা আমার ছেলেরও অধিক

ঐরূপ ঘটনায় অশিত কুমার মনে মনে বলিলেন,—আজ থেকে আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, হতভাগা যখন মা-লক্ষ্মীর গায়ে হাত তুলেছে, তখন সে পথে পড়ে মর্‌লেও আর তাকে চোখ দিয়ে দেখ্‌ব না।

(৭)

সুধীর কুমার মলিনার গহনাগুলি লইয়া বরাবর কলিকাতায় লাবণ্যের পাপাগারে উপস্থিত। তার কতকগুলি লাবণ্যকে পরাইয়া আনন্দ অনুভব করিল। আর কতকগুলি বিক্রয় করিয়া সুরার অর্চ্চনা করিল।

গহনা ও যথেষ্ট সুরা পাইয়া লাবণ্যের প্রেম বহ্নি দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল,—কৃত্রিম ভালবাসার কপট জৌলুস ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠল। তখন সুধীরের প্রতি আদর-যত্ন সোহাগ ভালবাসার অবধি নাই। তখন সুধীরের নামের "সু" শুনিলেই লাবণ্য প্রেমে গদ্‌গদ।

ঐরূপ কপট হাস্য-লাস্য ভাব-ভঙ্গিতে সুধীর প্রতারিত হইল। সে ভাবিল,—লাবণ্য আমায় যেমনটী ভালবাসে, তেমনটী আর কেহ বাসে না। এত ভাল বাসিতে বুঝি আর কেহ জানে না।

সেই আদরে মাতোয়ারা হইয়া সুধীর আফিসে যাওয়া ছেড়ে দিল। ফলে চাকুরীটী গেল। নগদ টাকা বসিয়া খাইলে ক'দিন চলে? কলিকাতার মত স্থানে লক্ষ টাকাও নিমেষে উড়ে যায়, সুধীরের ত সামান্য দুই হাজার টাকা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে উড়ে গেল।

পূর্ব্বে সে কখনও বিড়িটী খায় নাই, এখন ২৪ ঘণ্টা সুরাসক্ত। ফলে দুরারোগ্য ক্ষত ও বাতব্যাধিতে সুধীর আক্রান্ত হইল।

অর্থশূন্য পীড়াগ্রস্ত সুধীর এখন লাবণ্যের বিষ-নজরে পড়িল। লাবণ্যের যত কিছু কপট স্নেহ, মমতা, আদর-সোহাগ, সবই অন্তর্হিত হইল। বেশ্যার আবদার যতক্ষণ পূরণ করা যায়, ততক্ষণই তার যত্ন; পূরণ করিতে না পারিলেই, তার তাচ্ছিল্য। সুধীর এখন পূরণ করিতে অসমর্থ, সুতরাং তার উপর লাবণ্যের তাচ্ছিল্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

লাবণ্য এখন সুধীরকে কথায় কথায় ঝাঁটা লাথি মার্‌তে চায়, কথায় কথায় তার মা-মাসী তুলে, অশ্রাব্য অকথ্য ভাষায় তাকে গালাগালি দেয়। বলে,—হতচ্ছাড়া, মুখপোড়া বাঁদর, আর কোথাও জায়গা পাও নি? এখানে মর্‌তে এসেছ কেন? খ্যাংরা মেরে দূর করে দেবো—বেরো কুটেরোগী। তোকে বসিয়ে বসিয়ে কে খাওয়াবে? আমি কি তোর মা-মাসী যে খেতে দেবো? ভাল চাস্ বাদ তবে মান নিয়ে দূর হ।

এখন লাবণ্যের প্রেমের ভাষা ঐরূপ। হায় রে অন্ধ মানুষ! এততেও বেশ্যাকে চিন্‌তে পার না?

(৮)

একে রোগের কষ্ট তারপর বেশ্যার সার্ব্বক্ষণিক বাক্য-যন্ত্রণা, সুধীরের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠ্‌ল। পাপীর প্রায়শ্চিত্ত এখন ষোলকলায় পূর্ণ।

অনন্যোপায় হইয়া সুধীর কুমার পিতাকে পত্র লিখিল,—বাবা! আমি বে,ঘোরে মারা যাইতেছি, আমায় লইয়া যান, আমার উত্থানশক্তি নাই, আমায় ক্ষমা ক'রে বাড়ী লইয়া যান, নচেৎ অতি শীঘ্রই মারা যাইব।

অশিত কুমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি পত্রের জবাবটীও দিলেন না।

সুধীর তখন হতাশ হইয়া মলিনাকে পত্র লিখিল,—মলিনা! আমি মৃত-প্রায়—বিনা যত্নে, বিনা চিকিৎসায়, বে-ঘোরে মারা পড়িতেছি। তুমি যদি দয়া ক'রে বাবাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমায় নিয়ে যাও, তবে এ যাত্রা না বাঁচিলেও বাড়ীতে গিয়া শান্তিতে মরিতে পারি।

তোমার অত্যাচারী হতভাগ্য—স্বামী।

মলিনা স্বামীর পত্র পেয়ে কেঁদে আকুল হ'য়ে উঠল। কি করে? শ্বশুরকে কিছু বল্‌তে পারে না। সেই সময় তার সহোদর তাকে দেখ্‌তে এসেছিল। মলিনা তাকে বলিল,—দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একবার আনিতে যাও। তুমি তাঁকে নিয়ে এস।

মলিনার দাদা ত রেগে আগুণ। বলিল,—যে আমার বোন্‌কে মেরে ফেল্‌তে গিয়েছিল, সে পাজীকে আমি আন্‌তে যাব বৈ কি। তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক।

মলিনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ শত অপরাধ করিলেও সম্পর্ক যাবার নয়; আমার মুখের দিকে চেয়ে তাঁকে নিয়ে এস।

বোনের চোখে জল দেখে মলিনার দাদার প্রাণটা কেঁদে উঠ্‌ল। তখন অজয় বাবু কলিকাতায় যাইয়া ভগিনীপতি অর্থাৎ আমাদের সেই শ্রীমান সুধীর কুমারকে বাড়ীতে লইয়া আসিল।

(৯)

আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া অক্লান্ত ভাবে মলিনা সুধীরের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত হইল। পথ্যের খুব ধরাধর করা হইল। মুমূর্ষু হইলেও মলিনার যত্নে সুধীর শান্তি অনুভব করিতে লাগিল।

সুধীরের সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইয়াছিল। মলিনা স্ব-হস্তে সেই দুর্গন্ধ ক্ষতের উপর ঔষধের প্রলেপ দিত—স্ব-হস্তে ঘড়ি ধরিয়া ধরিয়া তাহাকে ঔষধ খাওয়াইত স্ব-হস্তে সুধীরের বেদনায় মালিশ করিত।

ঐরূপ যত্ন শুশ্রূষায় সুধীর কুমার শীঘ্রই সেরে উঠল। সাধ্বীর শ্রম ব্যর্থ হইল না। তার অধীর প্রাণের আকুল প্রার্থনা মঙ্গলময়ের প্রাণের দ্বারে পঁহুছিল। সুধীর কুমার এখন নিরাময়।

আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণে অনুতাপের হুতাশন জ্বলিতে আরম্ভ করিল। তার মনে হইতে লাগিল,—হায়। আমি কি নরাধম। সাধ্বী স্ত্রীর পবিত্র অঙ্গ হতে শয়তানের মত অলঙ্কার খুলে নিয়ে কিনা একটা পিশাচী বারবনিতার অপবিত্র দেহে পরায়েছি। পরায়ে আনন্দ অনুভব করেছি। ছি! ছি! ছি! অত্যাচার আমার অপদার্থ জীবনে। মলিনা আমার সতী, মলিনা আমার আদর্শ স্ত্রী, তার নির্দ্দোষ নিশ্বাস পড়িল! সতীর নিশ্বাস সহিবে কেন? সেই নিশ্বাসই ঘনীভূত হ'য়ে, মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে উৎকট ব্যাধিরূপে আমাকে আক্রমণ করেছিল। পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল। যেরূপ পাপ করেছি, আমার মনে হয় প্রায়শ্চিত্ত তদনুরূপ হয় নাই—পাপের সম্পূর্ণ ক্ষালন হয়েছে ব'লে মনে হয় না। হে ভগবন্! অন্তর্যামিন্! আমাকে কেন নরকের শেষ সীমায় যেতে দিয়েছিলে? অতটা অধঃপতনের পূর্ব্বে কেন আমাকে বজ্রাঘাতে নিহত কর নাই?

ঐরূপ অনুতাপে সুধীরের প্রাণ নিরন্তর জ্বলিতে লাগিল। জ্বলিয়া জ্বলিয়া সে নিষ্পাপ হইল। পুড়িয়া পুড়িয়া সোনা খাঁটি হইল।

আবার বিবেক ফিরিল, বুদ্ধি ফিরিল, পূর্ণ অভিজ্ঞতার সহিত চরিত্রের মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য সবই ফিরিল। এখন সুধীর আবার সেই সুধীর,—ধীর, নম্র, শান্ত প্রকৃতি, দেব-চরিত্র, সহশীল আর সর্ব্বক্ষণ অনুতপ্ত।

অনুতাপ পাপীর মহৌষধ। ইহার গুণে বিপথ গামী ঘোর পাষণ্ডও সুপথে আসে। তাই বলিতে ছিলাম, অনুতাপই মানুষকে নরকের দ্বার থেকে ফিরিয়ে এনে আবার মানুষে পরিণত কর্‌তে পারে।

অনুতাপের সুফল সুধীর কুমারের চরিত্রে দেদীপ্যমান্!

সাধক-সঙ্গীত।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

রামপ্রসাদী সুর।

আর কত ঘুমাবি তারা।
(আমায়) দোর খুলেদে ভব দারা॥
খেল্‌তে আমায় পাঠিয়ে ভবে মা আপনি ঘুমে হ'লি সারা।
তোর ছেলে রইল বাইরে পড়ে, দেখ্‌ দিনে তোর একি ধারা॥
দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যে হ'ল মা, (উঠ্‌ল) আকাশে কাল নিশির তারা।
(এখন) কোন্ পথে যাই, ভেবে না পাই, হ'য়েছি যে দিশেহারা।
এমন খেলা খেল্‌তে আমি আর কভু যাব'না তারা।
(তোর) কোলে ব'সে তোর মুখে মা, দেখ্‌বো জগৎ সারাৎসারা॥
অধম শ্রীপদ বলে (এখন) সাড়া দেগো ভয় হরা।
(আমি) সাড়ায় সাড়ায় তোর কাছে যাই, (হয়ে) মহানন্দে মাতোয়ারা॥

কাকলী।

লেখিকা,—শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

যাহার মনে বিষয় বাসনা নিরন্তর বিদ্যমান থাকে, অরণ্যে গমন করিলেও তাহার বহুবিধ দোষ ঘটিয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমনে সমর্থ হইয়াছে, গৃহে বাস করিয়াও তাহার তপস্যার ফল লাভ হইয়া থাকে। ঘৃণিত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারিলে, গৃহ ও তপোবন উভয়ই তুল্য জ্ঞান হইয়া থাকে। ১॥

মানবগণ সু-বাক্যরূপ অলঙ্কার দ্বারা যদ্রূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, সুবর্ণমাণিক্যাদির বিবিধ অলঙ্কার, স্নান, শরীরে সুগন্ধ লেপন অথবা কুসুমমালা দ্বারা দেহ অলঙ্কৃত করিলেও তদ্রূপ শোভা প্রাপ্ত হয় না। ভূষণাদির ক্ষয় আছে, সুমধুর বাক্যাবলী রূপ ভূষণের ক্ষয় নাই। ২॥

বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে কিছুই গুরুভার নহে; ব্যবসায়ীর পক্ষে অতিদূর দেশও বিদেশ নহে; এবং মিষ্টভাষীর পক্ষে কেহই শত্রু নহে। ৩॥

দেহীগণের সম্বন্ধে প্রিয় ও অপ্রিয়, সকল বিষয়েরই যে সমভাব, মনীষীরা তাহাকেই ক্ষমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৪॥

ক্ষমাতেই জগতের সকলকেই বশীভূত করিতে পারা যায়। ক্ষমার অসাধ্য কিছুই নাই। ক্ষমা রূপ বর্ম্মদ্বারা যাহার দেহ আবৃত থাকে; দুর্জ্জনেরা তাহার কোন অপকারই করিতে পারে না। ৫॥

সত্য যাহার ব্রত, দীন হীনের প্রতি যাহার করুণা, কাম ক্রোধাদি রিপু যাহার বশীভূত, সেই ব্যক্তিই বিশ্ব বিজয়ী। ৬॥

লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ লোভ হইতেই বহু প্রকার অভিলাষ জন্মে। লোভ হইতে মোহ উপস্থিত হয় ও শেষে বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব লোভই পতনের কারণ। ৭॥

পণ্ডিতেরা বহু শাস্ত্র অবগত হইয়া এবং নিখিল সন্দেহের ছেদন কর্ত্তা হইয়াও, তাঁহারাও কখন কখন লোভে বিমুগ্ধ হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া থাকেন। লেখা পড়া শিক্ষা করিলেই চরিত্র গঠন হয় না। সৎসঙ্গ ও সাধনা বিনা মানব মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। ৮॥

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিষয়ের সঙ্গে বিশেষরূপ ঘনিষ্টতা জন্মে। বিষয় সম্বন্ধ হইতে কামনার উৎপত্তি হয়, এবং বিষয়াভিলাষ হইতে ক্রোধ জন্মে। ৯॥

ক্রোধ হইলে হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট হয় এবং পুস্তকের ও শিক্ষকের সদুপদেশ বিস্মৃত হইতে হয়। এইরূপ বিস্মৃতি হইতে বুদ্ধির চেতনা বিলুপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মানবেরা জড় ভাব ধারণ করে। ১০॥

ধনবান্ হইয়া অখ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা, নির্ধন হইয়া যশঃ ও সুখ্যাতি লাভ করা বহু অংশে শ্রেয়ঃ। ১১॥

পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ও মূর্খের মূর্খতা, তাহাদের সহিত আলাপেই বুঝিতে পারা যায়। অপর পরিচয়ের আবশ্যক হয় না। ১২॥

সমালোচনা।

স্বপ্নফল বিজ্ঞানম্।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য দশ আনা মাত্র।

মানবও মাত্রেই নিদ্রিতাবস্থায় সময় সময় স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে; নিদ্রিতাবস্থায় সকলেই স্বপ্নকে বিশ্বাস করে; কিন্তু স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহা সত্য ঘটনায় পরিণত হয় কি না, সে সম্বন্ধে ভাবি শুভাশুভ ঘটনার স্বপক্ষে বিপক্ষে

বিবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী স্বপ্ন তত্ত্বের আলোচনা করিয়া সার সত্যে উপনীত হইয়াছেন। স্বপ্নতত্ত্বের সূক্ষ্মালোচনায় পূর্ব্বে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে, সন্দিগ্ধ চিত্ত Superstitious অশিক্ষিত দুর্ব্বল চিত্ত লোকেরাই স্বপ্নে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে, শিক্ষিত সুসভ্য দৃঢ়-চিত্ত ব্যক্তি কেহই স্বপ্ন দৃষ্ট ঘটনার ভাবি মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। প্রকৃতপক্ষে এ কথা সত্য নহে,—স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহা সত্য ঘটনায় পরিণত হয় কিনা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, আলোচ্য "স্বপ্নফল-বিজ্ঞানম্" পুস্তক খানিতে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য মহাতপা ঋষিগণ সূক্ষ্ম জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া মানবগণের হিতার্থে পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিলাতের মনিষীগণ স্বপ্নকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। সম্প্রতি সংবাদ পত্রাদিতে বিলাতের স্বপ্নতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, প্রসঙ্গানুরোধে এস্থলে পাঠক মহোদয়গণকে বিলাতের স্বপ্নতত্ত্বের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করতঃ উপহার প্রদান করিলাম :—

সোনার বিষয় কিছু স্বপ্ন দেখিলে আপনার বড় খারাপ অবস্থা হইবে। হয়ত বা এমনও হইতে পারে যে, আপনাকে ছেঁড়া মাদুরে শুইয়া সোনার স্বপ্নও দেখিতে হইবে। কিন্তু আপনি যদি কোন বহুমূল্য অলঙ্কারের বিষয় স্বপ্ন দেখেন তবে আপনার উন্নতি হইবে। আপনি যদি পুরুষ হন—যদি স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করেন এবং স্বপ্নে যদি দেখেন কারুকে সোনা দান করিতে-ছেন তবে আপনার কপাল পুড়িবে—অর্থাৎ আপনার কপালে একটি স্ত্রী আসিয়া জুটিবে।

স্বপ্নে যদি পেঁয়াজ দেখেন তবে তাহা কলহের পূর্ব্ব সূচনা। এই পেঁয়াজ যদি আবার কাঁচা হয় তবে তার ঝাঁঝ বেশী হইবে। তাহাতে আপনার স্ত্রীর সহিত মান অভিমানের পালা চলিতে পারে—এবং তাহাতে চোখের জলও পড়িতে পারে।

চটি জুতার (ছেঁড়া হইলেও ক্ষতি নাই) স্বপ্ন বড় সৌভাগ্যের কথা। ঘুমের মধ্যে যদি আপনার কপালে চটি জুতা জোটে তাহা হইলে আপনার জীবন বড় সুখের হইবে। কোন কুমারী যদি চটি জুতার স্বপ্ন দেখে তবে সে বড় ভাল ঘরের গৃহিনী হইবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। স্বপ্নে যদি পা দেখেন তবে আপনার কপালে ভ্রমণ আছে। কিন্তু যদি পা ধোয়ার স্বপ্ন দেখেন তবে আপনার কপালের কিছু অশান্তি ভোগ; কেহ রোধ করিতে পারিবে

না। কিন্তু যদি কেহ আপনার পা গন্ধ দ্রব্য এবং তেল দিয়া ধোয়াইয়া দিতেছে স্বপ্ন দেখেন তবে আপনার ভাগ্যে সম্মান লাভ অদূরে।

যদি কোন কুমারী পাশা খেলিবার গুটীর স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন সাবধান হয়। তাহার ভবিষ্যৎ স্বামীর চরিত্রের দিকে বিশেষ নজর তাহাকে রাখিতে হইবে। আর সে নিজের সম্বন্ধেও যেন সাবধান হয়।

নিজের বার্দ্ধক্যের স্বপ্ন দেখা বড় ভাগ্যের কথা। স্বপ্নদর্শনকারীর মনোমত পাত্র বা পাত্রীর সহিত বিবাহ হইবে এবং তাহারা অনেক কাল "মনের মিলে সুখে থাকবে।" কিন্তু আপনি যদি স্বপ্ন দেখেন যে, আপনার খুব অসুখ করিয়াছে, তবে স্থির জানিবেন যে, আপনার নিন্দা রটিতেছে, এবং তাহার মধ্যে কিছু কিছু সত্যও আছে। এই রকমের স্বপ্ন দেখিলে আপনার বন্ধুদের সম্বন্ধে সাবধান হইবেন।

স্বপ্নে যদি দাগ লেখা দেখা যায়, তবে আপনার কোন প্রিয়জনের সহিত ঝগড়া হইবার সম্ভাবনা। খেলাতে যদি জয়লাভ করেন, তবে আপনি আপনার শত্রুদের জয় করিবেন। আপনি যদি ব্যবসায়ী হন, তবে আপনার ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে।

আরো অন্যান্য বিষয়ের স্বপ দেখিবার আপনার অধিকার আছে। তাহার ব্যাখ্যাও আছে। জামা কাপড় ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বপ্নের অনেক রকম অর্থ হয়। তাহা পরে প্রকাশ করিব। বিলাতের লোকেরা বলে যে রাত্রির যে কোন সময় স্বপ্ন দেখিলেই হইল। তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। আমাদের দেশের স্বপ্ন-বিশ্বাসী লোকেরা বলে যে, ভোর রাত্রের স্বপ্নই নাকি সত্য হয়। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বিশেষ কিছু বলেন না। তাঁহাদের স্বপ্ন, স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা কিন্তু অনেক সময় এমন কত স্বপ্ন দেখি, যাকে কেবল স্বপ্ন মনে করতে [illegible]।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু স্বপ্নে দর্শন করিলে মানবের শুভাশুভ অথবা বিশেষ কোন ফলপ্রাপ্তি সূচনা করে, তাহা সাধারণ লোকের স্থূল বুদ্ধির অনধিগম্য হইলেও সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যঋষিগণ প্রগাঢ় গবেষণা এবং অসামান্য যোগবল দ্বারা তাহার শুভাশুভ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা ঐ প্রগাঢ় চিন্তার [illegible] পুরাণাদি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে স্বপ্নতত্ত্বের নানা তথ্য একত্র সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিয়া জন সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন একথা বলাই বাহুল্য।

জন্মভূমি।

২৭শ বর্ষ, } ১৩২৮ সাল, শ্রাবণ। { ৪র্থ সংখ্যা।

বিবাহ-পণ।

(শ্রীযুত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্-বি, এফ্, সি, এস্ মহোদয়ের ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ।)

(লেখক,—সাহিত্য-রত্ন শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।)

সমাজের সুশৃঙ্খলা নষ্ট করিতেছে—এমন একটী বিষয়ের আলোচনা করিতে আমি উদ্যত হইয়াছি। আমি ভরসা করি, আমার অলোচ্য বিষয়টীতে সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন। মনে হয়, বিষয়টী শুনিতে সকলেরই আগ্রহ জন্মিবে। আজ-কাল সর্ব্বত্রই বিবাহ-পণের আলোচনা চলিতেছে। আবার স্নেহলতানাম্নী কুমারীর শোচনীয় আত্মহত্যায় ঐ আলোচনা আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। স্নেহলতা হিন্দুর মেয়ে; বালিকা। তাহার বিবাহের প্রস্তাবে বর-পক্ষ অত্যধিক পণের চাপ দিলেন। সে চাপ পূরণ করিতে হইলে, স্নেহের মাতা-পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। তাই, তাঁহাদিগকে এই দারুণ দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্নেহ অনলে দেহ সঁপিয়া দিল—সোণার কোমল অঙ্গ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া গেল। স্নেহ জীবন্ত পুড়িয়া মরিল। কি করুণ দৃশ্য! বিবাহ-পণের এ তো একটা দুর্ঘটনা। ভদ্র-পরিবারের মধ্যে রক্ত-শোষক পণের দরুণ এইরূপ আরও কত শত অনিষ্টের সংঘটন হইতেছে। কন্যার বিবাহে পণ দিতে যাইয়া কত শত পরিবার দারুণ দারিদ্র্যকে চিরদিনের মত বরণ করিয়া লইতেছেন। স্নেহলতা যেমন পুড়িয়া মরিল, আমি জানি, বিস্তর পিতাও পণের দাবী পূরণ করিতে না পারিয়া,

মনের কষ্টে আত্মহত্যা করিয়াছেন: মেয়ে বড় হইয়া উঠিল, বিবাহের টাকা জুটাইতে পারিলেন না, তখন আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা হইতে জুড়াইলেন। আহা, কি শোচনীয় ঘটনা! আবার, এই দারুণ পণের ফলে অনেক বিবাহিতা বালিকাও আত্মহত্যা করিয়াছে। পিতা কন্যার বিবাহ-সময়ে হয় তো প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, পরে এত টাকা বা গহনা দিব, পরে হয় তো প্রাণপণ করিয়াও ঐ টাকার যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এদিকে প্রতিশ্রুত টাকা প্রভৃতি না পাইয়া কন্যার শ্বশুর শ্বশ্রূ বালিকার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল; ভাবিল, এইরূপ করিলে স্নেহের টানে পিতা টাকা লইয়া দৌড়িয়া আসিবে। পিতার টাকা নাই, কন্যাও এ উৎপীড়ন আর সহ্য করিতে পারে না। তখন সেই নব-বিবাহিতা বালিকা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া, শ্বশুর-শাশুড়ীর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইল। এরূপ ভারবহ ঘটনাও বিস্তর ঘটিয়াছে। হিন্দু-সমাজে নেহাৎ কম বয়সে বালিকাদের বিবাহ হয়, তখন তাহারা পণের কু-ফলের কথা—মাতা-পিতার হৃতসর্ব্বস্ব হইবার কথা ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারে না, অত কম বয়সে অতটা বুঝিতে শেখে না, তাই রক্ষা! নচেৎ মেয়েরা বাপের দুর্দ্দশা বুঝিতে, জানিতে, হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিবার পর যদি তাহাদের বিবাহ হইত, তবে পরেও কত শত মেয়ে যে আত্মহত্যা করিত, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তাহা হইলে আত্মহত্যার পরিমাণ হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইত। স্নেহলতা একটু বয়স্থা হইয়াছিল, তাই সে পণের বিষময় ফলের ধারণা করিতে পারিল, পিতার পরিণাম কি হইবে, তাহা অনুমান করিতে সমর্থা হইল। আর পিতাকে দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করিবারও পন্থা স্থির করিয়া ফেলিল!

এই পণ-প্রথার কু-ফল শুধু যে বাঙ্গালী-সমাজই ভোগ করিতেছে, তাহা নহে। এই কু-প্রথায় সকল সমাজই ন্যূনাধিক পরিমাণে কষ্ট পাইতেছে। ইংরেজ সমাজ ত পণ-প্রথায় ব্যতিব্যস্ত। সকল সমাজেই এই কু-প্রথা আছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজে যেমন বিবাহটা ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে, তেমনটী আর কুত্রাপি হয় নাই। ইংরেজ-সমাজে পণ-প্রথা থাকিলেও সেটা বিবাহ-চুক্তির মধ্যে ধরা-বাঁধা রকমে থাকে না; পিতা ইচ্ছামত—সাধ্যমত কন্যাকে যৌতুক দিয়া থাকেন। ইংরেজ-সমাজে দেখা যায়, কখন কখন পিতা যৌতুক দিতে চাহিয়া, হয় তো দিলেন না, বিবাহও হয় তো ভাঙ্গিয়া

গেল। এরূপটী খুব কমই ঘটিয়া থাকে। যে সকল পিতা অস্থিরচিত্ত, কেবল তাহারাই ঐরূপ কাণ্ড কখন কখন ঘটাইয়া তোলে। যে ক্ষেত্রে পুরুষ পরিবার-প্রতিপালনে সমর্থ হইয়া বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে ক্ষেত্রে বর-কনের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে একটা ভালবাসা ও সদ্ভাবের অনুশীলন চলিতে থাকে, সেরূপ স্থলে যৌতুকের কোন কথাই থাকে না।

মুসলমান-সমাজও পণ-প্রথার কু-ফল হইতে নিস্তার পায় নাই। এই বিষ সেখানেও বিসর্পিত হইয়াছে। মুসলমান নামক একখানা বিখ্যাত সংবাদ-পত্রে এই পণ-প্রথার কথা আলোচিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—বিবাহ-ব্যাপারটা আমাদের মধ্যেও একটা ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে, এজন্য আমাদের হিন্দু-ভ্রাতারাই দোষী। এ পাপে তাঁহারাই বেশী পাপী। আমরা তাঁহাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। ঐ সংবাদ-পত্রে স্নেহলতার মৃত্যু-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। যাহাতে ঐরূপ কাণ্ড না ঘটে, কু-প্রথাটী যাহাতে সমূলে নির্ম্মূল হয়, সেই জন্য হিন্দু-মুসলমানকে সাবধান হইতে বলা হইয়াছে।

বিহার অঞ্চলের অধিবাসীরাও এই পণ-প্রথার বিষময় ফল ভোগ করিতেছেন। সম্প্রতি "মিথিলা-মিহির" নামক সংবাদ-পত্রে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছিল। লেখক তত্রত্য লোকদিগকে পণগ্রহণে বিরত হইতে বলিয়াছেন। সেখানেও না কি দিন দিন এই প্রথা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। গত আদম-সুমারির হিসাবে দেখা যায় যে, একজন বিহারবাসী যদি বি-এ পাশ করিল, তবে বিবাহের বাজারে তাহার মূল্য সাড়ে তিন হাজার টাকা। ঐ রিপোর্টেই দেখা যায় যে, ম্যাট্রিকিউলেশন পাশ করা হইতে বি-এ পাশ করা পর্য্যন্ত কায়স্থ পাত্রের মূল্য পাঁচ শত হইতে তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠিতেছে; আবার দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পণও লওয়ার কথা জানা গিয়াছে। আমরা জানি, এই ব্যাপার অতিরঞ্জিত নহে; বরং ইহার চেয়েও অনেক সময় অনেক বেশী পণের দাবী করা হয় এবং দেওয়া হইয়াও থাকে। এইরূপ অসম্ভব পণের দাবী আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। এই দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া, লজ্জায় আমাদিগের হেটমুণ্ড হইয়া থাকা উচিত। ইংরেজ-শাসিত ভারতের আদম-সুমারির রিপোর্ট মূল্যবান্ বস্তু। সকলেই উহা আদর করিয়া পড়িয়া থাকেন। সমগ্র পৃথিবী উহার খোঁজ-খবর রাখে। ঐ রিপোর্টের ভিতরে আমাদের অযথা পণ লইবার কথা, আমাদের জাতীয় দৌর্ব্বল্যের কথা, আমাদের কলঙ্কের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই

কলঙ্ক মোচন করিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। উহার জন্য আমাদিগকে সাধারণের কাছে হেয় হইতে হইতেছে। এখন হইতে আমাদিগকে এরূপভাবে ঐ কলঙ্কশূন্য হইতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে আর কোন দিন আর কোন মানুষ-গণনার রিপোর্টে আমাদের ঐ কলঙ্কের কাহিনী বিঘোষিত না হয়।

অযথা পণের দাবী করিয়া, কনের পিতাকে শোষণ করিবার রীতিটী আগে ছিল না। এই ব্যবসায় অল্প দিন হইল দেখা দিয়াছে। আমি জানি, ৩৫ কি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বরের পিতা কনের পিতার নিকটে সামান্য একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ও কিছু অলঙ্কার চাহিয়া বসিতেন, আর সেই পরিমাণ খুব সহজেই দেওয়া যাইত। এই সুন্দর প্রথাটী মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহস্থের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। আবার যাঁহারা ধনী, তাঁহারা পুত্রের বিবাহে এটুকুও করিতেন না, কোনরূপ পণই তাঁহারা লইতেন না। এটুকু নিশ্চয়ই তাঁহাদের সৌজান্যের পরিচায়ক। যে সকল মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আজ-কাল ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন, যাঁহারা নিজেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছেন, আবার পুত্র-পৌত্রগুলিকেও সুশিক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেই এই বিষম পণ-প্রথা ভয়ানক চল্‌তি দেখা যাইতেছে। তাঁহারা যখন সুশিক্ষিত, তখন তাঁহাদের কাছে আমরা ইহার পরিবর্ত্তে ভাল জিনিসেরই আশা করিয়া থাকি। তাঁহাদের মধ্যে এই রক্ত-শোষক প্রথা প্রচলিত থাকা নিতান্তই আক্ষেপের কথা!

এই পুত্র-বিক্রয়ের পূর্ব্বে কন্যা-বিক্রয়-প্রথা বহুকাল যাবৎ বাঙ্গালার কতকগুলি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বিস্তর কুলীনের মেয়ে উপযুক্ত ধনী পাত্রের অভাবে অবিবাহিতা হইয়া থাকিত। কোন কোন নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-সমাজে এই কন্যা-বিক্রয়-প্রথা আজও প্রচলিত আছে। ভৃত্য-শ্রেণীর বিস্তর ব্যক্তি অর্থাভাবে বহুদিন বিবাহ করিতে পারে না; তাহাদিগকে স্ত্রী ক্রয় করিতে হয়। কুচবিহার ও উড়িষ্যায় কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী ক্রয় করা ব্যাপার প্রচলিত আছে। সেখানে পাত্রীর মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বঙ্গদেশে এক্ষণে ব্যাপার উল্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে পাত্রী ক্রয় করিবার পরিবর্ত্তে এখন পাত্র ক্রয় করিতে হইতেছে। এই কেনা-বেচা রীতিমত একটা ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বাজারে পাত্র এখন পণ্য। এই পণ্যের গুণ ও পরিমাণানুসারে মূল্যের তারতম্য ঘটে। সাধারণ ব্যবসায় দ্রব্যের মূল্যের মত পাত্র-মূল্যেরও হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। পাত্রীর পিতারা একটী পাত্রের পিতার নিকটে যাইয়া দর দিতে থাকেন। যিনি সর্ব্বোচ্চ দর ডাকেন,

পাত্রটী সেখানেই বিক্রীত হন। কখন কখন এই দর চড়িতে চড়িতে নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠে। বাজারে জামাতা সংগ্রহের এইরূপ তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে। দেশের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। যে ভদ্র-পরিবারের আর্থিক আয় খুব বেশী নহে, তাঁহাদের গুটীকত মেয়ে জন্মিলেই চক্ষু স্থির! সেই মেয়ের বিবাহ দিবার সময় তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত, এমন কি, ভিটেশূন্য পর্য্যন্ত হইতে হয়। পাত্রপক্ষের দারুণ রক্ত-শোষক পণের দাবীই ঐ শোচনীয় অবস্থার মূলীভূত কারণ। এইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে বলিয়া, মেয়ে সন্তানের উপর লোকের স্নেহ যেন কমিয়া যাইতেছে। এখন মেয়ে জন্মানটা যেন একটা মহাপাপ—মহা অমঙ্গল—মহা দুর্ঘটনা বলিয়া গৃহস্থেরা মনে করিতেছেন। পূর্ব্বে ছেলে হউক, মেয়ে হউক, প্রথম সন্তান জন্মিলেই শাঁখ বাজান হইত। এখন প্রথম সন্তান যদি মেয়ে হয়, তবে আর শাঁখ বাজান হয় না। মেয়ের উপর এখন এতই বিতৃষ্ণা! বিবাহের পূর্ব্বে কোন গৃহস্থের একটী মেয়ে যদি মারা যায়, তবে গৃহস্থ শোকাকুল হইলেও যেন একটু শান্তি অনুভব করেন। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, মেয়ের অসুখ বিসুখ হইলে তাহাকে নীরোগ করিবার জন্য মাতা-পিতা চিকিৎসার ত্রুটি করেন। ঐ গৃহস্থের আর্থিক আয় যদি সামান্য হয়, তবে ঐরূপ মৃত্যুতে শোকের মধ্যেও যে একটু শান্তির ভাব থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। স্নেহ-মমতা স্বাভাবিক বৃত্তি। এই মধুর স্বাভাবিক বৃত্তিটী পর্য্যন্ত পণ-প্রথার অত্যাচারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এইরূপে আমাদের সমাজের নৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটিতেছে। স্নেহ-মমতা যদি গেল, তবে নীতি দাঁড়াইবে কোথায়? অতএব এই অনিষ্ট-জনক পণ-প্রথাকে সমূলে উন্মূলিত করিবার জন্য আমাদিগকে এক্ষণে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে; তাহা হইলে আমাদের সমাজ দারুণ দুর্দ্দশা ও নৈতিক অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইবে।

ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে পীড়ার নিদান জানিবার আবশ্যক। তাহা না হইলে সুচিকিৎসা হয় না।

আমাদের সমাজে এই বিষময় পণ-প্রথা প্রচলিত হইবার একাধিক কারণ বিদ্যমান আছে। এইটী আমাদের স্বকৃত ব্যাধি। অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারগুলি যেমন শাস্ত্র-সম্মত, এটী সেরূপ নহে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এইরূপ কেনা-বেচা ব্যাপারকে ভয়ানকরূপে নিন্দা করিয়াছেন। আমাদিগকে লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই কু-প্রথাটী

আমাদের মধ্যে আসিয়া জুটিয়াছে। ইউনিভার্সিটি শিক্ষার শুভাগমন ও শ্রীবৃদ্ধিই ইহার মূলীভূত হেতু! আর যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারাই এই কু-প্রথার জন্য বেশী দায়ী। শিক্ষিতেরাই দোষী, এ কথা ভাবিলে অবাক হইতে হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ব্যাপার সেইরূপই। বাস্তবিকই ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই এই পণ-প্রথার বিস্তার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা তো এই প্রকার বিষময় ফল ভোগ করিতেছেনই, অন্যান্য যে সকল অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতির মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তাহারাও অজ্ঞাতসারে ইহার আবর্ত্তে আসিয়া পড়িতেছে। ব্যবসায়াত্মিকা ইংরেজী শিক্ষার এই ফল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এই শিক্ষার মাত্র ব্যবসায়াত্মক ভাবটুকুই গ্রহণ করিতে পারিয়াছি। ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে যে উচ্চশ্রেণীর মহান্ লক্ষ্য বিদ্যমান আছে, আমাদের উপর সে সকলের কিছুমাত্র প্রভাব আইসে নাই।

ঐ কু-প্রথার অন্য একটি কারণ—পাত্র নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তিত ধারা। দুইপুরুষ আগে অভিভাবকেরাই পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন করিতেন। পাত্রীপক্ষ মাত্র দেখিতেন—পাত্র সদ্বংশজাত কি না, সামাজিক মান-সম্ভ্রম আছে কি না। ঐ দুইটী বিষয় ধরিয়াই প্রধানতঃ নির্ব্বাচন চলিত। এর পর, যদি পাত্র কিছু লেখা-পড়া-জানা হইত, আর যদি তাহার চরিত্রে বিশেষ কোনরূপ দোষ পরিলক্ষিত না হইত, তবে তাহাকেই উপযুক্ত বলিয়া পাত্রীপক্ষ স্থির করিতেন। পাত্র উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত কি না, সে বিষয় লইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিব্রত হইতেন না। এখন উচ্চশিক্ষা যেমন জীবিকানির্ব্বাহের পথ, তখন সেরূপটী ছিল না। তখন পেটের ভাতের জন্য উচ্চশিক্ষার উপর এতটা নির্ভর করিতে হইত না। জীবন-সংগ্রাম সেকালে এরূপ প্রচণ্ড-মূর্ত্তি ধরে নাই। প্রত্যেক পরিবারেরই কিছু না কিছু ভূ-সম্পত্তি থাকিত; তাহাতেই তাহাদের খাওয়া-পরা চলিত, তাহাতেই খরচের টাকা উঠিত—সুখে-স্বচ্ছন্দে বেশ সংসার চলিয়া যাইত। তখন আমাদের অভাবও এত ছিল না। আমাদের পিতামহ পিতামহীরা বলিষ্ঠ ছিলেন। গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মের জন্য অযথা খরচা দিয়া চাকর-চাকরাণী রাখিবার প্রয়োজন হইত না। শিক্ষার ব্যয়ও তখন খুব সামান্য ছিল। অধিকাংশ লোকই মোটামুটি খাইয়া, সাদাসিধে বেশভূষা করিয়া ও মোটা-সোটা টেক্‌সহি জিনিস-পত্র লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত। বেতনভোগী পাচকের হাতে আহার্য্য নষ্ট হইবার

দুর্দ্দশা তখন ভোগ করিতে হইত না; বাড়ীর দরজার কাছ থেকে ভিখারী-ভিখারিণীদিগকে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত সজ্জিত ভৃত্যের তখন আবশ্যক হইত না। এখন যেমন প্রায় সকলেরই অজীর্ণ ও মূর্চ্ছা ব্যায়রাম দেখা যায়, তখন এরূপ ছিল না। এ ব্যায়রামের কথা তখন প্রায়ই শুনা যাইত না। তখন সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েরাও, বৃদ্ধাই হউন আর যুবতীই হউন, ঘর-গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্ম নিজের হাতেই করিতেন; তাহাতে তাঁহাদের অপমান-বোধ ছিল না। সামান্য আয়ের মধ্যেই একটী গৃহস্থের বেশ চলিয়া যাইত; সকলেই তখন নিজের নিজের অবস্থায় বেশ সন্তুষ্ট থাকিতেন। অতৃপ্ত ধন-লিপ্সা ও বিলাস-আড়ম্বর-বাসনা তখন এতটা বিব্রত করিয়া তুলিত না। সমাজের তাদৃশ অবস্থায় সদ্বংশজাতা, কৌলিকধর্ম্ম-কর্ম্ম-নিরতা, সুশীলা পাত্রী পাইলেই পাত্রের অভিভাবকেরা পরম পরিতুষ্ট হইতেন।

আমাদের এ যুগে ঐ ভাবটী আর নাই। পাত্র-নির্ব্বাচনে এখন একটা পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে। পাত্রের বংশমর্য্যাদা কিরূপ, তাহার পরিবারে শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কর্ম্ম যথারীতি অনুষ্ঠিত হয় কি না, তাহার বংশ নিষ্কলঙ্ক কি না, এ সব ব্যাপার পাত্রীপক্ষ এখন সর্ব্বাগ্রে দেখেন না। যদি পাত্র কোন সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত থাকে, কিংবা পাত্র যদি ডাক্তার, উকীল বা এইরূপ একটা কিছু হয়, অথবা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ছাড়পত্র তাহার একখানা আধখানা থাকে, তবে তাহাকেই উপযুক্ত বলিয়া মনে করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের সংখ্যার উপরেই পাত্রের আদর-অনাদর নির্দ্ধারিত হয়। পাত্র যদি সদ্বংশজাত হয়, মোটামুটি চলাচলের সংস্থান থাকে, কিন্তু হয়তো ম্যাট্রিকিউলেশনও পাশ করে নাই, তবে তাহার মূল্য হয় না। সরকারী অফিসের একজন পঞ্চাশ টাকা বেতনের কেরাণীও সেরূপ পাত্রের সঙ্গে তাহার কন্যার বিবাহ দিতে নারাজ। তাঁহার চক্ষে সে পাত্র গুণহীন। তিনি চান, পাত্র বি-এ, এম-এ পাশ হইবে, অথবা অন্ততঃ পাত্র কলেজে পড়িতেছে এমনটী হওয়া চায়। যদি সে পাত্র পরের গলগ্রহ ও নিঃস্ব হয়, অপরের দান বা সাহায্য লইয়াও যদি সে কলেজে পড়ে, তবুও সেই পাত্রই কেরাণীবাবুর হিসাবে উপযুক্ত! আবার যদি উপাধিধারী পাত্রের পিতা উকীল বা মুন্সেফ বা ম্যাজিষ্ট্রেট হন, তবে বিবাহের বাজারে তাহার মূল্য অত্যধিক। সেরূপ পাত্র না কি নিতান্তই দুর্লভ। পাত্রীপক্ষেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও ঐরূপ পাত্র-রত্নকে লাভ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন।

ব্যাপার যখন এইরূপ, তখন পাত্রের দর বিবাহের বাজারে যে দিন দিন

বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! পূর্ব্বকথিতরূপ পাত্রের সংখ্যা খুবই কম। কম হইবার আরও কারণ এই যে, আমরা কৌলিক প্রথার নিগড়ে বাঁধা; আমরা নির্দ্দিষ্ট সমাজ, বংশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সামাজিক হিসাবে বাধ্য। গণ্ডি অতিক্রম করিয়া যাইবার সাধ্য আমাদের নাই। তাই বলিতেছিলাম, ঐরূপ একটা উপযুক্ত পাত্রকে হস্তগত করিবার মানসে হয়তো পঞ্চাশ বা তারও বেশী পাত্রীপক্ষ চার ফেলিতে থাকেন; ঘটকের প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দেন; দিন দিন পণের মাত্রা বর্দ্ধিত করিতে থাকেন। এই পাত্রের পিতা যদি সামান্য কিছু পণ ছাড়িয়া পুত্রের বিবাহ দেন, তবে পাত্রী-পক্ষ তাঁহাকে দয়ার অবতার অতি-মানুষ বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকেন।

পণ-প্রথার আরও একটী দোষ আছে। স্ত্রীজাতির যে একটা মূল্য আছে সেইটুকু না বুঝাতে এই প্রথা আরও স্পর্দ্ধা সহকারে বৃদ্ধি পাইতেছে। এ দেশে লোকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, স্ত্রী পুরুষাপেক্ষা হীনতর। এই ধারণার জন্যও বিবাহের সময় পাত্রীর অনাদর বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমাজে স্ত্রীর মূল্য কম নহে, ইহা যতদিন সাধারণে বুঝিতে না শিখিবে, ততদিন সমাজের কু-প্রথা বিদূরীত হইবে না। সাধারণেকে স্ত্রীর মূল্য বুঝাইবার আবশ্যক হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন আমাদের সমাজে কুমারী-পূজা প্রচলিত ছিল, তখন সাধারণে কুমারীকে আদ্যা-শক্তির প্রতিরূপ বিবেচনা করিত, এখনই বা তাহাদের মূল্য লোকে না বুঝিবে কেন? কুমারীপূজা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, স্ত্রীজাতি আমাদের সমাজে খুব উচ্চ-আদর্শ অধিকার করিয়াছিলেন। আমরা এখন উঁহাদের ঐ উচ্চ ধারণা হইতে স্খলিত হইয়াছি; তাই বিবাহের সময় পণের চাপ দিয়া বসি। মনে করি, উঁহারা নিকৃষ্ট, আর পণের টাকা দ্বারাই নিকৃষ্ট জীবকে গ্রহণ করিবার ক্ষতি-পূরণ কতকটা হইয়া উঠিল। পারিবারিক জীবনের পূর্ণতা সাধন করিবার পক্ষে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই উপযোগিতা আছে। অর্থার্জ্জন স্বামীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম, কিন্তু সংসারের সুখ-শান্তি বিধান করা, সংসারটীকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল, সুগঠিত করিয়া তোলা স্ত্রীরই কর্ত্তব্য। আর সে কর্ত্তব্যসাধনও অল্পায়াসসাধ্য নহে। স্ত্রীর গুণেই সংসারে শান্তি বিরাজ করিয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর মূল্য স্বামীর অপেক্ষা কম নহে। আমাদের সমাজের পুরুষেরা যেদিন এই তথ্যটুকু পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, সেইদিন হইতেই স্ত্রী-জাতির প্রতি সম্মান সমাদর ও সানুকূল ধারণার বৃদ্ধি হইবে। তখন আর বিবাহের সময় উহাদের অনাদর হইবে না। কন্যাকে সুশিক্ষা দিলেও তাহাদের মূল্য ও

আদর বর্দ্ধিত হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ করিতে হইলে বিবাহের বয়স পরি-বর্ত্তিত করিতে হইবে। এখন যে বয়সে বিবাহ হয়, তাহার মধ্যে সুশিক্ষা হইতে পারে না। শিক্ষার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইলে আরও বেশী বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক।

নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যেই আমরা মেয়ের বিবাহ দিতে কতকটা বাধ্য হই। একারণেও সমাজে গুরুতর অনিষ্ট ঘটিতেছে। অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায় মেয়েরা শিক্ষিতা হইতেছে না, সেই কারণ তাহারা হীন বিবেচিত হইতেছে, আর সেই জন্যই পণের দাবীও চাপিয়া পড়িতেছে। যৌবনোন্মেষের পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য; নচেৎ কন্যার পিতাকে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। যে হিন্দুপরিবার একটু গোঁড়াভাবাপন্ন, তাঁহারা বয়স্থা কন্যার বিবাহ লইয়া খুব মুস্কিলে পড়েন। শাস্ত্রে এমন সব ব্যবস্থা আছে, যাহার মূলে কোনরূপ যুক্তি, কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সত্য বা কোনরূপ স্বাস্থ্যবিধি নাই, অথবা আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই সকল শাস্ত্রাদেশ অবনতশিরে মানিয়া চলিতেছেন। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। কয়েকজন প্রাচীন কালের শাস্ত্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যৌবনোদ্ভিন্না কন্যার বিবাহ দিলে, সেই কন্যার পূর্ব্বপুরুষেরা অর্থাৎ পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি স্বর্যাত মহাত্মগণ সেই পাপে সূক্ষ্ম-জগতে দুঃসহ শাস্তি ভোগ করিয়া থাকেন। এরূপ বিধির উদ্দেশ্য কি? আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, চিরপ্রচলিত বাল্যবিবাহে যাহাতে সমাজের লোক আস্থাবান থাকে, সেই উদ্দেশ্যেই ঐ বিধির সৃষ্টি। পাছে উত্তরকালে লোকে বাল্যবিবাহ পরিত্যাগ করে, তাই ঐরূপ ভয়প্রদর্শন! বাল্যবিবাহ কোন্ সময় হইতে সমাজে প্রচলিত হইল, আর কেনই বা হইল, তাহা আমরা জানি না, তবে আমার মনে হয়, যে সময়ের ঐ বিধি, সেই সময়ের সামাজিক অবস্থায় বোধ হয় উহার উপযোগিতা ছিল। কিন্তু সমাজ একটী সজীব প্রতিষ্ঠান। অতএব উহারও একটা ক্রম-বিকাশ আছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার বিধি-ব্যবস্থা অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইবে। সমাজের যখন যেমন অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবার জন্য, বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনও আব-শ্যক হইয়া উঠিবে। যদি সেরূপ পরিবর্ত্তন না হয়, তবে ঘোর বিশৃঙ্খলা আসিয়া দেখা দিবে, উন্নতি অভ্যুদয় বলিতে কিছুই থাকিবে না, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সমাজের জীবনী-শক্তি তিরোহিত হইবে, পরিশেষে সমাজ একটা মৃত-জড়পিণ্ডে পরিণত হইয়া দাঁড়াইবে। এটী প্রাকৃতিক নিয়ম।

সর্ব্বত্রই এই নিয়মের প্রাধান্য থাকিয়া যাইবে। বাল্যবিবাহ দিতেই হইবে বলিয়া পূর্ব্বে যে শাস্ত্রীয় বিধির কথা বলা হইয়াছে, আমরা যে গভীর শ্রদ্ধার সহিত ঐ বিধি পালন করিয়া চলিতেছি, তাহা নহে; শাস্ত্রের ভয়েই যে আমরা আড়ষ্ট তাহাও নহে, আমরা সামাজিক শাসনের ভয়েই প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করি না। সত্যের আদর করিতে, বিবেকের উপদেশ-বাণী পালন করিয়া চলিতে, যে নৈতিক সাহসের প্রয়োজন, আমাদিগের তাহা নাই। আমাদিগের নৈতিক সাহসের ঘোর অভাব। ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার খাতিরে আমাদিগকে কখনই বিবেক বিসর্জ্জন দিতে হইবে না। শিক্ষিত-সমাজ জানিয়া শুনিয়া অকারণে ঐরূপ গড়লিকা প্রবাহের মত কু-সংস্কারের অনুশরণ করিতেছেন, এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দোষ। যাহাতে শিক্ষিতেরা এই দোষ ক্ষালন করিয়া, বিদ্যা-বুদ্ধি-শিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, একটা নূতন পথে চলিতে পারেন, এক্ষণে সেইটীই তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অল্প দিন হইল, কলিকাতায় একটী পণ্ডিতের সভা বসিয়াছিল। সেই সভায় বঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী মত প্রকাশ করেন যে, অধিক বয়সে কন্যার বিবাহ দিলে, শাস্ত্রানুসারে কোন দোষই হয় না, আর সে জন্য কোন পূর্ব্বপুরুষকে প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন জন্য পরলোকে কোনপ্রকার যাতনা ভোগ করিতে হয় না। এই মতের সমর্থন-কল্পে পণ্ডিতমণ্ডলী কুলীন-কন্যাদিগের অধিক বয়সে বিবাহিতা হইবার কথার উল্লেখ করেন। তাঁহারা বলেন, কুলীনদিগের বেলায় যদি বয়স্থা মেয়ের বিবাহ দেওয়া দোষের না হয়, তবে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষেই বা দোষ হইবে কেন? আমার দৃঢ় ধারণা যে, পণ্ডিতমণ্ডলীর এই মীমাংসায় আমাদের সমাজের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইবে।

একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, এইরূপ বাঁধা-বাঁধি থাকায় কন্যার পিতাকে পাত্র-পক্ষের যথেচ্ছ দাবীর মক্কেল হইয়া পড়িতে হয়। বয়সের ঐরূপ একটা বাঁধা-বাঁধি না থাকিলে, ঐ কু-প্রথার বিলোপ ঘটিলে, পাত্রীর পিতা সামর্থ্য বুঝিয়া বিবাহ দিবার সময় পাইবেন। সেরূপ ক্ষেত্রে অযথা দাবী তাঁহাকে বিপন্ন করিতে পারে না। বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিলেই পণ-প্রথার এই সব অনর্থ-উৎপাত বিদূরীত হইয়া যাইবে। সে দিন গোঁড়া সামাজিকদিগের একটা সভা কলিকাতায় বসিয়াছিল। সেই সভায় বাল্য-বিবাহের আলোচনা চলিয়াছিল। সভায় স্থির হইল যে, অধিক বয়সে পাত্রের বিবাহ দেওয়ার হেতুতেই অত্যধিক পণের দাবী সমাজে আসিয়া

জুটিয়াছে। সভ্যেরা স্থির করেন যে, কম বয়সে ছেলের বিবাহ দিলেই, যথেচ্ছ পণ-প্রথা তিরোহিত হইবে। যদি ঐরূপ সিদ্ধান্তানুসারে কার্য্য করা হয়, তবে তাহার ফল আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। গোঁড়া সামাজিকদিগের উদ্দেশ্য ভাল হইলেও, তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত। আমরা ঐ মত গ্রহণ করিতে রাজি নহি। অধিক বয়সে পুরুষের বিবাহ হওয়ায়, তাহাদের শিক্ষা ও আর্থিক বিষয়ে বিস্তর সুবিধা হইতেছে। বঙ্গদেশের প্রায় সকলেই সেই সুবিধার কথা পরিজ্ঞাত আছেন। ছেলেদের বিবাহ কম বয়সে দেওয়া ভাল বলিয়া, ঐ সভায় যে মত গৃহীত হইল, সে সম্বন্ধে ১৮ই ফেব্রুয়ারীর ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্-পত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্য বাহির হইয়াছিল।—

"মিঃ সারদাচরণ মিত্রের সভাপতিত্বে যে সভা আহূত হয়, তাহাতে স্যর্ গুরুদাস ব্যানার্জী-প্রমুখ অনেক গোঁড়া হিন্দু বক্তৃতা করেন। অবধারিত হয় যে, ছেলেদের অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়াই যথেচ্ছ পণ-দাবির মূল কারণ। তাই, তাঁহারা স্থির করেন যে, ছেলের বিবাহ কম বয়সে দিতে হইবে, তাহা হইলে এই ভয়ানক পণের চাপ আর থাকিবে না। কম বয়সে ছেলেদের বিবাহ হইলেই যে ঐরূপ সুফল ফলিবে, তাহা মানিয়া লইবার কোন কারণই দেখা যায় না। পুত্রের যদি উপকার করিতে হয়, তবে পঠদ্দশায় সে যাহাতে বিবাহিত জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণায় না পড়ে, যাহাতে তাহার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়া না পড়ে, তাহাই দেখিতে হইবে। অধিক বয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়ায় এতই সুবিধা দেখা যায় যে, আমাদের মনে হয়, আরও বেশী বয়সে পুরুষের বিবাহ দিলে, আরও বেশী উপকার হইতে পারে। মনে হয়, সময়ে ছেলেরা আরও বেশী বয়সে বিবাহ করিবে। গোঁড়ারা যতই ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করুন, কোন আপত্তিই টিকিবে না।"

বলা বাহুল্য, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্-পত্রের ঐ মত এখন বাঙ্গালা দেশের সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন।

"আর যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, ছেলেরা অধিক বয়সে আর মেয়েরা অল্প বয়সে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় বলিয়াই উপযুক্ত পরিমাণ পাত্র পাওয়া যায় না, আর সেই নিমিত্তই পাত্রের পিতা যা খুসী পণ-স্বরূপ তাই দাবী করিয়া বসেন, তাহা হইলেও আশা করা যায়, স্নেহলতার শোচনীয় আত্মোৎসর্গ দেখিয়া, ছেলের পিতারা তাঁহাদের পণের দাবির হ্রাস করিবেন না; বরং মেয়ের পিতারাই আর কম বয়সে মেয়ের বিবাহ দিতে রাজি

হইবেন না। ছেলের বিবাহ যেমন অধিক বয়সে হইতে আরম্ভ করিয়াছে, মেয়ের বিবাহও যদি সেইরূপ অধিক বয়সে হইতে থাকে, তবে পাত্র-পাত্রীর সংখ্যাগত একটা সাম্যাবস্থা আসিতে পারে। তাহা হইলে বঙ্গবাসীর তাহাতে উপকারই হইবে; কেন না, তাহাতে বাঙ্গালী জাতির দৈহিক উন্নতি ব্যাহত হইবে না। একটু একটু মেয়ে বাল্য-বিবাহের কল্যাণে কতকগুলি ছেলে-মেয়ের মা হইয়া পড়ায়, তাহাদের শরীরে কিছুমাত্র বল থাকে না, শরীর পরিপুষ্টও হয় না। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে, এই জাতীয় দুর্ব্বলতা দূর হইবে।" উহাই ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের ধারণা। আমাদেরও কথাগুলির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আমাদের মনে হয়, ঐ কথাগুলির সারবত্তা সকলেই স্বীকার করিবেন। অধিক বয়সে মেয়ের বিবাহ দিবার ফল দেশের লোক হাতে কলমে বুঝিয়া দেখেন, ইহাও আমাদের ইচ্ছা ও আশা। ঐরূপ কার্য্য করিলে, শোষক পণ-প্রথার দাবী হইতে দেশ রক্ষা পাইবে, আবার বাঙ্গালী জাতি সজীব ও সবল হইয়া উঠিবে। এই মহান্ লাভে লাভবান্ হইতে হইলে, আমাদিগকে ছেলে মেয়ে উভয়েরই বাল্য-বিবাহ দেশ হইতে দূর করিতে হইবে।

অন্ততঃ ষোল বৎসর পূর্ণ না হইলে, কোন নারীরই সন্তান হওয়া উচিত নহে। এ বিষয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সকল দেশের, প্রাচীন অর্ব্বাচীন সকল ডাক্তার বৈদ্যেরই এক মত।

সুশ্রুত-প্রামাণিক বৈদ্য। তিনি বলেন, পিতার বয়স ২৫ হইবে, মাতার বয়স ১৬ হইবে, তবেই তাঁহাদের সন্তান বাঁচিতে ও বলিষ্ঠ হইতে পারে। তার কম বয়সে সন্তান হইলে, সে সন্তান গর্ভেই মারা পড়িবে, যদি প্রসূতও হয়, তবে অল্প বয়সেই মরিবে, যদি না-ও মরে, তবে চিররুগ্ন হইয়া থাকিবে। বৈদ্যপ্রবর সুশ্রুতের কথাগুলি এই,—

"ঊনষোড়শবর্ষায়াম্ অপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতি।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতোবান চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"

বিবাহের অল্পদিন পরেই বালিকারা মা হইয়া দাঁড়াইবার পথে আইসে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। অতএব, মা হইবার উপযুক্ত বয়সেই

মেয়েদিগের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। ষোল বৎসরের পূর্ব্বে কোন মেয়েরই বিবাহ দেওয়া ঠিক নহে। হিন্দু-সমাজ যেরূপ রক্ষণশীল প্রকৃতিবিশিষ্ট, তাহাতে উহার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা সংস্কার ঘটাইতে হইলে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। জোর-জবরদস্তীতে কাজ হইবে না। ধীরে ধীরে মতে মত দিয়া, আস্তে আস্তে সংস্কার চালাইতে হইবে। তাই, আমরা যদি এখন বিবাহের বয়স মেয়েদের পক্ষে ১৪ স্থির করিয়া লই, তবে আশা করা যায়, অচিরেই ইহাকে ১৬ করা যাইতে পারিবে; অথবা হয় তো ব্রহ্ম-সমাজের মত আরও বেশীতে পরিণত করা চলিবে।

কেহ কেহ ভাবেন যে, বেশী বয়সে বিবাহ দিলে, মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র কলুষিত হইয়া উঠিবে। আমরা যদি সামাজিক জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারি, আমরা যদি মেয়েগুলিকে অযথা-ভাবে পুরুষের সঙ্গে মিশিতে না দিই, আমরা যদি মেয়েগুলিকে লেখা-পড়ায় বা প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যাপৃতা রাখি, আর আমরা যদি সংসারে নৈতিক চরিত্রের প্রভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পারি, তবে ঐরূপ আশঙ্কার কোন কারণই থাকিতে পারে না। বাল্য-বিবাহের উচ্ছেদে শুভ ফলই ফলিবে। উহাতে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই।

পণ-প্রথা উঠাইয়া দিবার পথে আর একটী অন্তরায় আছে। পূর্ব্বে উচ্চবংশের মেয়ের খুব আদর ছিল। ঐরূপ মেয়ে আনিতে সকলেই ইচ্ছা করিতেন। কায়স্থের মধ্যে কুলীনের মেয়েকে পুত্রবধূরূপে আনিতে পারিলে অনেকে গৌরব অনুভব করিতেন। এমন কি, কুলীনের কালো মেয়েও শ্বশুর-ঘরে যথেষ্ট সম্মান ও আদর পাইত। এখন বিবাহ-ব্যাপারটী ব্যবসায়াত্মক হইয়া উঠায় ঐ ভাবটী আর নাই। এখন আর লোকে বংশ-মর্য্যাদা দেখিতে চায় না, এখন লাভ-লোকসান হিসাব করিয়া চলে। ঘরের বধূ কোন্ কুল হইতে লওয়া হইল, তাহা কেহ আজ-কাল দেখিতে চাহে না। বধূর সঙ্গে যদি ঝাঁপিপূর্ণ জহরত, আর ব্যাগপূর্ণ মুদ্রা আসে, তবে আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন এখন হয় না। আর যাঁহারা পণের বড় প্রত্যাশী নহেন, তাঁহারা অপ্সরার মত সুন্দরী বধূ চাহেন। ইহার ফলে কালো মেয়ের পিতাকে ঐ কালো রঙের জন্য বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হয়। সুন্দর রঙের জন্য বেগের মাত্রা একটু কম দেখা যায়। বেশী টাকা খরচ না করিলে, কেহই কালো মেয়ে বিবাহ করিতে চাহে না। পাত্রী নির্ব্বাচন করিবার যে রীতি আমাদের

সমাজে অধুনা প্রচলিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে, এই অসুবিধার কিয়ৎ পরিমাণে প্রতীকার হইতে পারে। এক্ষণে পাত্রীনির্ব্বাচনে যুবকদিগের কোন কথাই থাকে না; তাহাদের মতামতও লওয়া হয় না। তাহাদের বিবাহে যদি তাহাদের মত লইবার ব্যবস্থা করা যায়, তবে পণ-সমস্যার মীমাংসা অনেকটা সহজ হইয়া উঠে—বলিয়া আমার মনে হয়। কিন্তু এখনও অনেক দিন যাবৎ তাহাদের বিবাহের পাত্রী-নির্ব্বাচনের ভার তাহাদের পিতামাতার হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে; আর এরূপ থাকাও অনেক কারণে বাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ মাতাপিতা আজ-কাল শিক্ষিত; তাঁহারা বয়সেও প্রবীণ, সুতরাং ভাল-মন্দ জ্ঞানও তাঁহাদেরই বেশী। তাই, নির্ব্বাচনের ভার তাঁহাদের উপরে থাকিলে সহজেই আশা করা যাইতে পারে যে, ঐ নির্ব্বাচনের মূলে সামাজিক, নৈতিক ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বিবেচনা বিদ্যমান থাকিবে। অতগুলি দেখিয়া যদি এ পর্য্যন্ত পাত্রী-নির্ব্বাচন আমরা না করিয়া থাকি, ঐ বিষয়ে যদি আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াই থাকে, তবে আর যাহাতে ঐ ত্রুটি না হয়, এখনতাহাই করিতে হইবে। আমাদিগকে এখন যাবতীয় স্বার্থের জল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, সেই সুদূর প্রাচীন কালের সভ্যতা ও রীতি, আর বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ও অনুশীলনের ভাব স্মরণ করিয়া, পিতা-মাতার কর্ত্তব্য-পালন করিয়া যাইতে হইবে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি যে, এখনকার অভিভাবকেরা এই প্রথায় পাত্রী-নির্ব্বাচিত করিবেন। এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, যদি বালিকাগণকে ভালরূপ শিক্ষা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহারা উত্তর কালে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ জননী, আদর্শ গৃহিণী ও সমাজের আদর্শ ব্যষ্টি হইতে পারে না। তাই সমাজের সকল দিকেই স্ত্রী-শিক্ষার দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে—স্ত্রী-শিক্ষার একটা মহা জাগরণ পরিলক্ষিত হইতেছে। পুত্র-বধূ নির্ব্বাচন করিতে হইলে, এখন আর কটা রঙ দেখিলে চলিবে না, আর্থিক লাভালাভের হিসাবেও কাজ হইবে না, এখন দেখিতে হইবে, পাত্রী কিরূপ বংশের মেয়ে, সে বংশে কোন অপবাদ কলঙ্ক আছে কি না, বংশের লোকগুলি নৈতিক চরিত্রে চরিত্রবান্ কি না; এখন দেখিতে হইবে, পাত্রী শিক্ষিতা কি না, সামাজিক-গুণে গুণবতী কি না, স্বাস্থ্যবতী কি না, শিল্প-কলা-নিপুণা কি না? এইরূপ গুণবতী পাত্রী যে সংসারেই আসিবে, সেখানকারই শ্রীবৃদ্ধি হইবে। এইরূপ পাত্রী মিলিলে আর কোনপ্রকার বিবেচনার আবশ্যক করে না। এইরূপ প্রথায় পাত্রী-নির্ব্বাচন

করিলে, দেশের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা আরও দ্রুতভাবে প্রচারিত হইবে। তখন মেয়ের পিতারা মেয়েগুলিকে সুশিক্ষা দ্বারা গুণবতী করিয়া তুলিবেন। কারণ ঐ শিক্ষাই বিবাহের বাজারে পণের কাজ করিবে। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, প্রথমেই মেয়েদের বিবাহের বয়স বর্দ্ধিত করিতে হইবে, নচেৎ তাহাদের শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার সময় পাইবে না। স্ত্রী-শিক্ষা বলিতে, আমি এখনকার স্কুল-কলেজের শিক্ষাকে হুবহু বুঝি না। আমার একান্ত ইচ্ছা, বালিকাগণের শিক্ষা, যেন বালকগণের শিক্ষা হইতে পৃথক্ হয়। স্ত্রী-শিক্ষা এমনটী হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের নারীত্বের বিকাশ হইতে পারে, যাহাতে তাহারা নিপুণতার সহিত দায়িত্ব-পূর্ণ মাতৃকর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থা হয়, আর যাহাতে তাহারা পাকা গৃহিণী হইয়া সংসার চালাইতে পারে। সংসারই তাহাদের প্রধান কর্ম্মস্থল। সেখানে তাহাদের সর্ব্ববিষয়িণী উপযোগিতা বাঞ্ছনীয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা অধিকাংশ বালিকার পক্ষে অনুপযোগিনী। সময়াভাবে বালিকারা সেই সব শিক্ষার পূর্ণফল প্রাপ্ত হয় না; শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তা ছাড়া, পারিবারিক জীবনে ঐ শিক্ষা ফলোপধারিণী হয় না। উহার অনুশীলন করিতে গিয়া স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ চাপ পড়ে; অনেক সময় তাহাদের স্বাস্থ্যও বিনষ্ট হয়। "প্রবাসীর" ফাল্গুনের সংখ্যায় ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সেক্রেটারী মিঃ কে, বি, দাশ স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে একটী চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই সুলেখক যথার্থই বলিয়াছেন যে, আমাদের মেয়েরা স্কুল-কলেজে এখন যে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, তাহা গল্পের মজলিসের যোগ্য ও তাহাতে নারীত্বের কিছুমাত্র বিকাশ হয় না। উক্ত ভারত মহামণ্ডল স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিতেছেন। একটী বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ সভায় কলিকাতার লর্ড বিশপ্ না কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় বালিকাদিগকে খাঁটি পাশ্চাত্য-প্রথায় শিক্ষা দিলে সে শিক্ষা-প্রণালী নিষ্ফল হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারত-মহিলাকে আদর্শ চরিত্রের বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য ভারতের বাহিরে আমাদিগকে যাইতে হইবে না। ভারতেই এমন সকল রমণীর উদাহরণ আছে, যাঁহারা সদ্‌গুণে, পবিত্রতায়, চরিত্রের দৃঢ়তায় ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় অতুলনীয়া। তাঁহাদিগকে আদর্শের মত অনুসরণ করিয়া গেলেই ভারতের স্ত্রী-শিক্ষা সুফল-প্রসবিনী হইবে।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিশ্চন্দ্র।

(লেখক—শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রফেসার, স্কটীশচার্চ্চেস্ কলেজ।)

জীবিতের জীবন-চরিত লেখা নিয়ম-বিরুদ্ধ হইলেও, আজ আমরা জীবিত জ্যোতিশ্চন্দ্রের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। জ্যোতিশ্চন্দ্র কে? ইনি সশরীরে বর্ত্তমান একজন মহাপুরুষ—কাঠালপাড়া-নিবাসী স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র; 'বন্দেমাতরম্' এই ঋকের ঋষি—বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, হুগলি কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু গণিত শাস্ত্রের কঠোরতা তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে দিল না। তাঁহার অমোঘ শক্তি সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইলেও গণিতের ব্যূহ ভেদ করিতে প্রতিহত হইয়া পড়িল। তিনি বিদ্যালয় হইতে সরিয়া পড়িলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তাঁহার ইতি পড়িল।

জ্যোতিশ্চন্দ্রের পিতা-পিতৃব্য-পিতামহ সকলেই রাজ-সরকারে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কোন এক জেলার কোন এক গ্রামে একটী প্রসিদ্ধ বংশের সকলেই পুলিশের দারোগা ছিল। সেই বংশের একটী বালক লেখাপড়ায় অমনোযোগী হইলে, তাহার পিতা তাহাকে তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু জননীদেবী স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমার ছেলেকে তুমি কিছু বলিও না; লেখাপড়া না শিখে, দারোগাগিরি ক'রে খাবে।" জ্যোতিশ্চন্দ্রের বেলা এ নিয়মের ব্যভিচার হইল না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও, অবিলম্বে পুলিশ-বিভাগে ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হইলেন; এবং স্বকীয় প্রতিভাবলে District Superintendent of Policeএর কার্য্য করিতে করিতে দুর্ভাগ্যবশতঃ রোগগ্রস্ত হইয়া বিদায়বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তদবধি তাঁহার কর্ম্মজীবন শেষ হইল। আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, জ্যোতিশ্চন্দ্র পুলিশ-বিভাগে কর্ম্ম করিয়াও স্বীয় হস্ত নির্ম্মল রাখিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কের অঙ্ক পর্য্যন্তও স্পর্শ হয় নাই। জ্যোতিশ্চন্দ্র পুলিশ-বিভাগে "হরিণ-পরিহীন হিমকরবৎ" নিষ্কলঙ্কভাবে জীবন কাটাইয়া আসিয়াছেন। এখন জ্যোতিশ্চন্দ্র আমাদের একজন।

একাধারে বহুগুণের সন্নিবেশ অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। "একাবিদ্যা সুশিক্ষিতা" ইহাই আমাদের ধারণা ছিল। কিন্তু "ন্যায়ের সিদ্ধান্তভ্রান্ত উষ্ট্রের নিকটে" তদ্বৎ জ্যোতিশ্চন্দ্র আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা আত্মমুখে আত্ম-প্রশংসার তূর্য্যনিনাদ করেন, তাঁহারাই দশের নিকট গণ্যমান্য বলিয়া পরিগণিত হয়। কত বনফুল বনে ফুটিয়া শূন্যে সুবাস বিকীর্ণ করিয়া আপনিই শুকাইয়া যায়! কত মহামূল্য রত্ন সমুদ্রের অতলগর্ভে চিরদিনের জন্যে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, কে তাহার উদ্ধার করিতে যায়? এ সংসারে কত Village Hampden, কত Mute Milton কোন আঁধার কুটীরে পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া থাকে? কত অনুপম গুণরাশি বালবিধবার যৌবনের ন্যায় চিরদিন অনাদৃত হইয়া থাকে, এ ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। আমাদের জ্যোতিশ্চন্দ্রের গুণগ্রাম একমুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি না, তাই আজ সাধারণের জ্ঞান-গোচর করিবার জন্য তাঁহার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। "গুণৈর্হি সর্ব্বত্রপদং নিধীয়তে"—এ ক্ষেত্রে কেন তাহার ব্যভিচার হইবে?

যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-মন্দিরে আমার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়

হইল, তখন তাঁহার হ্যাট-কোটধারী মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল, বাঙ্গলা ভাষার পরীক্ষকরূপে এ কোন্ জীব আবির্ভূত হইল? শুনিলাম, ইঁনি পুলিশের কর্ম্মচারী ছিলেন, তখন বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলাম, কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়াও তাঁহাতে পুলিশ-পারুষ্যের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম, কেবল অবিমিশ্র করুণা ও পূর্ণ সরলতা। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইলে বুঝিলাম, জ্যোতিশ্চন্দ্র একটী আদর্শ পুরুষ—সৌজন্যের জলনিধি—অনন্তজ্ঞানের আধার।

জ্যোতিশ্চন্দ্র বৈষ্ণব। বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁহার পূর্ণ অধিকার। তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের যে কেহ সুললিত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছে, সেই বুঝিবে—জ্যোতিশ্চন্দ্র একজন সাত্ত্বিক বৈষ্ণব। 'রাসলীলা' ব্যাখ্যার সময়ে জ্যোতিশ্চন্দ্রের মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হয়। কৌষেয় বসনে ও চন্দন-চর্চ্চায় তাঁহার হৃদয়ের যে সৌন্দর্য্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা কেবল অনুমেয়, বর্ণনীয় নহে। তদীয় শ্রীমুখ-নির্গলিত চৈতন্য-চরিতামৃতের এরূপ হৃদয়গ্রাহী ও শ্রুতিমধুর ব্যাখ্যা আমরা আর কখনও শুনি নাই। এরূপ গভীর গবেষণার—এরূপ তত্ত্ব-রহস্যের পূর্ণবিকশন এ পর্য্যন্ত চক্ষে পড়ে নাই। মনে মনে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, কতবার আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছি।

জ্যোতিশ্চন্দ্র শাক্ত ও তান্ত্রিক। এ পর্য্যন্ত যে সব তন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, এবং যাহা এখনও পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত রহিয়াছে, জ্যোতিশ্চন্দ্র সে সমস্ত তন্ত্রেই পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ আনন্দ স্বামী তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। জ্যোতিশ্চন্দ্র যখন শক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ সর্ব্বেন্দ্রিয় কর্ণগত করিয়া, সেই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে থাকেন। শক্তি ও বৈষ্ণব-তত্ত্বের মধ্যে অহি-নকুলের ন্যায় চিরবিরোধ বর্ত্তমান, ইহাই আমরা জানিতাম। কিন্তু জ্যোতিশ্চন্দ্র এই বিরোধ-ভঞ্জন করিয়া উভয়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যে কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সে কথা আমরা লক্ষ কথায়ও ব্যক্ত করিতে পারি না।

জ্যোতিশ্চন্দ্র স্মার্ত্ত। জ্যোতিশ্চন্দ্র নব্য ও প্রাচীন স্মৃতিতে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত দশকর্ম্মের ব্যাখ্যায় যেরূপ পটুতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যথার্থই প্রশংসার যোগ্য।

জ্যোতিশ্চন্দ্র দার্শনিক। বেদান্ত শাস্ত্রে জ্যোতিশ্চন্দ্র ব্যুৎপন্ন-কেশরী। সাঙ্খ্য দর্শনেও তাঁহার বিশেষ অধিকার। তিনি একদিন সাঙ্খ্যমতে জগদ্ধাত্রী

প্রতিমার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, গলিতনখদন্ত আমি, ইহার পূর্ব্বে সেরূপ ব্যাখ্যা কখনও শুনি নাই। সর্ব্বদর্শনের সারদর্শন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, যাহার দোগ্ধা গোপাল-নন্দন—যাহার ভোক্তা সুধী—জ্যোতিশ্চন্দ্র সেই অপূর্ব্ব দুগ্ধ সুধী-অসুধী নির্ব্বিশেষে সকলকেই পান করাইয়াছেন। তাঁহার মুখে গীতার ব্যাখ্যা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। শাঙ্কর-ভাষ্য—শ্রীধরস্বামীর ভাষ্য, উভয় ভাষ্যই অত্যন্ত মনযোগের সহিত বহুবার পাঠ করিয়াছি, গুরুপাদমূলে উপবিষ্ট হইয়া, কত বহুমূল্য উপদেশ লাভ করিয়াছি, কিন্তু জ্যোতিশ্চন্দ্রের উপদেশ, সকল উপদেশকেই অতিক্রম করিয়াছে। ঈদৃশী ভক্তি ও জ্ঞানমূলক ব্যাখ্যা আমি অতি অল্পই শুনিয়াছি।

জ্যোতিশ্চন্দ্র জ্যোতিষী। জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্যোতিশ্চন্দ্রের নৈপুণ্য কম নহে। আমি দুই একবার ভিন্ন তাঁহার জ্যোতির্ব্বিদ্যার পরিচয় বিশেষরূপে প্রাপ্ত হই নাই। তথাপি সেই অল্প পরিচয়েই বুঝিয়াছি, তিনি অনেক "মহা জ্যোতিষিকের" অপেক্ষা যথার্থই এই দুরূহ শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

জ্যোতিশ্চন্দ্র আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক। যাহা ধ্রুব সত্য—যাহা এখন গল্পে পরিণত হইয়াছে, নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রোগের আমুল বিবরণ বলিতে জ্যোতিশ্চন্দ্র ভিন্ন আর কেহ পারেন কি না, এ বিষয় আমি জানি না। আমি বহুবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, জ্যোতিশ্চন্দ্র নাড়ী ধরিয়া, রোগীর মুখে কোন কথাই না শুনিয়া, রোগনির্ণয় করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহাত্মা ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ তাঁহার আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষক।তঁ াহার সুচিকিৎসার গুণে, আমি দেখিয়াছি, ৪।৫টী রোগী উৎকট রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

উপসংহারে "মধুরেণ সমাপয়েৎ।" জ্যোতিশ্চন্দ্র একজন সুকণ্ঠ-সুগায়ক। "বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন গায়ক কে?" তদুত্তরে নায়ক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় পত্রে জ্যোতিশ্চন্দ্রের নামই উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি একবার তদীয় সুধাকণ্ঠ-নির্গলিত সুধাময় হরিনাম শ্রাবণ করিয়াছেন, যিনি একবার তাঁহার ভাববিগলিত প্রেমাশ্রু দর্শন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন, এরূপ ভাবুক—এরূপ ভক্ত—এরূপ গায়ক—এ বঙ্গে নিতান্তই দুর্লভ।

এই জ্যোতিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে শুধু আমি নহি, অন্য লোকেও যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত—

"Selections from Bengali literature" গ্রন্থে জ্যোতিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক সুখ্যাতি আছে।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পাদিত "প্রেমপুষ্প" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, "শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জ্ঞানী ও ভক্ত অপিতু সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদ। তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাসময় কীর্ত্তন সকলেরই মনোমদ ও প্রীতিপ্রদ। ইত্যাদি।

'নায়ক-পত্র' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় "নায়কে" লিখিয়াছেন ঃ—

"শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বড় বাপের বেটা। * * জ্যোতিশ্চন্দ্র কেবল বড় বাপের বেটা নহে—নিজেও গুণী। তাঁহার মত নাড়ীজ্ঞান খুব কম লোকের আছে। এক এক সময়ে নাড়ী দেখিয়া দেহাগত রোগের যে পরিচয় দেন, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। * * * জ্যোতিশ ফলিত জ্যোতিষেও সুপটু। কোষ্ঠী গণনায় জ্যোতিশ একরূপ অপরাজেয়। * * এটর্ণি চারুচন্দ্র মিত্র ভায়াকে, জ্যোতিশ যমের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া আসিয়াছেন।"

এটর্ণি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' লিখিয়াছিলেন ঃ—

"Babu Jatish Chandra possesses wonderful power of diagnosising diseases by feeling the pulse only of patients. * * *

'অমৃতবাজার' স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ—

"He is a well-read man specially in spiritual literature and a famous singer of the Vaishnava Padavalis." * * *

ভাবুক ভক্ত পরমপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রসময় মিত্র এম্, এ, মহাশয় তৎপ্রণীত "কৃপাবৃষ্টি" পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ—

"আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই আমার নিকট আসিতেন। সঙ্কীর্ত্তনের গানে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ। হারমোনিয়মের সুর সহযোগে একান্তমনে অশ্রুপূর্ণনয়নে সুমধুর স্বরে যখন ইনি সংকীর্ত্তন গান করেন, তখন অতি কঠিনহৃদয় ব্যক্তিরও হৃদয় গলিয়া যায়।"

জ্যোতিশ্চন্দ্র-সম্বন্ধে, সংবাদ-পত্র ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের সমস্ত মত উদ্ধৃত

করিয়া, দেখাইতে গেলে, একখানি ছোট-খাট মহাভারত হইয়া পড়ে। এ জন্য আমরা প্রবন্ধ-বিস্তার ভয়ে এইখানেই সমাপ্ত করিলাম।

'জন্মভূমির' পাঠকবর্গ ইহা হইতেই তদীয় জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম এবং নাড়ী-জ্ঞানের প্রভূত ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন। একাধারে বহু গুণের সন্নিবেশ সর্ব্বত্র সুলভ নহে, এই জন্যই আমরা সনাতন রীতি লঙ্ঘন করিয়া, তাঁহার জীবিত কালেই তাঁহার জীবন-চরিতের কিয়দংশ পাঠকবর্গের শ্রুতিগোচর করিলাম।

প্রার্থনা।

(লেখক—শ্রীযুক্ত রসময় লাহা)

আবার এসেছি ফিরে তোমার চরণে—
মা আমার ;—এতদিন ছাই ভস্ম মেলা
লয়ে করিয়াছি শুধু মিছে হাসি খেলা,—
তোমারে ছাড়িয়া এই সংসার-প্রাঙ্গণে।
তুলে লও মা তোমার অধম নন্দনে
শেষ হয়ে আসে যে মা জীবনের বেলা ;
মা কি কভু সন্তানেরে করে অবহেলা ?
বিধুর মায়ের প্রাণ শিশুর ক্রন্দনে !

আমোদে হইয়া মত্ত তোমার আদর
উপেক্ষা করেছি কত ব্যথা দিয়ে মনে ;
ধূলিধূসরিত তনু আসন্ন কাতর
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে লও মা যতনে।
বুঝেছি মায়ের প্রাণ কতই গভীর,
ছেলে, চিরদিন ছেলে—হলেও স্থবির।

কমলা।

(লেখিকা—শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হুগলী জেলার একটী প্রসিদ্ধ পল্লীতে অবিনাশ বাবুর বাড়ী। তিনি একজন ধনবান ব্যক্তি। দুঃখের বিষয়, তাঁহার পুত্র-সন্তান হয় নাই। আমরা দুঃখের বিষয় বলিলেও তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ের কেহই সেরূপ মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, কমলার মত রূপে-গুণে অতুলনীয়া কন্যা পাইয়াছি।"

রাত্রি সাড়ে দশটা। কর্ত্তা অবিনাশ বাবু অন্তঃপুরে ভোজনে বসিয়াছেন। গৃহিণী প্রফুল্লমুখী ব্যজনহস্তে স্বামীর কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছেন। এমন সময় কমলা আসিয়া বলিল,—"বাবা! আজ একটা গল্প কর্‌তে হবে।"

কর্ত্তা। মা, আজ শরীরটা ভাল নাই; আজ আর গল্প করবো না। রাত প্রায় ১১টা হ'ল, তুমি এখন ঘুমাও গিয়ে।

গৃহিণী। দেখ, কমলা আমার কত কোমল! তোমার অসুখ হয়েছে শুনে, আর একটী কথাও কৈলে না। তোমার মধ্যে ওর জীবন।

কর্ত্তা। ঐ জন্যই ত ভয় হয়! আমাদের বুকে শেলের আঘাত ক'রে কমলা আমার ছেড়ে না যায়!

গৃহিণী। ষাট্, অমন কথা ব'লো না। এত পাপ কি ক'রেছি যে, আমাদের নয়নের তারা, জীবনের কেন্দ্র, অন্ধের যষ্টি, একমাত্র ধ্রুবতারা সেই সোণার কমলটীকে হারা'ব? ও কথা ভাব্‌লেও আমার দেহে প্রাণ থাকে না!

কর্ত্তা। তা'তো জানি, তবে কি জান, সত্য কথা ব'লতে কি, অমন মেয়ে প্রায়ই টেঁকে না।

গৃহিণী। থাক্, ছাড়ান দাও, ও কথায় আর কাজ নাই।

কর্ত্তা ঘড়ির দিকে চেয়ে বলিলেন,—"রাত স' এগারটা, আর রাত করো না, তুমি খেয়ে নাও।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বসন্তকাল। প্রভাতে মন্দ মন্দ মলয়-হিল্লোলে মর্ত্ত্যে যেন স্বর্গের আগমন হইয়াছে। উচ্চ বৃক্ষরাজি নবীন পল্লবে আবৃত হইয়া, অদূরে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। আম্রবৃক্ষের নব মুকুলের প্রাচুর্য্যে কোকিল আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া কুহুরিছে। পিকের ধ্বনিতে প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। এ দিকে পূর্ব্বাকাশে তরুণ-অরুণ পৃথিবীকে লোহিত রাগে রঞ্জিত করিতেছে।

সদর রাস্তার উপর একটী সুবৃহৎ রজতশুভ্র অট্টালিকা গৌরীশঙ্করের ন্যায় গর্ব্বভরে দণ্ডায়মান। উহার দ্বি-তলের একটী কক্ষে দম্পতি কথোপকথন করিতেছেন।

গৃহিণী। ভগবান যেন আমার ডাকে নিজে এসে তোমায় সেরে তুল্‌লেন। বাপ্ রে! একটা মাস কি অশান্তিতেই কাটিয়েছি, সে কথা আর বল্‌তে পারিনে। সে যে কি অশান্তি, তাহা ভগবানই জানেন।

কর্ত্তা। সে জন্য এখন আর অত উতলা হচ্ছ কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক ত আর হারায়নি! এখন যা' হোক্ দু'মাস তো ভাল আছি, তবে আর অতীত বিপদের কথা মনে ক'রে অস্থির হচ্ছ কেন?

প্রফুল্লমুখী স্বামীর সন্নিকটে উপবেশন করিয়া বল্‌লেন,—"অস্থির হব না! তোমার কি কিছু ছিল? সে কথা মনে কর্‌লে, তোমার সেই চেহারা মনে জাগ্‌লে, আমার হৃদ্-পঞ্জর একেবারে ভগ্ন হয়ে যায়!"

অবিনাশ বাবু প্রফুল্লমুখীকে বলিলেন,—"জানি প্রফুল্ল, তোমার মতন পতিপ্রাণা সতীসাধ্বীর পক্ষে সে চিন্তা বাস্তবিকই অসহ্য। যা'র তোমার মত স্ত্রী আছে, তা'র কি মরিবার যো আছে? তোমার গুণ অপরিসীম, তোমার ঋণ অপরিশোধ্য। যদি আমার একটু মাথা ধরিল, অমনি প্রফুল্লমুখীর আহার নিদ্রা দূরে গেল! তখন প্রফুল্লর মুখে বিষাদের কালীমাছায়া আসিয়া পড়িল। তখন তার তাড়নায় ঝি-চাকরেরা ডাক্তার আনিতে ছুটিল। অডিকলোন্, গোলাপ জলের শিশি হাজির হইল। সামান্য মাথা ধরিলে যা'র স্ত্রী এত ব্যস্ত হয়, সে যে বাতশ্লেষ্মা-বিকার হইলেও বাঁচে। আমি পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্য করেছি, তাই তোমার মত সর্ব্বগুণসম্পন্না স্ত্রী পেয়েছি। তোমার যদি অত গুণ না থাক্‌তো, তবে কি কমলার মত মেয়ে পেতাম?"

প্রফুল্লমুখী। নাও, তোমার আর অত লম্বা বক্তৃতা ক'রতে হবে না!

ঐ রাঁধুনী মেয়ে আস্‌ছে। দু'খানা গরম লুচি, একটু মোহনভোগ ও চা খাও।

রাঁধুনী দরজার কাছে আসিয়া বলিল,—"গিন্নি মা! বাবুর খাবার হয়েছে।"

প্রফুল্লমুখী। এস মা এস—ঐ টেবিলের উপর রাখ। কমলা কোথায়? তাকে ডেকে আন। তার খাবার ও চা এখানে এনে দাও।

রাঁধুনী চলিয়া গেলে উভয়ের দৃষ্টি হঠাৎ বাতায়ন-পথেপড়িল। তাঁহারা দেখিলেন, "নিম্নে পুষ্পোদ্যানে বাসন্তি শোভার লহরী ছুটিতেছে। গোলাপ, গন্ধরাজ, মল্লিকা, মালতী, যুঁই, জবা, চাঁপা, টগর, বেল, অপরাজিতা প্রভৃতি পুষ্পে উদ্যানটী যেন নন্দন-কাননে পরিণত হইয়াছে। মৃদুমধুর সুখস্পর্শ-সমীর-সঞ্চারে উদ্যানস্থ পুষ্করিণী-বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার উৎক্ষেপ হইয়াছে। সেগুলি আবার রবির সুবর্ণ-রশ্মিতে স্নাত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। অদূরে বকুল-তলে দু'কূল-বসনা কমলা ও তার সখী অনিলা দুইজনে বকুল ফুল কুড়াইতেছে। অবিনাশ বাবু ও প্রফুল্লমুখী সেই অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় কমলা ফুলের চুবড়ী হাতে করিয়া অনিলার সঙ্গে গৃহাভিমুখে ফিরিল। তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, প্রফুল্লমুখী অবিনাশ বাবুকে বলিলেন,—"তোমার যতদিন অসুখ ছিল, ততদিন কমলা আমার, তোমার বিছানা থেকে কোথাও যায় নি। তাহার মুখে একটী কথাও ছিল না। অনিমেষভাবে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তো। এখন তোমার শরীর একটু সুস্থ ও কমলার মুখে হাসি দেখে, আমাদের দেহে যেন প্রাণ এল।"

এদিকে রাঁধুনী খুঁজিয়া খুঁজিয়া, শেষে ফুলবাগানে যাইয়া কমলাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া, তাকে বলিল, "দিদিমণি, গিন্নি-মা তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

কমলা। চল, যাই। আমরা অনেকক্ষণ এসেছি।

কমলাকে সঙ্গে আনিয়া রাঁধুনী বলিল,—"গিন্নি-মা, দিদিমণিরা এসেছে।"

প্রফুল্লমুখী। আচ্ছা, যাও, তুমি কমলা ও অনিলার জন্য খাবারটা নিয়ে এস। পুনশ্চ কমলার প্রতি চেয়ে বল্‌লেন,—"এত বেলা হয়েছে; কিছু না খেয়ে ফুলবাগানে ব'সেছিলে?"

কমলা। মা, বকুল ফুলের গন্ধ বড়ই সুন্দর! তাই আমরা দু'জনে ফুল কুড়াচ্ছিলাম।

প্রফুল্লমুখী। মা অনিল, তুমি এলে কখন?

অনিলা। কমলা যখন ফুলবাগানে যাচ্ছিল, সেই তখনই আমি এসেছি।

রাঁধুনী চা ও খাবার হস্তে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উভয়ের খাবার টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

"এখন তোমরা খাও। বেলা হ'য়েছে, আমি যাই, ওঁর রান্নাটা আমি নিজে করিগে।" এই বলিয়া প্রফুল্লমুখী চলিয়া গেলেন।

অবিনাশ। দেখি মা, তোমরা কে কত ফুল কুড়িয়েছ! ফুল দেখিয়া বলিলেন,—"অনেক ফুল! আচ্ছা, এখন তোমরা দু'জনে দু'ছড়া মালা গাঁথ, কার ভাল হবে, আমি দেখে বল্‌বো। এখন আমি একটুক্ষণ বৈঠকখানায় যাই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিহরপুর বেশ সৌষ্ঠব-সম্পন্ন গ্রাম। সেখানে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁহার দুই কন্যা, এক পুত্র ও স্ত্রী—এই চারিটী পোষ্য। তিনি ধনী না হইলেও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। তাঁহার ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী।

স্ত্রী লাবণ্যময়ীর দিন বেশ সুখে কেটে যাচ্ছিল। কেন না, পুত্র সুশীলকুমার আই-এ পাশ করিয়া, বি-এ পড়িতেছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রভাবতী শ্বশুরালয়ে। কনিষ্ঠা হৈমবতীর এখনও বিবাহ হয় নাই। স্বামী-স্ত্রীর ইচ্ছা, মেয়ে একটু বড় ক'রেই বে দিবেন। ইঁহাদের সংসার বেশ শান্তিময়। উভয়ে আদরের হৈম-বতীকে নিয়ে সুখের মন্দাকিনী-প্লাবনে ভাসিতেছিলেন। কিন্তু চির-সুখ ও শান্তি কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। এক দিন রাত্রি ১টার সময় হৈমবতীর হঠাৎ কলেরা হইল। বিপদে সাহস ও ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন, লাবণ্য তাহা খুব ভালই বুঝিতেন। তিনি স্বামীকে বলিলেন,—"তুমি শীঘ্র ডাক্তার নিয়ে এস, আমি মেয়ের যত্ন করি।" ভূপেন্দ্রনাথ ডাক্তার আনিতে ছুটিলেন। লাবণ্যময়ী সেই নিশীথে একাকী সাহসে ভর করিয়া, ভগবানে নির্ভর রাখিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে দাস্ত-বমি পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভূপেন্দ্রনাথ ডাক্তার লইয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার আসিয়াই বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ! এ যে এশিয়াটীক্!" চাকর দিয়া ঔষধের বাক্স সঙ্গেই আনিয়াছিলেন, ঔষধ দিলেন। কিন্তু ঔষধের ক্রিয়া না হইতেই, নাড়ী পড়িয়া গেল। আবার উত্তেজক ঔষধ

দিতে লাগিলেন। তাহাতেও কিছু হইল না। তখন হাইপোডার্মিক্ ইন্‌জেক্‌সন করিলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তিনি বলিলেন,—"আর হইল না।" শুনিয়া লাবণ্যময়ী চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ডাক্তার বাবু! আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব দিচ্ছি, আপনি হৈমকে বাঁচান।" এই বলিয়া ডাক্তারের পায়ের উপর লুঠাইয়া পড়িলেন। সন্তানের স্নেহের কি প্রবল প্রভাব! যে লাবণ্যময়ী অসূর্য্যম্পশ্যা—চন্দ্র-সূর্য্য কখন যাহার মুখ দেখিতে পায় নাই, আজ কি না, তিনি কাঙালীর মত পর-পুরুষের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা!

ডাক্তার। মা! আমার কি অসাধ? যতদূর সাধ্য, তা ক'রেছি। এখন আর উপায় নাই। মাত্র একটী পথ আছে; তাহা আমরা পারি না। শ্রীশ ডাক্তারকে যদি শীঘ্র আনাইতে পারেন, তবে তিনি আসিয়া ইন্‌ট্রাভেনস্ ইন্‌জেকশন করিতে পারেন; আমি তাঁহার সহায়তা করিতে পারি। তাহা হইলে রোগী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।

তখন লাবণ্যময়ী ভূপেন্দ্রনাথকে বলিলেন,—"ওগো! শিগ্‌গির যাও, শ্রীশ-ডাক্তারকে আন।"

ভূপেন্দ্রনাথ ছুটিয়া একজন মজুরের বাড়ী গিয়া বলিলেন,—"বাবা! আমি বড় বিপদে পড়েছি। হৈম বুঝি আমাদের ছেড়ে যায়। আমার আর লোক নেই। একা রেখে নিজেও যেতে পাচ্ছিনে। এই নাও ৫৲ টাকা, শীগ্‌গির শ্রীশ ডাক্তারকে নিয়ে এস। তিনি যদি আস্‌তে না চান, তাঁকে বলিও, আমি ডবল্ ভিজিট দিব। এক মাইল রাস্তা, ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই এসো, তুমি ডাক্তার নিয়ে এলে আরও পুরস্কার পাবে। তুমি যাও, আমি দেখে যাই।"

মজুরটী চ'লে গেলে, তিনি বাড়ী ফিরিলেন।

এদিকে হৈমবতী অজ্ঞানাবস্থায় বলিলেন,—"মা, জ—ল, জ—ল।"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি একটু মৌরীভিজান জল হৈমবতীর মুখে দিলেন, কিন্তু হৈম তাহা গিলিতে পারিল না, গণ্ড বহিয়া পড়িয়া গেল। তার পর চক্ষু বুঁজিয়া গেল, হাত-পা নীলবর্ণ ধারণ করিল, জোরে শ্বাস বহিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া লাবণ্য মেয়ের বুকের উপরে ঝুঁকিয়া, মুখের উপর মুখ রাখিয়া, রুদ্ধনিশ্বাসে বলিতে লাগিলেন—"ওমা হৈম আমার, আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে মা? ওমা, তুমি যে আমার বুকের ধন, বুক থেকে কোথাও যেতে দেবো না মা, মা ব'লে ডাকো মা!"

ডাক্তার বাহির করিবার জন্য হৈমকে নিতে এলেন দেখে, লাবণ্যময়ী তাকে কোলে তুলে বল্‌ছেন,—"না না, তা পার্‌বেন না! এ যে আমার বুকের রক্ত—হৃদ্‌পিণ্ড, আমি বুক ছাড়া করবো না।"

ডাক্তার আর অগ্রসর হ'তে পার্‌লেন না। জগতে এমন নিষ্ঠুর কে আছে যে, মা'র বুক থেকে সন্তান ছিনিয়া নিতে পারে?

ভূপেন্দ্রনাথ বাড়ীতে আসিতেছিলেন; রাস্তা থেকে স্ত্রীর চীৎকার শুনিয়া আরও দ্রুতবেগে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করেই স্ত্রীর নিকট হইতে হৈমকে লইয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—"ননীর পুতুল হৈম, ওমা! আমাদের ছেড়ে অসময়ে কোথায় যাও মা!"

রাত্রি তিনটার সময় হৈমের জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল। আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় মনে হইতে লাগিল, হৈম যেন ঘুমাইয়া আছে। মুখখানি তখনও যেন প্রস্ফুটিত পদ্মের মত ঢল ঢল করিতেছে। নামে হৈমবতী—রূপেও সাক্ষাৎ হৈমবতী। দেহ ত নয়, যেন তপ্ত কাঞ্চন! সেই কাল কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলির নীচে ক্ষুদ্রায়তন নিটোল কপালখানি; সেই সুন্দর—সুঠাম ভ্রূযুগল; সেই আকর্ণপ্রসারী মৃগনয়ন; সেই লোহিতাভ সুন্দর কপোলদ্বয়; সেই অলক্তলাঞ্ছিত পাতলা অথচ ফোলাল ফোলাল ছোট্ট অধর-পল্লব; সেই ছোট্ট সুন্দর চিবুক; সেই গোলালো গোলালো মৃণাল-ভুজদ্বয়; সেই চাঁপার কচি অঙ্গুলিগুলি; সেই শিখর সদৃশী দন্তশ্রেণী—দেখিলে তাহাকে সাক্ষাৎ হৈমবতীই মনে হইত! আহা! তখনও যেন সে মুখখানি হাসিতেছিল।

কয়েকজন প্রতিবেশিনী আসিয়া লাবণ্যময়ীকে প্রবোধ দিতে লাগিল। ভূপেন্দ্রবাবু শ্মশানের কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। নয়ন-আসাঢ়ে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। দু'জন প্রতিবেশী তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিলেন; তাঁহারা অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া প্রভাবতীর স্বামীকে টেলিগ্রাম করিলেন। (ক্রমশঃ)

শৈশব।

(সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী সরস্বতী।)

হে শৈশব! এস তুমি এস পুনরায়—
কেন আসিবে না তুমি? দেখি বর্ষ-অন্তে
ছয় ঋতু ফিরে আসে—আবার বসন্তে
শ্যামলা প্রকৃতি-অঙ্গে বিবিধ শোভায়
যৌবন-কুসুম ফোটে! বিহঙ্গের স্বরে—
মাধুরী-অমিয় বহি মুনি-মন হরে।
শৈশব কি চিরতরে নিয়াছ বিদায়?
কোথা সেই সরলতা—বাল্য-চপলতা,
চাঁদের মধুর হাসি মুখে—মিঠে কথা!
চরণে নূপুর বাজে যেন পায় পায়—
কোথা সেই মন-প্রাণ? সব দিন দিন
সংসারের কশাঘাতে প্রস্তর-কঠিন!
অস্তাচলে হয় যদি রবির উদয়—
সুখের শৈশব আর ফিরিবার নয়!

প্রত্যক্ষ দেবতা।

(লেখক—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।)

নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেব ময়ায় চ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে॥
সর্ব্বযজ্ঞ স্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্টিনে।
সর্ব্বতীর্থাবলোকায় করুণা সাগরায় চ॥

ব্রহ্মপদার্থ হইতে স্ফুলিঙ্গের মত বিচ্ছুরিত হইয়া আমরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ছুটিয়া যাইতেছি। ছুটিয়া কোথায় চলিয়াছি? আবার আমাদের স্ব-প্রকৃতি কি না ব্রহ্মের সহিত সংমিলিত হইতে যাইতেছি। ঠিক

যেন একটা বৃত্ত গঠন করিয়া চলিতেছি। যোগীপ্রবর লেড্‌বিটার বলেন, এই কল্পিত বৃত্তের ৩২ ভাগের ১ ভাগ মাত্র, এই পরিদৃশ্যমান জগতে আর ৩১ ভাগ সূক্ষ্ম জগতে অতিবাহিত হইতেছে। সনাতন আর্য্য শাস্ত্রেও বলিয়াছেন যে, আমরা ৮০ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া এই নরদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি।

পার্থিব জীবনের প্রথমাংশে আমরা খনিজ পদার্থ ছিলাম, তার পরে উদ্ভিদ্-দেহ প্রাপ্ত হইলাম, তার পর তির্য্যক দেহ, তৎপরে পশুদেহ, সর্ব্বশেষে মানব-দেহে ফুটিয়া উঠিলাম। প্রতি স্তরেই আমাদের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তার বিকাশ ঘটিতে লাগিল। ইহারই নাম—ক্রমবিকাশ পদ্ধতি। ইহাকেই ইংরাজিতে ইভলিউশন থিওরী বলে। পাশ্চাত্য জগতে ডারউইন সাহেব ইহার প্রবর্ত্তক হইলেও প্রাচ্যদেশে ভারতীয় আর্য্যেরা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তাই বলিতেছিলাম, ক্রমবিকাশের পদ্ধতিক্রমে পার্থিব জীবনে নরদেহই চরম উৎকর্ষ। পার্থিব জীবনে বলিলাম কেন? অনেকে মনে করেন, মানব-দেহের পরে বুঝি আর ক্রমবিকাশ হয় না, এইটীই বুঝি বা ক্রম-বিকাশের শেষ সীমা। বস্তুতঃ তাহা নহে। মানব-দেহের পরে আমাদিগকে উচ্চতর স্তরে অর্থাৎ দেব-যোনিতে যাইয়া ফুটিতে হইবে। এই মানবই ভিন্ন ভিন্ন দেব-যোনির ভিতরে প্রকাশ পাইবে, অবশেষে এই মানবই যম, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ-যন্ত্রের পরিচালক, নিয়ন্তা ও বিধাতা হইয়া দাঁড়াইবে। তার পর কল্প-কল্পান্তে আমাদের চির আকাঙ্ক্ষিত স্ব-প্রকৃতিতে অর্থাৎ ব্রহ্মে যাইয়া সংশ্লিষ্ট হইবে। ইহাই সৃষ্টিধারা, ইহাই ক্রম-বিকাশের দুন্দুভি-নিনাদ, ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানের বিজয় ঘোষণা। সমগ্র জীবনের ৩২ ভাগের এক ভাগ পার্থিব জীবন। এই ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি লইয়া যদি ৮০ লক্ষ হয়, তবে ৩১ ভাগের মধ্যে কত অসংখ্য দেহ ধরিতে হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই দেবতার সংখ্যা পরিকল্পনা করিতে গিয়া অতিন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন ঋষিরা ৩৩ কোটি গণনা করিয়াছেন। ৩৩ কোটি দেবতার অন্যরূপ ব্যাখ্যা থাকিতে পারে, কিন্তু দেবতার সংখ্যা যে অত্যধিক তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

দেবতার সম্বন্ধে ২।৪টী কথার অবতারণা এখানে সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছি। কোন কোন তথা-কথিত পণ্ডিত মনে করেন, দেবতা বলিয়া স্বতন্ত্র সত্তা নাই। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী "সত্যার্থ প্রচার" পুস্তকে ঐরূপ

কিম্ভূত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ধাতু প্রত্যয়ের সাহায্যে দেখা যায়, দেবতার পরিকল্পনা ঈশ্বরেরই বিভূতি প্রকাশ করে। উহা দ্বারা এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও বুঝিতে হইবে না। দেবতত্ত্ব গ্রন্থে এই মতের সুন্দর খণ্ডন হইয়াছে। জুদা-ধর্ম্ম, ইশলামধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মেই এনজেল্, পরী, দেবদূত প্রভৃতির কথা আছে। অতএব দেবযোনির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধরা ঈশ্বর মানিয়া না থাকিলেও দেবযোনি মানিয়াছেন। অরূপ দেব-রূপ দেব তাঁহাদেরই কথা। আর যদি অন্যদিক দিয়া দেখি, তাহা হইলেও স্বতন্ত্র দেবাস্তিত্বের কথা স্বীকার করিতে হয়। খনিজ পদার্থ হইতে সুশৃঙ্খলার সহিত ক্রমবিকাশ-পদ্ধতি চলিয়া আসিয়া যদি মানবে আসিয়া স্থগিত হয়, তাহা হইলে নির্দ্দোষ নিখুঁত ব্রহ্মপদার্থ এই দুইটীর মধ্যে একটা অপ্রাসঙ্গিক সৃষ্টিছাড়া রকমের ব্যবধান থাকিয়া যায়। ক্রমবিকাশের দুইটী পদার্থ কেমন বে-মালুম মিল খাইয়াছে, কিন্তু মানব ও ব্রহ্মে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এখানে বে-মালুম মিল কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? প্রকৃতির রাজ্যে কুত্রাপি এরূপ অসঙ্গতি নাই। প্রকৃতির সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা, সর্ব্বত্রই নিয়মের বাঁধন, সর্ব্বত্রই অনুশাসন, সর্ব্বত্রই হিসাব-নিকাশ। অতএব মানবের পর দেবযোনির অস্তিত্ব খাঁটি সত্য ও প্রাকৃতিক বিধান।

কিন্তু ঐ সকল দেবতা প্রত্যক্ষ নহে। উহারা দিব্য দৃষ্টির বিষয়ীভূত। মরণের পর পিণ্ডদেহে আমরা উঁহাদের অনেকের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিব বলিয়া মনে হয়। মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, বুদ্ধির উপরে আর একটী স্তর আছে, তাহাকে প্রজ্ঞা বলে। আমরা বুদ্ধির দ্বারা যে সকল পদার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, প্রজ্ঞাদ্বারা তৎসমুদয় বুঝিতে পারি। বুদ্ধি-রজ্জুতে অতীন্দ্রিয় ব্যাপার বাঁধা পড়ে না; বাঁধিতে গেলে যশোদার রজ্জুর মত ছোট হইয়া যায়। অতীন্দ্রিয় বিষয় ধরিতে গেলে, জানিতে গেলে, বুঝিতে গেলে—প্রজ্ঞার সাধনা করিতে হইবে। তখনই সেই দিব্য-জগতের দিব্যদেহধারী অপ্রত্যক্ষ দেবমণ্ডলী মানবের কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু সেটা সাধনা সাপেক্ষ, সময় সাপেক্ষ, সুকৃতি সাপেক্ষ।

তাই, মানবের পক্ষে পার্থিব জীবনে কোন্ দেবতা প্রত্যক্ষ তাহারই হিসাব করা যাউক। এই হিসাব করিতে হইলে, যাঁহারা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-

সম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান, স্থূল জগৎ সূক্ষ্ম-জগৎ উভয় জগতের খোঁজ-খবর যাঁহারা খুব ভাল করিয়া জানেন; জানিয়া মানবের কল্যাণ কামনা করিয়া মানবকে ক্রমবিকাশের উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে আরূঢ় করিবার মানসে কল্যাণ-দায়িনী উপদেশবাণী মেঘমন্দ্রে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকে এক্ষণে তাঁহাদের অনুশাসন ও উপদেশ মানিয়া চলিতে হইবে।

ত্রিকালদর্শী ভগবান ব্যাস, ভগবান মনু প্রভৃতি সকলেই মাতা ও পিতাকেই প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ তাঁহাদের অর্চ্চনা করা, তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলা, তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করা—মানবের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আদেশ করিয়াছেন। মাতাপিতা কেন প্রত্যক্ষ দেবতা, সে বিচার আমরা করিব না; ব্যাস বশিষ্ঠের উপদেশ। সুতরাং তাঁহাদিগকেই প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া মানিতে হইবে। তা ছাড়া, প্রত্যক্ষ দেবতা কেন? এই "কেন" শব্দের কারণ খুঁজিতে গেলে, আমরা অতি সহজেই দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের ভালবাসা ও স্নেহ যেমন নির্ম্মল, যেমন আত্মহারা, যেমন স্বার্থের পঙ্কিলতাশূন্য, যেমন অনাবিল, মধুর, শান্তি-নিস্যন্দিনী, তেমনটী এই স্থূল জগতে আর কুত্রাপি দেখা যায় না। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যের পিছু পিছু ছুটিবার পূর্ব্বে যদি আমরা এই প্রত্যক্ষ দেবতার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, মনে মনে নিজের স্বতন্ত্র্য বুদ্ধিটুকু সেখানে ন্যস্ত করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে ক্রমে ত্যাগের পক্ষে—নিষ্কাম সাধনার পথে যাইয়া উঠিতে পারি। পার্থিব জীবনে সে সাধনাটুকু কম উপাদেয় হইবে না। এই পথ ধরিয়া চলিলে হয়তো কোটি জন্মের প্রারব্ধ ফলের কশাঘাত হইতে নিস্তার পাইয়া যাইব। আবার মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া যদি দেখি, তাহা হইলেও দেখিতে পাই যে, প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দেবতা মাতাপিতাকে সংযতভাবে প্রণাম করিতে করিতে মনের একটা স্থৈর্য্য, মনের নিরন্তর গতির একটা মধুর স্থগন অভ্যাস হইয়া যাইবে। এই প্রকারে আমরা ক্রমে ধ্যান-ধারণা নিদিধ্যাসনের পথে যাইয়া উঠিব। তাহাতেও আমাদের অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ ঘটিবে। অতএব সকল দিকেই এই প্রত্যক্ষ দেবতাকে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রণাম করা বিধেয়।

পিতামাতা জীবিত না থাকিলে বা নিকটে না থাকিলে, উদ্দেশেও প্রণাম করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাহাতেও ঐ মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে। স্ত্রীলোকের গুরু পতি; সুতরাং শ্বশুর ও শ্বশ্রূ গুরুর গুরু—পরমগুরু। সুতরাং

স্ত্রীলোকের পক্ষে শ্বশুর শ্বশ্রূকে প্রণাম করিলেই মাতাপিতাকে সেবা করিয়া সাধনার পক্ষে যাওয়াই হয়। তাঁহাদের সেইটীই কর্ত্তব্য। শ্বশুর ও শ্বশ্রূ যদি জীবিত না থাকেন, তবে উদ্দেশেই সেইরূপ সাধনা করিতে হইবে। এটী সামাজিক রীতি নহে, এটী সাধনার পদ্ধতি! মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনের একমাত্র সহজ পন্থা। অতএব,—

দুর্লভং মানুষমিদং যতোলব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ॥

সমালোচনা।

শ্রাদ্ধতত্ত্ব।—শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর সঙ্কলিত; ৺কাশীধাম অখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ-রক্ষা মহাসভার পক্ষে শ্রীযুক্ত তারাচরণ শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য তিন আনা মাত্র।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে শ্রাদ্ধ কি? কি ভাবে, কোন্ যুগে হিন্দুসমাজে শ্রাদ্ধপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত, বেদ পুরাণাদি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রাদি গ্রন্থে কতপ্রকার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা অনুষ্ঠাতার ইহ-লৌকিক ও পার-লৌকিক মোক্ষ ফল ঘটে, ইহলোকবাসিগণের সহিত পিতৃলোকবাসিদের অধ্যাত্ম সম্বন্ধকে সন্নিকট ও ঘনিষ্ঠতর করিয়া মুক্তির পথে যাইবার একমাত্র সেতু শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কিরূপে সহায়তা করে এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় কি? বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের ঘোর বিপ্লবের দিনে আলোচনা করিয়া হিন্দুধর্ম্মানুরাগী পাঠক মহোদয়গণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

হিন্দুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বেদ পুরাণাদির ব্যবস্থানুসারে আস্তিকতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা বলাই বাহুল্য। আমরা এই শ্রাদ্ধতত্ত্ব পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীতি ও শান্তি লাভ করিলাম। প্রত্যেক হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজানুরাগী মহোদয়গণকেও পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কলিকাতা।

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৭শ, বর্ষ। ১৩২৮ সাল, ভাদ্র। ৫ম, সংখ্যা।

মনের অসত্তা প্রতিপাদন।

(শাস্ত্র সঙ্কলিত)

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত জীবনবিহারী সিংহ L. H. M. S.

ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত না করিতে পারিলে তাহারা মানবের পরমশত্রু হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তবিক উহারা স্বভাবতঃ হৃদয়ের শত্রু। ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণ মহানরক রূপ সাম্রাজের অধিপতি। তাহাদিগকে জয় করিয়া বশে রাখা বড়ই কঠিন। তাহারা দুষ্কৃতিরূপ সর্ত্ত ধারণ ও আশারূপ শত শলাকা সহায় হইয়া, বিবিধ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা স্বভাবতর কৃতঘ্ন। এই জয় আপনাদের আশ্রয় দেহকে বিনষ্ট করে। ইন্দ্রিয়গণ পক্ষিরূপে, কার্য্যাকার্য্যরূপ পক্ষ বিস্তার ও বিষয়রূপ আমিষ আহার করিয়া, মানবের শরীররূপ কুলায়ে সর্ব্বদা বিহার করে। বিবেকরূপ দুর্ভেদ্য জাল বিস্তার করিয়া, ঐ ইন্দ্রিয়রূপ শঠ বিহঙ্গমগণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে, আর কোন কালেই শান্তি ভঙ্গ হয় না। যে ব্যক্তি এই কুদেহরূপ পত্তনে বিবেকরূপ ধনসঞ্চয় করিতে পারেন, তাঁহার কোন কালেই অশান্তিরূপ দারিদ্র দুঃখের ভোগ হয় না। অন্তরিন্দ্রিয়গণ কস্মিন কালেও তাঁহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না এবং তিনি কদাচ

এই মৃত্তিকাময় দেহের পরিচর্য্যা করিয়া, আপনার অধোগতির দ্বার বিস্তার করেন না।

চিত্তরূপ সর্প ক্ষয়প্রাপ্ত ও মনোরূপ শক্র নিগৃহীত হইলে, নব বসন্ত সদাগমে সঞ্জরীর ন্যায়, উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিলাভ হয়, এবং ভোগ বাসনা সকল হৈমন্তিকী পদ্মিনীর ন্যায়, ক্ষীণ হইয়া, নির্ব্বাণ শান্তি সমুদ্ভাবন করে। তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়তর অভ্যাস দ্বারা মন পরাজিত না হইলে, হৃদয়রূপ আকাশ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া বাসনারূপ বেতাল সমুদ্রের ভয়ঙ্কর নৃত্যে একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

দেহরূপ সাম্রাজ্যে বিবেকিগণের মনই অভিমত কার্য্য করে বলিয়া ভৃত্য, সৎকার্য্য সাধনে সবিশেষ নিপুণ বলিয়া মন্ত্রী. ইন্দ্রিয়াদিরূপ রিপুবর্গের আক্রমণ করে বলিয়া সামন্ত, লালন করে বলিয়া পরম স্নেহময়ী ললনা, পবিত্র করে বলিয়া পাবন, পালন করে বলিয়া পিতা এবং পরম বিশ্বাসভাজন বলিয়া সুহৃৎ স্বরূপ।

শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা আত্মাকে দর্শন ও অনুভব করিলেই, মন বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, পরম সিদ্ধি সমুদ্ভাবন করে। এই কারণে মনই পরম পিতা। এই মন মহা-মণিস্বরূপ, সদ্‌গুণ-সহায়ে অর্জ্জিত হইয়া, পরমাত্মার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে, প্রবোধরূপ তেজে সমুদ্দীপিত হইয়া উঠে। যে বিবেকরূপ কুঠার জন্মরূপ বৃক্ষ ছেদন করে, এই মনই তাহার নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। পরম সিদ্ধি সাধন জন্য, বহু পক্ষে কলঙ্কিত, মনোরূপ মণিকে, বিবেকরূপ সলিলে প্রক্ষালিত করিয়া, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে জ্ঞানরূপ আলোক লাভ করিতে হয়। জড়ভাবে আচ্ছন্ন, সামান্য ব্যক্তির ন্যায়, এই বিবিধোৎপাত পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর ভবভূমিতে পতিত হইয়া, বিবেক বিহীন ও তজ্জন্য অবসন্ন হওয়া উচিত নহে। এই বিচিত্র সংসারমায়াবশে যে বিবিধ অনর্থে পরিপূর্ণ মহামোহরূপ হিমিকা সমুত্থিত হইতেছে, কদাচ তাহাতে আচ্ছন্ন হওয়া উচিত নহে। স্বকীয় নির্ম্মল বুদ্ধির সহায়তায় সত্য বস্তুর দর্শন, বিবেক অবলম্বন ও ইন্দ্রিয়রূপ শক্রদল দলন করিয়া, ভবরূপ সাগরের পারে সে ব্যক্তি গমন করিতে পারে, সেই-ই মুক্তি লাভে সমর্থ হয়।

এই অসত্য দেহে সুখ দুঃখাদি সমস্তই অসত্য। অতএব হে সাধক! তুমি পরমপদে স্থিতি লাভে যত্নবান হও ও শোক দুঃখের অতীত হইয়া অবস্থিতি কর এবং স্বকীয় সুন্দর মনীষা সহায়ে, এই জগৎ, এই আমি ইত্যাদি বৃথাজ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক, পরমপদে অধিষ্ঠান করিয়া, পান ভোজনে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে, জীবন্মুক্ত, মনোহীন ও অবধ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

মৃত-শিশু।

লেখক,—ডঃ শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

ফুটবে বলিয়া কতই বাসনা
ফুটিতে পারিল না।
মুকুলে শুকাল নিদাঘ বাতাসে
আশ ত পূরিল না॥
গাহিবে বলিয়া অমর সঙ্গীত,
লহর তুলিত গো।
মরীচিকা প্রায় সে সাধ মিলিল
গান না গাহিল গো॥
হাসিবে বলিয়া অধরের কোণে
অধর ফুলিত রে।
সুখের সাগরে ভাসিবে বলিয়া
বাসনা জাগিত রে॥
বাসনা সমাধি হইল তাহার
হাসিত হাসিল না।
সাগর শুকাল নিদাঘ তপনে
ভাসিতে পারিল না॥
বাসনা তাহার স্বপনের প্রায়
জাগিয়া মিলিল গো।
বুকের ভিতরে গুমরি কাঁদিয়া
মরমে মরিল গো॥
স্বরগের ফুল স্বরগে যাইল
মরতে রহিল না।
রাখিয়া যাইল বিষম যাতনা
স্মৃতিটি নিবিল না॥

যাহার কিছুই নাই,—সেই সুখী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ।

উপরি উক্ত উক্তিটী যে সম্পূর্ণভাবে সত্য, তাহা মহর্ষি বশিষ্ঠদেব; তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রকে সম্যক বুঝাইয়া ছিলেন। বাস্তবিক প্রকৃত সুখ বা সন্তোষ ধনরত্নাদি, পুত্রকন্যা, আহার বিহার, অট্টালিকা প্রভৃতিতে নহে, সুখ মনে। আপনা আপনি, দিবা রাত্রি নির্জ্জনে বসিয়া অসুখী ভাবিলে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তাও তাহাকে সুখী করিতে পারেন না। যে ব্যক্তির মন সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, প্রকৃত পক্ষে সেই ব্যক্তিই সুখী, যাহার কিছুই নাই সে-ই সন্তুষ্ট; সুতরাং সেই ব্যক্তিই সুখী। দরবেশ বা ঋষিগণ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁহারা ইহ জগতের সমস্ত বিষয় পরিহার পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের কিছুই নাই। সেই জন্য তাঁহারাই সুখী।

অনেকে বলিতে পারেন, ধন, রত্ন, গৃহ, ঘরবাড়ী, ভু-সম্পত্তি প্রভৃতি শত সহস্র সুখের বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী হইলে, কিরূপে সুখী হওয়া যায়? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে সংসার অবশ্যই এক দিন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তাহার আশ্রয়ে সুখের সম্ভাবনা কি? যাহারা মূঢ় ও স্থূলবুদ্ধি, তাহারাই এই নশ্বর সংসারকে স্থায়ী ভাবিয়া, আসক্ত ও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য পদে পদেই দুঃখ ভোগ করে। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্যু যেন আমি তুমি, রাজা প্রজা, সকল লোককেই কেশে গ্রহণ করিয়া দ্বারে দ্বারে, গৃহে গৃহে বিচরণ করিতেছে। বিষয়ের পর বিষয়, ধনের পর ধন, বিভবের পর বিভব, যতই কেন সঞ্চয় কর বা না কর, কিছুতেই কাহারও পরিহার নাই। হে পাঠক? আপনি শত পুত্রের পিতা হউন বা না হউন, শত ব্যক্তির অধিপতি হউন বা হউন, শত পরিবারের কর্ত্তা হউন বা না হউন, মৃত্যু আপনাকে কখনই ছাড়িয়া দিবে না বা দয়া করিবে না। একথা একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলেও, যাহার শরীর রোমাঞ্চিত বা মানসে বৈরাগ্যের সঞ্চার না হয়, সে পশু ও জড়েরও অধম। তাহার হৃদয় নাই, চেতনা নাই, প্রাণ ও স্বত্ব নাই।

বলিতে কি, মৃত্যুকে জানিতে পারাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। যে ব্যক্তি

মৃত্যুকে না জানে, সে সর্ব্বপ্রকার পাপই করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে। কোন কুকর্ম্ম তাহার পরিহার্য্য বা অকরণীয় হয় না। যাবৎ প্রকৃত জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ সংসারে থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু যখন জ্ঞান বলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংসার একদিন অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে, তখন ইহা ত্যাগ করিয়া, প্রস্থান করাই পরম কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত।

সংসারী লোকের প্রকৃত সুখভাগ্য কখনই সম্ভব নহে। কেননা, এক দিকে যেমন তাহার সুখ আছে, অন্যদিকে তেমনই তাহার ততোধিক দুঃখ আছে। এই প্রকার দুঃখাধিক্য বশতঃই সংসারী জীবের প্রকৃত সুখভোগ হয় না। প্রাবৃট সূর্য্যের কিরণ যেমন প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না, সংসারীর সুখেরও তদ্রূপ প্রাদুর্ভাব সম্ভাবনা নাই। সংসারী ব্যক্তি অতি কষ্টে ধনোপার্জ্জন করিল, চোরে বা দস্যুতে অথবা অপব্যয়ে কিংবা অতিব্যয়ে, অথবা অন্যবিধ উপদ্রবে সে ধনের ক্ষয় হইল। সে ব্যক্তি পুত্রের পর পুত্রের, এবং কন্যার পর কন্যার জনক হইল, হয়ত সেই সকল পুত্র মূর্খ বা অত্যাচারী অথবা আপ্তসুখী কিম্বা অকালে কালকবলে নিপতিত হইল। এইরূপ কোন না কোন দিকে, কোন না কোনরূপে, সংসারী জীবের আপদ বিপদ আছেই আছে; কোন কালেই তাহার পরিহার নাই। এই জন্যই সংসারীর সুখ ভোগ আকাশ কল্পনার ন্যায় একান্ত অলীক ও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

কাল দোষ, বুদ্ধিদোষ ও কর্ম্মদোষ ইত্যাদি বিবিধ অত্যাচারও মানবের সুখ তিরোহিত হইয়াছে। যে সময়ে যে কার্য্য করা উচিত, সংসারী জীব তাহা করে না। এই জন্য, সুখের পরিবর্ত্তে তাহার দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহারই নাম কালদোষ। অনেকেই বাল্যকাল অসৎ ক্রীড়ায় যাপন করে, যৌবন কাল তরুণী প্রসঙ্গে বিষয় সেবায় আত্মমালিন্য সংঘটন করে; এবং বৃদ্ধ কালে পরমার্থচিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া, বালকের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। এইরূপে যাহা করিলে অসুখ ও অশান্তির সম্ভাবনা, সে তাহাই করিয়া থাকে। অন্যান্যেরা এই দৃষ্টান্তের অনুসারী হয়। এই কারণে কত ব্যক্তি বাল্যকালেই জন্মের মত নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা বাল্যকালে নষ্ট ও ভ্রষ্ট না হয়, কোন মতে স্বপদে অবস্থিতি করে, তাহারা যৌবনের সমাগমে তাহার দুরন্ত বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া প্রায়ই নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া উঠে। যাহারা যৌবন নষ্ট না হয়, বৃদ্ধ কালে ভীষণ জরার তাড়নায় তাহাদিগের বুদ্ধি শুদ্ধি প্রায়ই লোপ প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধকাল অতি কঠিন কাল। ইহা সংসারের শেষ

সীমা। মৃত্যু ঐ সীমান্তে স্বয়ং দণ্ডায়মান। যাহারা যৌবনের সমাগমে রক্তের তেজে দিগ বিদিগ্ জ্ঞান শূন্য হইয়া মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, নানা প্রকার কদর্য্য অনুষ্ঠান করে এবং এইরূপ চিরদিন যাইবে, মনে করিয়া যাহারা যৌবনকাল দূষিত করে, তাহারা এই বৃদ্ধকালে অবশ্যই শোক করিয়া থাকে! কেননা, পাপের ফল অনুতাপ। উহা অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

হে সংসারী! তোমার শরীরে এখন দিব্য তেজঃ দিব্য পুষ্টি ও দিব্য কান্তি। তৎপ্রভাবে তুমি মনে করিতেছ মৃত্যু তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। নানাপ্রকার পাপানুষ্ঠান করিতে তোমার কিছু মাত্রও সংকোচ বোধ হয় না। যুবতীকণ্ঠ বিনিঃসৃত সুমধুর স্বরলহরী শ্রবণ করিতে তোমার যেমন আমোদ বোধ হয়, সদুপদেশ বা কোন প্রকার সৎকথা শ্রবণ করিতে তোমার সেরূপ আমোদ হয় না। প্রত্যুত বিরক্তিই হইয়া থাকে। তুমি বিবিধ বেশভূষা করিয়া, আপনার এই কৃমিকীট ভোজ্য অসার দেহ সুসজ্জিত করিতে যেরূপ উৎসুক ও আমোদিত হও, স্বীয় ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতে তোমার সেরূপ আমোদ হয় না। অসদানুষ্ঠানে আত্মাকে জর্জ্জরিত করিতে তোমার যেরূপ আমোদ অনুভূত ও প্রীতি সমুপজাত হয়, সাক্ষাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ স্বরূপ সাধুসঙ্গে বাস ও তাঁহাদের সদুপদেশরূপ অমৃত পান করিয়া, অজর, অমর ও অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে সেরূপ অভিলাষ বা আমোদ বোধ হয় না। মদ কল কোকিল-কাকলী কোলাহল সঙ্কুলিত, মলয়মারুত মৃদুবেগ বিকম্পিত. মধুকর নিকর-করম্বিত, সুমঞ্জুল লতাকুঞ্জে প্রিয়-তমার সহিত বাক্যালাপ করিতে তোমার যেমন প্রীতি উপস্থিত হয় ও একাগ্রতা উপজাত হয়, তাপস তরুতলে নিরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক পরমার্থ পীযুষ রস পানে অমর ও অক্ষয় হইতে সে প্রকার বাসনার সঞ্চার হয় না। ভাল খাইব, ভাল পরিব, ভাল থাকিব ইত্যাদি অসার বিষয় সেবার অনুসন্ধান প্রসঙ্গে দিন দিন ক্ষীণ, হীন ও তেজোবিহিন হইতে তোমার যেমন চেষ্টা, অভিলাষ বা প্রবৃত্তি হয়, ভাল খাওয়াইব, ভাল পরাইব ইত্যাদি সাধু বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া পরমার্থপদবী পরিস্ফুরণ পূর্ব্বক নির্ব্বাণ পদে আরোহণ করিতে সে প্রকার প্রবৃত্তি হয় না। প্রিয়তমা রমণীর বিরহযোগ সংঘটন হইলে, তোমার যেরূপ অসহ্য দুঃসহ অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়া, মনকে ব্যাকুল বা স্বর্গভ্রষ্টের ন্যায় একান্ত বিষাদিত করে, সাধুসঙ্গের বিচ্ছেদ হইলে, তোমার কখনই সে প্রকার অবস্থার সংযোগ হয় না। তুমি বিচিত্র গৃহে, বিচিত্র আসনে উপবেশন

করিয়া আত্মাকে মলিন, ক্ষীণ ও ম্লান করিতে যে প্রকার অভিলাষী হও;— কুশাসনে আসীন হইয়া, ধ্যান ধারণা প্রসঙ্গে পরমার্থ সঙ্গীত রস পান করিয়া, আত্মাকে নির্ম্মল, নিষ্ণাত ও নির্ব্বাণপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাসনা হয় না।

বর্ষাকালীন নদীবেগ যেমন উদ্ধত, যৌবনের বেগ তদপেক্ষাও উদ্দাম হইয়া থাকে। নিতান্ত শিক্ষিত, সদ্‌বুদ্ধি ও ধৈর্য্যশালী না হইলে, যৌবনরূপ অপার জলধি পার হওয়া দুর্ঘট। অনেকেই ইহাতে অকালে মগ্ন হইয়া থাকে। যাহারা কথঞ্চিৎ উদ্ধার পায়, তাঁহাদেরও নিস্তার নাই। তাহারা প্রায়ই শক্তি হীন, সামর্থ হীন, ক্ষমতা হীন ও গতি হীন হইয়া থাকে। তাহাদের বৃদ্ধকাল পরম শোচনীয় মূর্ত্তি ধারণ করে। অথবা তাহাদের মধ্যে অনেককেই হয় ত বৃদ্ধ দশায় সুখাবলোকন করিতে হয় না। তাহারা অকাল জরা বা অকাল বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত হইয়া অকালেই কালের উদর পূরণ করে।

সুখও এই সময়ে এইরূপ অবস্থাপন্ন মানুষকে ত্যাগ করে। কেননা, প্রবৃত্তি সমূহ শতমুখী হইয়া প্রায়ই কুপথে ধাবমান হয়। তজ্জন্য অকার্য্যে অপব্যবহারে আসক্তি জন্মিয়া, দুঃখের শত সহস্র দ্বার বিস্তার ও সুখের সুপথ রোধ করে। বিজ্ঞ ব্যক্তি অবশ্যই এ বিষয় সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। যৌবন সমাগমে সৎশিক্ষা সর্ব্বতোভাবে অপেক্ষণীয় ও প্রয়োজনীয়। তাহা হইলে কথঞ্চিৎ স্বস্তি লাভের সম্ভাবনা।

এ জগতে সকল লোকেই সুখের জন্য কর্ম্ম করে, কিন্তু বুদ্ধির দোষে হিতে বিপরীত করিয়া, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের সঞ্চয় করিয়া থাকে। যাহা করিলে, ভাল হইতে পারে, সে বিষয় বুঝিতে না পারিয়া, তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করে ও তজ্জন্য অনিষ্ট যোগ ভোগ করে। আমি ভাল বুঝি, সকলেরই প্রায় এই প্রকার অভিমান আছে। ইহারই নাম বুদ্ধির দোষ। এই প্রকার বুদ্ধি দোষই মানুষের সুখের পথ রোধ করিয়া রাখে। ভ্রান্তমনা হইয়া, যে যে কার্য্য করে, তাহাই তাহার দুঃখের হেতুভূত হয়। অহম্মন্যতা অপেক্ষা বুদ্ধিদোষ আর কি হইতে পারে? বিধাতা অপেক্ষা বুদ্ধিমান কেহ নাই। তিনিই আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনিই সকল বুদ্ধির আকর। তিনি নিজ বুদ্ধিতে যাহা করিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার ব্যভিচার বা অন্যথা হয় না। তিনি বুদ্ধি বলে এই প্রকার মহানিয়তি স্থাপন করিয়াছেন, যে, যে ব্যক্তি অহম্মন্য হইবে, তাহার কখন ভদ্রস্থতা নাই। সে হিত করিতে গিয়া, বিপরীত করিয়া, আপনিই আপনার শত্রু হইয়া থাকে। এ বিষয়ে

কোন রূপ সন্দেহ বা অসম্ভাবনা নাই। লোকে আপনার বুদ্ধিদোষ সহসা বা সহজে বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারিলে, কখনও তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া, দুঃখ ভোগ করেনা।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনীষিগন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহার কিছুই নাই, সেই সুখী। সন্ন্যাসীদের কিছুই নাই, সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই সুখী। কিছু না থাকিলে, কোনরূপ বন্ধন থাকে না। দেখিতে পাওয়া যায় পক্ষীরা কেমন সুখে বিহার করিতেছে। সংসারের বদ্ধ মানবের মত উহাদের কোন রূপ বন্ধন নাই। যখন যেখানে ইচ্ছা, সেই স্থানেই থাকে এবং যখন যেরূপ ইচ্ছা, সেই মত আহার বিহারাদি করে। মানুষের মত ইহাদের প্রত্যাশা নাই, বাসনা নাই, এবং বিবিধ ভোগ বিলাসেরও চেষ্টা নাই। তজ্জন্য পক্ষীরা লালায়িত হইয়া, মানুষের মত লোকের দ্বারে দ্বারে উদয়াস্ত ভ্রমণ করে না। অন্যের গলগ্রহ হইয়া, অতি কষ্টে দগ্ধ উদর পূরণ করে না। প্রতারণা বা শঠতা করিয়া, পরের সর্ব্বনাশ পুরঃসর আপনার অভিলাষ সাধন করে না।

হায় মনুষ্য! তুমি কত দিনে সৎ হইবে, সৎ পথে চলিবে, সৎ স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া শান্তির সোপান অধিকার করিবে? তাই বলিতে ছিলাম যাহার কিছুই নাই, সেই সুখী।

আমি।

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী।

নাহি চাহি সম্রাটের রত্ন-সিংহাসন—
নাহি চাহি কুবেরের ধন-রত্ন-রাজি;
সে যদি আমারে করে প্রিয় সম্ভাষণ—
একবার হেসে চায়—তবে উঠে বাজি
নিদ্রিত মরম-বীণা মধুময় সুরে।
চকিতের পরশণে হৃদয় সরসে
ফুটে শত-শত দল হাসিয়া মধুরে,
সৌরভে ভুবন ভরি সুবাসিয়া রসে।

এ বিশ্ব-মুদিত হবে ধ্যান-সমাহিত,
দুইটি হৃদয় শুধু জেগে রবে চেয়ে—
দুহুঁ দোঁহা পানে সদা-তৃপ্তিতে তৃষিত—
উঠিবে মরমে গান—দিন যাবে গেয়ে!
সংসার সম্বন্ধ হীন—রব পূত অতি—
সমাধি ক্ষেত্রের তরু কুসুম যেমতি!

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

তাঁহার হৃদয়ের দুঃখের ছায়া মায়ের হৃদয় স্পর্শ করিলে তাঁহার প্রত্যবায় আছে। মাতৃ বাক্য অবশ্য প্রতিপাল্য। স্থির করিলেন তিনি সংসারী হইবেন। ক্রমে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। আজ গাত্র-হরিদ্রা ও আয়ুর্দ্ধান্ন। আনন্দ উৎসবের সীমা নাই। রজনী প্রভাত হইবা মাত্র রমণীগণের উলুধ্বনি, পক্ষীগণের কলধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া প্রতিবেশীদিগকে সানন্দে জাগরিত করিল। গ্রামস্থ গণ্য মান্য সকলেই বিবাহের গৃহে আগমন করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদর ও আপ্যায়িত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহের ভার দিতে লাগিলেন। বিবাহে রমণীগণের আনন্দ উৎসাহ অধিক। অনেক স্ত্রীলোকের সমাগম হইল। কমলাকান্তের মাতা তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত আহ্বান করিয়া "দেখ মা, কর মা" ইত্যাদি বাক্যে এ ঘর ও ঘর করিয়া গাত্র হরিদ্রার যোগাড় ও গাত্র হরিদ্রার তত্ত্ব লাকুড্ডীতে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। লাকুড্ডী চান্না হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ। চান্না হইতে গাত্র হরিদ্রা লইয়া যাইলে বধুর গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটীতে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্ত্রীলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ওগো মা লক্ষ্মীরা, তোমরা গোলমাল করিয়া আর সময় নষ্ট করিও না। শীঘ্র কমলের গাত্রে হরিদ্রা স্পর্শ করাইয়া হরিদ্রা দাও, আমি লাকুড্ডীতে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।" সাত

জন এয়ো সাধকের অঙ্গে হরিদ্রা লেপন করিতে বসিলেন। সম্বন্ধ অনুসারে কেহ কপালে, কেহ মুখে, কেহ বক্ষ দেশে হরিদ্রা মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। মানুষ মাত্রেই পরিহাস প্রিয়। বিশেষতঃ সময় ও সম্বন্ধ অনুকূল হইলে রমণীগণ পরিহাস পরিত্যাগ করিতে পারেন না। হরিদ্রা মর্দ্দন করিতে করিতে এক জন রমণী বলিলেন,—"ঠাকুর পো, বাসরঘর বড় জম্‌কালো কর্ব্বে।" দ্বিতীয় কহিলেন,—"পার্ব্বেত, না, তখন বোবা হয়ে থাক্‌বে।" তৃতীয় কহিলেন,—"আমার ঠাকুর পো মুখ খুল্লে আর কাহাকেও গান কর্ত্তে হবে না, বিয়ের বাড়ী নাট মন্দির করে তুল্‌বে, পাড়ার মেয়েরা গান শুন্‌তে দৌড়ে আস্‌বে।" উহাদের মধ্যে বয়স্কা জনৈকা বলিলেন,—"দেখো ভাই গাঁয়ের নাম রেখো, কেবল না মা বল্লে হবে না, টপ্পা গাইতে হবে, কই তোমার মুখে কখনও ত টপ্পা শুনি নাই, টপ্পা শিখেছ ত?" আর এক জন কহিলেন,—"টপ্পা কি তোমাদের কাছে গাইবে, সময় পেলেই গাইবে। যে এত গান জানে, নিজে গান কর্ত্তে পারে, সে কি টপ্পা জানে না, টপ্পা বেঁধে গাইবে, ওই দেখ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌ছে। বাসর ঘরে বউ দিদি পাশে বস্‌লে ঠাকুর পোর দিল খুলে যাবে, তখন স্ফূর্ত্তি দেখ্‌বে।" অন্য এক জন কহিলেন,—"তোমরা ত দেখ্‌তে পাবে না।" সাধক রমণীগণের মনস্তুষ্টির জন্য একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কেন তোমরা ফুল সজ্জা দেখ্‌বে।" বামাগণ সকলে হাস্য করিয়া কহিলেন,—"দেখ্‌লে তোমাদের কাছেই এই, সেখানে না জানি কি কর্ব্বে।" বর্ষীয়সী কহিলেন,—"বেশ বলেছ দাদা, বেঁচে থাক।" এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"কি গো মারা! হ'ল গায়ে হলুদ দেওয়া হল, আমায় একটু হলুদ দাও, বেলা হয়ে গেল, লোক পাঠায়ে দি।" একজন স্ত্রীলোক একটু হলুদ আনিয়া দিলেন। সাধকের গাত্র হরিদ্রা শেষ হইল, তিনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, যজ্ঞোপবীত, বস্ত্রাদির দিকে দৃষ্টি করিয়া ভাবিলেন, "রং না মাখিলে সং সাজা হয় না। সংসারে থাকিতে হইলে কত সং সাজিতে হইবে। পুত্র পরিবার, পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, বন্ধু-বান্ধব, শত্রু-মিত্র, প্রতিবেশীগণ কত সং সাজিবে ও সাজাইবে। হাস্য, চিৎকার, ছুটাছুটী কত অভিনয়ের বশবর্ত্তী হইতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মায়ার পর্দ্দা দ্বারা চারিদিক বন্ধ করিয়া মা আমার পুরুষত্ব, অভিমান ও অহঙ্কারের আলো জ্বালিয়া দিবেন। লীলাময়ী লীলা দেখিবেন, এ জীবনটা গোলমালেই কাটিয়া যাইবে। মায়ার পর্দ্দা কাটিয়া বাহিরে দাঁড়াইতে পারিব না। জ্ঞানের আলো আমার অন্তর্দৃষ্টিকে আহ্লাদিত করিবে না। নির্জ্জনে

বসিয়া কৃপাময়ীর অনুপম রূপ ও পরমানন্দ ভোগ করিতে পারিব না। প্রলাপ গ্রস্ত রোগীর ন্যায় চারি দিকে বিচিত্র বর্ণের বীভৎস মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। হায়, হায়! মা? তাই কি আমাকে সংসারের প্রথম রং মাখাইলে, দেখি তোমার ইচ্ছা কি? নিতান্ত শরণাপন্ন কিঙ্করকে চরণে স্থান কি দিবে না! যদি না দাও, তবে কেন তোমাকে ভালবাসাইতে শিখাইলে?" বাস্তবিক সং সাজা। সর্ব্বাঙ্গে গাত্র হরিদ্রা, দক্ষিণ হস্তে দুর্ব্বাসহ সূত্র-বন্ধন, কোমরে জাঁতি। সূত্র-বন্ধন সংসারের বন্ধন সূচক, জাঁতিটী বিলাসের পরিচয়। বর্ত্তমান অপেক্ষা পূর্ব্বে পান সুপারি চর্ব্বণের প্রথা অধিক ছিল। গুভ্র দন্ত দরিদ্রের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহা "শালুক খেয়ে দাঁত কাল, লোকে বলে আছে ভাল।" এই পুরাতন প্রচলিত শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়। পান সর্ব্বদেশে সর্ব্ব সময়ে বিলাসের দ্রব্য। মহাকবি তুলসীদাস পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে শিবশঙ্কর, তুমি যদি আমাকে সংসারী কর, তাহা হইলে আমাকে পান পুরাণ সোহাগিন সঙ্গ, গোদ খেলায়ত সুন্দর বালা" দাও যদি না দাও, আমি চাহি না "দেহিমৃগছালা।" যদি আমাকে সংসারী কর, তবে আমাকে পুরাণ পান, সুন্দরী রমণী দাও, না দাও, আমাকে সন্ন্যাসী কর। এখনও উড়িষ্যা দেশে পুরুষ মাত্রেই পানের থলি কোমরে রাখিয়া থাকে। পান সুপারি চির কালই বিলাসের দ্রব্য, বধূকে স্বামীগৃহে আসিয়া প্রথমে সুপারি কাটিয়া দিতে হয়, এ প্রথাও অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়।

সাধক বহির্দ্দেশে আসিবামাত্র সমবয়স্কগণ নবভাবে প্রিয় সম্ভাষণ করিল। কেহ বলিল,—"বেশ সাজিয়াছ। তোমার মুখে সংসার পরিত্যাগের প্রশংসা সর্ব্বদা শুনিতে পাই। সন্ন্যাস বেশ, বড় ভাল। টোল পরিত্যাগ করিয়া বহুদিন গেরুয়া বাস পরিত্যাগ কর নাই। এ তোমার উত্তম সন্ন্যাসই বেশ। হরিদ্রাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—একি! ভস্ম লেপন বুঝি? জাঁতিটীকে ধরিয়া বলিল,—"এটী বুঝি ত্রিশূল?" দুর্ব্বাবন্ধনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা বুঝি!" দ্বিতীয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বালাই, সন্ন্যাসী বেশ কেন, দেখ্‌ছনা, নটবর বেশ। সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন, জাঁতি নহে, মদন বাণ, অক্ষমালা নহে, ফুলশর। কাল মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হবে, পুরুষ:প্রকৃতির মিলন হবে। সাধক হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"প্রকৃতিই পুরুষের বল। প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষের অস্তিত্ব অসম্ভব। পুরুষ প্রকৃতির বিকাশ মাত্র।

প্রকৃতি হইতেই পুরুষের উৎপত্তি। সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে মহাশক্তি সম্পন্না যোগ-মায়া-রূপিণী প্রকৃতির সাকার রূপের নাম পুরুষ। তৃতীয় কহিলেন,—ভাই তোমার কাল হইতে আর এ সকল বুজরুকী চলিবে না। ইহার পর তোমার মুখে নিশ্চয়ই অন্য কথা শুনিতে পাইবা বিষয়, ব্যবসায়, জমী, জায়গা, অন্নবস্ত্র, এই লইয়া কত তর্ক বিতর্ক, কত চিন্তা, কত কল্পনা করিতে হইবে তাহার জন্য প্রস্তুত হও। চতুর্থ বলিলেন,—"বিবাহ করিলেই কি ইষ্ট চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হইবে? এ কথা আমি স্বীকার করি না। সংসার প্রতিপালন করিয়াও ইষ্ট চিন্তার সময় যথেষ্ট থাকে। সংসার চিন্তায় মনসরোবরকে একবারে মলিন ও আবর্জ্জনা পূর্ণ না করিলে, আমার বিশ্বাস, তাহাতে পরকালের সম্বল পুণ্য-শতদল জন্মিতে পারে, সৌরভে গৌরবে প্রস্ফুটিত হইয়া লোক সমাজকে সুখী করিতে পারে এবং পুণ্য-মার্জ্জিত আত্মা পরিণামে শ্রীহরিপাদ-পদ্মে স্থান পাইতে পারে।" প্রথম কহিলেন,—"পুণ্য কি সংসার ছাড়া, সৎকর্ম্মে মন থাকিলে সব হয়। সাধকের কাণের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—একি কাণের ভিতর হলুদের ঢেলা কেন?" তৃতীয় কহিলেন,—দাঁড়াও, এখনি কি, ছাল্‌না তলা পার হতে দাও, তবে বুঝ্‌তে পার্ব্বে বিবাহ কি শক্ত ব্যাপার। বড় বড় চাপড়, কাণ মলাতে বেদম করে ফেল্‌বে। সাধক হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বিবাহ করলেই নানা ঝঞ্ঝাটে পড়্‌তে হবে, কতই লাঞ্ছনা সইতে হবে, মেয়েরা ছাল্‌না তলাতেই তার নমুনা দেখিয়ে দেয়।

এদিকে অন্তঃপুর মধ্যে রমণীগণের গাত্র হরিদ্রা মর্দ্দনের হুলাহুলি পড়িয়া গেল। তেল দাও, হলুদ দাও, মাখ মা, ভাল করিয়া মাখ, ইত্যাদি বামাকণ্ঠ-স্বরে অন্তঃপুর মুখরিত হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে উলুধ্বনিতে অন্তঃপুর ও বহির্মহল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তৎকালে হরিদ্রা মর্দ্দনের বিশেষ প্রচলন ছিল, এমন কি স্ত্রীলোকেরা যে ঘাটে স্নান করিতেন, সে ঘাটের জল ঘোর হরিদ্রাবর্ণ হইত। কাল বিশেষে রুচিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন আর নিত্য হরিদ্রা মর্দ্দনের প্রথা নাই। নৈমিত্তিক প্রথাও অতি সংক্ষেপে সম্পাদিত হয়, বিবাহাদি কর্ম্মে হরিদ্রা স্পর্শ করেন মাত্র। সধবার লক্ষণ সিন্দুর, তাহারও উপর বীততৃষ্ণা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে সধবাগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত সীমন্তে সিন্দুর গ্রহণ করিতেন। ললাট গগণে সিন্দুর রেখা জবাকুসুম সন্নিভ প্রদোষ-কালিন সূর্য্যরশ্মির ন্যায় শোভা ধারণ করিত। এখন ব্রাহ্মগণ অনেকে সূচিকার অগ্রে সূক্ষ্ম ভাবে কপালে সিন্দুর গ্রহণ করেন।

হরিদ্রা মর্দ্দনে ও সিন্দুর গ্রহণে অপ্রবৃত্তি কেন? আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। বামাগণকে সর্ব্বদা অন্তঃপুর মধ্যে থাকিতে হয় ও শরীর ঘর্ম্মাক্ত থাকে। হরিদ্রা দুর্গন্ধ নাশক ও চর্ম্মরোগ নিবারক, তাই হরিদ্রা মর্দ্দন প্রথা সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। সমাজ ও কাল পরিবর্ত্তন প্রিয়। অনেক স্থলে উত্তমের স্থান অধম, ও অধমের স্থান উত্তম অধিকার করে। এখন যেমন স্ত্রীলোকেরা নিমন্ত্রণে কি অন্য কোন স্থানে যাইতে হইলে কেশ কলাপে আতর গোলাপ সুগন্ধ তৈলাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন তখন রমণীগণ স্থানান্তরে গমনের দিনে বেশী করিয়া হরিদ্রা মর্দ্দন করিতেন। সাধারণের মধ্যে এই প্রথা অতি প্রবল ছিল, তাহা নিম্ন লিখিত সাধারণ মধ্যে চলিত শ্লোকে অনুমিত হয়,—"তোদের হলুদ মাখা গা, তোরা রথ দেখ্‌তে যা। আমরা হলুদ কোথা পাব, আমরা উল্‌টা রথে যাব।" তখন মধ্যবর্ত্তী লোকের মধ্যে বিবাহে জলপান বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। জলপান বলিলে মুড়ী, মুড়কী, খই, লাড়ু, লুচি পর্য্যন্ত বোঝায়। এখনও অনেক স্থলে বিবাহে জলপান বিতরণের প্রথা আছে, কিন্তু খাদ্যের অভাবে ক্রমে এই প্রথা সমাজচ্যুত হইতে চলিয়াছে। কমলাকান্তের জননী মনের আহ্লাদে তৈল হরিদ্রা ও জলপান বিতরণ করিতে লাগিলেন, এইরূপ মহাসমারোহে গাত্র হরিদ্রা ও আয়ুর্দ্ধানের দিন কাটিয়া গেল।

বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। সধবাগণে অতি প্রত্যুষে মাঙ্গলিক কলসী জলপূর্ণ করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। সুখ-চিপিটক ভক্ষণের হুলাহুলি পড়িয়া গেল। রমণীগণ প্রতি গ্রাসে উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঊষা দেবী সুহাস্যে তাহাদের হাস্য উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গমগণ প্রত্যুষে তাহাদের উলুধ্বনির সহিত যোগ দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বাসা পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ চলিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরযাত্রী দিগের আহারের ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের সত্বর ব্যবস্থা করিতে ব্রতী হইলেন।

পল্লীগ্রামে মধ্যবর্ত্তী লোকের বিবাহে বরযাত্রী দিগের জন্য হস্তিযান, অশ্বযান, ও নরযানের ব্যবহার এখনও নাই, পূর্ব্বেও ছিল না। গোযানের প্রচলন ছিল কিন্তু বর্ত্তমানের মত নহে। এক্ষণে অনেকে পদব্রজে কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত হওয়া অপমানের বিষয় বিবেচনা করেন। কাজেই বরকর্ত্তাকে বিস্তর গো-যানের সংগ্রহ করিতে হয়। তখন বালক, বৃদ্ধ, স্থবীর ও স্ত্রীলোক ব্যতীত কেহই গোযানে আরোহণ করিতেন না। গোযানে গমন কাপুরুষের কার্য্য

বলিয়া বিবেচিত হইত। অনেকেই বলিষ্ঠ ও শ্রম সহিষ্ণু ছিলেন। খাদ্যের অভাব ছিলনা, সকলেই পুষ্টিকর খাদ্য ও তৎপ্রসূত সংসারের সুখ শান্তি ভোগ করিতে পারিতেন। গ্রামান্তরে যাইতে হইলে অনেকে প্রবল রৌদ্রের সময় তাল-পত্রের ছত্র পর্য্যন্তও গ্রহণ করিতেন না, পথের সম্বল গাত্র-মার্জ্জনী, পরিধান বস্ত্র ও কোন স্থলে একটী হুঁকা মাত্র লইতেন, ধূম পানের প্রচলন বর্ত্তমানের মতই ছিল, পথি মধ্যে গ্রাম পাইলে তামাক সেবন করিতেন। গ্রামবাসীরা যথেষ্ট সম্মানের সহিত ধূম পান করাইতেন এবং আগন্তুকের সমুদয় পরিচয় লইতেন, স্নান ও আহারের সময় হইলে, অভ্যাগতকে স্নান আহার না করাইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিতে দিতেন না। প্রায় সকল গ্রামেই ব্রাহ্মণের বাস ছিল। যে গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস না থাকিত, অন্য গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাস করান গ্রামবাসীরা আপন কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। যে গ্রামে কেবল মাত্র মুসলমানের বাস সেখানেও হিন্দুর জলগ্রহণ উপযুক্ত জাতির বাস থাকিত। সঙ্গতিশালী মুসলমানগণ হিন্দু ভাইদিগের আহারাদির ব্যবস্থা ও সম্মান করিতে পারিবেন বলিয়া, উপযুক্ত বৃত্তি দিয়া হিন্দুদিগকে তাঁহাদের নিকটে বাস করাইতেন। তখন দূরবর্ত্তী গ্রামে যাইতে হইলে কাহাকেও অর্থ সম্বল লইয়া যাইতে হইত না। হায়, হায় আজ বাঙ্গালায় সে ভাব নাই। গ্রামের মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তি দেখিলে "মহাশয় আপনার বাড়ী কোথায়, কোথায় যাইবেন" আর কেহই জিজ্ঞাসা করেন না, এমন কি স্থল বিশেষে কেহ কেহ তৃষ্ণাতুর জলপ্রার্থী পথিককে ইঙ্গিত দ্বারা পুষ্করিণী দেখাইয়া দেন, পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ দোষাবহ বিবেচনা করেন। সমাজের সহৃদয় ভাব যেন ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিতেছে। হায়! বাঙ্গলা কি জন্য তুমি তোমার পূর্ব্ব পুরুষ দিগের সরলতা ও উদারতা পরিত্যাগ করিতেছ। তুমি উদারতাকে আশ্রয় কর, উদারতা সুখ ও স্বাস্থ্যের মূল। তুমি উচ্চ, নীচ, দোষী নির্দ্দোষী, নিঃস্ব ধনাঢ্য, পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে প্রিয় সম্ভাষণ, অভিবাদন, সহাস্য বদনে আলাপ পরিচয় ও সহানুভূতি শিক্ষা দাও।

লাকুড্ডীতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী বিবাহের আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণ। বহির্গৃহ সজ্জিত। গ্রামস্থ অনেক ভদ্রলোক ও সাধারণ সমাগত। বাহিরে কুমারীগণ 'ওই বর আসিতেছে' বলিয়া হুলাহুলি করিতেছে। অন্তর্হলে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সাধক কালীনাম ধ্যান করিতে করিতে বরযানে উপস্থিত হইলেন। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও কোলাহলের সীমা

রহিল না। ছোট ছোট কুমারীগণ আসিয়া বলিল,—"তোমার জাতিখানি দিয়া এই সুপারিটী কাটিয়া দাও।" কেহ বলিল,—"একেবারে কাট্‌তে হবে," কেহ বলিল,—"দেখিব, কেমন জোর," কেহ বলিল,—"দেখো যেন হাত কাটে না।" সাধক কুমারীদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। রমণীর দাসত্ব নিয়োগের এই প্রথম সূচনা। সাধককে বরের আসনে বসান হইল। পূর্ব্বের প্রথা অনুসারে বরযাত্রীদিগের সামান্য জল যোগের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এখনও দূরাগত বরযাত্রী দিগের প্রথমে সামান্য জল যোগের ব্যবস্থা আছে। জলযোগের পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিবাহের অনুমতি লইয়া পাত্রকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। কন্যা ও বরপক্ষীয় দিগের তর্ক বিতর্ক ও বিচার আরম্ভ হইল। গ্রামের শ্রেষ্ঠতা পতিপন্ন করিবার জন্য উভয় দলের ঘোরতর বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। তখন বিবাহ ইত্যাদি স্থলে পারসী, আরবী ভাষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শুভঙ্করের অস্থিত পঞ্চক এই সকল বিষয়ের বিচার হইত। স্থল বিশেষে শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়া বিতণ্ডার শেষ হইত। কন্যা কর্ত্তা বিপন্ন হইতেন। জ্ঞান বৃদ্ধ দিগের দ্বারা অতি কষ্টে উভয় পক্ষকে শান্ত করা হইত। কন্যা দলস্থ একজন উঠিয়া সভামধ্যে বরযাত্রী দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনাদের মধ্যে কেহ কি আরবী, পারসী জানেন?" তৎক্ষণাৎ বরযাত্রী পক্ষ হইতে পারসী ভাষায় প্রতিধ্বনিত হইল "চান্নার প্রায় সকল ভদ্র লোকই পারসী জানেন, আরবী জানা লোকও এখানে উপস্থিত। চান্নার পারসী ও লাকুড্ডীর পারসীর প্রভেদ অনেক।" পারসীতে কিয়ৎক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডার পর অন্যান্য বিষয়ের বিচার চলিতে লাগিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সৌভাগ্য ক্রমে উভয় পক্ষে হাতাহাতি হইল না, বরযাত্রীদিগকে গ্রামান্তরে আসিয়া সমস্ত রাত্রি জঠর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না। বিবাহের শেষ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ের তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল।

এদিকে অন্তঃপুরে ছাল্‌না তলায় ঘোড় মাথায় সাধক বসিলেন। সম্মুখে পূর্ণপাত্র তদুপরি কুশময় ব্রাহ্মণ, পার্শ্বে গঙ্গাজল তুলসী ও বিল্ব। বরের সজ্জিত পরিধান বস্ত্র ও গাত্রবস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া পট্ট বস্ত্র পরিধান ও উত্তরীয় প্রদান করা হইল। বিবাহের মন্ত্র আরম্ভ হইল। বর আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া পরিণয়ে প্রতিশ্রুত হইতে লাগিলেন। বিবাহের সাক্ষী বিল্ব গঙ্গাজল ও দর্ভময় ব্রাহ্মণ, যাঁহারা অবিনশ্বর, সাক্ষাৎ ও সত্যস্বরূপ,—যাহাদের কখনও ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। সাক্ষীগণ রক্ত মাংসময় দেহধারী মানব নহেন হিন্দুর

পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস। হিন্দুর মতে পরজন্ম দিবসের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিবসের ন্যায় অতি নিশ্চিত। পরমাত্মা অবিনশ্বর, আত্মা তাঁহার অংশ। হিন্দুর বিশ্বাস ইহ জন্মের সমুদয় কর্ম্মের ফল লইয়া আত্মা পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন। জন্ম ও মৃত্যু, দেহ ও ব্যাধি, বৃক্ষ ও ফল, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল অবিচ্ছিন্ন। জন্মান্তর অদৃশ্য হইলেও ইহ জন্মের সুখ শান্তি ও সমুদয় ফলাফল পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফলের বিকাশ মাত্র। ইহা পরীক্ষার জন্য প্রজ্ঞা চক্ষুর প্রয়োজন হয় না, সংসারের দিকে চাহিয়া একটু চিন্তা করিলেই প্রতীয়মান হয়। সহধর্ম্মিণীর প্রতি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করিয়া মানব ইহ জন্ম সুখ স্বচ্ছন্দে অতি বাহিত করিতে পারে কিন্তু জন্মান্তরে তাহাকে কৃত কর্ম্মের ফলভোগী নিশ্চয়ই হইতে হইবে। বিচার ব্যতীত কেহই দণ্ডনীয় হয় না। শুদ্ধ মানব রাজত্বের এই নিয়ম নহে, বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-রাজত্বেরও এই নিয়ম। বিবাহে অঙ্গীকৃত বিষয়ের প্রত্যবায়ে সাক্ষীর প্রয়োজন। বিষ্ণু, গঙ্গাজল, তুলসী, দর্ভময় ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কে পরকালে সাক্ষী দিতে সক্ষম? তাই বিবাহে ইহাদের সম্মুখে অঙ্গীকার করান হয়। পবিত্রতার বিঘ্ন হইলে হিন্দুর কোন কর্ম্মই শাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন হয় না, সেই জন্যই রক্তমাংসময় ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি স্বরূপ কুশময় ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করা হয়। সাধক বয়সে যুবা হইলেও জ্ঞান বৃদ্ধ। বিষ্ণু, তুলসী, গঙ্গাজলের সম্মুখে অঙ্গীকার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন,—কি ঘোরতর বন্ধন! সমস্ত জীবনের ও পরকালের শক্তি সঞ্চারিণী রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে বসিয়াছি। যদি কামিনী আমার মনের অনুগামিনী না হয়, হায়! হায়! তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে। সন্ন্যাসীদত্ত মন্ত্র স্মরণ করিয়া দেখিলেন, সর্ব্ব কর্ম্ম বিধায়িনী প্রসন্নময়ী সর্ব্বমঙ্গলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। সাধক মনে মনে বলিলেন,—"মা তোমার ইচ্ছা পরিপূর্ণ হউক। অবগুণ্ঠনবতী হরিদ্রা রঞ্জিত নববস্ত্র পরিধানা কন্যা সমানীতা হইয়া বর পার্শ্বে স্থাপিতা হইল। কন্যাকর্ত্তা বরের হাটু ধরিয়া সম্প্রদান মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থানান্তরিত হইলেন। পুরোহিত ব্রাহ্মণ "উৎবহস্ব, উৎ বহামি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইয়া বিবাহ শেষ করিলেন। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের শক্তি অসীম, ব্রাহ্মণের সেই শক্তি ঋষি [illegible] বাক্যের উপর। ঋষি প্রণীত ব্রাহ্মণ মুখ নিঃসৃত বাক্য সকল হিন্দু জীবনে [illegible] সম্পন্ন। জাত কর্ম্ম অন্নপ্রাশন হইতে হিন্দুর ঊর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ সকল কর্ম্মের বিধান কর্ত্তা। ব্রাহ্মণের উচ্চারিত বাক্য সকল ভ্রম পূর্ণ ও

দুর্ব্বোধ্য হইলেও কর্ম্ম সুসম্পাদিত হইয়াছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সে কর্ম্ম অসম্পাদিত আছে, ইহা কাহারও বলিবার ক্ষমতা নাই। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে কথিত আছে, ব্রাহ্মণ কুটিল, কদাচারী ও লোভী হইলেও তাহার অবমাননা করিওনা, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সম্মান করিবে, সেই অন্তর্নিহিত শক্তি পুরুষ পরম্পরা প্রাপ্ত ও সমাজ প্রদত্ত।

সাধক-সঙ্গীত।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

কাফী মিশ্র—একতালা।

(একবার) হৃদয় মাঝে উদয় হও হে গোলক বিহারী।
(আমি) নয়ন মুদে দেখ্‌বো তোমার রূপের মাধুরী॥
(মোহন) ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, করে বাঁশরী।
(দাঁড়াও) জ্ঞান কদম্ব মূলে, বামে লয়ে কিশোরী॥
(বাঁশী) 'রাধা' 'রাধা' সাধা বোলে বাজ্‌বে মুরারি।
(আমার) প্রেম যমুনা উজান ব'বে তুলে লহরী॥
হৃদয় হবে বৃন্দাবন তোমার নেহারি।
আঁধার কানন হবে তখন আলোকের পুরী॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বনের পাখী শুকসারী।
(গাবে) সুতানে "রাই কৃষ্ণ" ব'লে গগন বিদারি॥
(আমি) নামে রূপে মত্ত হ'য়ে আপ্‌না পাসরি।
অন্তরে বাহিরে তোমার দেখ্‌বো শ্রীহরি॥

ইষ্ট-কবচ।

(গল্প)

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

(১)

"কৌমার যখন তার, বলিত সে বারম্বার,
সে আমার আমি তার অন্য কারো হবনা!
অরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার,
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হলনা।"

অস্ফুট স্বরে কবি হেমচন্দ্রের ঐ কয়টী হতাশের কথা রেণুপ কুমারের মুখ হইতে বেরিয়ে পড়্‌ল। বেরিয়ে পড়লেও রেণুপ তা জানিতে পারে নাই। কেন না, সে তখন ছাদে বসিয়া নীল আকাশের নীলিমায় কোলে সন্ধ্যার ছায়া দেখিতেছিল।

পশ্চাতে যুবতী স্ত্রী বিলোলা লহরী। রেণুপের হুঁস নাই। বিলোলা চুপি চুপি রেণুপের পেছন হইতে তার চোখ দুটি টিপিয়া ধরিয়া চাপাহাসি হাসিল। সে কে? এর উত্তর রেণুপকে দিতে হইবে, এইটীই এই রহস্যের তাৎপর্য্য।

রেণুপ চোখ টেপা হাতখানিতে হাত দিয়া দেখিল, এ ত সেই চিরপরিচিত বিলোলার বিলোল মৃণাল।

রেণুপ প্রকাশ্যে বলিল, "বাঃ ঠিক হয়েছে, দুইটী মৃণালের ডগায় দুইটী আঁখি কমল এখন মুদ্রিত; সন্ধ্যাকালে তো কুট্‌বেনা, বুঁজেই যাবে, তাই বুঝি এই ব্যবস্থা?

বিলোলা চোখ দুটী ছাড়িয়া দিয়া রেণুপের কাছে এসে বলিল, "বা তুমি আর দুই এক সেঞ্চুরী আগে জন্মিলে বেশ হইত, তাহইলে এই কবিত্বের একটা মর্য্যাদা পেতে। এমন চাঁদ চকোর, মৃণাল-পদ্ম, মেঘ চাতক এসব দৃশ্যবস্তুর উপমা দিতে নাম কেনা চলে না। সে যুগ আর নাই। ব্যাস বশিষ্ঠ হইতে সবীন সেন পর্য্যন্ত এ সব উপমায় নাম পেয়েছেন। এখন মিষ্টিক যুগের সূত্রপাত, এখন অসমঞ্জস লোকের ভাবে বিভোর হইয়া একটা অদ্ভুত রকমের কিছু খুঁজিয়া ফেল, যাহা কেতাবে নাই, কোরাণে নাই, যাহা দেখা যায় না, শুনা যায় না, ভাবা যায় না, বলা যায় না, বুঝা যায় না; বুঝান যায় না, এক কথায় যাহা অবাঙ্ মনসো, গোচর, এমন একটা কিছু বলিতে পারিলেই এখন বাহাদুরী। তোমার ও মৃণাল আর কমল, উহাতে চলিবে না।"

রেণুপ। বা! তুমি যে একটা মস্ত বড় লেক্‌চার ঝেড়ে নিলে, দেখ্‌ছি? কোন স্থানের সভা-নেত্রী টেত্রী হবার ইচ্ছে আছে না কি? মাইরি, এমন একটা বক্তৃতা শুনলে নিতান্ত বুদ্ধের প্রাণেও যেন কেমন একটা উত্তেজনা আসে। তাই কবির ভাষায় তোমরা রসবতী, রসিকা, রসময়ী, তাই নিতম্বের উপরে গহমার নাম পর্য্যন্ত "রসনা" তাই নারী বিহনে মন সংসারে রসে না আর বসে না।

বিলোলা তখন মুচ্‌কি হেসে একটু বিলোলা কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, সব শুনিছি!

রেণুপ। কি শুনেছি?

বিলোলা। সত্য বল্‌বে? না জিজ্ঞেসা কর্‌ব, ঠিক উত্তর দিবে?

রেণুপ। ঠিক বল্‌ব।

বিলোলা। অই যে হেম বাবুর হতাশের আক্ষেপে কি কতকগুলি ছাই ভস্ম আছে—"কার ধন কারে দিলি, আমার সে হল না" ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি সেই পাপের কথাগুলি বেহুঁস অবস্থায় ব'লে ফেলছ, আর আমি সর্ব-জান্তা অন্তর্য্যামী ভগবানের মত সব শুনে নিয়েছি! তবে রে চাঁদ, তুমি মনের মধ্যে একটা বাজার বসিয়েছ? এখন শিগ্‌গির পাপের কথাগুলো ব'লে মনটাকে সাদা দুধের মত ক'রে ফেল।

রেণুপ। আচ্ছা, বেশ? তা বল্‌ছি; শোন।

বিলোলা। তুমি তো বেহুঁস প্রেমিক; খবরদার যেন কোন কথা বাদ না পড়ে; ঠিক ঠিক কাঠগড়ার আসামীর মত বলে যাবে।

রেণুপ। আমার কাহিনী শুন্‌বের আগে অন্য একটী কথার জবাব দেও।

বিলোলা। কি কথা?

রেণুপ। এই যে, এইমাত্র বল্‌লে যে হেম বাবুর হতাশের মধ্যে কার কি কতকগুলো ছাইভস্ম আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে! আচ্ছা, অতবড় কবি, তার লেখাগুলো হ'ল ছাইভস্ম।

বিলোলা। হতাশের আক্ষেপ পদ্যটা যে ছাইভস্ম, তা আমি দু'শবার—দু হাজারবার—দু লক্ষবার বল্‌ব। গেরোস্থর মেয়ে একজনের সঙ্গে বিবাহিতা

হয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রণয়ের কথা বলে, অপরকে বলে, "ছিলাম তোমার আমি, তুমিই আমার স্বামী, ফিরে জন্মে প্রাণনাথ পাই যেন তোমারে।" এর চেয়ে হিন্দুর মেয়ের কলঙ্কের কথা কি আর আছে? যে কবি এই আদর্শ সমাজের সাম্‌নে ধরেছেন, তাঁকে বড় কবি বল্‌ব না তো আর কাকে বল্‌ব? যে সমাজে সীতার আদর্শ শুক তারার মত জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বল্‌ছে সেই সমাজে আজ এই আদর্শ! ছি! ছি! ছি! অমন অপরূপ কবির আর বড়াই ক'র না। ও সব ছাই ভস্ম তুলে যাও। দুটো কথায় ছটা থাক্‌লে কবি হয় না, ভাবের ছটা থাকা চাই, আর তাহাতে সমাজের বিরাট চরিত্রের উন্নেষ উন্নতিও ঘটিবে, সমাজ ক্রমোন্নতির দিকে উঠিতে থাকিবে, এমন লেখা যার হাত দিয়ে বেরোয়, তাকেই কবি বল্‌তে হবে।

রেণুপ। বহুত আচ্ছা, রক্ষা কর বাবা, এখন আমার এজাহার শোন। সে আজ অনেক দিনের———

বিলোলা। র'সনা! ঐ যে শিড়ীর উপর কার পায়ের শব্দ শুনা যাচ্ছে। তোমার কোন্ ইয়ার আস্‌ছে, আমি যাই, তুমি খুব বেশী আড্ডা দিও না। শিগ্‌গীর, শিগ্‌গীর নীচের এস।

(২)

রেণুপ। আচ্ছা, বন্ধু তুমি চুপে চুপে এলে কেন বল দেখি; মাইরি, আমার জান্‌বের বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

দক্ষিণে। তোমার তো বাল্য জীবনের প্রণয় ব্যাপার আমি সবই জানি। যার প্রাণের উপর দিয়ে অত বড় একটা জয়দেবী পিরীতের তুফানের মত ব'য়ে গিয়েছে, এই বিলোলা-লহরীর প্রেম লহরী তার প্রাণে কেমন ছুট্‌ছে, দেখ্‌বের বড় সাধ হয়ে ছিল; তা ভাই তোমার লহরী বড় চতুরা; আমার গন্ধ পেয়েই একেবারে সাপের মত সাঁ করে পালিয়ে গেলেন। তবে তোমাদের কথা যে একটু আধটু না শুনেছি, তা নহে। আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছ বাবা! এইবারই তোমার পিরীতের রোগ সেরে যাবে।

রেণুপ। তা ত যাবে! কিন্তু ভাই আমার বিলোলা ত অতি কোমলা—সুচারু হাসিনী—সুমধুর ভাষিণী—সুমন্থর গামিনী। তবে তুমি তাকে উপহাস করছ কেন?

দক্ষিণে। না বন্ধু ভুল বুঝে নিও না। আমি স্ত্রীজাতিকে শ্রদ্ধাই করিয়া থাকি। সূতিকাগৃহ হইতে ঠাকুর ঘরে নৈবেদ্য কারিণী, সন্তানেত্রী হইতে

আরম্ভ করিয়া মলমূত্র পরিষ্কার কারিণী—সব বিভাগেই এই গৃহলক্ষ্মীরা বিরাজমানা। সমস্ত বিভাগেই এদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।

রেণুপ। আচ্ছা ভাই, তা'তো হল, তুমি আড়ি পেতে কিছু কিছু শুন্‌তে পেয়েছ বল্‌লে না? কি শুনেছ ভাই?

দক্ষিণে। আর কথা কিছু নয়, মনে হইল যেন একটা কি জান্‌বার জন্য তোমাকে উঠে পড়ে ধরেছেন।

রেণুপ। ঠিক! সেই পারুল কুমারীর কথা।

দক্ষিণে। কি করে টের পেলেন?

রেণুপ। কি জানি? কি একটা হতাশের কথা নাকি অজ্ঞাতসারে বেহুসের মত বলে ফেলেছি, আর সেইটে নাকি বিলোলা শুনে নিয়েছে। যেমন শুনা আর অম্‌নি শুন্‌বের জন্য জিদ।

দক্ষিণে। ঐ ত রোগ। মেয়ে জাতির ঐ একটা মস্ত ভ্রম। অত কৌতূহল—অত ছট্‌ফটানি—অত হাপাহাপি, লাফালাফি পুরুষের নাই। পুরুষ রোহিত; আর উহারা সফরী। সেই জন্যই তো সকল দেশের সকল কবি, সকল দার্শনিক, সকল পণ্ডিত, সকল শাস্ত্র, ওদের তরলমতি, চপল, অবিশ্বাসিনী—এই সব বিশেষণ দিয়ে গিয়েছেন। আচ্ছা বেফলইবা একটা হতাশের কথা, তাই নিয়ে স্বামী বেচারীকে এত ধর পাকড় কেন? এত অনুসন্ধান অনুযোগ অনুমান-অভিমানই বা কেন, আর এত তর্জ্জন গর্জ্জন সর্জ্জনইবা কেন?

বন্ধু। এখন আসি, তোমার বিরহিনীর বিরহ আগুণ হয় তো দাউ দাউ করে জ্বল্‌ছে। আমি যাই, ভাই; তুমিও আর কবির মত এই সাজের আকাশ তলে না থেকে এখন বিলোলা ফুলেলার কাছে যাও।

রেণুপ। বিলোলা ফুলেলা, এর অর্থ কি? বিলোলার সঙ্গে ফুলেলার অর্থ কি?

দক্ষিণে। অর্থ আমিও জানিনে। কি জানি ভাই তোমাদের সবই সৃষ্টি ছাড়া রকমের। তোমার নাম রেণুপ। বলিহারি নাম! এত লক্ষ লক্ষ নাম শুনি, রেণুপ নাম তো ভাই শুনিনি। এরূপ একটা নাম তোমার কেন হইল, কেমন করিয়া হইল, কত দিন ভাবিয়াছি, স্থির কর্‌তে পারি নি। তারপর তোমার গৃহিণী আস্‌লেন। শুন্‌লাম তাঁর নাম বিলোলা-লহরী! বাঃ! অতি সৎকার! এমন নাম কই কোথাও ত দেখিনি। রাগ করনা বন্ধু,

তোমাদের নামের সঙ্গে যেন কেমন এক রকম কাব্য কাব্য গন্ধ ছাড়ে। আজ কাল ভাই ঐ রকম ভঙ্গি সকল দিগেই দেখ্‌ছি। অর্থ থাক্ আর না থাক্, একটা শুন্‌তে ভাল হলেই বাস্! অনেকে মেয়ের নাম রাখেন—নিভাননী। আরে, ইন্দু নিভাননী না বল্‌লে কি শুধু "নিভাননীর" অর্থ হয়? এ সব আমদানি যে কে কোথা থেকে করে, তাইভাবি। তাই আমিও বিলোলা—ফুলেলা একটা বলে ফেল্‌লুম। বন্ধু বুঝেছ তো, তোমাদের হাওয়া লেগে গেছে। তবে ভাই আসি।

(৩)

বিলোলা। এখন বল শুনি তোমার সেই কাহিনীটী কি?

রেণুপ। যশোহর জেলায় "চাকুরস" নামে একটী গ্রাম আছে। দিব্যি পল্লী। পল্লীটি একটী বিলের ধারে। বিলে এত মাছ যে সে কথা বল্‌লে লোকে ভাব্‌তে পারে যে আমি গাল-গল্প কর্‌ছি। জলের উপর বড় বড় ধাপ; ধাপের নীচে মোটা মোটা কল্‌মী, কল্‌মীর ডাঁটা সঙ্গে শৈবাল জমাট বাঁধিয়া বেশ শক্ত হইয়া থাকে। ঐ শৈবালের স্তরের মধ্যে বড় বড় কই—মাগুর, তোড়া, পাঁকাল প্রভৃতি মাছ সকল সময়েই পাওয়া যায়। একখানি কাস্তে হাতে করিয়া খানিকটা ধাপ-সংযুক্ত শৈবাল কাটিয়া ডাঙ্গায় তুলিলেই ছয় সাত সের মাছ পাওয়া যায়। দুই তিন মিনিটের পরিশ্রমের ফল ছয় সাত সের সজীব কই মাগুর! তাই বল্‌ছি ঐ গ্রামের লোকে কখনই মাছ কিনিয়া খায় না।

বিলোলা। ধাপের কথা বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। সে জিনিষটা কি?

রেণুপ। ধানের গাছ ত দেখিয়াছ? এ ঠিক অতবড় জলাভূমির এক প্রকার ঘাস। তারপর শোনো ঐ ক্ষুদ্র পল্লীটিতে যথেষ্ট আম, নারিকেল, জাম, লেবুর বাগান। ঐ সব জিনিষ এত বেশী জন্মে যে কাহাকেও উহা কিনে খেতে হয় না। যারা গরীব, তারাও বাগানে গেলে দশ-কুড়ি গণ্ডা আম খেতে পায়। কিন্‌লেও দু'পয়সায় হয় তো দুই শত আম পায়। খেজুর গাছ যে শেখানে কত তার ইয়ত্তা হয় না। বিশ হাজার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকলের বাড়িতেই যথেষ্ট রস, গুড়, পাটালি, ন'লেন গুড়, তাত রস, সেঁজো রস। কে কত খায়। রসের ছড়াছড়ি। গ্রামের চারিদিকে মাঠ। খুব বড় মাঠের মধ্যে ফল-ফুল, মাছ-শাক, তরি-তরকারী পূর্ণ ছোট গ্রামখানি। গ্রামখানি যেন একখানি রূপ-মধুর ছবি; যেন ———

বিলোলা। কবিত্ব রাখ, আসল কথাটা বলে ফেল।

রেণুপ। ঐ গ্রামে আমার বড় ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। আমি অতি ছোট বেলায় দিদির সঙ্গে সেখানে যাইয়া কিছু দিন করিয়া থাকিতাম। গুড় আম, কাঁঠাল, নারিকেল খাইয়া জ্যান্ত মাছ ধরিয়া বিলে বা'জ দিয়া বেশ স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটাইতাম। তত স্ফূর্ত্তি, তত আনন্দ, তত শান্তি, জীবনে আর কখনও পাই নাই।

বিলোলা। বিলে কি করিয়া বা'জ দিতে?

রেণুপ। তাল গাছের ডোঙায় একটা লোক বেশ চড়িতে পারে। একটা সরু লম্বা বাঁশ লইয়া ঐ ডোঙায় চড়িয়া বাহিয়া যাইতাম। ডোঙা ফন্ ফন্ করিয়া ধাপের উপর দিয়া যাইত, সে বেশ স্ফূর্ত্তি। মাঝে মাঝে ধাপশূন্য স্থান পাওয়া যাইত, সেখানে হয় তো পাঁচ সাত হাত গভীর কালো জল, বড় বড় মাছ খেলছে দেখতাম। আহ্লাদে মাছের মাথায় লগির বাড়ী মেরে দিতাম। সে কি মজা!

বিলোলা। লগি কি?

রেণুপ। না, তোমার সঙ্গে কথা বলা পোষায় না। লগি কি—ধাপ কি, এত অকেজো প্রশ্ন কর্‌লে চলেনা। তুমি এই কলকেতা বাসীদের মত বিলাতী আহাম্মুখ। কলকেতার লোক যেমন ভাবে ধান গাছের বড় বড় ডগা হয়, তুমিও হয় তো ভাব্‌ছো লগি বুঝি বা জর্ম্মণ দেশীয় একটা মস্ত কিছু। তা নহে; ঐ যে আগে বললুম যে একখানি সরু বাশ দিয়া ডোঙা বাহিতাম উহাকেই লগি বলে।

বিলোলা। আচ্ছা, বলো।

রেণুপ। দিদির একটি ছোট ননদ ছিল। তার বয়স আর আমার বয়স একেবারে ঠিক এক। সেও সাত বছরের, আমিও সাত বছরের। দু'জনে এক সঙ্গে খেতাম—এক সঙ্গেই বা বলি কেন, অনেক সময় এক পাতেই খেতাম। এক সঙ্গে খেলা করিতাম। এক সঙ্গে ফুল তুলিতাম, আম কুড়াইতাম, সেঁজুতি পূজার আলপনা দিতাম। আমি নুংটো হয়ে ধাপের মধ্যে কাঁকড়া মাছ ধর্‌তে কোমর জলে নাবিতাম, পারুলও আমার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘটি হাতে করে যেত।

বিলোলা। সেও জলে নাব্‌তো?

রেণুপ। আরে নানা। সে যে মেয়ে মানুষ, সে জলে নাববে কেন?

তাই বল্‌ছি, পারুল আর আমি যখন ঐরূপ ভাবে মাছ ধর্‌তাম—খেলা কর্‌তাম—ফুল কুড়াইতাম, তখন পারুলের মা ও আমার দিদি আমাদের দুটিকে দেখে কত স্নেহের হাসি হাস্‌তেন—কত প্রীতি অনুভব কর্‌তেন। বাল্য কালের সেই মিলন আমাদের বড়ই মধুর লাগিত।

কালক্রমে আমাকে আমার দেশের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়া-শুনা করিতে হইল। পারুলের সঙ্গে কয়েক বৎসর আর দেখা শুনা হইল না। দিদি আমাকে যাইতে লিখ্‌লেন। আমারও যাইবার খুব ইচ্ছা হইল। দিন স্থির করিয়া একদিন বাড়ী হইতে রওনা হইলাম। দশ ক্রোশ পদব্রজে যাইতে হইবে। চলিলাম——

বিলোলা। এত পথ হাটিতে সাহস হইল? ধন্য পা দু'খানি!

রেণুপ। তাইত বলছিলুম তুমি বিলাতী আহাম্মুখ! দশ ক্রোশ, পনের ক্রোশ পথ যে হাটিতে না পারে, তার জীবনে আবশ্যক কি? আক্‌বর বাদসাহ যে দিনে পঁচিশ ক্রোশ হাটিতে পারিতেন। তাতে কি তার অগৌরব ছিল? আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সুদূর দ্বারকা তীর্থে, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে, বদরি বিশালার কামাক্ষায়, হাটিয়া হাটিয়া যাইতেন, তাহাতে কি কিছু নিন্দা ছিল? আর সেই বংশে এই সব ননীর পুতুল জন্মিয়াছে। এখনকার বাবু নাম ধারী অকেজো লোক গুলো আধ ক্রোশ পথ যেতে হলেই হা ট্রাম—যো ট্রাম করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া কপালে চোখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। এ গুলো কি মানুষ?

বিলোলা। আচ্ছা, হয়েছে! এখন তোমার সেই পারুলের কথাই বলো।

রেণুপ। ঠাট্টা কেন? আমার পারুলটা দেখ্‌লে কোথায়? তাই বল্‌ছি,—বৈকাল হ'তে হ'তেই চাক্‌-রস গ্রামে দিদির বাড়ী যাইয়া উঠ্‌লেম।

যাবার সময় পারুলের কথাই মনে ভাব্‌ছিলুম, মনে হইতে ছিল, পারুলের বয়স এখন পনের—সে এখন বিবাহিতা—পরের স্ত্রী, যৌবনে পড়িয়াছে,—হয় তো তার এখন কত লজ্জা হয়েছে। আমার সঙ্গে হয় তো সে এখন সেরূপ অবাধে মিশিবে না। এই সব চিন্তায় বিভোর হয়ে যাইতে ছিলাম; তাই পথের কষ্ট মনে আসে নি। পারুল বাড়ীর মধ্যে ছিল। সে অনেক দিন পরে আমাকে দেখ্‌বে, তাই বারে বারে চকিত দৃষ্টিতে এদিক্‌ ওদিক্‌ চাহিতে ছিল।

আমি ভেবে ছিলুম একেবারে বাড়ীর ভিতর যাইয়া দিদির কাছে উঠ্‌বো।

যেতেই পারুলের চোখে চোখে পড়িলাম। অনেক দিন পরে দু'জনের চারি চক্ষু নিমেষের জন্য এক হইল। পারুল হেসে ফেল্‌লে। সে চাহনির মধ্যে আনন্দ—উল্লাস—লজ্জা সব যেন জড়াজড়ি কর্‌ছে। কিশোরের সরলতার সঙ্গে নূতন যৌবনের লজ্জা ও চপলতার সংযোগ। সে যে কি মধুর তাহা বুঝিয়ে দেওয়া চলে না। ভাষায় সে ভাব ফুটে না।

চোখে চোখে প'ড়ে আমিও লজ্জায় জড়সড় হয়ে বাড়ীর ভিতরে যাইতে পারিলাম না। বাহিরের ঘরে এলাম।

পারুল একটু পরেই এসে বল্‌লে,—"রেণুপ! তোমার দিদি ডাক্‌ছেন। ভিতরে এস, বাহিরে কেন?"

অল্পক্ষণেই বুঝিলাম, পারুল সেই পারুলই আছে। পরিবর্ত্তনের মধ্যে তার ভালবাসার গাঢ়তা আরও বাড়িয়াছে—এখনও সেই নিঃশঙ্ক ভাব—সেই হাসি, সেই গল্প। তবে এখন তার কথার একটী সাদা অর্থ নহে—তার প্রায় প্রতি কথার মধ্যে যেন সমস্যাপূর্ণ—এক একটা কথার কত রকম অর্থ। সে সাদা সরল চাহনি নাই—এখন সে চাহনির মধ্যে কেমন এক রকম তরলতা, কেমন এক রকম মধুরতা, যার চেয়ে প্রীতির জিনিস কল্পনা রাজ্যেও আছে কিনা সন্দেহ।

বিলোলা। আচ্ছা, তারপর; কবিত্বটা একটু খাটো কর।

রেণুপ। পনর ষোল দিন পরে বাড়ী ফিরিলাম। কয়েক বৎসর পরে আবার যখন আমার বয়স আঠার বৎসর, তখন পুনরায় দেখা হইল। তখনও পারুল আমার প্রতি সেইরূপ আসক্তা। তখন আরও খোলা খুলি ভাব; সকল সময় আমি তার কাছে বসিয়া গল্প করা চায়, হাস্য কৌতুক করা চায়, এক মুহূর্ত্তের বিচ্ছেদও তার কাছে অসহ্য। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—পারুল, তুমি বেশ সুখী হইয়াছ? পারুল উত্তর করিল,—না। কেবল ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, আর এক দৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে রহিল। তার সেই নীরব চাহনিতে যেন চারি বেদ, আঠার পুরাণের চেয়েও বেশী কথা ব'লে ফেল্‌লে। প্রাণের কত ফাঁকা—কত অভিমান—কত নিরাশা—কত ভাবি জীবনের কল্পনা—ভগবানের কাছে কত লুকানো প্রার্থনা—এরূপ কত কি ভাষা, মহাভাষা ঐ স্থির সৌদামিনীর নিশ্চল চাহনিতে ব্যক্ত হইল। আমি মুগ্ধ-ব্যথিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুদিন পরে আমাকে স্কুলে ফিরিতে হইল। ফিরিবার সময় বলিলাম;—পারুল! তবে আসি এখ

বলিল,—"মনে রেখ।" বাড়ী আসবার দুই মাস পরেই শুনিলাম সে বিসূচিকা রোগে মারা গিয়াছে। তখনই থেকেই আমি তার ঐ দুটি কথা হৃদয়ে গেঁথে রেখেছি। ঐ কথা দুটিই আমার—ইষ্ট-কবচ।

প্রার্থনা-গীতি।

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ সরকার বিরচিত।

সিন্ধু—মধ্যমান।

আর কত দুখ দেবে তারা,—
(ভেবে) পাইনা যে তার কুল কিনারা॥
(আমি) সদাই ডাকি মা ব'লে কি,
তাই চাপা'চ্ছ দুখের ভরা॥
দয়াময়ী সবাই বলে, (কেন) এ দীনে নিদয়া হ'লে,
অভাগা সন্তান ব'লে, (তাই) কাঁদায়ে ক'রছ সারা॥
যদি মোরে কাঁদাইতে, পাঠায়েছ এ জগতে,
তবে মা দুখ সহিতে দেহ শক্তি সারাৎসারা॥
অঘোরের এই বাসনা, শুন শুন শবাসনা,
(যেন) কান্না ল'য়ে এ রসনা
(সেই) শেষের দিনেও বলে "তারা॥"

কোষ্ঠী-শিক্ষা।

লেখক, শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কেতু কুণ্ডলী।

দ্বাদশটী ঘর যুক্ত একটি চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে রবি কেতু বুধ, মঙ্গল কেতু বৃহস্পতি, চন্দ্র, কেতু শুক্র, রাহু কেতু ও শনি দ্বাদশটি ঘরে ক্রমে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। পরে রবির ঘরে ২৬, ২৭, ১, কেতুর ঘরে ২, বুধের ঘরে ৩ ১৪, ৫, মঙ্গলের ঘরে ৬, ৭, ৮, কেতুর ঘরে ৯, বৃহস্পতির ঘরে ১০, ১১ ১২ চন্দ্রের ঘরে ১৩, ১৪, ১৫ কেতুর ঘরে ১৬, শুক্রের ঘরে ১৭, ১৮, ১৯ রাহুর

ঘরে ২০, ২১, কেতুর ঘরে ২২, শনির-ঘরে ২৩ ২৪, ২৫ নক্ষত্র স্থাপন করিতে হয়। এখানেও জাতকের জন্ম নক্ষত্র অনুসারে বর্ষাধিপতি নির্ণয় করিতে হইবে। যথা ২৬, ২৭, ১ নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষ রবি ২ নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষ কেতু, এইরূপে ক্রমান্বয়ে পর পর গ্রহ পর পর বর্ষের অধিপতি হইবেন।

গুরু কুণ্ডলী।

নয়টি প্রকোষ্ঠ যুক্ত একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে যথাক্রমে রবি মঙ্গল কেতু চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, ও রাহু এই নয়টী গ্রহ পর পর স্থাপন করিয়া রবির ঘরে ৮,১৭,২৬, মঙ্গলের ঘরে ৯, ১৮, ২৭, কেতুর ঘরে ১০, ১৯, ১, চন্দ্রের ঘরে ১১, ২০, ২, বুধের ঘরে ১২, ২১, ৩, বৃহস্পতির ঘরে ১৩, ২২, ৪, শুক্রের ঘরে ১৪, ২৩, ৭, শনির ঘরে ১৫, ২৪, ৬, রাহুর ঘরে ১৬, ২৫, ৭, নক্ষত্র স্থাপন করিয়া জন্ম নক্ষত্র অনুসারে বর্ষপতি নির্ণয় করিতে হইবে। যথা—৮, ১৭, ২৬, নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষে রবি, ৯, ১৮, ২৭, নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষে মঙ্গল ইত্যাদি ক্রমে পর পর গ্রহ পর পর বৎসরের অধিপতি হইবেন।

পূর্ব্বোক্ত জাতকের ২২ নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে সুতরাং উহার কেতু পাতকী মতে চন্দ্র, কেতুকুণ্ডলী মতে কেতু এবং গুরু কুণ্ডলী মতে বৃহস্পতি প্রথম বৎসরের অধিপতি। পরে ক্রমান্বয়ে পর পর বৎসরে পর পর গ্রহ অধিপতি হইয়াছেন। জাতকের পূর্ব্বে অঙ্কিত ত্রিপাপ চক্র দেখিলেই এই চক্র বুঝিতে পারিবেন।

ষন্নাড়ী চক্র।

জাতকের যে নক্ষত্রে জন্ম হয় সেই নক্ষত্রটীর নাম জন্ম নাড়ী। তথা হইতে গণনায় দশম নক্ষত্রটীর নাম কর্ম্ম নাড়ী। ষোড়শ নক্ষত্রটীর নাম সংঘাতিক নাড়ী, অষ্টাদশা নক্ষত্রটীর নাম সমুদয় নাড়ী, ত্রয়োবিংশতি নক্ষত্রটীর নাম বিনাশ নাড়ী, এবং পঞ্চ বিংশতি নক্ষত্রটীর নাম মানস নাড়ী, এই ছয়টী ষন্নাড়ী নামে অভিহিত, যথা পূর্ব্বোক্ত জাতক ২২ নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সুতরাং ২২ সংখ্যক নক্ষত্রটী উহার জন্ম নাড়ী ৪ সংখ্যক নক্ষত্রটি উহার কর্ম্ম নাড়ী, ১০ সংখ্যক নক্ষত্রটি সাংঘাতিক নাড়ী, ১২ সংখ্যক নক্ষত্রটি সমুদয় নাড়ী, ১৭ সংখ্যক নক্ষত্রটি বিনাশ নাড়ী, ১৯ সংখ্যক নাড়ীটী উহার মানশ নাড়ী নামে অভিহিত।

জাতকের জন্ম নাড়ী উপস্থিত হইলে দেহ নিষ্ঠা ও অর্থের হানি হয়। কর্ম্ম নাড়ী উপতাপিত হইলে জাতকের কর্ম্মের হানি হয়। মানস নাড়ী উপতাপিত হইলে শরীর, ধন, ও বন্ধু হানি হয়। সমুদয় নাড়ী উপতাপিত হইলে মিত্র, তুল্য ও অর্থ হানি হয়। বিনাশ নাড়ী উপতাপিত হইলে জাতকের দেহ, ধন ও সম্পদ সমস্ত বিষয়েরই নাহি হইয়া থাকে।

নবতারা অর্থাৎ বিরিঞ্চি চক্র।

জন্ম, সম্পদ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরম মিত্র এই নয়টি ঘর অঙ্কিত করিয়া জাতকের জন্ম নক্ষত্র ঘরে, তৎপরের নক্ষত্র সম্পদের ঘরে এইরূপে বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি সাধক, বধ, মিত্র ও পরম মিত্র ঘরে ক্রমে পর পর ২৭টী নক্ষত্র তিন শ্রেণীতে স্থাপন করিতে হয়। এই চক্রের বিপদ, প্রত্যরি, ও বধ ঘরের তারা সকল অশুভ ইহাতে যাত্রাদি শুভকার্য্য নিষিদ্ধ, অপিচ জাতকের জন্ম কুণ্ডলী চক্রে যদি কোন গ্রহ এই তিন ঘরের কোন একটী নক্ষত্রে অবস্থান করেন তবে সেই গ্রহের দৃষ্টি অশুভ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত জাতকের ১০ সংখ্যক নক্ষত্র বধ ঘরে পড়িয়াছে এবং এই ১০ সংখ্যক নক্ষত্রে বৃহস্পতি অবস্থিত সুতরাং বৃহস্পতির দৃষ্টি অশুভ।

গ্রহগণের স্বাভাবিক মিত্র, শত্রু ও সম নির্ণয়।

রবির মিত্র চন্দ্র, মঙ্গল বৃহস্পতি, শত্রু শুক্র ও শনি সম বুধ। চন্দ্রের মিত্র রবি, বুধ চন্দ্রের শত্রু নাই সম মঙ্গল শুক্র, বৃহস্পতি ও শনি। মঙ্গলের মিত্র রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি। শত্রু বুধ সম শুক্র ও শনি। বুধের মিত্র রবি ও শুক্র। শত্রু চন্দ্র সম মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। বৃহস্পতির মিত্র রবি চন্দ্র ও মঙ্গল শত্রু বুধ ও শুক্র। সম শনি। শুক্রের মিত্র বুধ ও শনি। শত্রু রবি ও চন্দ্র সম মঙ্গল ও বৃহস্পতি। শনির মিত্র বুধ ও শুক্র, শত্রু রবি চন্দ্র ও মঙ্গল সম বৃহস্পতি। রাহুর মিত্র শুক্র ও শনি, শত্রু রবি চন্দ্র ও মঙ্গল। সম বুধ ও বৃহস্পতি। কেতুর মিত্র রবি চন্দ্র ও মঙ্গল। শত্রু শুক্র ও শনি, সম বুধ ও বৃহস্পতি।

জাতকের জন্মকালীন গ্রহগণের শত্রু, মিত্র ও সম নির্ণয়।

যে গ্রহ যে ঘরে অবস্থান করেন তথা হইতে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, দশম ও একাদশ ঘরে অবস্থিত গ্রহ তাহার মিত্র হইয়া থাকেন। আর যে গ্রহ সে ঘরে অবস্থান করেন তথা হইতে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম অবস্থিত ঘরে গ্রহ তাঁহার শত্রু হইয়া থাকেন। গ্রহগণের মধ্যে যিনি যাঁহার স্বাভাবিক মিত্র, সম শত্রু হয়েন তিনি জন্মকালীন মিত্র হইলে যথাক্রমে অধিমিত্র, মিত্র ও সম হইয়া থাকেন, আর যাহারা স্বাভাবিক শত্রু, সম ও মিত্র হয়েন তাঁহারা জন্ম কালীন শত্রু হইলে যথাক্রমে অধি শত্রু, শত্রু ও সম বলিয়া কথিত হয়েন।

কোন গ্রহ মিত্র গৃহে অবস্থান করিলে কিঞ্চিৎ বলবান। সম গৃহে কিম্বা সম ভাবাপন্ন ও শত্রুগৃহে অবস্থান করিলে হীন বল হইয়া থাকে।

সপ্তশূন্য চক্র।

১ম কোষ্ঠা। সামান্য ক্লেশ।	২য় কোষ্ঠা। রিষ্টি ভাব।	৩য় কোষ্ঠা। শূন্যে রিষ্টি।	৪র্থ কোষ্ঠা। বৃহস্পতি ও দুই রিষ্টি।
৬ ২ ৩ ১ ২	১ ৪ ৫ ৬ ৫	৩ ৬ ০ ৪ ১	৫ ১ ২ ২ ৪
৪ ০ ০ ০ ৪	০ ৪ ৪ ০ ০	৪ ০ ০ ০ ৪	০ ৪ ৪ ০ ০
৩ ০ ০ ০ ০	০ ৩ ৩ ০ ০	৩ ০ ০ ০ ০	০ ৩ ৩ ০ ০
৫ম কোষ্ঠা। দশ শূন্য রিষ্টি।	**৬ষ্ঠ কোষ্ঠা। প্রথমে চন্দ্র ও দুই শূন্যে রিষ্টি।**	**৭ম কোষ্ঠা। রিষ্টি।**	**৮ম কোষ্ঠা। শুক্র ও দুই শূন্যে রিষ্টি।**
০ ৩ ৪ ০ ০	২ ৫ ৬ ৫ ৩	৪ ০ ১ ৩ ৬	৬ ২ ৩ ১ ২
৪ ০ ০ ০ ৪	০ ৪ ৪ ৪ ০	৪ ০ ০ ০ ৪	০ ৪ ৪ ৪ ০
৩ ০ ০ ০ ০	০ ৩ ৩ ৩ ৩	৩ ০ ০ ০ ০	০ ৩ ৩ ৩ ৩
৯ম কোষ্ঠা। মহারিষ্টি।	**১০ম কোষ্ঠা। মঙ্গল ও দুই শূন্যে রিষ্টি।**	**১১শ কোষ্ঠা। কষ্ট।**	**১২শ কোষ্ঠা। প্রথমে শূন্যে ক্লেশ।**
১ ৪ ৫ ৬ ৫	৩ ৬ ০ ৪ ১	৫ ১ ২ ২ ৪	০ ৩ ৪ ০ ০
৪ ০ ০ ৪ ৪	০ ৫ ৪ ৪ ০	৪ ০ ০ ৪ ৪	০ ৪ ৪ ৪ ০
৩ ০ ০ ৩ ৩	০ ৩ ৩ ৩ ৩	৩ ০ ০ ৩ ৩	০ ৩ ৩ ৩ ৩
	১৩শ কোষ্ঠা। সপ্ত শূন্য।	**১৪শ কোষ্ঠা। বুধ ও দুই শূন্যে রিষ্টি।**	
	২ ৫ ৬ ৫ ৩	৪ ০ ১ ৩ ৬	
	৪ ০ ০ ০ ৪	০ ৪ ৪ ৪ ০	
	৩ ০ ০ ০ ০	০ ৩ ৩ ৩ ৩	

উপরে সপ্ত শূন্য চক্রের ১৪টী কোষ্ঠা (ঘর) অঙ্কিত হইয়াছে। এই সমস্ত কোষ্ঠী দ্বারাই জীবনের সমস্ত বৎসরের ফল জানিতে পারা যাইবে। কোন বৎসর বয়সের ফল কোন কোষ্ঠীর নিরূপণ করিতে হইলে তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে।

সপ্তশূন্য চক্র বুঝিতে হইলে স্বরাশ ও রাশির অঙ্ক জানা নিতান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য স্বরাক ও রাশির অঙ্ক নিম্নে লিখিত হইল। যথা—৮১ মেষ, সিংহ,

বৃশ্চক, আ, কা, হা, রা, ধা, ভাঁ, বা। ৯৯ তুলা, বৃষ, এ, যে, টৈ, থে, কে, রে, সে। ৮৭ মিথুন, কর্কট, কন্যা, ই, থি, জি, রি, শি, নি, শি। ৯৩ ধনু, মীন, উ, গু, ঝু, তু, পু, ষু। ১০৫ মকর, কুম্ভ, ও, চো, ঠো দো, বো লো, গো।

সপ্তশূন্য চক্রে রাশির অঙ্ক হইতে ধরিতে হয় যথা বৃষ, ১ মিথুন ২, কর্কট ৩, সিংহ ৪, কন্যা ৫, তুলা ৬ বৃশ্চিক ৭, ধনু ৮, মকর ৯, কুম্ভ ১০, মীন ১১, ও মেষ ১২।

পঞ্চ স্বরের নাম —জন্ম, কর্ম্ম, আধান, পিণ্ড ও ছিদ্র।

বয়সের অঙ্ক, রাশির অঙ্ক ও স্বরাঙ্ক যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ক তিন স্থানে রাখিবেন। পরে ঐ অঙ্কের এক স্থানের অঙ্ককে দ্বিগুণ করিয়া ৭ দ্বারা ভাগ করতঃ যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই অঙ্ক জন্ম স্বরের উপরে রাখিতে হয়। দ্বিতীয় স্থানের অঙ্ককে চতুর্গুণ করিয়া ঐ গুণিতাঙ্ককে ৮ দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই অঙ্ক জন্ম স্বরের মধ্যে রাখিতে হয়। তৃতীয় স্থানের অঙ্ক দ্বিগুণ করিয়া তাহাকে ৬ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকবে সেই অঙ্ক জন্ম স্বরের নিম্নে রাখিবেন। পরে বয়স রাশি ও স্বরাঙ্কের সহিত ৫ যোগ করিয়া তিন স্থানে রাখিবেন। এবং এক স্থানের অঙ্ককে দ্বিগুণ করিয়া ৭ দ্বারা ভাগ করতঃ অবশিষ্টাঙ্ক কর্ম্ম স্বরের উপরে রাখিতে হয়। দ্বিতীয় স্থানের অঙ্ককে চতুর্গুণ করিয়া ৮ দ্বারা ভাগ করতঃ অবশিষ্টাঙ্ককে কর্ম্ম স্বরের মধ্যে রাখিবেন, তৃতীয় স্থানের অঙ্ক ত্রিগুণ করিয়া ৬ দ্বারা ভাগ করতঃ অবশিষ্টাঙ্ককে কর্ম্ম স্বরের নিম্নে রাখিবেন। অনন্তর বয়স রাশি ও স্বরাঙ্কের সহিত ৯ যোগ করিয়া উক্ত প্রকারে অধিক আধান স্বর নির্ণয় করিবেন। এইবার পিণ্ড স্বর ঠিক করিতে হইলে বয়স, রাশি ও স্বরাঙ্ক গ্রহণ না করিয়া জন্ম, কর্ম্ম ও আধান স্বরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অঙ্ক সমুদয় যোগ করিয়া তিন স্থানে রাখিবেন। পরে এক স্থানের অঙ্ক দ্বিগুণ করিয়া ৭ দ্বারা ভাগ করতঃ অবশিষ্টাঙ্ককে পিণ্ডস্বরের উপরে স্থাপন করিবেন। দ্বিতীয় স্থানের অঙ্ক চতুর্গুণ করিয়া ৮ দ্বারা ভাগ করতঃ অবশিষ্টাঙ্ককে পিণ্ডস্বরের মধ্যে রাখিবেন। তৃতীয় স্থানের অঙ্ক ত্রিগুণ করিয়া ৬ দ্বারা ভাগ করতঃ অবশিষ্টাঙ্ককে পিণ্ডস্বরের নিম্নে রাখিবেন।

অনন্তর ছিদ্রস্বর নির্ণয় করিতে হইলে বয়স, রাশি ও স্বরাঙ্কের সহিত জন্ম, কর্ম্ম, আধান ও পিণ্ডস্বরের উপরের সমুদয় অঙ্ক যোগ করিয়া দ্বিগুণ

করতঃ ৭ দ্বারা ভাগ করতঃ অবশিষ্টাঙ্ককে ছিদ্রস্বরের উপরে রাখিবেন। বয়স, রাশি ও স্বরাঙ্কের সহিত জন্ম, কর্ম্ম আধান ও পিণ্ডস্বরের মধ্যের সমুদয় অঙ্ক যোগ করিয়া চতুর্গুণ করিয়া ৮ দ্বারা ভাগ করতঃ অবশিষ্টাঙ্ক ছিদ্রস্বরের মধ্যে রাখিবেন। অতঃপর বয়স, রাশি ও স্বরাঙ্কের সহিত জন্ম, কর্ম্ম, আধান ও পিণ্ডস্বরের নীচের সমুদয় অঙ্ক যোগ করিয়া ত্রিগুণ করতঃ ৬ দ্বারা ভাগ করিয়া অবশিষ্টাঙ্ককে ছিদ্রস্বরের নিম্নে রাখিবেন। এখন যে কোষ্ঠাটি নির্ণিত হইবে, সেই কোষ্ঠাটী ১।১৫।২৯।৪৩।৫৭ বৎসরের নীচে রাখিবেন। তাহার পর যে কোষ্ঠা নির্ণয় হইবে সেইটী ২।১৬।৩০।৪৪।৫৮ বৎসরের নীচে রাখিবেন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে পর পর কোষ্ঠা স্থাপন করিয়া জীবনের ফলাফল নির্ণয় করিবেন।

সপ্তশূন্য চক্রের ফল।

যদি কোন জাতকের ত্রিপাপ যুক্ত বৎসরে সপ্তশূন্য পড়ে তবে সেই বৎসর তাহার মৃত্যু হয়।

দুই রাহুযুক্ত—বৎসরে কিম্বা রাহুর দশান্তর দশায় সপ্তশূন্য যোগ হইলে সেই বৎসর মৃত্যু হয়।

পাপ গ্রহের বৎসরে সপ্তশূন্য চক্রের দশশূন্য পড়িলে জাতকের সেই বৎসর মৃত্যু হয়।

সপ্তশূন্য চক্রে প্রথমে বুধ তৎপরে দুই শূন্য থাকে এবং যদি সেই বৎসর বুধের অন্তর্দশা হয়, আর বুধ বর্ষপতি হয়েন তবে সেই বৎসর জাতকের মৃত্যু হয়।

ত্রিপাপ চক্রে পাপ গ্রহের বর্ষে সপ্তশূন্য চক্রের প্রথমে বৃহস্পতি, তৎপরে দুই শূন্য এবং শেষে মঙ্গল থাকেন সেই সেই বৎসর জাতকের মৃত্যু হয়।

সপ্তশূন্য চক্রের দ্বিতীয় স্বরে যদি শুক্র ও দুইশূন্য থাকে এবং পাপ গ্রহের বর্ষ হয়, তবে সেই বৎসর জাতকের মৃত্যু হয়।

সপ্তশূন্য চক্রের প্রথমে তিন শূন্য এবং শেষে মঙ্গল থাকেন, তবে সেই বৎসর জাতকের অত্যন্ত ক্লেশ হয় কিন্তু শুভগ্রহ বর্ষপতি হইলে শুভ ফল হয়।

সপ্তশূন্য চক্রে যে বৎসর দশশূন্য হয়, সেই বৎসর যদি বৃহস্পতি ও শুক্র বর্ষপতি হয়েন তবে জাতকের নানারূপ ক্লেশ হয়।

সপ্তশূন্য চক্রে যদি চন্দ্রের সহিত রাহুর যোগ হয়। এবং শেষে শূন্য থাকে

আর বৃহস্পতি, চন্দ্র ও শনি বর্ষপতি হয়েন, তবে সেই বৎসর জাতকের মৃত্যু হয়।

সপ্তশূন্য চক্রে প্রথমে মঙ্গল তৎপরে দুই শূন্য ও শেষে মঙ্গল থাকেন আর পাপ গ্রহের বর্ষ হয় তবে সেই বৎসর জাতকের মৃত্যু হয়।

ক্রমশঃ

সমালোচনা।

রসাল।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ সঙ্কলিত, কলিকাতা ৩ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ছাপা কাগজ, বাঁধাই মন্দ নহে। মূল্য এক টাকা মাত্র।

বঙ্গে প্রাচীন কাল হইতে উদ্ভট শ্লোক ও কবি-কথা প্রসঙ্গে বৃদ্ধ পরম্পরায় বহু বিচিত্র প্রবাদ বচন বা কিংবদন্তীর মধ্য দিয়া যে সকল রসভাবময়ী প্রসঙ্গ সমাজে চলিয়া আসিতেছে, সেই সকল রস সন্দর্ভের কয়েকটি একত্র গ্রথিত করিয়া গ্রন্থকার "রসাল" ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন, রসাল আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১০৩ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তকের মূল্য এক টাকা নিরূপণ করাও কি রসাল পুস্তকের একটা রহস্য? রসালের বহুল প্রচার কামনায় রসাল পুস্তকের মূল্য এক টাকা স্থলে আট করিলেই ভাল হইত।

দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের জীবনী ও পদাবলী।—শ্রীপাট দোগাছিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী প্রভুপাদ প্রণীত, মূল্য আট আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পরিকর শ্রীপাট দোগাছিয়া নিবাসী দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুর প্রসিদ্ধ প্রাচীন পদ কর্ত্তা ছিলেন।

আমরা দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের জীবনী ও পদাবলী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যার পর নাই শান্তিলাভ করিলাম। পুস্তকখানি একখানি প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী—এই পদাবলী সম্বন্ধে আর নূতন পরিচয় দিবার কোনও প্রয়োজন নাই—এই পদাবলী বৈষ্ণবসাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ্—প্রত্যেক পদাবলীতেই প্রাণস্পর্শী ভাব আছে, তাহা শব্দ লালিত্যে ও পদযোজনায় অভিনব। গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইয়াছে, আমরা এই সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পদকর্ত্তা বলরাম দাস ঠাকুরের জীবনী ও পদাবলীর বহুল প্রচার কামনা করি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

জন্মভূমি।

২৭শ বর্ষ, } ১৩২৮ সাল, আশ্বিন। { ৬ষ্ঠ, সংখ্যা।

বিবাহ-পণ।

(শ্রীযুত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্-বি, এফ্, সি, এস্ মহোদয়ের ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ।)

(লেখক,—সাহিত্য-রত্ন শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।)

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

* * * এক্ষণে আর দক্ষিণরাঢ়ী উত্তররাঢ়ী বাছিলে চলিবে না—চলাও উচিত নহে। মূলে তো সবই সমান, কেবল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিবার দরুণ এই কৃত্রিম পার্থক্য দেখা দিয়াছে। আবার রাঢ়ীব্রাহ্মণ বরেন্দ্র বা বৈদিক ব্রাহ্মণের কথা গ্রহণ করেন না। এরূপটীই বা হইবে কেন? তিন ঘর কুলীন ছাড়া অপরের সহিত কায়স্থ মৌলিকেরা উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবেন না বলিয়া একটা রীতি চলিয়া আসিতেছে। এই বজ্র বন্ধনে পড়িয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে। তাঁহাদের নিজের পারিবারিক সংখ্যা (৮০) অশীতিরও অধিক। সুতরাং তাঁহাদের বিবাহের ক্ষেত্র বড়ই সঙ্কীর্ণ। মৌলিকগণ পরস্পরের মধ্যে যদি বিবাহ করিতে পারেন, তবে অনেকটা অসুবিধা দূর হয়। সেরূপ নিয়মই বা না হইবে কেন? এই সব দেশাচার তুলিয়া দিলে বিবাহের ক্ষেত্র প্রশস্ত হইয়া উঠিবে, তাহার ফলে পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষকে অসম্ভব পণের দাবি করিয়া জ্বালাতন ও বিব্রত করিতে পারিবেন না। এইরূপ চলাচল করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার কায়স্থ-সভা চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখনও বিশেষ ফল কিছু হয় নাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও ঐরূপ একটা সংস্কারের চেষ্টা

হওয়া আবশ্যক। আমাদের আশা আছে, কালক্রমে ঐরূপ সংস্কার অনুষ্ঠিত হইবে, আর তখন দেশের লোক দারুণ পণের জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। সম্প্রতি কলিকাতায় পণ্ডিতদিগের একটি সভা বসে। ঐ সভায় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত স্মৃতিকণ্ঠ বাচস্পতি প্রভৃতি মহাত্মাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলেন যে, পূর্ব্বকথিত-রূপ বিবাহ হওয়া পক্ষে শাস্ত্রের কোন নিষেধ নাই। পণ্ডিতদিগের ঐ ব্যবস্থা খুবই মূল্যবান; কেন না, গোঁড়া হিন্দু-সমাজও উঁহাদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রভাব সমাজের উপর কম নহে। আমার মনে হয়, এখন আর কেহ ঐরূপ বিবাহে সংশ্লিষ্ট হইতে দ্বিধা মনে করিবেন না।

পাত্রীপক্ষকে শোষণ করিয়া যে অর্থ লওয়া হয়, তাহার কিরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। কোন কোন স্থলে দেখা যায়, ঐ পণের টাকাদ্বারা পাত্রপক্ষ বিবাহের খরচা নির্ব্বাহ বা তাঁহার সাংসারিক ঋণ পরিশোধ করেন। ঐ ঋণ হয় তো পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিতেই হইয়াছিল। কন্যার বিবাহের ঋণ পুত্রের বিবাহের পণে শোধ দেওয়া হয়। পুত্রের বিবাহ হইলে এই নবদম্পতির জন্য স্বতন্ত্র একখানা গৃহের আবশ্যক হওয়ায়, অনেক সময় ঐ পণের টাকাদ্বারা সেই গৃহ নির্ম্মিত হয়। বরপক্ষ যদি বেশী পরিমাণ পণ আদায় করিতে সমর্থ হন, তবে অনেক সময় ঐ টাকায় কোম্পানীর কাগজ কেনা হয়। আবার কেহ কেহ ঐ টাকার সাহায্যে পুত্রকে বিলাতে পাঠাইয়া বিলাতী শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু খুব বেশী সময়ই ঐ টাকায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। বাজি, বাজনা, মিছিল প্রভৃতি বৃথা ব্যাপারে উহা ব্যয়িত হইয়া থাকে। পাত্রের মা ফরমাইশ করিলেন যে, তাঁহার পুত্রের বিবাহে খুব রোসনাই হওয়া চাই, ব্যাণ্ডের বাজনা চাই ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেই সব ব্যাপারের খরচা পাত্রীর পিতাকে দিতে হইবে। চমৎকার ব্যবস্থা! বিবাহের পূর্ব্বে গাত্র-হরিদ্রার একটা রীতি আছে। ঐদিন বরের বাড়ী হইতে কনের বাড়ীতে অনেকগুলি উপহার উপঢৌকন প্রেরিত হয়। তাহার মূল্য ধরিয়া বেবাক টাকা পাত্রীর পিতার কাছে আদায় করা হইয়া থাকে। আজকাল ঐ খরচাও খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা পর্য্যন্ত গাত্র-হরিদ্রার ভয়াবহ খরচে জর্জ্জরিত হইতেছেন।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মধ্যে যাঁহারা সম্পন্ন, তাঁহারা এই ব্যাপারে খুব বেশী আড়ম্বর করিয়া খরচা করেন। আর সেই ব্যাপার দরিদ্রদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। যাঁহারা বনিয়াদি গৃহস্থ, তাঁহাদের এরূপ ভাব দেখা যায় না; যাঁহারা আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছেন, হঠাৎ বড়মানুষ হইয়া দু'পয়সার মুখ দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই ঐ রোগে ধরে। ধনী সম্ভ্রান্ত বংশের ব্যক্তিরা চিরদিনই সংযত-চরিত্র। তাঁহারা কোনরূপ বাড়াবাড়ি করেন না। বরাবর তাঁহাদের সংসারে যেরূপ খরচের নিয়ম আছে, তাঁহারা তাহা হইতে এক পাও এ-দিক্ ও-দিক্ যান না। কিন্তু যিনি এ বিষয়ে যত খরচই করুন, তাহার এক কপর্দ্দকও বরপক্ষ দেন না, সমস্তই কন্যার পিতার কাছ হইতে লওয়া হয়। পাত্রীর হতভাগ্য পিতাই ইহার মক্কেল! পাত্রের পিতা বিবাহের সময় যে শত শত আত্মীয় স্বজনকে খাইতে দেন, তাহার খরচাও পাত্রীর পিতাকে বহন করিতে হয়। এইরূপ আরও অনেক ব্যাপারে ঐ পণের টাকার অন্যায় ব্যবহার হইয়া থাকে। সে সকলগুলির উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। অতএব বরের পক্ষে যেদিকে যত খরচাই হউক, সবই পণরূপে পাত্রীর পিতার নিকট হইতে লওয়া হয়। তা ছাড়া, গহনার একটা স্বতন্ত্র দফা আছে। কত টাকার সোণা জহরত দিতে হইবে, তাহার মূল্যও পাত্রপক্ষ স্থির করিয়া দেন। অতএব দেখা গেল, পণস্বরূপ যে অর্থ পাত্রীর পিতার নিকট হইতে শোষিত হইয়া থাকে, তাহাতে পাত্রপক্ষের স্থায়ী সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয় না, তাহাতে বৃথা আমোদ আড়ম্বরের ব্যয় সংকুলান হয় মাত্র। আর সেই বৃথা ব্যয় কুলাইতে গিয়া অনেকগুলি পরিবারকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী সাজিতে হয়। একটু ভাবিলেই দেখা যায় যে, এই রীতি ভয়ঙ্কর নৃশংস। নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তি ভিন্ন এরূপ কার্য্য অন্য কেহ সমর্থন করিবেন না। সর্ব্ব প্রযত্নে নৈতিক বলে বলীয়ান হইয়া এই কুপ্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

পণ-প্রথা তুলিয়া দিয়া একটা সংস্কার ঘটাইতে হইলে বৃদ্ধ যুবা সকলেরই একমত হইয়া কাজ করা কর্ত্তব্য। যুবকদিগের বিবেক ও কর্ম্মকুশলতার উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে। যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি এদিকে জাগিয়া উঠে, তবে অচিরাৎ ঐ কু-প্রথা দেশ হইতে বিদূরীত হইবে। বাপের অন্যায় দেখিয়াও যে যুবকেরা কথা বলে না, সে কেবল

সম্মানের খাতিরে। কিছু দিন হইল, কয়েকটী ঘটনা দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, এ বিষয়ে যুবকদিগের বিবেক উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে। পাত্রীপক্ষকে পণদ্বারা শোষণ করা যে গর্হিত, তাহা ছেলেরা এখন বেশ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর এই ব্যাপার দূর করিতে যে তাহাদের যথেষ্ট শক্তি আছে, তাহাও তাহারা বুঝিয়াছে। পণ লইয়া বিবাদ করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞাও অনেকে করিয়াছে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি যে, তাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা পালন করিবে। আমি যুবকদিগকে অবাধ্যতা শিক্ষা দিতেছি, এমনটী যেন কেহ না বুঝেন। পিতামাতাকে ভক্তি করা, পিতামাতার নিকটে বাধ্য থাকা, ভারতীয় চরিত্রের একটী মহান্ বৈশিষ্ট্য। বিশেষ স্থল ব্যতীত এ বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলিতেই হইবে। পিতার আদেশ পালন করিতে যাইয়া, পুত্র দেহত্যাগও করিতে পারে; কিন্তু আত্মাকে কলুষিত করা—বিবেককে পরিত্যাগ করা কদাচ তাহার কর্ত্তব্য নহে। এই বিবেকই ভগবানের বাণী। ইহা নিরন্তর মনের মধ্যে স্ফূরিত হইতেছে। সমস্ত হিসাব নিকাশ দূরে রাখিয়া, সমস্ত আদেশ আহ্বান তাচ্ছিল্য করিয়া এই বিবেকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। পণের ব্যাপার লইয়া পিতা-পুত্রে একটা ভয়ানক বিরোধ ঘটিবে, চিরবিচ্ছেদ দেখা দিবে, আমরা এরূপ ধারণা করিতে পারি না। বিবাহের বয়স হইলে পুত্রকে আর ছোট্টটী মনে করা উচিত নহে, তখন তাহাকে সুহৃৎ-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া চলা পিতার কর্ত্তব্য।

"পালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শেবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥"

বিবাহ-ব্যাপার যুবকদিগের জীবনের গুরুতর কার্য্য। এ বিষয়ে তাহাদের পরামর্শ, মতামত, ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানা সকল পিতারই কর্ত্তব্য। পণ লওয়া সম্বন্ধে পুত্রের ইচ্ছা কিরূপ, পিতার তাহা জানা আবশ্যক। পুত্র যদি পণ না লইবার ব্রত গ্রহণ করে, তবে সেই পবিত্র ব্রতের মর্য্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, মাতাপিতার সেটুকু বুঝিয়া চলা ও সন্তানকে সে বিষয়ে সাহায্য করা উচিত। পুত্রকে জবরদস্তী করিয়া ঐ ব্রত হইতে বিচ্যুত করা তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমি যে কথাগুলি বলিলাম, আশা করি, বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই তাহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিবেন। তাই বলিতেছি, সাধারণে যদি আমার কথামত চলেন, যদি

মাতাপিতা পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া বিবাহ-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে পিতা-পুত্রে বিরোধ হইবার আদৌ আশঙ্কা থাকে না।

পণ-প্রথা বন্ধ করিবার আরও কয়েকটী উপায় নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। সেগুলি অবলম্বন করিলেও ঐ কুপ্রথার বিলোপ সাধনে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি। পণ-প্রথা যে সর্ব্বনাশের প্রসূতী, ইহাতে যে সমূহ সর্ব্বনাশ হইতেছে, এই ভাব—এই ধারণা লোকের মনে জাগরূক রাখিবার অভিপ্রায়ে সভা-সমিতি করিয়া ঘোর আলোচনায় আমাদিগকে নিরত থাকিতে হইবে। পিতা-পুত্র সকলকেই 'পণ লইব না' বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। তার পর ঐ প্রতিশ্রুতি অঙ্গীকার-পত্রে লিখিয়া সহি করিতে হইবে। শুধু যুবকদিগের সহি করিলে চলিবে না, তাহাদের অভিভাবকগণকেও সহি করিতে হইবে। এই উপায়ে পিতা-পুত্রের মধ্যে বিবাদ-সংক্রান্ত মনোমালিন্য ঘটিবার সম্ভাবনা মন্দীভূত হইয়া আসিবে। অনেকের নিকট ঐরূপ অঙ্গীকার-পত্রের কোন মর্য্যাদাই নাই। অঙ্গীকার করিয়া যদি তাহা প্রতিপালিত না হয়, তবে বাস্তবিকই সে অঙ্গীকার বৃথা ও নিরর্থক। কিন্তু আমার মনে হয়, যাঁহারা শিক্ষিত ও চরিত্রবান, তাঁহারা অঙ্গীকার পালন করিয়া চলেন। অনিষ্টকারিণী পণ-প্রথার কথা সকলের মনে জাগাইয়া রাখিবার জন্য একটা সুশৃঙ্খল স্থায়ী সভা গঠন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া, দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে ছোট ছোট সভার আবশ্যক। দেশের মধ্যে যেখানে যে বিবাহ হইবে, যেখানে পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষকে শোষণ করিয়া পণ লইবে, ছোট ছোট সভা সেই সব খোঁজ-খবর লইয়া ঐ বড় স্থায়ী সভার কাছে রিপোর্ট করিবেন। তখন বড় সভা সেই শোষক পণ-গ্রাহকের এই নীচাশয়তার কাহিনী অতি সত্বর দেশময় প্রচার করিয়া তাহাকে সাধারণের কাছে হেয় করিয়া তুলিবেন। গ্রাহক যদি পদস্থ ব্যক্তিও হয়েন, তবুও তাঁহার কোন খাতির করা বা তাঁহাকে ভয় করিয়া চলা হইবে না। এইরূপ ভাবে কার্য্য করিলে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে একটা সবল মতের সৃষ্টি হইবে। এই মতই পরিশেষে ঐ কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হইবে। কেহ কেহ বলেন, ঐরূপ দুরাচার পণ-গ্রাহককে সমাজচ্যুত করা হউক। দু-চার পুরুষ আগে কাহাকেও সমাজচ্যুত করিলে বিশেষ ফল ফলিত, কিন্তু এখন আর সে কাল নাই। এখন সমাজ-চ্যুতির ফল কিরূপ দাঁড়াইবে বলা যায় না। অনেক কারণে আমি এরূপ শাস্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক নহি।

আমার সময় অল্প। তাই, পণ-প্রথার সকল দিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিতে পারিলাম না। বাল্য-বিবাহ আর স্ত্রী-শিক্ষা এ দুইটী বড় বিষয়। এ দুইটীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা চলে; সময় অভাবে বলিতে পারিলাম না। ঐ সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে মাত্র দুই একটী কথা বলিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পণ-প্রথা প্রচলিত থাকিবার অনেকগুলি কারণ আছে। তাই উহার উচ্ছেদ করিতে হইলে মাত্র একটা উপায় অবলম্বন করিলে চলিবে না। উচ্ছেদের যতগুলি পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইল, সকলগুলিই অবলম্বন করিতে হইবে। সকলগুলির সমবায় ফলে উচ্ছেদ সাধন ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি যে উচ্ছেদের সকল উপায়গুলিই বলিতে সমর্থ হইয়াছি, এমন কথা বলিতে পারি না। আমি কয়েকটী উপায় সাধারণের সম্মুখে বিবৃত করিলাম। এইগুলির আলোচনা করিতে করিতে অনেক কথা পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

আমার কথাগুলির সারমর্ম্ম এই :—

১। আমাদের দেশের মেয়েদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে সাধারণকে বুঝাইয়া একটা মত গঠন করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রযত্নে মেয়েদিগকে শিক্ষিতা করিতে হইবে। মেয়েরা গুণবতী হইয়া উঠিলে, বিবাহের সময় তাহাদের যথার্থ আদর বাড়িবে।

২। এখন যেমনভাবে পাত্রনির্ব্বাচন করা হয়, এরূপ রীতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। মাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি দেখিয়া পাত্রনির্ব্বাচন করিলে চলিবে না। ইহাতে পরিণামে প্রতারিত ও হতাশ হইতে হয়। পাত্র নির্ব্বাচনের সময় পাত্রের মোটামুটি লেখা-পড়া, চরিত্র, মেজাজ, প্রকৃতি ও বংশের খোঁজ-খবরই প্রধানতঃ লইতে হইবে। পাত্রীনির্ব্বাচনের সময় তাহার সাধারণ শিক্ষা, ধর্ম্মানুরাগিণী কি না, তাহার কুল-শীলের কথা, তাহার বংশের মধ্যে কোন প্রকার চরিত্রদোষ আছে কি না, তাহার শিল্পানুরাগ—এই সব ব্যাপারের তত্ত্ব-তল্লাস লইবার আবশ্যক।

৩। বালিকাগুলিকে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে বিবাহ দেওয়ার নিয়ম তুলিয়া দিতে হইবে। পণ-প্রথার উচ্ছেদকল্পে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক কার্য্য। এ বিষয়ে আমাদিগকে দৃঢ়তার সহিত বদ্ধপরিকর হইতে হইবে; নচেৎ কোন ফলই হইবে না। সমাজ যদি বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহা হইলে ভয় পাইলে চলিবে না, তখন সাহসের সঙ্গে যুঝিতে হইবে। তাহা হইলে অজ্ঞান অন্ধ সমাজ আপনা হইতেই জ্ঞান ও সত্যের আলোক দেখিতে পাইবে।

বিবাহের বয়স বর্দ্ধিত করিয়া দিলে স্ত্রী-শিক্ষার পথ সহজ হইয়া আসিবে। আর দুর্ব্বল সন্তানের জন্ম নিবারিত হইয়া জাতি সবল হইয়া উঠিবে। এখন যেমন আমাদের জাতির দিন দিন ক্ষয় হইতেছে, এমনটী আর হইবে না।

৪। এক একটী জাতির শাখা-প্রশাখার মধ্যে উদ্বাহ-সম্বন্ধ প্রচলিত হওয়ার প্রয়োজন। এ বিষয়ে শাস্ত্রের নিষেধ নাই। কেবল বহুকালের দেশাচারনিবন্ধনই এরূপ বিবাহ চলিত নাই। আধুনিক অবস্থায় সমাজে এরূপ বিবাহের প্রচলন আবশ্যক। দেশাচার পরিত্যাগ করায় কোন দোষই হইতে পারে না। এরূপ বিবাহের প্রচলন হইলে নির্ব্বাচন ক্ষেত্র প্রশস্ত হইবে, আর পণের অত্যাচারও বিদূরীত হইবে।

৫। বিবাহের সময় লৌকিকতা রক্ষা করিতে গিয়া আমরা যে অনাবশ্যক খরচ করি, সেগুলি কমাইতে হইবে। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, পণের অধিকাংশ অর্থই বৃথা আড়ম্বরে ব্যয়িত হইয়া থাকে। হিসাব করিয়া ন্যায্য খরচের মধ্যে গেলে অত্যধিক পণ দাবি করিবার প্রয়োজন হইবে না।

৬। বিবাহের খোঁজ-খবর লইবার নিমিত্ত একটা বড় স্থায়ী সভা ও ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ছোট ছোট সভা গঠন করিয়া রাখিতে হইবে। দুরাচার পণ-গ্রাহকদিগের কাহিনী সাধারণে প্রচার করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে ভয় করিলে চলিবে না। অবিবাহিত যুবক ও তাহাদের অভিভাবকেরা 'পণ লইব না' বলিয়া অঙ্গীকারপত্রে নাম স্বাক্ষর করিবেন। ইহাতে নীতি ও শিক্ষা উভয়েরই পরিচয় দেওয়া হইবে। পণ-প্রথার কু-ফল প্রচারার্থে প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিতে হইবে।

৭। এই কুপ্রথাকে আমাদের দেশ হইতে বিদূরীত করিতে হইলে আমাদিগকে নৈতিক বলে বলীয়ান হইতে হইবে। সাধারণের উপকারার্থে আমাদিগকে ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রাচীন কালের সেই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি আর এ যুগের শিক্ষা ও অনুশীলনের কথা স্মরণ করিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। এ দুটিতেই বিবাহে ব্যবসায় বুদ্ধি নিন্দিত হইয়াছে।

আমাদের সমাজের সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিই পণ-প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এটী শুভ লক্ষণ। সমাজসংস্কার-কার্য্যে এক শ্রেণীর গোঁড়ারা শুধু শুধু বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। পণ-প্রথার বিরুদ্ধে যখন সকলেই একমত, তখন আমাদের আশা হয়, ভগবান আমাদের প্রতি সদয় হইবেন।

কমলা।

(লেখিকা—শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী।)

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধীরেন্দ্র। প্রভা! আজ তুমি অমন ক'রে রয়েছ কেন?

প্রভাবতী। কেমন ক'রে আছি?

ধী। এই ভাল ক'রে কথা কচ্ছ না! মুখে হাসি নাই। প্রভা যেন আজ হীনপ্রভ!

প্র। প্রাণেশ! সত্যই আজ যেন ভাই আমার মনটা মিছামিছি অস্থির হচ্ছে, মার জন্য—হৈমর জন্য প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, আর মনে হচ্ছে, হয়তো তাদের অসুখ ক'রেছে।

ধী। এমন হওয়া মন্দ নয়! তুমি কি পাগল, এখানে ব'সে কি ক'রে জান্‌লে যে, তাঁদের অসুখ করেছে? এই তো কাল পত্র এসেছে! অসুখ হ'লে তো লিখতেন?

প্র। পত্র লেখার পর যদি অসুখ হয়, তাই ভাব্‌ছি!

"তুমি কি ক্ষেপেছ? মিছামিছি মন খারাপ ক'র না; এসো, লক্ষ্মীটী আমার, মিথ্যা ভয় ক'রে মন খারাপ কর্‌তে নেই।"

এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ প্রভাবতীর কর দুইটী আদরে ধরিয়া, নিজের কাছে বসাইয়া বলিলেন,—"প্রিয়তমে! তোমায় পাঠিয়ে দিয়ে আমি থাক্‌তে পারি না। তুমি যখন অত অস্থির হয়েছ, তখন মাকে ব'লে তোমাকে শীঘ্রই পাঠিয়ে দেবো। একাকী থাক্‌তে যদিও আমার খুব কষ্ট হবে, কেন না, একদিন তোমায় না দেখলে আমার এক যুগ মনে হয়, তথাচ সে কষ্ট আমি সহ্য কর্‌বো। আমার সুখের জন্য—প্রাণের অধিক যে যুবতী, তার ম্লানমুখ দেখতে পার্‌বো না। যার সুখের জন্য জীবনপাত কর্‌তে পারি, নিজের সুখের নিমিত্ত তাকে অসুখিনী কর্‌তে পার্‌বো না। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমাকে দু'এক দিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেবো। প্রভা! এখন তুমি আর মুখ শুকিয়ে একটুখানি করো না। যে দু'দিন থাক, বেশ হাসি-মুখে থাক। তুমি গেলে তোমার জন্য যখন কষ্ট হবে, তখন তোমার হাসি

মুখখানি মনে কর্‌বো, আর মনে মনে ভাব্‌বো, প্রভা তো আমার সুখিনী হয়েছে, তার মুখে তো হাসি ফুটেছে, তখন আর এ কষ্ট আমার কষ্টই নয়!"

প্রভা। তোমাকে যেন আমি পাঠিয়ে দিতেই বল্‌ছি!

ধী। না বল্‌লেও তোমার মুখে ব'লে দিচ্ছে।

প্রভা। আমার ইচ্ছে, তুমিও চলো, দিন পনের থেকে আবার দু'জনেই আস্‌বো।

ধী। আমাকে তুমি এত অধম মনে করো না যে, স্ত্রৈণ হ'য়ে শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস কর্‌তে যাব!

প্রভা। তুমি যদি আমায় সত্যই ভালবাস্‌তে, তা' হ'লে অমন কথা বল্‌তে না। আমি কি তোমায় স্ত্রৈণ হ'তে বল্‌ছি?

ধী। তোমায় ভালবাসি সত্য, তোমার জন্য সমস্ত কষ্টই সহ্য কর্‌তে পারি। কিন্তু তাই ব'লে সম্মান নষ্ট কর্‌তে পারি নে।

প্রভা। আমি তোমায় সম্মান নষ্ট কর্‌তেও বল্‌ছি নে, স্ত্রৈণ হ'তেও বল্‌ছি নে।

ধী। প্রভা, তুমি অত চড়া চড়া কথা ক'চ্ছ কেন? আমি তোমার করেছি কি? ভালবেসেই কি এত অন্যায় করেছি? ভালবাসার কি এই পরিণাম?

প্রভা। আমি কড়া কথা বল্‌ছি, না তুমি কড়া কথা বল্‌ছো? আমি তো মাত্র বলেছি যে, তুমি আমার সঙ্গে চলো, আর তুমি বল্‌লে কি না যে, আমি তোমায় স্ত্রৈণ হ'তে বল্‌ছি! মা যদি শোনেন, তবে কি ভাব্‌বেন বল দেখি? তিনি ভাব্‌বেন, 'তাঁর ছেলেকে আমি কু-পরামর্শ দিতেছি।

ধী। মা তা ভাব্‌বেন কেন?

প্রভা। তা ভাব্‌বেন না ত কি? স্ত্রৈণ মানে কি?

ধী। স্ত্রৈণ মানে কি শুন্‌বে?—যে স্ত্রীর কথায় উঠে, স্ত্রীর কথায় বসে—স্ত্রীর অত্যন্ত বশ।

প্রভা। তবেই তো হ'লো, তোমাকে আমার বশে এনে, কুপরামর্শ দিয়ে, তোমার মাকে পর ক'রে দিই।

ধী। আঃ! এমন বোকাও তো কোথাও দেখিনি! কুপরামর্শ শুন্‌লেই কি স্ত্রৈণ হয়, নইলে হয় না? কু-পরামর্শই হোক, আর সু-পরামর্শই

হোক, নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে বৌর কথামত চল্‌লে—বৌর বশীভূত হ'লে তাকেই স্ত্রৈণ বলে।

"তা আমাকে বুঝিয়ে বল্‌লেই তো হয়! আমি তো অতো-শতো বুঝিনে।"

এই কথা ব'লেই প্রভা স্বামীর গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে,—"তুমি কি আমার উপর রাগ কর্‌লে?"

ধী। না, আমি রাগ করি নাই, তোমার উপর রাগ কোন দিন করিও নাই, করিবও না। কেন না, আমি জানি, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অল্প। উহারা সহসাই রাগিয়া উঠে। তা ছাড়া, প্রভার উপর ত আমার রাগ হ'তেই পারে না।

স্বামীর এই স্নেহ-পূর্ণ বাক্য শুনিয়া আনন্দে অধীরা হইয়া প্রভা পুনরায় চুম্বন করিয়া তাঁহার বক্ষে সোহাগ আবেশে ঢলিয়া পড়িল। ধীরেন্দ্রনাথ প্রভাবতীকে আদর করিয়া বসাইলেন। তাহার পর দু'জনে অনেক গল্প করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। দু'জনেই ঘুমাইতেছেন, এমন সময় মা আসিয়া ডাকিলেন, "ধীরেন!—ও ধীরেন!—ও ধীরেন! একবার শীগ্‌গির বাইরে আয়।"

"কি হয়েছে মা?" ব'লেই ধীরেন বাহিরে এল। মা টেলিগ্রামের একখানি খাম হাতে নিয়ে বল্‌লেন,—"এই ছাখ্, কি এসেছে বাবা!—আমার হাত পা কাঁপ্‌ছে!"

আলোর কাছে গিয়া ধীরেন্দ্রনাথ পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে—"তোমার শ্বশুরের বড় বিপদ, প্রভাকে নিয়ে শীঘ্র এসো।" মাকে বলিলেন,—"কি করা যায়?"

মা। যখন বিপদ, তখন যেতেই হবে।

ধী। তবে রাত ৪টার গাড়ীতেই যাওয়া যাক্।

পুনশ্চ প্রভার দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—"খানকতক কাপড় ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। ৪টার ট্রেণে যেতে হবে।"

প্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে গুছাইতে লাগিল। ধীরেন্দ্রনাথ চাকরকে বলিলেন,—"একখান্ গাড়ী ঠিক ক'রে আন।" গোছ-গাছ সব হয়ে গেল। গাড়ীও এল। শাশুড়ী এসে বৌর সিঁথেয় সিন্দুর দিয়ে দিলেন। পরে ছেলেকে বল্‌লেন—"ব্যাপার কি আমাকে খুলে লিখিস্। বেশী দিন থেকো না, তাঁদের বিপদ কম্‌লেই চ'লে এসো, সাবধান হয়ে থেকো।"

পরদিন বেলা ১১টার সময় তাঁহারা হরিহরপুরে পঁহুছিলেন, মেয়ে-জামাইকে দেখে লাবণ্যময়ী একেবারে চীৎকার ক'রেই মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়্‌লেন।

দু'জনে অনেক যত্নে তাঁর জ্ঞান সম্পাদন কর্‌লেন। ক্রমে হৈমবতীর মৃত্যু সংবাদ শুন্‌লেন। শুনেই প্রভা কাঁদিতে লাগিল। ধীরেন বাবুও দুঃখিত হইলেন। ধীরেন বাবু শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। প্রভাকেও সান্ত্বনা দিলেন। ৩।৪ দিন পরে কিছু শান্ত হইলে, প্রভার সহিত ধীরেন বাড়ী ফিরিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লমুখী। মেয়ে এত বড় হ'লো, তার বের কথা তো একবারও বল না?

অবিনাশ। তার আর বল্‌বো কি! বিয়ের সময় হ'লে বিয়ে দিলেই হ'ল। তার আর বলা-বলি কি?

প্র। বিয়ের কি সময় হয় নি? আর যখনই মনে করা তখনই কি বে হয়?

অ। কেন হবে না? যত টাকা লাগ্‌বে, তাই দেবো, তবে কেন বে দেওয়া যাবে না?

প্র। শুধু টাকা হলেই কি বে হয়? পাত্র খুঁজ্‌তে হবে না?

অ। পাত্র খুঁজ্‌তে ক'দিন লাগে? ঐ তো যতীনবাবু অনিলার বে পনের দিনের ভিতরেই দিয়ে ফেল্‌লেন।

প্র। আমি অমন জামাই চাইনে।

অ। জামাই মন্দ হ'ল কিরূপে? মাসে এক্‌শো ক'রে টাকা উপায় কর্‌ছে।

প্র। পোড়াকপাল টাকার! পেটে একটু বিদ্যে নেই—চা বাগানে প'ড়ে থেকে দুটো টাকা উপায় কর্‌লেই বুঝি ভাল জামাই হলো? ও টাকা ক'টা তো ডাক্তার বাড়ীতেই যাবে! আমি টাকা চাইনে—আমার অমন জামাই হ'লে আত্মহত্যা কর্‌বো।

অ। আমি অমন জামাই আন্‌বো, তাই কি বল্‌ছি? বল্‌ছি এই যে, কত অল্প সময়ের মধ্যে যতীনবাবু জামাই পেলেন। তিনি যেরূপ খুঁজেছেন, সেইরূপ পেয়েছেন। আমরা যেরূপ খুঁজবো সেইরূপ পাব। এখন কথা হচ্ছে এই—কি রকম জামাই তোমার ইচ্ছা?

প্র। আমার?—অবস্থা যেমন তেমন হউক, তবে ছেলেটী লেখাপড়া-জানা চাই। অন্ততঃপক্ষে যেন বি-এ পড়ে। আর ছেলেটী দেখ্‌তে শুন্‌তেও ভাল হওয়া চাই।

অ। আচ্ছা, তাই হবে। তোমার পছন্দমত জামাই এনে দেবো।

প্র। এখনও এনে দেবে, বল্‌ছো! অনিলা কমলার চেয়ে প্রায় একমাসের ছোট। তার বে হয়ে গেল, কমলা তার বড়, অথচ বের খোঁজ নেই! বৈশাখ মাসের ভিতর মেয়ের বে দিতেই হবে। কেন না, এর পর কমলার জোড়া বছর পড়্‌বে।

অ। যদি ঠিক্ কর্‌তে পারি, তবেই বৈশাখ মাসে দিব।

অপরাহ্ণ বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় অবিনাশ বাবু নিজ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পুষ্করিণীর সোপানাবলী বেদীর উপর উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন মালীকে বলিলেন, "হরমোহনকে ডেকে আন্।" অল্পক্ষণ পরে মালী আসিয়া বলিল—"দেওয়ানজী বাবু ঐ আস্‌ছেন।" দেওয়ান আসিয়া অবিনাশ বাবুকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবিনাশ বাবু বসিতে অনুমতি করিলে, নিকটেই বসিলেন, এবং দেওয়ানজী বলিলেন,—"আমায় কি জন্য ডেকেছেন?"

অ। ডেকেছি কেন জান, কমলার বিয়ে দেবার সময় হয়েছে। একটী পাত্র ঠিক করো। ছেলেটি দেখ্‌তে যেন সুশ্রী হয়, লেখাপড়াও জানা চাই, অন্ততঃ যেন বি-এ পড়ে। অবস্থা দেখবার প্রয়োজন নাই। এই মাসের ভিতরেই পাত্র ঠিক কর্‌তে পার্‌লে ভাল হয়, বুঝেছ?

দে। তা হ'লে আমাকে কিছুদিন ছুটি দিতে হবে; কেন না, সময় অল্প। ওদিকে একটু বেশী না খাট্‌লে চল্‌বে না।

অ। তোমায় পনের দিন ছুটি দিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভূপেন্দ্রনাথ ও লাবণ্যময়ী হৃদয়ের গভীর যাতনায় দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই চক্ষের জলে বক্ষ প্লাবিত; আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণের মত মাঝে মাঝে এক একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হৃদয়-অভ্যন্তরস্থ শোক একটু মন্দীভূত করেন। প্রভাকে কোলে ক'রে শোকের বেগ কমাইবার ইচ্ছা মনে করেন, কিন্তু প্রভাবতীর মুখ দেখিলে হৈমবতীর মুখ আরও মনে জাগিয়া উঠে; কেন না, একই ছাঁচে দু'জনার মুখ গড়ান। যাহা হউক, অনেক কষ্টের মধ্যেও প্রভাকে নিয়ে উপরের হাহাকার সামলাইতে লাগিলেন।

একদিন প্রভা কাজ-কর্ম্ম সমাধা করিয়া, মাকে স্নান করাইয়া, এবং

নিজে স্নান করিয়া রান্না করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ভূপেন্দ্রনাথ দু'খানি পত্র হাতে করিয়া বাড়ী আসিলেন।

বাপের হাতে পত্র দেখিয়া প্রভা দাঁড়াইলেন; কেন না, ধীরেন্দ্রনাথের পত্র কয়েক দিন পায় নাই।

ভূপেন্দ্র বাবু একখানি খাম প্রভার নিকটে ফেলিয়া দিয়া লাবণ্যময়ীকে বলিলেন,—"প্রভাকে নিয়ে যাবে।"

লাবণ্যময়ী। কি ক'রে জান্‌লে?

ভূপেন্দ্র। এই দেখ, প্রভার শাশুড়ী পত্র লিখেছেন।

লাবণ্যময়ী। তুমি পড়।

ভূপেন্দ্র বাবু পড়িতে লাগিলেন ঃ—

"বৈবাহিক মহাশয়, আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রকুমারের ২৮শে ফাল্গুন উপনয়ন হইবে। আগামী পরশ্ব ২৫শে তারিখে শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ বধূমাতাকে আনিতে হইবে। ২৬শে দিন ভাল আছে। ঐ তারিখে বধূমাতাকে পাঠাইয়া দিবেন, আর আপনি ও বৈবাহিকা ঠাকুরাণী যদি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সঙ্গে আসেন, তাহা হইলে বড়ই আনন্দিত হই। এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ইতি—

ধীরেন্দ্রের মা।"

ভূপেনবাবু পত্র পড়িয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "প্রভা শ্বশুরবাড়ী যাবে। কি ক'রে যে দিন কাটাবো, তাই ভাবছি।"

লাবণ্যময়ী বলিলেন, "যখন পাঠাতেই হবে, তখন আর ভাবিয়া কি ফল? যার ভাবনা তিনিই ভাব্‌বেন। একমাত্র ভগবানই ভরসা।" প্রভাকে বলিলেন, "মা, তুমি আর রাঁধিতে যাইও না। আমি যাই দুটো রাঁধিগে। আহা, বাছা এসে খাট্‌তে খাট্‌তে, কি হয়ে গেল! আমাকেও ভগবান গুঁড়া ক'রে দিলেন। একদিনও দু'টো রেঁধে খাওয়ায় নি।"

"না না, আমিই রাঁধ্‌ছি," বলিয়া প্রভা শীঘ্র ভাত চড়াইয়া দিল। তারপর ঘরে গিয়া খামখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

"প্রিয়তমে!—তোমার পত্র পাইলাম। তুমি ভাল আছ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি ২৫শে তোমাকে আনিতে যাইব; তুমি প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। বীরেণের পৈতার কাজ-কর্ম্মে বড়ই ব্যস্ত আছি। অধিক লিখিতে পারিলাম না। ইতি—

তোমার—ধীরেন্দ্রনাথ।"

যথাসময়ে আসিয়া ধীরেন্দ্রনাথ প্রভাকে লইয়া গেলেন। প্রভাকে বিদায় দিয়া লাবণ্যময়ী চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; ২৪ ঘণ্টা চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই হৃদয়বিদারক চীৎকারে ভূপেন্দ্রনাথ আরও অস্থির হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি লাবণ্যময়ীকে বলিলেন,—"লাবণ্য! আমি সর্ব্বদাই তুষানলে দগ্ধ হইতেছি, আর তোমার এই সদা সর্ব্বদা হাহাকারে আমি একেবারে পাগল হইব দেখিতেছি। যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, এখন পাগল হইলে শত্রু হাসিবে। ধৈর্য্য ধর। মরণই স্বাভাবিক। ছোট থেকে যেমন বড় হইয়া যৌবনে পড়িবে ও পরে বৃদ্ধ হইবে, সেইরূপ মৃত্যুও সকলেরই হইবে। আমাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ২য়-১৩॥

মানুষ ত মরে না; কেবল এই অন্নময় দেহটা ত্যাগ করে মাত্র।

গীতার অন্য স্থানে শ্রীমধুসূদন বলিয়াছেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২য়-২২॥"

"লাবণ্য! গীতার এই সমস্ত উপদেশ মনে ক'রেই ধৈর্য্য ধর। তুমিও চির-দিন থাক্‌বে না, আমিও থাক্‌বো না; একদিন না একদিন সকলকেই সে স্থানে যেতে হবে। সেখানে গেলে আবার হৈমকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। সেই আশাই এখন মূল মন্ত্র হইয়াছে। তুমিও তাই কর।"

লাবণ্য। নিশ্চয়ই যে দেখা হবে তা কি ক'রে জান্‌বো?

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি-এ, এল্-এম্-এস্।

যে সকল সুসন্তানকে অঙ্কে ধারণ করিয়া জননী জন্মভূমির পবিত্র মুখ সমুজ্জ্বল হয়, সেই সকল ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীরগণের আদর্শ-চরিত্র আলোচনায় যে জন-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, একথা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই উদ্দেশ্যে আজ আমরা, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ও অকৃত্রিম বন্ধু পরলোকগত আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের পবিত্র জীবনী নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। যাঁহারা গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের সহিত সুপরিচিত, তাঁহাদিগকে তাঁহার পবিত্র জীবনী সম্বন্ধে কোন নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহারা সকলেই বিদিত; কিন্তু যাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের জীবনের বিশেষ কোনও সংবাদ অবগত নহেন, তাঁহাদিগের জন্যই এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের

অবতারণা,—আমাদের বিশ্বাস, ইহা সংক্ষেপে লিখিত হইলেই ইহার দ্বারা উক্ত মহানুভব ব্যক্তির উন্নত চরিত্র ও আদর্শজীবনের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া পাঠকমাত্রেই উপকৃত হইবেন।

গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ ইং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পতিত-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কয়েকজন নিত্যসিদ্ধ প্রিয় পরিকর গোস্বামীবংশের পূর্ব্বপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া ইঁহাকে পবিত্র ও বৈষ্ণব-জগতে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই সুপবিত্র বৈষ্ণব-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারই প্রভাবে সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় অতি শৈশব হইতেই বৈষ্ণবজনোচিত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে,—সরলতায় ও কোমলতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার শৈশব-লালিত্যে এমন সকল স্নিগ্ধ ভাবমাধুরীমা ফুটিয়া উঠিত, যাহা সন্দর্শন করিয়া গ্রাম্যস্থ ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রতি অত্যধিক স্নেহ প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের অঙ্গনে সমুপস্থিত হইয়া, তিনি সুমধুর স্বরে "শ্রীকৃষ্ণের শতনাম" আবৃত্তি করিতেন। প্রত্যূষে এই সরলমতি সুন্দর বালকের মুখোদ্গীরিত ভুবনমঙ্গল "কৃষ্ণনাম" শ্রবণে প্রফুল্লিত প্রতিবাসী, আন্তরিক আশীর্ব্বাদের সহিত স্নেহভরে তাঁহার হস্তে খাদ্যসামগ্রী অর্পণ করিতেন। গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের পিতৃদেব ৺মনোহর গোস্বামী মহাশয় অতিশয় সরল-প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিশেষত, পরোপকার, ধর্ম্ম-ভীরুতা ও সৎসাহস প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি গ্রাম্যস্থ সকলেরই প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। শিষ্যদিগের নিকট হইতে গুরুপ্রণামী-স্বরূপ যাহা কিছু অর্থাদি প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতেই তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ কোনও প্রকারে সঙ্কুলান হইয়া যাইত; ইহার অধিক তাঁহার আর কোনও আয়ের উপায় ছিল না, সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন যে অতিশয় অস্বচ্ছলতা ও দরিদ্রতার ভিতর দিয়া অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। শৈশব হইতেই দরিদ্রতার সহিত তাঁহাকে যে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাঁহার ভাবী জীবনের প্রগাঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব সেই সংগ্রামেরই অমৃতময় ফল। সন্ধ্যা সমাগত হইলে বালক সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতৃব্যের নিকট বসিয়া, প্রত্যহ তাঁহার নিকট হইতে শ্রীভগবৎলীলা গুণাদিসূচক নানা প্রকার সুমধুর কাহিনী শ্রবণ করিতেন। সেই অমৃতময় শ্রীভগবৎ কথা শুনিতে শুনিতে এদিকে বালক যেমন আত্মহারা হইয়া যাইতেন,

সেইরূপ অপর দিকে বৃদ্ধও সেই পবিত্র কাহিনী বলিতে বলিতে অশ্রুজলে পরিসিক্ত হইতেন। দরিদ্র-কুটীরের অভ্যন্তরে—সেই দীনজন-প্রতিপালকের দয়া ও লীলাকথামৃতে নিমজ্জিত এই বালক ও বৃদ্ধের পবিত্র সম্মিলনে যে বিমল আনন্দের উৎস ছুটিত, তাহার তুলনা এ জগতে অতীব বিরল। এই আনন্দ-প্রবাহ গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সজীব ছিল। তাঁহাকে অনেক সময়ে বলিতে শুনিয়াছি—"সেই ভগবৎ করুণার সুশীতল ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত—ভগ্নকুটীরের ভিতর বসিয়া, পেটে ক্ষুধা ও মুখে হরিনাম যেমন মধুর বলিয়া বোধ হইত—তাহার পর ত' জীবনের কতদিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেরূপ মিষ্টতা—সেরূপ আনন্দ আর কোথাও পাই নাই।"

তিনি তাঁহাদের গ্রাম্যদেবতা—"শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ"কে তাঁহাদের দীন-পরিবারবর্গের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও প্রধানতম অবিভাবক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সরল শৈশব-হৃদয়ে এই বিশ্বাস—পরম সত্যরূপেই অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। কোনও আনন্দের সংবাদ থাকিলে অমনি বালক ছুটিয়া গিয়া—সর্ব্বাগ্রেই রাধাবল্লভকেই জানাইতেন;—কোনও দুঃখ উপস্থিত হইলে তাঁহারই প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতেন। ভক্তবৎসল শ্রীভগবানও এই সরল বালকের সরল বিশ্বাস উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিতে কোনও দিন উপেক্ষা করেন নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে এমন শত শত অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাকে আমরা তাঁহার ভাবী-জীবনের প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের মূল ভিত্তিরূপে উল্লেখ করিতে পারি। সংক্ষেপে কেবল এইরূপ দুই একটি ঘটনামাত্র আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ শৈশবে গ্রাম্যস্থ বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিয়া একান্ত আগ্রহ ও যত্নের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকেন। অতি অল্পবয়স হইতেই তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাইয়া শিক্ষকগণ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রায় প্রতিবারেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। অর্থাভাব বশতঃ পাঠ্যপুস্তকের সকলগুলি তাঁহার ক্রয় করা হইয়া উঠিত না, এইজন্য তিনি অনেক সময়ে বিদ্যালয়ে গমনপূর্ব্বক সকলের শেষে যাইয়া বসিতেন; প্রথম বালক হইতে তাঁহার পূর্ব্বেকার সহধ্যায়ী পর্য্যন্ত একে একে পাঠ আবৃত্তি করিতে করিতেই তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া, যথাসময়ে শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই

আবৃত্তি করিতেন। একদিবস সন্ধ্যার পর কোনও সহধ্যায়ীকে পরদিবসের নির্দ্দিষ্ট পাঠ অভ্যাস করিতে শুনিয়া, সুরেন্দ্রনাথ নীরবে তাঁহার পাঠাগারের বাতায়ন পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই বালকের উচ্চারিত পাঠ শ্রবণপূর্ব্বক কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেছিলেন। শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ত আদৃত হইতে দেখিয়া—উক্ত সহধ্যায়ী তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল; সুতরাং তাঁহাকে স্বীয় বাতায়ন পার্শ্বে অবস্থিত জানিতে পারিয়া, সহধ্যায়ী তৎক্ষণাৎ অধ্যয়ন স্থগিত রাখিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল; সুরেন্দ্রনাথের সেইদিনকার পাঠ আয়ত্ব হইল না। পর-দিবস বিদ্যালয়ে গমন করিলে, ঘটনাক্রমে শিক্ষক মহাশয় সেদিন সর্ব্বপ্রথমেই সুরেন্দ্রনাথকে পাঠ আবৃত্তি করিতে আদেশ করিলেন, ও তাঁহাকে অকৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া ও বিশেষ অনুসন্ধানে তাঁহার এ যাবৎ পাঠ্যপুস্তকগুলির সমস্ত ক্রয় করা হয় নাই জানিয়া, কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিলেন। এই প্রকার অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন; ইহার ফলে, পরক্ষণেই কিঞ্চিৎ দুঃখ ও অভিমান তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, এই দুঃখ ও অভিমান তাঁহার চিরারাধ্য দেবতা শ্রীরাধাবল্লভ ব্যতীত আর অপর কাহারও উপর নহে। সেই দিন বিদ্যালয়ের ছুটির পর সর্ব্বপ্রথমেই ভগবৎ শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া, বালক অভিমানজড়িতস্বরে বলিলেন, "ঠাকুর! যদি আজ আমায় বইখানি না দাও, তবে কাল থেকে আর বিদ্যালয়ে যা'ব না।" এই সরল শৈশব-হৃদয়ের কাতর নিবেদন—জানি না, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের দারুময়ী মূর্ত্তি শ্রবণ করিল কি না? কিন্তু তিনি গৃহে উপস্থিত হইলেই, তাঁহার পিতৃদেব ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"অমুক লোক কতকগুলি পুরাতন বই পাঠাইয়া দিয়াছে, তা'র ছেলে উঁচু ক্লাসে উঠিয়াছে,—তাই এগুলো তা'র আর কাজে লাগিবে না। দেখ্ দেখি, যদি কোন বই তোর পড়ায় লাগে?" পুস্তকের কথা শুনিয়াই আশায় উৎফুল্ল বালক দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি তাঁহার নিষ্প্রয়োজনীয় পুস্তকরাশির উপর প্রথম পুস্তকখানিই সেই গ্রন্থ—যাহার জন্য তিনি আজ বিদ্যালয়ে তিরস্কৃত হইবার পর পুস্তকের অভাব, এইমাত্র তাঁহার দয়াময় শ্রীরাধাবল্লভের নিকট বলিয়া আসিয়াছেন। সাধারণতঃ আমরা এই ঘটনাকে "কাকতালির ন্যায়" পরিদর্শন করিতে পারি, কিন্তু গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ এরূপ ঘটনায়—তাঁহার দয়াময়ের অনন্ত দয়া বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। ভগবৎ করুণার

অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তিনি যে কেবল অভাবের মধ্যেই অনুভব করিতেন, তাহা নহে,—সম্পদে-বিপদে, আশায়-নিরাশায়, সুখে-দুঃখে—অথবা মৃত্যুর ভৈরবী ছায়ার মধ্যেও সেই দীনজন-প্রতিপালকের দয়ার মূরতি—তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠিত। আমরা তাঁহার জীবনের এইরূপ দুই একটি ঘটনামাত্র নিম্নে উল্লেখ করিব।—

ভাজনঘাট গ্রামের উত্তর প্রান্তে ২।৩ ক্রোশ দীর্ঘ ও বহু বিস্তৃত একটি বিল বা জলাশয় আছে। একদিবস সুরেন্দ্রনাথের কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় ভ্রাতা, তাঁহাকে সন্তরণ শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে উক্ত জলাশয়ে লইয়া যান। তখন বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারায় বিলটি পরিপূর্ণ ও দিগন্তবিস্তৃত-প্রায় হইয়া, অতিশয় ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। উক্ত আত্মীয় নিজে বিলক্ষণ সন্তরণপটু ছিলেন। তিনি সন্তরণ-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ বালক সুরেন্দ্রনাথকে সন্তরণে সাহায্য করিয়া, অল্পে অল্পে যখন প্রায় বিলের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত, ঠিক সেই সময়ে, তাঁহার অপর কতিপয় সন্তরণপটু বন্ধুকে বিশেষ উৎসাহের সহিত উক্ত জলাশয় পারাপার হইতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সেই দিকে দ্রুত প্রস্থান করিলেন। সন্তরণে অত্যন্ত উল্লাস বশতই হউক বা তাঁহার ভ্রাতা সন্তরণ শিক্ষার্থীটি স্বসামর্থ্যে তীরে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইবে, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তীতেই হউক, তিনি আর একবারও সুরেন্দ্রনাথের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না, বা তাঁহার অবস্থার কথা ভাবিলেন না। নিমজ্জনাশঙ্কায় আকুলিত বালকের কাতর অনুনয় তাঁহার কর্ণে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, তিনি অনেক দূর-ব্যবধানে চলিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ে যে পরিমাণ সন্তরণ শিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অপরের সাহায্য ব্যতীত কোন প্রকারে ১০।১২ হাত যাইতে পারেন মাত্র। কিন্তু এই বর্ত্তমান জীবন-সঙ্কটে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে ন্যূনপক্ষে শতহস্ত বিস্তৃত জলরাশি অতিক্রম করিতে হইবে, সুতরাং তাঁহার এই বিপদের গভীরতা—পাঠক, একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন! প্রাণরক্ষার জন্য সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া ১৫।১৬ হস্ত পরিমিত জলরাশি অতিক্রম করিয়া আসিলেন; কিন্তু আর শক্তিতে কুলাইতেছে না। তাঁহার শেষ শক্তি যাহা—তাহার বিশ্রান্তিস্থলে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল! দেহ সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়িল! নিমজ্জমান বালক

কেবল শেষ একবার তাঁহার দয়াময় "রাধাবল্লভ" নাম উচ্চারণ করিয়া সলিল-গর্ভে অদৃশ্য হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ করুণার স্নিগ্ধজ্যোতি নিরাশ্রয় বালকের জীবনরক্ষার্থ সলিল-গর্ভে প্রতিবিম্বিত হইল! নিমজ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই একখানি প্রোথিত দীর্ঘ বংশদণ্ড তাঁহার দেহ স্পর্শ করায়, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া উঠিলেন। বর্ষা আগমনের পূর্ব্বে ধীবরেরা কোনও প্রয়োজন বশতঃ এই দীর্ঘ বংশদণ্ডখানি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়াছিল। বর্ষা সমাগমে বিলের জল অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায়, তাহা সলিল-গর্ভে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়। বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে এই বংশদণ্ডটি যে কোথায় আছে, তাহা নিরূপিত করা সম্পূর্ণ অসাধ্য ছিল; সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে এই অপ্রত্যাশিত আশ্রয়যষ্টি লাভ করা যে একমাত্র তাঁহার দয়াময়ের অনন্ত দয়ার পরিচয়, তাহা ভগবৎ-বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

বাল্যকাল হইতেই গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। একদা একখানি জীর্ণ নৌকারোহণে তিনি তাঁহার পিতৃদেবের সহিত নদী উত্তীর্ণ হইতেছিলেন। পিতা ও পুত্র ব্যতীত নৌকায় অপর আরোহী কেহ ছিল না। তরণীখানি নদীর মধ্যস্থলে যাইতে না যাইতেই, তলদেশ বিদীর্ণ হইয়া ভীষণ বেগে জল উঠিতে থাকে। নিমজ্জনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিয়া, তাঁহার পিতৃদেব অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে, তিনি সাঁতার জানেন কি না, জিজ্ঞাসা করায়, সুরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত বা বিচলিত না হইয়া, তৎক্ষণাৎ জনকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ জানাইলেন যে, তিনি উত্তম সন্তরণ-পটু; এমন কি, দুইবার অক্লেশে পারাপার হইতে পারেন। পুত্রের কথায় আশ্বস্ত হইয়া, পিতার হৃদয়ে পুনরায় বল ও উৎসাহ আসিল। তিনি দ্বিগুণ শক্তিতে তরণী বাহিতে লাগিলেন, ইহাতে নৌকাখানি তীরের প্রায় সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া জলমগ্ন হইল। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথ তখন কিঞ্চিন্মাত্রও সন্তরণ জানিতেন না। তিনি সেই দিন এইভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন না করিয়া, সন্তরণ সম্বন্ধে নিজ যথার্থ পরিচয় জ্ঞাপন করিলে, নিজেকে হয় ত অশেষ বিপদে পতিত হইতে হইত।

এইরূপে অনেক বিপদ ও অভাবের মধ্য দিয়া ও শ্রীভগবৎ করুণার স্নিগ্ধরশ্মি বক্ষে ধারণ করিয়া, গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে গ্রাম্যস্থ বিদ্যালয় হইতে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি এই পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের মধ্যে

কেবল মাত্র দুই নম্বর কমের জন্য প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। পরে বারাসতের গবর্ণমেণ্টের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাইনর পরীক্ষায় যে বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার শিক্ষাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। বারাসতে আসিয়া গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ, তাঁহার শিক্ষাদি বিষয়ে তৎকালীন Director of Public Instructionএর ভূতপূর্ব্ব সহকারী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয়ের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উন্নতচরিত্র প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল লক্ষ্য করিয়া, সেই সময় হইতেই তাঁহাকে বিশেষ স্নেহচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। উভয়ের মধ্যে একটা গাঢ়তর আন্তরিকতা বরাবর সজীব ছিল।

এই বারাসত ইংরাজী স্কুল হইতেই গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। গুস্তিয়ানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার ৺ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের বৃত্তি পাইয়া, তিনি কলিকাতার মেট্রোপোলিটন্ কলেজে প্রবেশ লাভ করেন। উক্ত বৃত্তি হইতে তাঁহার শিক্ষাদির সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ না হওয়ায় প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে শিক্ষকতা করিয়া নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। দরিদ্রতার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাই তিনি দরিদ্রের দুঃখ চিরদিন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন; সেই জন্য সেই সময় হইতেই ছাত্রাদি পড়াইয়া যে অর্থ পাইতেন, তাহা হইতেই ২।৫ টাকা তাঁহার ন্যায় অভাবগ্রস্থ ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতেন।

গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ, মেট্রোপলিটন্ কলেজ হইতে যথাসময়ে এফ-এ ও তৎপরে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার্থ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে তাঁহার পিতৃদেবের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায়, অর্থাভাবে তাঁহার সংসার প্রায় অচল হইয়া উঠিল; সুতরাং অধ্যয়ন স্থগিত রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হইল। কিছুদিন অবিশ্রান্তভাবে চেষ্টা করিয়াও যখন সুবিধাজনক কোনও কার্য্যের সংস্থান করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, যখন বিপদের অন্ধকার মাথার উপর ঘনাইয়া আসিত, যখন নিরাশার গাঢ়মেঘ হৃদয়ে সঞ্চিত হইত, তিনি সেই সময়ে অত্যন্ত বিশ্বাসের সহিত শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নাম সর্ব্বদা গ্রহণ করিতেন ও তাঁহার

নিকট প্রার্থনা করিতেন। ইহার ফল প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে ফলিত। এই সময়েও ঠিক তাহাই হইল। একদিন কোনও নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, শ্রীভগবানের নিকট ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করিবার পরেই তাঁহার নিরাশ হৃদয়ে হঠাৎ যেন একটা আশার আলোক ফুটিয়া উঠিল। তিনি বাসায় ফিরিয়াই, শয্যার উপর একখানি পত্র পাইলেন। উৎসাহভরে পত্রখানি উন্মুক্ত করিয়াই দেখিতে পাইলেন, জয়পুর হইতে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহার জন্য একটি চাকরী স্থির করিয়া শীঘ্রই তথায় তাঁহাকে যাইতে লিখিয়াছেন। তাঁহাকে Thakur Saheb of Bagrura পুত্রের শিক্ষকতা করিতে হইবে। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তিনি অবিলম্বে জয়পুরে গমন করিলেন। এই স্থানে আসিয়া, বিশ্বাস ও ভক্তির এক প্রবল বন্যা উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার পবিত্র হৃদয়-তট পূর্ণ করিয়াছিল। তাঁহার "পরিচয়" নামক পুস্তকের পাঠক মাত্রেই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। আজমীঢ়ের সুপ্রসিদ্ধ Mayo Collegeএ অবস্থানকালে, তত্রস্থ সামন্ত রাজপুত্র-গণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও অপরাপর গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের জয়পুর আগমনের পর হইতেই তাঁহার পিতৃদেবের সাংসারিক অবস্থা অনেক পরিমাণে স্বচ্ছল হইয়াছিল। পিতার সমুদয় ঋণভার অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পরিশোধ করিতে সক্ষম হইয়া নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলেন। অনেক দুঃখ কষ্টের পর সময়ে তাঁহাদের সংসারে একটু সুখের আলোক পরিদৃষ্ট হইতে থাকিলেও সে সুখ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই বিষাদময় ঘটনা তিনি স্বপ্নযোগে জানিতে পারিয়া, শীঘ্রই দেশে প্রত্যাগমন করেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত সত্যে পরিণত দেখিয়া, সুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি পুনরায় মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বীয় অধ্যয়নের ও সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এই সময়ে গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হিন্দু-হোষ্টেলের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কিছুদিন পরেই নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি কুমারখালি নামক স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ডাক্তারী চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েন। কুমারখালি

আগমনের পর হইতেই গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসের এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছিল। যে চরিত্রকে তিনি এতদিন প্রবল পরীক্ষার ভিতর দিয়া, আদর্শ ও পবিত্ররূপে বিকসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, কর্ত্তব্যের কঠিন ক্ষেত্রের সহিত এই সময় হইতেই প্রকৃষ্টরূপে তাহার সংযোগ আরম্ভ হয়।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি কুমারখালির চতুঃপার্শ্বস্থ ৫০।৬০ মাইল স্থানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক-চিকিৎসকরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সেই সকল স্থানের পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র কৃষক হইতে সৌধনিবাসী ক্রোড়পতি পর্য্যন্ত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোক অতি বিরল ছিল, যাহারা ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথের নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ না করিত। তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসায়ের এইরূপ অসামান্য উন্নতি কেবল যে তাঁহার সুচিকিৎসার ফলেই হইয়াছিল এমন নহে, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তাঁহার অসামান্য বিনয়, সরলতা ও স্বার্থত্যাগ, তাঁহার অসীম দয়া ও ঈশ্বরবিশ্বাস প্রভৃতি গুণাবলীও এই উন্নতির পথে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছিল। তিনি যখন কোনও রোগীর চিকিৎসাভার গ্রহণ করিতেন, তখন ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে তাহার আরোগ্যের জন্য ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কোনও দিন উপেক্ষা করিতেন না।

একদা কুমারখালি হইতে ১২মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের কোন ধনিগৃহে চিকিৎসার্থ আহুত হইয়া, গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ তথায় গমন করেন। তৎকালে জনৈক দরিদ্র কৃষক উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া, তাঁহার চিকিৎসাধীন ছিল। কৃষক তাহার বৃদ্ধা জননীর একমাত্র সন্তান ও তাহাদিগের দরিদ্র পরিবারবর্গের একমাত্র অবিভাবক। সুতরাং ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ, এই দরিদ্র কৃষকের চিকিৎসায় যে দায়ীত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া, সেই রাত্রিতেই ফিরিয়া আসিবেন এই সর্ত্তে উক্ত ধনবান্ ব্যক্তির গৃহে গমন করেন। তাঁহার ব্যবস্থাপিত ঔষধ সেবনের পর হইতেই সেই রোগী অনেক পরিমাণে সুস্থ বোধ করে ও সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন গোস্বামী মহাশয় উক্ত কাতর কৃষকের বৃত্তান্ত জানাইয়া, সেই রাত্রিতেই প্রত্যবর্ত্তন করিবার বাসনা জ্ঞাপন করিলে, উক্ত ধনীব্যক্তি সে প্রস্তাবে বিশেষভাবে আপত্তি করেন ও প্রত্যহ পঞ্চশত মুদ্রা হিসাবে ডাক্তার সুরেন্দ্রমাথকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে আরও ২।৩ দিন তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সেই ভগ্ন-কুটীরশায়ী দীন

আতুরের প্রতি তাঁহার সুমহান্ দায়ীত্ব চিন্তা করিয়া, তিনি সেই প্রস্তাব উপেক্ষা পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ষ্টেশনে উপস্থিত হইবার অল্প কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই, রাত্রির শেষ গাড়ী ষ্টেশন পরিত্যাগ করায়, তিনি বিশেষ অসুবিধায় পতিত হয়েন। ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহাকে সেই রাত্রির জন্য ষ্টেশনে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেও তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান এমন প্রবল ভাবে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিতে থাকে যে, তিনি আর কোনরূপ চিন্তা না করিয়া, তখনই রেলওয়ে লাইনের ধার দিয়া একাকী সেই অন্ধকার রাত্রিযোগেই অবিশ্রান্ত ভাবে সুদীর্ঘ ১০।১২ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক অতি প্রত্যুষেই দরিদ্র-আতুরের পর্ণকুটীর-দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক অসাধারণ ত্যাগস্বীকার ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠগুণে তিনি স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান ধনী দরিদ্র সকলেরই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনেক মুসলমান পরিবারে তিনি কেবল "দয়াল হাকীম" নামেই পরিচিত ছিলেন। তাহারা তাঁহার নাম বা অপর পরিচয়াদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিত না।

বৈষ্ণব-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও বৈষ্ণব-পরিবারের সংস্পর্শে থাকিয়া গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ বৈষ্ণবজনোচিত অনেকগুণে বিভূষিত ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীভগবন্নামে দৃঢ় বিশ্বাস ও জীবে দয়া—এই সাধনদ্বয়কে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হৃদয়ের সহিত গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন গৃহের বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন, একটি অপরিচিত ব্যাধিগ্রস্থ পথিক সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় ও বিপন্ন হইয়া একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া আছে। তাহার সর্ব্বশরীর ক্ষতময় ও কীটে সমাচ্ছন্ন। হতভাগ্য ব্যাধির যন্ত্রণায় মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ করিতেছে ও এক একবার "হরিনাম" উচ্চারণ করিয়া পরিতাপের অশ্রুধারায় নিজ কলুষরাশি বিধৌত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। হরিনাম শ্রবণ করিবামাত্র গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট যাইয়া, তাহার অবস্থা বিদিত হইলেন ও তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। পরোপকারপ্রিয় কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া, নিজবাটীর সন্নিকটস্থ অপর একটি গৃহে স্থান দান করিলেন। জনৈক পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার এইরূপ কার্য্য দর্শনে বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তিনি তাঁহাকে বিনীত ভাবে বলিয়াছিলেন, "ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। বিপন্ন জীবের সাহায্য করা মানুষমাত্রেরই

অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা কর্ত্তব্য তাহার অনুষ্ঠান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত বা গৌরবান্বিত হইবার কিছুই কারণ নাই। বিশেষতঃ, মহাপ্রভুর উপদেশ—যাহার মুখে অন্ততঃ একবার হরিনাম শ্রবণ করা যায়, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। সুতরাং এই ব্যক্তির সেবায় বৈষ্ণব-সেবাও লাভ করিতে পারিব।" প্রত্যহ রোগী দেখিতে বাহির হইবার পূর্ব্বে, তিনি স্বহস্তে এই রোগীর দুর্গন্ধ ক্ষতময় দেহ ধৌত করিয়া দিয়া, যথাযথ ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া যাইতেন। ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও লোকটি কয়েক দিবস পরেই মৃত্যুর শীতল অঙ্কে শয়ান করে। এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-কুলশীলজনের গলিত মৃত-দেহের সৎকার-কার্য্যে কেহই স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইল না দেখিয়া, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ অপর কাহাকেও এ সম্বন্ধে অনুরোধ না করিয়া, স্বয়ংই কতিপয় আত্মীয়ের সাহায্যে এই কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে এই কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া, দেখিতে দেখিতে অনেক লোক সেখানে উপস্থিত হইল। তাঁহার মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণীত হইয়া, স্থানীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত লোক সানন্দচিত্তে এই সেবা-কার্য্যে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত যোগ দিলেন। পথিঃ-নিক্ষিপ্ত নগণ্য দরিদ্রের মৃতদেহ, স্বেচ্ছায় সানন্দে কত লক্ষপতি মিলিয়া বহন করিয়া চলিলেন। সে দিনকার সেই দৃশ্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনেকে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই। এইরূপে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথের সুমধুর চরিত্রের সান্নিধ্যে আসিয়া অনেক বিলাস-পরায়ণ উচ্ছৃঙ্খলমতি ধনিসন্তান জীবন-স্রোতের পরিবর্ত্ত করিয়া পারিবারিক ও সামাজিক সুখ-শান্তি-বিধানে সক্ষম হইয়াছিলেন। দান সম্বন্ধে গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ আজীবন মুক্তহস্ত ছিলেন। অর্থসঞ্চয়ের স্পৃহা তাঁহার জীবনে কোনও দিন স্থান পায় নাই। তিনি সারা জীবনে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিলেও এই অর্থসঞ্চয়ে নিস্পৃহতা ও দানশীলতাই তাঁহাকে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। তিনি বলিতেন, "আমরা যে পরিমাণে ভগবানের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব, তিনিও সেই পরিমাণে আমাদের ভার গ্রহণ করিবেন। ভগবান সুবিচারক, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং তাঁহার উপর নির্ভর করিলে আমাদের হিতাহিত নির্ব্বাচন করিয়া, প্রয়োজন অপ্রয়োজন বুঝিয়া, যথাসময়ে তাহার সুব্যবস্থা করিতে তিনি যেমন সমর্থ, এমন আর কাহার দ্বারা হইতে পারে? সুতরাং নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দের ব্যবস্থায় নিজেকে নিযুক্ত রাখা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।" বাস্তবিকই বলিতে কি, একটু নিবিষ্টচিত্তে

তাঁহার দৈনন্দিন লিপি (diary) পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আশ্রিতবৎসল শ্রীভগবানের অসীম করুণার স্নিগ্ধ ধারায় ইহার প্রতিপত্র সুরসিত হইয়া রহিয়াছে। শরণাগত প্রতিপালক শ্রীভগবানের আশ্রিতরক্ষণার্থ যেন একটা আসা যাওয়ার চরণধ্বনি, ইহা পাঠে সহৃদয় ভাবুক ব্যক্তিমাত্রেরই উপলব্ধি হইবে।

গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান-পিপাসা অত্যন্ত বলবতী ছিল। গ্রন্থ অধ্যয়নে তিনি যেরূপ আনন্দ পাইতেন, এমন আর কিছুতেই নহে। দিবসের অধিকাংশ সময় নিজ ব্যবসায় ব্যস্ত থাকায়, তিনি রজনীতে নিশ্চিন্ত মনে প্রায় ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। রাত্রিতে কেবল ২।৩ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইলেই তিনি যথেষ্ট মনে করিতেন। তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থসকল, এই অসীম পরিশ্রমের ফল। যখন তিনি কোনওপ্রকার শারীরিক যন্ত্রণায় বা মানসিক চিন্তায় আক্রান্ত হইতেন, তখন অনেক সময়ে একখানি ধর্ম্ম বা দার্শনিক গ্রন্থ কিছুক্ষণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেই, সেই রোগ-যন্ত্রণা বা চিন্তার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। তিনি অনেক সময়ে অশান্তি ও রোগ-যন্ত্রণার হস্ত হইতে অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের জন্যও নিষ্কৃতি পাইতে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতেন।

এই সময় হইতে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে বিদেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এই সত্য আবিষ্কার করিতে তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন। সেই পরিশ্রম ও অসীম অধ্যবসায়ের প্রথম রত্নকণিকা তাঁহার "আর্য্যধাত্রীবিদ্যা"। ইহা ইংরাজী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। গভীর গবেষণাপূর্ণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্ সুধীমাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন, "ইহা বাস্তবিকই আয়ুর্ব্বেদের গৌরবস্বরূপ"। ইহার পরবর্ত্তী বৎসরে তাঁহার সুবিখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দ্বিতীয় পুস্তক "Punsarana or the Causing the Birth of a Male Child" মুদ্রিত হয়। এই পুস্তক প্রণয়নকালে তিনি একদিন কলিকাতায় আসিয়া পরমশ্রদ্ধাস্পদ জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "Caesarean Section" (বিপন্ন গর্ভিনীর উদর কাটিয়া সন্তান বহিঃস্করণ যাহা য়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকগণ এক আশ্চর্য্য অভিনব অস্ত্রচিকিৎসা বলিয়া পরিঘোষণা করেন) আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

ডাক্তার সরকার মহাশয় তখন রোগী দেখিবার জন্য বাহির হইতেছিলেন। তিনি কিছু বিরক্তভাবে বলিলেন, "এখন আমি কিছু শুনিতে পারিব না; অন্য সময়ে আসিবেন।" ডাক্তার সরকার মহাশয়ের সম্বন্ধে গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে কিছু কিছু অবগত ছিলেন। তিনি জানিতেন, লোকে বাহিরের ব্যবহারে মনে করে, তিনি কিঞ্চিৎ রূঢ়ভাষী, কিন্তু যিনি একবার তাঁহার স্নেহের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই দেখিবেন, যেন একটি সরল শিশু, বিজ্ঞানের মুকুট মাথায় দিয়া বসিয়া আছেন। তাই তিনি ডাক্তার সরকার মহাশয়ের রুক্ষভাষা শ্রবণে একটুও ক্ষুণ্ণ না হইয়া, নম্রভাবে বলিলেন, "আমি আপনার আদেশমত অন্য সময়েই আসিব, কিন্তু উপস্থিত আপনাকে এ বিষয়ে একটি মাত্র কথা শুনিতে হইবে।" ইহা শ্রবণে ডাক্তার সরকার পুনরায় কিঞ্চিৎ উগ্রভাবে বলিলেন, "বল—কি বলিবে বল; শুনি।" তখন গোস্বামী মহাশয় সেই বিষয়ে শাস্ত্রোদ্ধৃত একটি সূত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন, ইহা বর্ত্তমান Caesarean Section এরই সমানার্থ-বোধক সূত্র। বিজ্ঞান বীরের চিন্তাস্রোত তদ্দণ্ডেই অন্য পথে প্রধাবিত হইল। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই গোস্বামী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সুবৃহৎ লাইব্রেরী-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেবেলা আর রোগী দেখিতে যাওয়া হইল না। তিন ঘণ্টা গ্রন্থের পর গ্রন্থ মিলাইয়া, যখন গোস্বামী মহাশয়ের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিলেন, তখন স্নেহসূচক স্বরে বলিলেন, "তুমি বাস্তবিকই একটি মহৎ জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছ। তোমার পুস্তক বর্ত্তমান মাস হইতেই আমার পত্রিকায় (The Calcutta Journal of Medicine) প্রকাশিত হইবে, এবং আমি মনে করি, ইহার প্রত্যেক লাইন আমেরিকা ও য়ুরোপের বিজ্ঞানবিদ্গণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। তুমি কলিকাতায় আসিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত উন্নতির জন্য যত্নবান হও, আমি সাধ্যমত তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিব।" ডাক্তার সরকারের কথা সত্যে পরিণত হইয়াছিল। গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের 'Punsavana'' সম্বন্ধে আমেরিকা ও জর্ম্মণদেশীয় মাসিক পত্রিকায় অতি উচ্চভাবে প্রশংসিত হইয়াছিল। আমাদের দেশীয় সুধিবৃন্দের মধ্যেও অনেকেই ইহাকে অতি উচ্চে স্থান দান করিয়াছেন। ইদানিন্তন অনেক গ্রন্থকার এই সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়ের "Punsavana"-কে প্রমাণ গ্রন্থস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তার সরকার মহাশয় এই পুস্তকখানি প্রথম সংস্করণ নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া দেন। তাহার আদেশ-মত গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ কুমারখালি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিকতা উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অধুনায়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাতেও অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন। এইজন্য কলিকাতায় আগমনের ৩।৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ডাক্তারী চিকিৎসার পরিবর্ত্তে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা করিতে থাকেন। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীই মেডিকেল কলেজের গ্রাজুয়েটরূপে সর্ব্ব-প্রথম আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন। আজকাল আমাদের দেশে পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সুদক্ষ কবিরাজ-বৃন্দের সম্মান বৃদ্ধি যথেষ্ট পরিসরতা লাভ করিলেও, গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ এই পথের প্রথম পথিক বলিয়া, তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া, এই পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন। এ সম্বন্ধে তৎকালে "বসুমতী" পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ "ভারতবর্ষের" বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে ইহা সম্যক্ বোধগম্য হইবে।" চিকিৎসা-কার্য্যে দীর্ঘকালব্যাপী অভিজ্ঞতা ও সুযশের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারী ও কবিরাজী শাস্ত্রে প্রকৃত ভূয়োদর্শন, যদি বাস্তবিকই বর্ত্তমান সময়ের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয়, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকরূপে কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীই এদেশে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সহানুভূতি পাইবার যোগ্য।"—বসুমতী।

অতঃপর কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আগমন করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ও তাহার উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি ডাক্তার সরকারের সহিত মিলিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা আরম্ভ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই এই বিজ্ঞানভাস্কর অস্তমিত হয়েন, সেই জন্য কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সহিত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বেশী দিন অতিবাহিত করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই। গোস্বামী সুরেন্দ্র-নাথের প্রতি তাঁহার এতদূর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, স্বর্গারোহণের একদিন পূর্ব্বেও আয়ুর্ব্বেদ মতে তাঁহার চিকিৎসা করিবার জন্য কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে নিজের অত্যন্ত অসুস্থতাবশতঃ তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহার পর কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ একে একে তাঁহার "ত্রিধাতু বা বাতপিত্ত কফতত্ত্ব" (১৯০১), "আয়ুর্ব্বেদে প্রশ্ন ও প্রতিবচন" (১৯১২), "আয়ুর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া" (১৯১৪), "বস্তিগত-বিকার" (১৯১৬), "Problem of life here and here after or the Science of Ether"

প্রভৃতি চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ মৌলিক পুস্তক সকল প্রকাশিত হয়। তাঁহার "ত্রিধাতু" নামক পুস্তক বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আয়ু-র্ব্বেদের সর্ব্ব-প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় বাত, পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে এ যাবৎ যে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা অপনোদন করিয়া কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ই সর্ব্ব-প্রথম তাহার বিজ্ঞানসম্মত যথার্থ অর্থ প্রতিপন্ন করেন। বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদীয় বিষয়ক ইংরাজী বা অপর ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ পুস্তকেই বাত, পিত্ত, কফ বিষয়ের বর্ণনা কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের উক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র। অনেক গ্রন্থকার এ বিষয়টি যে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের পুস্তক হইতে গৃহীত, ইহা অনেক স্থলে তাঁহাদের গ্রন্থে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "Science of Ether" পাঠ করিয়া—স্বদেশের ও বিদেশের অনেক স্বনাম-ধন্য পণ্ডিত-মণ্ডলী ইহাকে একখানি অতি উচ্চ বিজ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রে যে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই গ্রন্থে তাহা সম্যকরূপে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। বহু সমালোচনা পত্রের মধ্যে কেবল মাত্র লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ Royal Colonial Institute Journal, South Africaস্থ Grey Instituteএর সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Bryant সাহেব প্রভৃতির ২।১টি সমালোচনা মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যাহা হইতে কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের যৎকিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

"It shows the author to be a man of wide reading of both Eastern and Western Philosophy and Sceince; and he shows clearly enough that many of the fundamental doctrines of our modern Science, evolution, conservation of matter and force, atomic theory, have been shadowed forth more or less clearly by the profound thinkers of India. Their purely deductive reasoning has led in many cases to precisely similar conclusions as the inductive System of European Science." * *

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণরূপে উন্নতি বিধান করিতে হইলে, আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ ও হস্‌পিট্যালের পরিস্থাপনা বিশেষ প্রয়োজন চিন্তা করিয়া, কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে স্বীয় উদ্যম, চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে কলিকাতা সহরে "The Calcutta Ayurvedic Institution and Pharmacy" নামে একটি

বিদ্যালয় ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়টি যাহাতে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করে, তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে কলিকাতার তৎ-সময়ের প্রায় সমস্ত কবিরাজমণ্ডলী কয়েকটি সভায় একত্রিত হইয়া যাহাতে বিদ্যালয় ও ঔষধালয়টি চিরস্থায়ী ও সাধারণের ব্যয়ে পরিচালিত হয়, তদ্বিষয়ে মতামত স্থির করেন। তাঁহারা এ বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর মতদ্বৈধ হওয়ায়, তাঁহারা নিরস্ত হয়েন। তখন পুনরায় কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ববৎ এই বিদ্যালয়টির সমগ্র ভারগ্রহণ করিয়া নিজ সাধ্যমত ৪।৫ বৎসর যাবৎ পরিচালিত করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি বৃহৎ কার্য্য দশজনের মিলিত সাহায্য ব্যতীত কখনও পরিচালিত হইতে পারে না। ইহারও অবস্থা তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে গোস্বামী মহাশয়কে ঋণগ্রস্থ হইতে ও বহু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। তিনি ডায়াবিটিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহারই বিষময় ফলে তিনি দিন দিন দুর্ব্বল ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের সেবাকার্য্যে তিনি কোন দিনের জন্যও বিরত হইতে পারেন নাই। তিনি বলিতেন, "স্বদেশের দরিদ্র-সন্তান যাহারা—তাহাদের পক্ষে পুস্তকের দ্বারা দেশের সেবাকার্য্য যেমন সম্ভব এমন আর কিছুতেই নহে।" অসুখের জন্য তিনি বলিতেন, "ইহা শ্রীভগবানেরই শুভ ইচ্ছা! আমি সুস্থদেহে থাকিলে অন্যান্য কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—লেখাপড়া করিবার অবসর পাইতাম না—কিন্তু এখন তাহার সুন্দর অবসর পাইয়াছি। ভগবানের ইচ্ছা, আমি এইরূপ ভাবেই দেশের ও আয়ুর্ব্বেদের সেবা করি।" তিনি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য যে পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন—আমাদের বিশ্বাস, চিরদিন সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ সম্প্রদায়ের সহৃদয় উদারচেতা সভ্যমাত্রেই তাহার জন্য কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বিরত থাকিবেন না।

আয়ুর্ব্বেদ ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ব্যতীত তিনি অনেকগুলি সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তাঁহার "স্নেহময়ী" উন্মাদিনী, স্বদেশ ও সরমা, মারবার-প্রসূন, রূপ-সনাতন, প্রেমাশ্রু, প্রেমাঞ্জলী, পরিচয়, পুষ্পাঞ্জলী, আশা ও আলো প্রভৃতি পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ যখন যাহা লিখিতেন, তখন মনে করিতেন, ইহার দ্বারা তিনি

বঙ্গ-সাহিত্য জননীর পবিত্র অঙ্গ শোভিত করিতেছেন; তাই তাঁহার লেখার অক্ষরে অক্ষরে পবিত্রতা সংলিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে এমন পৃষ্ঠা একখানিও পাওয়া যায় না, যাহা পাঠে শ্রীভগবানের কথা স্মরণ করাইয়া না দেয়। তাঁহার পুস্তক সম্বন্ধে আমরা নিজের কথা বিশেষ কিছু না বলিয়া সাধারণের অবগতির জন্য কেবলমাত্র কয়েকটী অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—রায় বাহাদুর ৺কালিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "আপনার লেখা গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র, ইহাও আজিকার বঙ্গসাহিত্যে একটি অসামান্য সম্পদ।" তাঁহার "প্রেমাশ্রু" প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ পাঠ করিয়া "বসুমতী" লিখিয়াছিলেন,—এমন প্রাণস্পর্শী—এমন সরল সুন্দর—গঙ্গাজলের ন্যায় এমন পবিত্র কবিতা, বাঙ্গালা সাহিত্যে বড় বেশী বাহির হয় না। বাহির হইলে পাপ-তাপক্লিষ্ট নরনারী অনেক সান্ত্বনা লাভ করিত।"

কাশী হইতে জনৈক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা, কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের "প্রেমাশ্রু" ও "প্রেমাঞ্জলী" পাঠ করিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি কেবলমাত্র গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে কাশী হইতে কুমারখালী আগমন করেন। গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ তৎকালে কিছুদিনের জন্য চিকিৎসার অনুরোধে মফঃস্বলে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। উক্ত সাধু-মহাত্মা যে পত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"বাবা! আমি অপরিচিত ফকীর—বাঙ্গালী, আজ ৫৭বৎসর হইল সংসার-ত্যাগী। কাশীতে আসিয়া তোমার লিখিত "প্রেমাঞ্জলী" ও প্রেমাশ্রু পড়িয়া অশ্রু-ত্যাগ করি। বাঙ্গালী যে আবার অশ্রুমোচন করিবে, একীভূত হইবে, "সে আমি, না আমি সে" বুঝিবে—তাহা ভাবি নাই। যে পারিয়াছে, সে বড় কম পদার্থ নহে। তাই একবার তাহার দৃষ্টিলাভ ও সঙ্গলাভ করিতে, বাবার নাম করিয়া, রাধারাণীর রজঃ মাখিয়া, জয় সচ্চিদানন্দ ফুৎকার করিয়া দৌড়িলাম। কিন্তু বাবা, তোমার দর্শন না পাইয়া, সে আশা ফলবতী হইল না।"

সিরাজদ্দৌলা প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "প্রেমাশ্রু" পড়িলাম। ইহার প্রতি-অশ্রুকণা মুক্তাফলের ন্যায় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে আত্মমহিমায় আপনি উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের "স্নেহময়ী"

সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় "বসুমতী" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—"যিনি Sensational কিছু চাহেন, তিনি স্নেহময়ী পড়িবেন না। যিনি শান্তিলাভ করিতে চান, প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে চান, মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে চান, তিনিই এই পুস্তকখানি পাঠ করিবেন। আমরা লেখকের উচ্চহৃদয়, প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব, অকৃত্রিম দেশহিতৈষণার শতমুখে প্রশংসা করি। "স্নেহময়ী" প্রত্যেক স্নেহময়ী মাতা, ভগ্নী, কন্যা, সহধর্ম্মিণীর দৈনিক পাঠ হওয়া উচিত।" দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় তাঁহার সঞ্জীবনীতে লিখিয়াছেন, "স্নেহময়ী" একখানি উপন্যাস। এমন উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় খুব কমই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিতে করিতে আমাদের রোমাঞ্চ হইয়াছিল। শ্রীশচন্দ্রের চরিত্র কি সুন্দর। তাঁহার পর-সেবা ও সেবকদল গঠনের কথা পাঠ করিয়া ভাবিয়াছি, হায়! আমরা কেন তাঁহার মত হইলাম না। ভাই বঙ্গবাসি, এই সময়ে এই গ্রন্থখানি পাঠ কর, আর "শরচ্চন্দ্র" ও "সুধা" হইয়া স্বদেশের সেবা কর।" গোস্বামী মহাশয়ের অন্যান্য পুস্তক সম্বন্ধেও এই প্রকার অভিমত। আমরা বাহুল্যভয়ে আর বেশী উদ্ধৃত করিলাম না। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন—

"সাহিত্যের গঙ্গাজলে, প্রেমভক্তিশতদলে,
পূজে যেই জননীর পবিত্র চরণ।
তারই কীর্ত্তি তারই যশঃ, তাহারি কাব্যের রস,
মৃতপ্রাণে ঢেলে দেয় অমৃতের প্রস্রবণ॥"

আমাদেরও বিশ্বাস—তাঁহার এ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের বহুমূল্য রত্নস্বরূপ চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে।

সুসিদ্ধান্তপূর্ণ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রচার দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের গৌরববৃদ্ধির ও শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার ও সাধনা এই দুটীই গোস্বামী মহাশয়ের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি বহু চেষ্টা, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত ও এ যাবৎ অপ্রকাশিত—'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থ, প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়া ১৯১৬ সালে সর্ব্ব-প্রথম মুদ্রিত করেন। গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত এই পুস্তকের সুদীর্ঘ ভূমিকা পাঠ করিলে—বৈষ্ণবজনমাত্রেই অতীব প্রীত হইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক প্রভৃতি কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ তিনি পদ্যানুবাদ ও টীকাদি সহ প্রকাশিত করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-
ক্রমিক সং

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৭শ, বর্ষ। | ১৩২৮ সাল, কার্ত্তিক। | ৭ম, সংখ্যা।

কুলো।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় বি, এ।

(১)

শুদ্ধবংশে জন্মতব হায় কি নিয়তি,
ডোমের ভবনে বাল্যে তোমার বসতি।
ডোম-শিশু সনে ক্রীড়া শৈশবে তোমার,
ডোমের গৃহিণী দোহে করে পরিষ্কার।

(২)

না জানি ডোমের মায়া, কেমন হৃদয়,
হাতে গ'ড়ে করে তোমা বাজারে বিক্রয়।
নীচ সঙ্গ বংশ উচ্চ কিবা দুঃখ তায়,
কোকিল যে অন্য পুষ্ট কিবা আসে যায়।

(৩)

শুদ্ধসরে জন্ম ওই সরোজশোভন,
চণ্ডালে চয়ন করে পূজয়ে ব্রাহ্মণ।
মৃণালে কণ্টক, চন্দ্র কলঙ্ক মলিন,
গুণ হেতু সমাদৃত তারা চিরদিন।

(৪)

নির্গুণের আভিজাত্য শুধুই গর্জ্জন,
শরতের ঘন যথা নাহি বরিষণ।
শুদ্ধবংশ-জাত ওই কোদণ্ড প্রমাণ।
গুণহীন হ'লে তায় কে করে সন্ধান?

(৫)

জাবালি করিত আগে গোষ্ঠে গোচারণ,
দেখি গুণ কৃষ্ণ তাঁরে করেন ব্রাহ্মণ।
তবগুণে মুগ্ধ হ'য়ে রাখিতে সম্মান,
শীতলা জননী শিরে দিলা তব স্থান।

(৬)

চিরদিন দেখি তব সাধু আচরণ,
দোষ ত্যজি কর তুমি গুণের গ্রহণ।
ক্ষুদ্র কুঁড়া অবজ্ঞনা সকল ত্যজিয়া,
ধর হৃদে ভাল যাহা আদর করিয়া।

(৭)

অসাধু চালুনি তায় ধিক শতবার,
শত ছিদ্র পথে গুণ করে পরিহার।
দেখুক শিখিয়ে তোমা অসাধু দুর্ম্মতি,
কত মান তার যার আছে গুণে রতি।

(৮)

শুভনিশা অধিবাস শুভ দেবতার,
ধর হৃদে মাঙ্গলিক সামগ্রী সম্ভার।
পুরোহিত করে উঠি আহা ভাগ্যফল,
দেব অঙ্গ পরশনে জনম সফল।

(৯)

বিজয়া দশমী দিনে কত কুলনারী,
তোমারে মাথায় নিয়ে হাতে নিয়ে ঝারি।
প্রদক্ষিণ করি মা'কে জলধারা দিয়ে,
পাঠায় কৈলাসপুরে বরণ করিয়ে।

(১০)

সিতপক্ষ মার্গশীর্ষ পুণ্য শুভ তিথি,
পূজে চণ্ডী কুলনারী যথা কুলরীতি।
চিত্ররেখা অঙ্গে তব সাথী বদরিকা,
আবির্ভূতা তোমাতে মা কুলুই চণ্ডিকা।

(১১)

দেবতার প্রিয় তুমি হে সুপ সুন্দর,
মাঙ্গলিক কার্য্যে থাক রত নিরন্তর।
না ভাবি আপন, ভাব পরের ভাবনা,
পরহিত ব্রত তব জীবন সাধনা।

(১২)

শ্রীসনে বরণ কর্ম্মে—তুমিই সহায়,
চারুসজ্জা দেখি তব বিবাহ নিশায়।
রক্তবস্ত্রে অঙ্গ তব করি আচ্ছাদন,
শুভ সমালম্ভ নারী করে বিরচন।

(১৩)

বরকে বরণ করি নববধূ সনে,
ঘরেতে তুলিয়া আন পরম যতনে।
শুভোদর্ক দম্পতীর তোমার কৃপায়,
তাই ভাল বাসে বুঝি রমণী তোমায়।

(১৪)

বাল্যে চিত্ররূপ তব নয়ন রঞ্জন,
সুকুমারী বালিকার আদরের ধন।
কচি কচি মেয়ে সব বসি খেলা ঘরে,
কচি হাতে ধুলি ঝেড়ে রাধাবাড়ি করে।

(১৫)

যৌবনে যুবতী করে দম্পতী বরণ,
আকম্পিত অঙ্গ তব নিরখি নয়নে।
চির অচঞ্চল তুমি সংযত হৃদয়,
তবে কেন এ বিকার তোমাতে উদয়।

(১৬)

অথবা নারীর স্পর্শ লাগে যার গায়,
স্থৈর্য্য ধৈর্য্য দমযম কোথা ভেসে যায়।
অচেতন দেহে আনে চেতন পুলক।
ধন্য স্পর্শ রমণীর অপূর্ব্ব কুহক।

(১৭)

গম্ভীর অশোক তরু বিষণ্ণ বদন,
উদ্যানে একটী কোণে কে করে সতন॥
যখনি রমণী চারু চরণ পরশে,
হাসিয়া ফুটিয়া উঠে হরষরভসে॥

(১৮)

কামরূপে সিদ্ধমন্ত্র যোগিনী যেমন,
পুরুষে করিয়া মেষ খেলে অনুক্ষণ।
সেই মত লীলাবতী যুবতীর করে,
কত মত করখেলা কত রঙ্গ ভরে।

(১৯)

কভু উর্দ্ধে কভু নিম্নে উত্থান পতন,
কভু বাম অঙ্গে হেলে নৃত্য বিমোহন।
পরশ আবেশে যদি অলস আনায়,
কামিনী করের টোকা তোমাকে জাগায়।

(২০)

রুণু রুণু বাজে তায় করের কঙ্কন,
থেকে থেকে দোলে কিবা কর্ণ আভরণ।
হেরি সে সুষমা, শুনি ধ্বনি সুমধুর,
কর্ম্ম ক্লান্তি বুঝি সুর্প কর তুমি দূর।

(২১)

কোমরে কাপড় বাঁধা ঝুটী বাঁধা মাথে,
অসুর মর্দ্দিনী সম ঝাড়ু নীর হাতে।
গোলাঘরে উদয়াস্ত করি প্রাণপণ,
করহ তাদের তরে জীবিকা অর্জ্জন।

(২২)

পরের কারণে শুধু ভাবনা তোমার,
কত মতে সাধ তুমি পর উপকার।
দরিদ্র গৃহস্থ বধূ তোমাতে রাখিয়া,
ডাল বেছে পায় কিছু ঘরেতে বসিয়া।

(২৩)

আশ্বিন পোহায়ে গেল কার্ত্তিক আগত,
মাঠে মাঠে ধান গাছ শোভা করে কত॥
গাছে গাছে ধান শীষ শীষে দুধভরা,
মনে হয় ধরা যেন সত্য বসুন্ধরা।

(২৪)

দুগ্ধ শীর্ষ ধান্যগর্ভে লক্ষ্মীর আবাস,
ভাবিয়া চাষার মনে বড়ই উল্লাস।
পায়স পিষ্টক আদি করিয়া রন্ধন,
ধানেরে খাওয়ায় সাধ কৃষক সুজন।

(২৫)

সংক্রান্তি নিশার শেষে পল্লী বালদল,
তোমারে বাজায়ে গায় হেমন্ত মঙ্গল।
হরিণ বরাহ মাংস দিবে উপহার,
বলি উচ্চ কণ্ঠে গায় জয় কমলার।

(২৬)

দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা কার্ত্তিক সন্ধ্যায়,
কর তুমি গৃহস্থের অলক্ষ্মী বিদায়।
তোমারে বাজায়ে তারা বামহাতে নিয়ে,
তে-মাথায় রাখে ছেড়া চুল চাপা দিয়ে।

(২৭)

কুলটা পাংশুলা নারী নর কুলাঙ্গার,
খেদাইতে চাহে লোকে বাতাসে তোমার।
মশামাছি কীট পোকা, পতঙ্গ মাকড়,
কর ডাক সংক্রান্তিতে এ সব উজড়।

(২৮)

অশুভ নাশন তুমি চির শুভঙ্কর,
দেবতা মানব কাছে সমান আদর।
সর্ব্ব শুলক্ষণ কার্য্যে তুমি অগ্রসর,
কত গুণ ধর তুমি হে সুর্প সুন্দর।

(২৯)

গৃহযাগ অন্তে ল'য়ে মাথায় তোমারে,
গৃহলক্ষ্মী আগে যান গৃহের মাঝারে।
অনুগামী কর্ত্তা আর যত পরিজন,
সে দিন সাধহ তুমি গৃহের লক্ষণ।

(৩০)

জমিদার বাকীকর করিতে আদায়,
প্রজারে ধরিতে যবে পেয়াদা পাঠায়।
চর্ম্মরূপে পৃষ্ঠচর্ম্ম রাখিবে বলিয়া,
বলে তোমা যেতে সব পিঠেতে বাঁধিয়া।

(৩১)

জ্যৈষ্ঠে কুতুহলী কত কুললনায়,
সুমিষ্ট আমের রস তোমাতে মাখায়।
মহা সত্ত্ব তুমি নিত্য রোদেতে পুড়িয়া,
আমসত্ত্ব আনি দেহ ঘরেতে তুলিয়া।

(৩২)

বৃষ্টিকালে করিবারে এ ঘর ও ঘর,
বধূজনে ধরে তোমা মাথার উপর।
ছত্ররূপে শিররক্ষা কর রমণীর,
নিজ অঙ্গে ধর তুমি বৃষ্টি ধারা নীর।

(৩৩)

শূন্য বিষ ঢোড়া যবে আত্মরক্ষা তরে,
চক্ররূপে ধরে তোমা মাথার উপরে।
তখন ভয়েতে কেহ নিকটে না যায়,
বিষহীন আশি বিষে তুমিই সহায়।

(৩৪)

কৃষক অঙ্গনা কর গোময় লেপন,
পরিস্কৃত সুবিস্তৃত সুন্দর প্রাঙ্গণ।
মোরগ ফুলের গাছ শোভে আশে পাশ,
বসন্ত লক্ষ্মীর চির রুচির আবাস।

(৩৫)

সে অঙ্গণে আহা কিবা সজ্জিত সুন্দর,
কনক মঞ্জরী ধান্য তৃণ গুচ্ছ পর।
তক্তায় আছাড়ে চাষা ঝ'রে পড়ে ধান,
চাষার প্রাণের আশা জগতের প্রাণ।

(৩৬)

হৃষ্ট পুষ্ট কি সুন্দর বলিষ্ঠ গঠন,
সন্ধ্যা সমাগমে চাষা ল'য়ে পরিজন।
নেচে নেচে ঘুরে ফিরে মনের উল্লাসে,
তুঁষ চিটে দূর করে তোমার বাতাসে।

(৩৭)

নাকেতে নথনী কিবা অঙ্গের বাঁধুনি,
হাতেতে কাঁসার পৈঁছে চাষার ঘরণী।
ধামা কাঁকে মেয়ে সাথে আসিয়া চত্বরে,
পালি মেপে খাঁটী সোণা তুলে আনে ঘরে।

(৩৮)

আট কৌড়ে মহোৎসবে কি কষ্ঠ তোমার,
মানুষের একি রীতি একি অত্যাচার।
সপ্তরথি ঘেরি যথা অভিমন্যু মারে,
তেমতি বালক বৃন্দ প্রহারে তোমারে।

(৩৯)

আট কৌড়ে বাট্ কৌড়ে খোকা আছে ভাল,
বোকা পাঁঠা বাবা তার দাড়িগুলো কালো।
গান গেয়ে দণ্ডাঘাতে ধরে তারা তাল,
সে তালে নাকাল তুমি বেহদ্দ বেহাল।

(৪০)

মাথা ডিঙাইয়া তোমা ফেলে যে কোথায়,
ধারেক্ তোমার পানে ফিরিয়া না চায়।
আট ভাজা খই মুড়ি কোঁচড় ভরিয়া।
নিয়ে যায় খেতে খেতে ঘরেতে চলিয়া,

(৪১)

এত কষ্ট তবু তুমি রত পরহিতে,
গৃহিণী কুড়ায়ে রাখে ছাই ফেলে দিতে।
ভস্ম দেহ ভস্মভূষ দিব্য অলঙ্কার,
শিখাও জগতে এই চরমের সার।

(৪২)

তোমার গুণের কথা বলিহারি যাই,
কেবল তোমার নিন্দা শুনি এক ঠাঁই।
লোকে বলে অস্থির যে দুষ্ট মেয়ে গুলো,
হাত পা তাদের যেন বগুণের কুলো।

(৪৩)

সুর্পনখা পাপীয়সী স্বেচ্ছায় কামুকী,
নখেতে তোমারে ধরি তবু কালামুখী।
মজিল কলঙ্কে ঘোর ঘুচাইল মান,
চিহ্ন তার চিরদিন কাটা নাক কান।

(৪৪)

কোন্দলেতে সিদ্ধ পিঠ কুটিলা রমণী,
থরহরি বিষচণ্ডী রসনা অশনি।
সুর্পনখা নামে তার লোকে পরিচয়,
নীচ সঙ্গে তব নিন্দা শুনে দুঃখ হয়।

(৪৫)

ধর্ম্ম যদি হয় সত্য পর উপকারে,
সে ধর্ম্ম অর্জ্জন তুমি ক'রেছ সংসারে।
ধর্ম্মে স্বর্গলাভ যদি শাস্ত্র সত্য হয়,
অক্ষয় হইবে স্বর্গ তোমার নিশ্চয়।

(৪৬)

পবিত্র চরিত্র তব যে করে শ্রবণ,
শীতলা মাতার কৃপা পায় সেইজন।
লক্ষ্মী বাঁধা থাকে তার গৃহলক্ষ্মী পাশে,
চরমে পরম গতি কৈলাসে নিবাস।

———•———

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বিবাহ শেষ হইল, শঙ্খধ্বনী ও স্ত্রী-আচার আরম্ভ হইল। বিবাহে স্ত্রী-আচার শীর্ষ স্থানীয়, বরের পক্ষে শঙ্কট স্থল। চড়টা, চাপড়টা, কাণ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ হইল। সাধকের মুখে কথা নাই। মৌড় মস্তকে অবনত বদনে রমণী শাসন সুখে সহ্য করিতে লাগিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, রমণীর সহিত যুদ্ধে পুরুষ চিরকালই পরাস্ত. বলপ্রয়োগ করিলে কোন ফল হইবে না বরং উপদ্রব বাড়িবে, মশা কামড়াইলে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে হয়, হাত দিয়া তাড়াতাড়ি করিলে ঝাঁকে ঝাকে গায়ে আসিয়া বসে এই ভাবিয়া গো মেষাদির গাত্র মর্দ্দনে যেরূপ তাহারা স্থির হইয়া দাঁড়ায়, সাধকও তদ্রূপ ভাব অবলম্বন করিলেন। বরকন্যা বাসর গৃহে প্রবেশ করিল এবং তথায় তাহাদের জলযোগের ব্যবস্থা হইল। সাধক আজ রমণীগণ পরিবেষ্টিত। সকলেই সহাস্য বদন। প্রকৃতি মণ্ডলীর মুখাবরণ শিথিল, কাহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠ, তাহাও আনন্দে স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে। রমণীগণের হৃদয় নিঃসৃত মধুর হাস্য, সুন্দর দশন রাজির বিমল সৌন্দর্য্য, প্রভাত পদ্মের ন্যায় অধর ওষ্ঠের সুন্দর কান্তি, কুবলয় নয়নের কিরণ জ্যোতি বাসর গৃহের দীপালোককে ক্ষীণদীপ্তি করিয়া তুলিল। দাম্পত্য প্রেমই রমণী জীবনের যথাসর্ব্বস্ব ধন। দাম্পত্য প্রেমে রমণী জীবনের সমস্ত লীলাই স্থাপিত। দাম্পত্য প্রেমের সুগন্ধ পাইলে রমণী তাহা আঘ্রাণ না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই বাসর গৃহে সম্বন্ধ অবিচারে অনেকেই সমাগত। একজন প্রবীণা বাসর গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"এ কি বাসর

যে চুপ, কাহারও মুখে কথা নাই। সকলেই বরকন্যার দিকে চেয়ে আছে।
বরকন্যা দেখে বুঝি সুখে বিভোর হয়েছে, আহা বেশ সেজেছে। একুশ বাই
বৎসরের ছেলে, দশ এগার বৎসরের মেয়ে, দুটীই দেখ্‌তে ভাল—সমান মিলন,
রাম সীতার মিলন হয়েছে। সাধককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"কি হে
নাগর মুচ্‌কী মুচ্‌কী হাস্‌ছ যে, শুধু হাস্‌লে হবে না, এই দিন চিরকাল মনে
রাখ্‌তে হবে। আজ যাকে পাশে বসিয়েছ ওকে চিরকাল প্রাণের অধিক
ভাল বাস্‌তে হবে, তবেই সংসারে থেকে সুখ পাবে।" পার্শ্ববর্ত্তিনী কয়েকটী
সোহাগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ফিক্ ফিক্ করে হাসছিস কেন,
রসিকতা জানিস না, ভবিযুক্ত হয়ে বোসনা, রসের কথায় বাসর ভিজায়ে
দেনা, গান করে নাগরের মন দ্রব করে দে, তবে ত জানি বাসর জাগানি,
কই বাসর রাখ্‌তে পারে এমন ত কাহাকেও দেখ্‌ছিনা। এখনও বুঝি
অনেকের খাওয়া হয় নাই।" নবীনাদিগের মধ্যে একজন বলিলেন,—"মুখ
গায়েন, নইলে কি গান হয়, তুমি আগে আরম্ভ কর, বাসর জম্‌কে নাও, তার
পর আমাদিগকে ছেড়ে দিবে।" সাধক সহাস্য বদনে ভাবিলেন, মাতৃ-আজ্ঞা
আজ প্রকৃতির সহিত একাসনে উপবিষ্ট। প্রকৃতির সম্মান রক্ষা করা সর্ব্বতো
ভাবে কর্ত্তব্য। জীবমাত্রেই পরমাপ্রকৃতির ইচ্ছার বশীভূত, তাহার কর্তৃ
কিছুই নাই। করুণাময়ী সকলি তোমার ইচ্ছা, "বাজীকরের মেয়ে শ্যাম
যেমনি নাচাও তেমনি নাচে" মা যেমনি নাচাবে তেমনি নাচ্‌বো। এমন
সময় কয়েকজন স্ত্রীলোক বাসরে প্রবেশ করিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া প্রবীণ
কহিলেন, এই বাসরের লোক এসেছে। এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহ
রান্তে বাহিরে যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে বাসরের স্ত্রীলোকদিগকে সম্বোধ
করিয়া কহিলেন, "ওগো মা লক্ষ্মীরা, ছেলে মানুষ, অনেক দূর থেকে এসেছে
সমস্ত রাত্রি জাগাইওনা, বাবাজীকে একটু ঘুমুতে দিও।" প্রবীণা কহিলে
"মায়া বসেছে, কাল পরের ছেলে ছিল, আজ আপনার," রমণীদিগ
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কিলো ছবির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি
মুখ খোলনা।" একজন ঝি ছিল সে পারুক না পারুক সকল কাজেই অগ্রণ
হত, তারি উপর বাসরের মুখ খুলিবার ভার হইল। ঝি বলিবামাত্রে
উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিল—

"সুখের দিনে, সুখের মেলন, দেখ্‌না তোরা নয়ন ভরে,
ফুটলো পদ্ম এলো ভ্রমর, ভোঁ ভোঁ করে বস্‌লো ধারে,

মধু খেতে বড় সাধ—লোকের বাতাস সাধ্‌লে বাদ,
চারি ধারে ঘুরে বেড়ায় সরে যেতে মন না সরে॥

ঝির স্বরটী তেমন মিষ্ট ছিল না, কিন্তু সে জানিত সে বেশ গাইতে পারে। তাহার গান শুনিয়া সকলেই হাসিল, সাধকও হাসিলেন কিন্তু অদৃশ্য ভাবে। তিনি উপহাস ও কৌতুক ছলেও কাহারও মনে কষ্ট দিতেন না কারণ তিনি জানিতেন, জীবমাত্রেই বিশ্বজননীর প্রতিকৃতি। ঝি সকলের হাস্য দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "এ গান আমি বড় বাসরে ভাল লোকের মুখে শুনেছি, তোমরা গাওনা কে কত গাইয়ে হা কল্লেই টের পাওয়া যাবে।" পার্শ্ববর্ত্তিনী জনৈক স্ত্রীলোকের পানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তোমার হাসিটা বড় চটচটে যেমন তপ্ত খোলায় খই। গাও না দেখি বাহাদুরী। যারা কর্ম্মে কুড়ে, তারাই কাজের লোকের কাজে ছন্দ ধরে।" প্রবীণা বলিলেন, "ঝি রাগ করো না, এ হাসি খুসীর জায়গা, তুমিত বাসরের মুখ খুলেছ, তোমারি বাহাদুরী।" রমণীরা এ উহাকে প্রথম গান করিতে উপরোধ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে একে একে গান আরম্ভ করিলেন। বামাকণ্ঠ বীণাধ্বনিকে পরাজয় পূর্ব্বক গৃহদ্বার দিয়া বাহির হইয়া অধিকতর সুমিষ্টভাবে অন্দর মহল সংলগ্ন রাত্রি জাগরণ ক্লান্ত লোকদিগের কর্ণকুহর শীতল করিতে লাগিল। সাধক ভাবিলেন, প্রকৃতি মণ্ডলীর স্বর এত সুমধুর কেন। তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোমল, অন্তর সরল, তাই কি কারণ। মা ত আমার পরমা-প্রকৃতি, না জানি তাঁহার অন্তর কতই সরল, কতই স্নেহের আধার, তা না হলে ব্রহ্মাণ্ডের লোকের কি মা হতে পারেন। মা হওয়া কি মুখের কথা, মায়ের মত মা না হলে লোকে মা বলে ডাকবে কেন? আমার বিশ্বজননীর যদি এত গুণ না থাকিত তাহা হইলে লোকে শোকের সময় দুঃখের সময় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়াও তাহাকে ভাবিয়া কাতর নয়নে তাঁহার দিকে চাহিত না। মা দেখা সহজে দেন না সত্য, কিন্তু যে সন্তান মুখে কাপড় দিয়া মায়ের জন্য কাঁদে, গোপনে চক্ষের জল ফেলে, প্রাণের যন্ত্রণা জানায়, মা তার সকল জ্বালা নিবারণ করেন, যা চায় তাই দেন তাহাতেও যদি না ভোলে শেষে দেখা দিয়া সব জ্বালা নিবারণ করিয়া দেন। সাধকের উপর সঙ্গীতের উপরোধ চলিতে লাগিল, সাধক গাহিলেন,—

তোমারি কারণে সঁপিলাম যৌবন জীবন প্রাণ।
রমণী রতন তুমি প্রেমিকা সুজন॥

কঠিন হৃদয় যার, সদাই চাতুরী তার,
চিরদিন নাহি রয় কুজনে মিলন।
প্রেমিকার এই গুণ নব রস প্রতি দিন
কখনও না হইবে রস পুরাতন॥

সকলে গান শুনিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। অমিয় তুল্য সুমিষ্ট স্বর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়া সকলের হৃদয়কে কি এক অপূর্ব্ব রসে আপ্লুত করিল। সুখ স্রোত শরীরের প্রত্যেক ধমনী ও শিরাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সঙ্গীত শেষে কেহ কেহ তাহার মুখ পানে চাহিয়া আহ্লাদের সহিত কি ভাবিতে লাগিলেন, কেহ কেহ সাধক পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, গান শুনে পেট ভরে যাবে, দুঃখ যে কেমন তা জান্‌বি না। প্রবীণা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বেঁচে থাক দাদা বেশ গেয়েছ।" পুনশ্চ গান করিবার জন্য উপরোধ চলিতে লাগিল, সাধক গাহিলেন,—

সাধ করে পীরীতি করিতে,
যদি মিলন হয় সুজন সহিতে সই।
আমার যেমন মন সে যদি হয় তেমন
কি আর অধিক সুখ সে সুখ হইতে॥
কি ক্ষণে হেরিলাম রূপ, সুধাময় রস কূপ,
সেই হইতে প্রাণ কাঁদে তাহারে দেখিতে।
কমলাকান্তের যদি আনিয়া মিলায় বিধি
সেরূপ লাবণ্য নিধি হৃদয়ে রাখিতে॥

সকলে বলিলেন, "বেশ গান।" বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি তোমার বাঁধা।" সাধক বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ;" প্রবীণা বলিলেন, "এরূপ কত গান বাঁধিতে পার," সাধক বলিলেন, "যত গুলি চান।" বৃদ্ধা রমণীদিগকে বলিলেন, "ওলো তোরা পার্ব্বিনে, তোরা গান করিস না গান শোন।" সাধকের উপর পুনশ্চ গান করিবার উপরোধ চলিতে লাগিল, এইরূপে বিবাহের বাসর রাত্রি জাগরণে কাটিয়া গেল।

বিবাহরাত্রি অনেকেরই জাগরণেই অতিবাহিত হইল। লাকুড্ডীর ভট্টাচার্য্য মহাশয় শয্যাগ্রহণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বিহগগণের কলধ্বনি সহ শয্যাত্যাগ করিলেন। জাগরণ বশত শরীর সন্তপ্ত সুখস্পর্শ প্রভাত বায়ু অতি বড় মনোহর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কন্যাদায় হইতে মুক্ত, মন প্রসন্ন কাককলরবও তাঁহার

কর্ণে কঠোর বলিয়া অনুমিত হইল না। জীবন রাজ্যে বাল্যকাল সুশোভিত কুসুম উদ্যান, যৌবন জনাকীর্ণ জনপদ, বার্দ্ধক্য বিজন প্রান্তর কিম্বা শ্মশান আত্মা ও মনের প্রসন্নতা, পবিত্রতা, স্বচ্ছন্দতা প্রভাবেই অনুভব হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিশির শয়নে দুর্ব্বাদলের বিমল ভাব কুসুম কলাপের বিকাশ ও বিশুদ্ধ ভাব সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশে অরুণের ছটা ভুবন আলোকিত করিয়া উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া বৈঠকগৃহে আগমন পূর্ব্বক বরযাত্রীদিগের প্রভাত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল যোগাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানের ন্যায় তৎকালে চা পানের প্রচলন ছিলনা, সময়ের গুণে কন্যাকর্ত্তাকে সে উপদ্রব সহ্য করিতে হইল না, প্রথা অনুসারে বিবাহের পরদিন বরযাত্রীগণ কন্যাকর্ত্তার গৃহে অবস্থান করিতেন। যে স্থলে কন্যা কর্ত্তা বরযাত্রীদিগকে বিবাহের পরদিন দিবসে অন্ন ও রাত্রে ঘৃতপক্কান্ন ভোজন করাইতে না পারিতেন, তিনি সমাজে দীন বা কৃপণ বলিয়া গণ্য হইতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিবাহের পরদিন বরযাত্রীদিগের উপদ্রব সহ্য করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের উপদ্রব অসংখ্য ছিল সেই জন্য পূর্ব্ব প্রচলিত কথা আছে, "ঘরের বালাই বরযাত্রী" যাহা হউক, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগের তাম্রকূট, পান ও জলযোগাদির ব্যবস্থা করিয়া কুশণ্ডিকা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ বিবাহে কুশণ্ডিকা এক বিরাট ব্যাপার। অগ্নিহোত্র স্থাপন, বহ্নির উপাসনা, সহধর্ম্মিণীর অগ্নিহোত্র রক্ষার অঙ্গীকার ইত্যাদি কুশণ্ডিকার অঙ্গ। সহধর্ম্মিণীকে আজীবন সমুদয় ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যে কর্ম্মে নিরন্তর ব্রতী হইতে হইবে, তাহারি প্রথম অভিনয়। ত্যাগশীল না হইলে কেহই জগতের উপকার করিতে পারেনা ও লোক সমাজে পূজনীয় হইতে পারেনা। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বলোক হিতার্থে অধ্যয়ন, যজন, যাজন প্রভৃতি ক্রিয়ায় ব্রতী থাকিতেন, সেই জন্য তাঁহারা শীর্ষস্থানীয় ও পূজনীয়। তাঁহারা সকল বর্ণের হিতাকাঙ্ক্ষী সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি তাই তাঁহারা দেবতার ন্যায় পূজনীয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা অরণ্যবাস পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম ও নগর মধ্যে বাস করিলেও ভূসম্পত্তি রাখিতেন না, দুগ্ধ ও হবির জন্য ধেনু বৎস প্রতিপালন করিতেন, যাজন ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, ধন সঞ্চয়ে বীততৃষ্ণ ছিলেন, স্বার্থ প্রসূত লোক সমাজের ঈর্ষা তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইত না, সে কারণে কেহই তাঁহাদিগের হিংসা কি ঈর্ষা করিতেন না পরন্তু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া সকল বর্ণই তাঁহাদিগের

পদানত থাকিতেন। ব্রাহ্মণগণ বহুগুণশালী ছিলেন বলিয়া সমাজ বন্ধনের প্রথম হইতে আপনাদের ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম মহাবৃক্ষের উপর কতই কুঠারাঘাত, কতই বজ্রাপাত চলিয়াছে, কিন্তু উহার অন্তর্নিবদ্ধ পবিত্র রস মহাশক্তি সম্পন্ন ও মূল সকল সত্য ভূমি, অতএব সরস ও দৃঢ় ভূমিবদ্ধ বলিয়া উহা সমূলে উৎপাটিত হয় নাই। কাল কাহারও সমান ভাবে থাকিতে দেয় না, রূপান্তর কালের অনিবার্য্য নিয়ম। ব্রাহ্মণদিগের শৈথিল্য বশতঃ কালে ইহার কি অবস্থা ঘটিবে কে বলিতে পারে। যতদিন বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রচলন থাকিবে, ততদিন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ হইবে না। হোম ও যজ্ঞ বৈদিক ক্রিয়ার অঙ্গ আহুতি প্রদানে বায়ু নির্দ্দোষ হয়, বায়ু নির্দ্দোষে সলিল সকল প্রসন্ন ও নির্দ্দোষ হয়, ভেষজ সকল দূষিত হয় না, সংক্রামক ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়া যায়। যেস্থানে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, সে স্থান বিষদোষ যুক্ত হইলেও বিশুদ্ধ হয়। ঋষিগণ বলিয়াছেন, হবির্গন্ধ ও গোময় সর্ব্ববিষ নাশক হিন্দুর গৃহে কোন স্থান কলুষিত হইলে গোময় উপলিপ্ত হয়। কোন কোন স্থলে গোবর দেওয়ার প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা দেখা যায় না, বড় দুঃখের বিষয়। পূর্ব্বে অনেক গৃহেই প্রায়ই হোমক্রিয়া হইত, এখন সে প্রথাও শিথিল হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণেরও হোমাগ্নি আর সহ্য হয় না। পূর্ব্বে হোমাগ্নি বেষ্টন করিয়া বসিয়া কর্ম্মকর্ত্তা আত্মীয় স্বজন সহ হবির্গন্ধ গ্রহণ করিতেন, এখন সে হোমাগ্নিও নাই, হবির্ধূমও সহ্য হয় না। কৃতদার ব্রাহ্মণ মাত্রেরই বোধ হয় স্মরণ আছে, বিবাহের সময় কুশণ্ডিকায় কিরূপ কষ্টভোগ করিয়াছেন। আজ সাধক সহধর্ম্মিণীর সহ হোমাগ্নির পার্শ্বে উপবিষ্ট। চক্ষু রক্তবর্ণ, কলেবর ঘর্ম্মাক্ত। বরবর্ণিনীর তরল নয়ন আধ বিকশিত কুবলয়ের ন্যায়। সাধক আনন্দে বিভোর। হোমাগ্নির মধ্যে বিশ্ব-বিমোহিনী জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিতে লাগিলেন। অগ্নির নৃত্যের সহিত আনন্দময়ীর নৃত্য দেখিতে লাগিলেন, অগ্নির কষ্ট অনুভব করিতে পারিলেন না। এইরূপে যথাবিহিত কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরযাত্রীদিগকে যথা সাধ্য মধ্যাহ্ন ভোজন ও রাত্রে পক্কান্ন ভোজন করাইলেন। কেহ কেহ নিরুপদ্রবে নিদ্রাসুখ অনুভব করিবার আশায় গ্রামস্থ আত্মীয় কুটুম্ব গৃহের আশ্রয় লইয়া পুনঃ পুনঃ উদ্গার রেচন ও সলিল পান করিয়া বহুকষ্টে নিদ্রা দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। বরযাত্রীগণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৈঠকগৃহে কিয়ৎক্ষণ শয্যা আলিঙ্গন করিয়া গাত্রোত্থান

করিলেন, গমনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। প্রায় অনেক স্থলে বরযাত্রীগণ বিবাহের দিন কন্যাকর্ত্তার উপর এমন কি কন্যাকর্ত্তার প্রতিবেশিগণের উপরও অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না সেই জন্য প্রতিবেশীগণ বিবাহের পরদিন সন্ধ্যা ভোজনের পর বরযাত্রীদিগের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে ত্রুটী করিতেন না। বরযাত্রীদিগকে অনেক স্থলে সন্ধ্যা ভোজনের পরই পলায়ন করিতে হইত, কিন্তু লাকুড়ডীর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরযাত্রী দূরবর্ত্তী গ্রামের বলিয়া সন্ধ্যা ভোজনের পরও তাহাদের উপর শিষ্টচার প্রদর্শনের জন্য সকলকে অনুনয় করিয়াছিলেন। বরযাত্রীগণ অনেকেই শেষ রাত্রে গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, চান্না দূরবর্ত্তী বলিয়া বৈবাহিকের ইচ্ছা অনুসারে পাত্র কন্যাকে নরযানে বরযাত্রীগণের সহিত বিদায় দিলেন। পাত্র কন্যা সুসজ্জিত হইয়া নরযানে উপবিষ্ট হইলেন। চারিদিকে শঙ্খধ্বনি ও বামাকণ্ঠ মধুর উলুধ্বনি হইতে লাগিল সকলেই প্রসন্ন বদন, কেবলমাত্র কন্যার পিতা মাতা বিষণ্ণ, অশ্রুপূর্ণ। এক এক বার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে, আবার জামাতা ও তৎপার্শ্বে কন্যাকে দেখিয়া উৎকণ্ঠার লাঘব হইতেছে। প্রিয়তমা কন্যা যাহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন, যে কন্যা তাহার গৃহের অলঙ্কার ঐশ্বর্য্য, যাহাকে এতদিন লালন পালন করিয়াছেন, যাহার ক্রন্দনে অন্তরের অস্থি পর্য্যন্ত বিচলিত হয়, আজ তাহাকে পরগৃহ বাসিনী করিবার জন্য বিদায় দিতেছেন, যাহার সুখ দুঃখ চিরকালের জন্য পরের উপর ন্যস্ত করিতেছেন, সেই প্রাণসমা কন্যাকে বিদায় দিতে জনক জননীর হৃদয় বিচুর্ণ হইতে লাগিল। মায়াবী সংসারীর কথা দূরে থাকুক এরূপ ক্ষেত্রে বিরাগীরও বিকার উপস্থিত হয়। বধুও অবগুণ্ঠনে ক্রন্দন করিতেছেন। আজন্ম পরিচিত গৃহ, অতি স্নেহের পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, ভাই বন্ধু ত্যাগ করিয়া অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কোথায় যাইতেছেন, বধুর এখনও সে জ্ঞান হয় নাই, তাই তাহার মানসিক উদ্‌বেগের কারণ। বরকন্যা ও বরযাত্র বিদায় হইল।

সাধক প্রকৃতি সহ নরযানে গৃহাগমন করিতেছেন। রজনী সংযোগে নিদ্রিত গ্রাম, নির্জ্জন প্রান্তর পার হইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে শিবাগণের মুখ নিঃসৃত অগ্নি দৃষ্ট হইতে লাগিল। বধু নিদ্রিত, সাধক প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—"জগন্মাতঃ শিবাভির্ঘোররাবার্ভি চতুর্দ্দিক্ষুসমন্বিতা" মা প্রকৃতিময়ী তোমার অনুপম রূপ রজনী, দিবস তোমার প্রচণ্ড রূপ। এই রজনীতে কি অপূর্ব্ব কৌশলে কি বশীকরণ মন্ত্রে দিবসের প্রচণ্ড, উন্মাদগ্রস্ত

অবনীরে শবের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে শায়িত করেছ, দিবসের উজ্জ্বল রূপের পরিবর্ত্তে তোমার নবজলধর রূপ ঢেলে দিয়াছ। এই অন্ধকারকে সাজাতে তোমার ত্রুটী দেখিতেছি না। নক্ষত্র মণ্ডিত নীল কলেবর নভোমণ্ডলের জ্যোতি অতি মৃদুভাবে অবনী মণ্ডলের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর ন্যায় প্রদর্শন করাইতেছ। যামিনী কুসুম সকল তাহাদের শরীরের সুগন্ধ চারিদিকে বিস্তার করিতেছে। নিশাচর পশু পক্ষিগণের শব্দ তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, খদ্যোতকুল কণ্ঠাভরণ, কর্ণভূষণ। মা তোমার খেলা নিশি দিনে সমান। আজ কোথায় আমাকে শ্মশান কোলে নির্জ্জনে তোমার চিন্তায় বসাইবে, না প্রকৃতি কোলে নরযানে বসাইয়া শিবাগণের মুখ নিঃসৃত অগ্নিরূপ অট্টহাস্য করিতেছ, একি পরীক্ষা, পরীক্ষা কি মা তুমি ত আমার মন, তবে আর পরীক্ষা কি? তোমার পরীক্ষা তুমিই কর। এমন সময় দেখিলেন, বধুর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, মৃদুস্বরে কাঁদিতেছেন, সাধক কহিলেন, "কাঁদিতেছ কেন? আপনার লোক দেখ্‌তে পাও নাই, মা বাপকে দেখ্‌তে পাও নাই। পরে জান্‌বে আমি তোমার বড় একটা পর নই। ওই দেখ তোমাদের গ্রামের বেহারারা তোমার সঙ্গে যাচ্চে।" সাধক ভাবিলেন, সুখের গৃহ, সুখের পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা একজন অপরিচিত পুরুষের পার্শে, বধুর উদ্‌বেগের প্রচুর কারণ আছে। সাধক মনে মনে হাস্য করিয়া কহিলেন, "জগন্মাতঃ! অপরিচিত পুরুষের সহিত অপরিচিতা কুমারীর মিলন ও ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ় প্রেমের আবির্ভাব দ্বন্দ্বরূপে বিরাজ করিয়া সংসারময় তাহাদের কি বিচিত্র লীলা। সংসার প্রদর্শনী ক্ষেত্রে তোমার এই দুটী চিত্র অতি দর্শনীয়।

সম-বেদনা।

লেখক,—ডঃ শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

আর না গাহিব গান।
যদি নাহি পারি বারেকের তরে
কাঁদাতে মানব প্রাণ॥

শুধু গেয়ে কিবা ফল?
যদি আর্ত্ত তরে না বহাতে পারি
পাষাণে ভেদিয়া জল॥

আরনা বাজাব বীণা।
যদি না সে পারে রণিয়া দানিতে
পরাণে শান্তি কণা॥

আপনি কাঁদিয়া পরকে কাঁদাব
কাঁদাব পরের তরে।
গলাটি জড়ায়ে কাঁদিব তাহার
যাহার নয়ন ঝরে॥

তাহে যদি পারি অধরে তাহার
ফুটাতে হাসির রেখা।
ধন্য হইবে জীবন আমার
বীণারে করিয়া সখা॥

ঠাকুর-দা।

(গল্প)

লেখক,—সাহিত্য রত্ন শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

(১)

রাধারমণ চৌধুরী। বলি ওহে নীলু ভায়া! এর মধ্যেই জড় হয়ে পড়্‌লে যে! চল নদীটের ধারে একটু সান্ধ্য ভ্রমণ করে আসি। অত ব'সে থাক্‌লে বাতে ধরবে বুঝ্‌লে?

নীলরতন চট্টরাজ। আরে ভাই জড় হবার আর বাকী কি, বয়স তো কম হ'ল না? এই ফাল্গুনে বিরাশী পূর্ণ হবে।

রাধারমণ। আবে ছোক্‌রা বল কি? তুমি তাহা হইলে আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট। তুমি তো ছোক্‌রা হে!

নীলু। ছোক্‌রা ব'লে ছোক্‌রা? একেবারে বাছের বাছ ছোক্‌রা। নিমতলার যাত্রী!

রাধারমণ। ভুল বুঝেছ হে ভায়া ভুল বুঝেছ। বয়স হলেই মানুষ বুড়ো হয়না। যার প্রাণে উৎসাহ নাই, আশা আকাঙ্ক্ষা নাই স্ফূর্ত্তি নাই, সে-ই বুড়ো। সে ১৬ বছরের যুবক হলেও, সে বুড়ো। আর যার প্রাণে উদ্দাম বাসনা,—যে স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা,—সে দেড়শত বৎসরের হইলেও যুবক।

নীলু। মানুষ আবার দেড়শত বছর বাঁচে নাকি?

রাধারমণ। কোন খবরই রাখনা? তোমার এই ভারতবর্ষের হিসাবে নরা গজা বিশে সয়, কিনা, মানুষ একশত কুড়ি বৎসর বাঁচে, কিন্তু "লঞ্জিভিটী" নামে একখানি ইংরেজি কেতাবে হিসাব দিয়াছে, হাংবর্ষের লোক নাকি ১৬৫ বৎসর বাঁচে অনুসন্ধান করিলে নাকি দুইশত বৎসর বয়সের লোকও পাওয়া যায়।

নীলু। কি আশ্চর্য্য!

রাধারমণ। মূর্খরা কথায় কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকে। বলি জগতে আশ্চর্য্যটা কি হে? আর অসম্ভব বা কি? কেন ত্রৈলঙ্গস্বামীর বয়স কি কম হয়ে ছিল? কেহ কেহ বলেন, তাঁর বয়স তিন শত বছর হয়ে ছিল। তা'ছাড়া অনেক প্রামাণিক গ্রন্থে এমন কথাও বেরিয়েছে যে, যোগ-বলে মানুষ সাত হাজার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। আবার খিওশফিষ্টরা বল্‌ছেন, মৈত্রেয় ঋষি নাকি তিন হাজার বৎসর বেঁচে আছেন। তবে ভায়া! তুমি ছোক্‌রা নও তো কি? তুমি তো দুধের ছেলে হে!

নীলু। তবে আর কি? চল নদীর ধারে দুই ছোকরা বেড়ানো যাক।

যাইতে যাইতে নীল রতন চট্টরাজ রাধারমণ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা দাদা! তুমি যে বল্‌ছিলে হরিবংশের লোক ১৬৫ বৎসর এমন কি দুই শত বৎসরও বেঁচে থাকে, সে—

রাধারমণ। সত্যই বাঁচে; এই দেখ গ্লাড্‌ষ্টোন—

নীলু। আরে! তা বাচুক, আমি সে কথার প্রতিবাদ কচ্ছিনে। আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি যে সেই হরিবংশটা কোন্ দেশ?

রাধারমণ। বার বার হরিবংশ, হরিবংশ কর্‌ছ কেন, হরিবংশ নয়—হরিবর্ষ; এক শুন্‌তে আর শোন কেন?

নীলু। আচ্ছা হল, সেই হরিবর্ষই বা হল! সে কোন্ দেশ?

রাধারমণ। ওহো! তুমি সে খবরও রাখনা—কেবল তামাক খেয়ে আর দাবা খেলেই চুল পাকিয়েছ? আরে আজ কাল যাকে ইউরোগ বলে, ঐটেই সেকালে হরিবর্ষ নামে খ্যাত ছিল। মহাভারতে শোন নি যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে হরিবর্ষের যবন রাজা এসেছিল?

নীলু। হাঁ—হাঁ—হরিবর্ষের কথা তো আছে।

রাধারমণ। চট্টরাজ ভায়া! ঐ!—ঐ সেই হরিবর্ষ!

নীলু। আচ্ছা! উহাকে হরিবর্ষ বলে বটে?

রাধারমণ। বাহবাঃ তুমি যে সত্য সত্যই দুধের ছেলে হ'য়ে দাঁড়ালে! যেন কিছুই জানো না?

নীলু। বাঃ বাঃ বেশ অর্থ! সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন এমন বাহাদুরি আর কোথায় আছে? এক ফুঁয়ের নরম—গরম—এক ফুঁয়ে রাম—রহিম!

(২)

রাধারমণ। নীলু ভায়া পথের ধারে গর্ত্তের মধ্যে মানুষের কথা শুনা যাচ্ছে না? শোন দেখি!

নীলু। তাই তো—তাই তোঃ—

"মুখ মুছিয়ে দিতে আবার এত গরম জল দিলে কেন বাবা? মুখে গরম জল দেবে দাও, চোখের ভিতর গরম জল কেন বাবা—চোখ যে জ্বল্‌ছে বাবা—নিরীহ ভদ্দর লোকের মত এখানে শুয়ে আছি—এখানে তুমি কেন বাবা?"

ঐ কথা গুলি শুনে রাধারমণ চৌধুরী ও নীলরতন চট্টরাজ এক পায়—দু পায় পথের ধারে সেই গর্ত্তটার কাছে গিয়া দেখ্‌লেন,—শিবু অধিকারী মাতাল হয়ে কাদামাটী মেখে গর্ত্তে প'ড়ে আছে; বমি করে সেই বমির উপর গড়াগড়ি দেওয়ায় তার নাকে মুখে মাথায়, কাপড়-চোপড়ে বমি মাখামাখি হয়েছে, একটা রোঁয়া-উঠা শীর্ণকায় বিশ্রী কুকুর ঐ বমি চেটে চেটে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে তার মুখের উপর প্রস্রাব কর্‌ছে।

এইরূপ দেখে তাঁরা দুজনেই অবাক্। দুজনেই যুগপৎ বলে উঠ্‌লেন,—সুরাপানে কি দুর্গতি! তখন তাঁরা কুকুরটাকে তাড়াইয়া বিষ্ঠা বমি মাখা শিবু অধিকারী মহাশয়কে ধরাধরি করে চন্দনা নদীতে লয়ে গেলেন। বিষ্ঠা-

সাগর ও আর এক জন পণ্ডিত নাকি এক সময়ে বিষ্ঠা বমি-মাখা একটা কলেরা রোগীকে ঠিক এইরূপ করে ব'য়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

চন্দনা নদী রতনদিয়ার ঠিক দক্ষিণে প্রবাহিতা। এক-ধারে ঐশ্বর্য্যবতী পল্লীখানির পাদ-ধৌত করিয়া কলনাদিনী চন্দনা নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়াছে—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, সে এক স্বর্গীয় ছবি। বৈকালে যেন সে দৃশ্যের মাধুরি আরও বেড়ে উঠে। তাই দেখ্‌বার জন্যই রাধারমণ ও নীলরতন যাচ্ছিলেন। সে সৌন্দর্য্য দেখা সে দিনকার মত আর ঘট্‌ল না। তাঁরা সে দিন শিবু ঠাকুর-দাকে লইয়াই মহাব্যস্ত!

বমি ও বিষ্ঠা ধৌত করিয়া তাঁরা শিবুকে লইয়া যখন বাড়ী আস্‌ছিলেন, তখন শিবু ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে বলে উঠ্‌লেন,—"কেন বাবা, জ্যান্ত জলসই কর্ত্তে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে আন্‌লে কেন? আরও কিছু মতলব এটেছ নাকি?

রাধারমণ ও নীলরতন কোন উত্তর করলেন না। শিবু ঠাকুর-দা বগর্ বগর্ করে কত কি মাথা মুণ্ডু বক্‌তে বক্‌তে চল্‌ল। তাঁরা শিবুকে বাড়ী পঁহুছে দিয়ে স্নান করলেন।

(৩)

নীলু। কাচ্ছা, দাদা, শিবু অধিকারী তো আমাদের চেয়ে অনেক ছোট, কেমর নয় কি?

রাধারমণ। নিশ্চয়ই। তার বয়স ৬০।৬৫ বৎসরের বেশী নয়। কেন, সে কথা তোমার মনে উঠ্‌ল কিসে?

নীলু। কাল ওর খানায় পড়ে থাকার কথাটা মনে পড়ে গেল। যখন আমরা ওকে বাড়ী নিয়ে যাই, তখন ছেলে বুড়ো "ঠাকুর-দা মাতাল হয়েছে" "ঠাকুর-দা মাতাল হয়েছে" বলে ওর বাড়ী পর্য্যন্ত হাস্‌তে হাস্‌তে দেখ্‌তে এল। আচ্ছা, ও ঠাকুর-দা হ'ল কিসে? সকলেরই ঠাকুর-দা; এ কেমন ঠাকুর-দা? গ্রামর মধ্যে ত বয়ঃজ্যেষ্ঠ এখন আমরা; ঠাকুর-দার পোষ্ট এখন আমরাই পেতে পারি, আমাদের ছেঁটে শিবু ঐ পদে কি করে বাহাল হল? হিন্দু মুসলমান; ইতর, ভদ্র, ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ—সকলেই বলে ঠাকুর দা! বাহবা মজা! "শিবু ঠাকুর-দা"ও বলে না, একেবারে নিভাজ ঠাকুর দা! যেন যোগরূঢ়ী পঙ্কজ!

রাধারমণ। ভায়া হে, জৈমিনী বলেছেন,—দেহের তিন গাছ লোম পাকলেই মানুষ বিজ্ঞ হয়। আমি দেখ্‌ছি তুমি এই বিধির প্রতি প্রশ্ন—তোমার সব কেশ পেকে গেল, কিন্তু বিজ্ঞতা আদৌ ফুটল না। যেমন মচীরা দুই চার ঘণ্টা ধরে হাজরা ভেটে যথেষ্ট মাথা নাড়ে, মাথা কোটে, অথচ তার ঘাড়ে ঠাকুর আসেনা। মাথা কোটাই সার। তোমারও তেমনি কেশ পাকাই সার! ঐ যে ঠাকুর-দার কথা বলছ তার ব্যাখ্যা শোন।

ঐ ঠাকুর দাকে সরকারি ঠাকুর-দা বলে।

নীলু। কেন, কোন মহাত্মা ঐ নাম দিয়েছে নাকি?

রাধারমণ। না হে ভায়া না। যে জিনিস সকলেই অবাধে ব্যবহার কর্‌তে পারে, তাকে সরকারি জিনিস বলা যায়। শিবুকে সেইরূপ সকলে সরকারি ঠাকুর-দা করে নিয়েছে। যে, বয়সে ওর চেয়ে অনেক বড় সেও ঠাকুর-দা বলে; যে, অন্য সম্পর্কে জড়িত, সেও হয়তো সময় বিশেষে ঠাকুর দা বলে বসে। তাতে দোষ হয় না। এরূপ সম্পর্কে বয়সের, জাতের, ভেদ বিচার নাই। শুধু ঠাকুর-দা নহে, এরূপ সার্ব্বজনীন সরকারি সম্পর্ক এক এক গ্রামে এক এক রকম আছে। কোন গ্রামে সরকারি মামা—কোন গ্রামে সরকারি দাদা, কোন গ্রামে সরকারি কাকা, এইরূপ অনেক সরকারি ডাক আছে। আপামর সাধারণ ঐ সরকারি ডাকে তাকে ডেকে থাকে। চৌকিদারেরা রাত্রে চীৎকার করে ঐ নামে ডাক ছেড়ে চোর বেটাদের একটু সাবধানতার সঙ্গে ভয় প্রদর্শন করে থাকে। কে বা কাহারা পাঞ্জিকার কোন্ শুভ নক্ষত্র যোগ দশা অন্তর্দ্দশা লগ্ন দেখে প্রথমে ঐ সরকারি ডাকের সৃষ্টি করে ছিলেন, তাহা আমি জানিনে; সেটা অকেজো প্রত্নতাত্ত্বিক গুলো বসে বসে ঠিক করুক গে, মূল কথা গ্রাম্য দেবতার মত প্রায় সকল গ্রামেই ঐ সরকারি ঠাকুর দা প্রভৃতি আছে।

নীলু। এখন বুঝ্‌লেম! তা হলে শিবু একজন সরকারি ঠাকুর দা! তা উহাতে ওর—

রাধারমণ। হাঁ—হে—হাঁ, উহাতে ওর সুবিধাও অনেক আছে। এই ধর, যদি শিবু সরকারি ঠাকুর দা না হইত তবে বোধ করি ওকে কাশীবাসী হতে হইত।

নীলু। তার অর্থ কি?

রাধারমণ। তাই তো বলি, কেবল শুধু শুধু চুল পাকিয়েছ। সরকারি

ঠাকুর-দা, সকলেই ওকে একটু খাতির মুরদ করে। গ্রামে যত মামলা মোকর্দ্দমা, প্রায় সকল গুলিরই কোন পক্ষে না কোন পক্ষে তদ্বিরের ভার পায়, তাতে বেশ দু'পয়সা পায় যত মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার ভার ওর উপরে। তাতে পরকাল গেলেও ইহকালের খরচার সংস্থান হয়। দেশে সেবার সেটেলমেণ্টে এসেছিল, অনেকের কাগজ পত্র দেখ্‌বার ভার ওর উপরে দেওয়া হয়। ও কেষ্টোর জমি মধু মালের নামে; মধু মালের জমি সাধু পাটনীর নামে, চাঁদ বিশ্বাসের জমি সুবল মিত্রের নামে লিখিয়ে বিস্তর টাকা উপার্জ্জনের চেষ্টায় ছিল। অমন সাংঘাতিক জীব কি আর আছে? যারা ঠাকুর-দা ঠাকুর-দা করে ওর কাছে গিয়ে পড়ে, ঐ নরাধম তারই অপকার করে বসে।

নীলু। তবে লোকে বিশ্বাস করে কেন?

রাধারমণ। আরে তাই তো বল্‌ছি। ঐ যোগারূঢ় সম্পর্কটার কুহক মন্ত্রে। লোকে বুঝেও বোঝে না! জেনেও মনে রাখেনা! ঠাকুর-দা, ঠাকুর-দা করে ওর পেছু লয়। ঠিক যেন সেই তন্ত্রের উচাটনের মত, তা'ছাড়া নদী যেমন দুই কূল ভাঙ্গেনা—এক কূল ভাঙ্গে—আর এক কূল গড়ে, ঠাকুর দাও সেইরূপ। তুমি একটু ভাল করে পূজো দাও, তোমার নামে পঁচিশ বিঘা জমি লিখিয়ে দেবে। তুমি দুই চার বোতল ধান্নেশ্বরী দিয়ে যা ইচ্ছে তাই ওর দ্বারা করে নিতে পার। শুধু সরকারি ঠাকুর-দ বলে এই রতনদিয়ার মত শিক্ষিত স্থানে ও নিস্তার পেয়ে যাচ্ছে; নচেৎ ওর পাপীয়সী বিধবা কন্যাটীকে নিয়ে কাশী যেতে হত। উহার সঙ্গে কেহই আহারাদি করিত না, নিশ্চয়ই সমাজচ্যুত হইত।

নীলু। রাম—রাম—ওর মেয়ের কথা আর তুল না।

রাধারমণ। না, তা আর তুল্‌ছিনে। বলি, এ দেশে যার চলে না, সেই তো কাশী যায়! কেমন নয় কি? ঐ দেখ ঐ রামচন্দ্রপুরের তারণ চট্টর অচল হল, অমনি সপরিবারে ভদ্দর লোক কাশীবাসী হল; ঐ দেখ গোবর্দ্ধনপুরের গণেশ মুখুজ্যের মেজো মেয়ে স্বামী ও পিতা সকল গোষ্ঠী থাকতেও কাশীবাসিনী হল। সেখানে দু'মুঠো ভাত নাকি পাওয়া যায়। অন্নপূর্ণার স্থানে না খেয়ে কেহই থাকে না। সরকারি ঠাকুর-দা না হলে ওকেও ঐরূপ কাশীবাসী হইতে হইত। সেরেফ ঠাকুর দা বলে বেঁচে গেল। ঠাকুর-দার যে লীলা, এক মুখে তা কে বর্ণনা করবে।

(৪)

দয়াল চৌধুরী রতনদিয়া গ্রামের মধ্যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁর ধন যক্ষের ধন নয়, বেশ খরচ পত্র করে থাকেন। বারো মাসে তের পার্ব্বণ হয়। দেশের কাজে দশের কাজে তিনি অগ্রণী। ফরিদপুর জেলাটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ব্যাপিয়া তাঁর সুনাম আছে।

আজ তাঁর কন্যার বিবাহের ভোজ। দশ মণ লঙ্কার বরাদ্দ হইয়াছে—এই লঙ্কার মেকদারে অন্যান্য জিনিস খরচ হইবে। এক কথায় ভোজটা খুবই বড় ধরণের হইতেছে।

পাঠক! বিশেষজ্ঞগণ এক এক স্থানে এক এক দ্রব্যের মাপ কাঠিতে ভোজের বড় ছোট স্থির করেন। বর্দ্ধমান জেলায় প্রথমেই ঠিক করা হয়—কয় হাঁড়ি কলায়ের ডা'ল বা কয় মণ তেঁতুল, খরচ হইবে; সেইরূপ ফরিদপুরের ভোজে প্রথমেই স্থির করা হয়—কয় মণ লোহিতবর্ণ পাকা পাকা লঙ্কার খরচ হইবে।

তাই বল্‌ছি দয়াল চৌধুরীর কন্যার বিবাহে দশ মণ লঙ্কার আয়োজন হইয়াছে।

বর-পক্ষের নিবাস ২৪ পরগণা। পৃথিবীর উত্তর মেরু, দাক্ষণ মেরুর যেমন ঠিক বিপরীত, ঝাল খাওয়া সম্বন্ধে বর পক্ষের প্রকৃতি ফরিদপুর জেলার লোকের প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ২৪ পরগণার লোক ভাতে বেঞ্জনে মিষ্টি খায়—মাছের ঝোলে, পাঁঠার ঝোলেও মিষ্টি দেয়, "লঙ্কা" শব্দ উচ্চারণ করলেও নাকি তাদের রক্তামাশয় হয় ও পেট ফেটে রক্ত পড়্‌তে থাকে। আবার ফরিদপুর বাসীরা বলে—যারা লঙ্কা খায় না, তারা মানুষ নয়; তারা বলে—"ঝালে ঝোলে বজ্জনম্"—যে তরকারিতে ঝাল নাই, ঝোল নাই, সেটা খাদ্যই নয়; লঙ্কায় গায়ের পোকা মরে।

লঙ্কা সম্বন্ধে ২৪ পরগণার মত ঠিক কি, ফরিদপুরের ধারণা সত্য, তাহা চরক সুশ্রুত, বাগ্‌ভটের শিষ্য অনুশিষ্যেরা বিচার বিতণ্ডা করে স্থির করুন। আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই বল্‌তে চাইনে। তবে আমাদের মনে হয়—দুইটী স্থানেরই বাড়াবাড়ি আছে। ২৪ পরগণার বিরক্তি, আর ফরিদপুরের আসক্তি, দুইটীই যেন মাত্রা ছাড়া! সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্। মাঝামাঝি রকম খেলেই ভাল হয়।

ভোজ খেতে খেতে বর-পক্ষের দারুণ দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। ঝালে,

চোখের জলে—নাকের সিগনীতে মুখের লালায় মিশিয়া ভদ্রলোক গুলির অপূর্ব্ব মুখশ্রী ফুটিয়া উঠ্‌ল। মুখ মণ্ডল লাল, হু—হা, হায়—হায়—"বাবা গেলুম্" শব্দে ভোজ তলায় যেন "শোকের ঝড় বহিল চৌদিকে" রকম হইয়া উঠিল।

থালে সারসের পায়স খাইবার দুর্গতি দেখে যেমন শৃগাল হেসে ছিল, বরপক্ষের দুর্গতি দেখে কন্যাপক্ষেরা সেইরূপ টিট্‌কারি দিল। দুর্গতিই বটে!

একে ত পেটে খিদে, তার পর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, বরপক্ষের সহ্য হইল না, খুব কথা কাটাকাটি আরম্ভ হইল—ক্রমে দুই পক্ষই ভয়ঙ্কর অগ্নিশর্ম্মা! সকলেই সরকারি ঠাকুর-দার পাছু পাছু ছুটিল।

অতি ভোজনে ঠাকুর-দার সর্ব্বাবয়ব অপেক্ষা উদরের ভার বেশী হইয়া ছিল, তার পর শত্রুপক্ষের সিংহ গর্জ্জন ও প্রতিহিংসা সূচক পশ্চাদনুশরণ, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর-দার বীরত্বের সহিত পলায়ন এতগুলি ব্যাপার বহির্জগতে যুগপৎ ঘটায় তার অন্তর্জগতের বিমুক্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহা দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। মল মূত্র ত্যাগ করতে করতে বীরপুঙ্গব, বীরকেশরী ঠাকুর-দা একেবারে রান্না ঘরের মধ্যে উননের পাশে গিয়া হাজির। উনুনের কিছু উপরে মই বাঁধা ছিল—সেই মইয়ের উপর হাঁড়ি, কড়াই, হাতা বেড়ী খুন্তী আর একটা হাঁড়িতে চিংড়ীমাছের ঝোল অম্বল ছিল। ঠাকুর-দা তাড়াতাড়ি পলাইতে গিয়া সেই মইয়ের সঙ্গে মাথায় ঠক্কর খেয়ে বস্‌ল। যেমন সজোরে ঠক্কর, অমনি ভাতের হাড়ি তার গা বহিয়া সকল দেহে কালি মাখিয়ে পড়্‌ল; অম্বলের হাড়ি উল্‌ঠাইয়া মাথা হইতে সহস্র শাখায় নাক মুখ বেয়ে পড়্‌তে লাগিল; ঠাকুর-দা ভয়ে বিস্ময়ে "অ্যাঁ" ব'লে যেমন হা করেছে, অমনি একটা অম্বলের চিংড়ী তার নাকের কাছ থেকে গড়িয়ে মুখের মধ্যে এসে হাজির. রসনা বিনা আপত্তিতে চিংড়ী মহারাজকে উদর নামক সহরে লালাজীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন; খুন্তীখানা ঠাকুর-দার পায়ে তাহার আহাম্মুকি দেখে মাথা খুঁড়ে বস্‌ল। ফলে রক্তমাথা হওয়ায় তার গোদা পা খানি যেন কোকনদ হয়ে দাঁড়াল।

আমাদের বলতে যে সময় লাগ্‌ছে, এর সহস্র ভাগের একভাগ সময়েই এতগুলি কাণ্ড ঘট্‌ল। অকস্মাৎ "হুড়—পাড়" শব্দ শুনে নিদ্রোত্থিত ভীতা চকিতা গৃহিণী সম্মার্জ্জনী লইয়া কেলো কুকুর ভ্রমে ঠাকুর-দাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল

ঠাকুর-দা। আরে কর কি; আরে আমি—আমি—আরে সবুর কর—আরে ——

গৃহিণী। অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—তুমি? তুমিই তো বটে। তুমিই তো? তুমি নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলে—তুমি কেমন করে—অ্যাঁ—অ্যাঁ—তুমি এখানে এলে কেমন করে?

ঠাকুর-দা। মুখে যে খই ফুট্‌ছে। অত কথার উত্তর কি করে কর্‌ব? সে বিস্তর কথা. বাড়া দুটি বৎসর লাগ্‌বে বল্‌তে। পরে ইতিহাস বর্ণনা করব. এখন জল দাও খাই, বাইরের দরজা দাও. কেহ দেখ্‌তে না পায়।

গৃহিণী তখন ধূমাবতী মূর্ত্তি ত্যাগ করে ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি ধর্‌লেন—খইল দিয়ে, গোবর দিয়ে, সাবান দিয়ে ঠাকুর-দার গায়ের কালি ঝুলি দূর কর্‌লেন। ঠিক যেন ঠাকুর-দার অঙ্গ রাগ আরম্ভ হল।

তারপর রান্নাঘরের পিঁড়েয় একখানা পিঁড়ি পেতে বসে ঠাকুর-দা ভোজের কাহিনী গৃহিণীকে বলিতে লাগিলেন।

(৫)

নীলু। আরে, দাদা, কাল দয়াল চৌধুরীর বাড়ীতে ভোজের ব্যাপারে শিবু অধিকারীর দুর্গতিটা শুনেছ?

রাধারমণ। হ্যাঁ, শুনিছি বই কি! গাঁ ভেসে গিয়েছে, কারো শুন্‌তে বাকি নেই। তোমাকে সে দিন ত বল্‌ছিলেম যে ঠাকুর-দার লীলা এক মুখে বলে শেষ করা যায় না।

নীলু। সে দিন মদ খেয়ে বাহ্যে করে ফেলে ছিল। ঠাকুর-দার কাহিনী অমৃত সমান! তোমার মুখে শুনি আমি মহাপুণ্যবান।

রাধারমণ। তবে পুণ্যবান্ ভায়া, এই কাহিনীর আর একটু অমৃত পান কর।

নীলু। বলো বলো, দাদা, শুন্‌বের জন্য কৌতুহল বাড়্‌ছে।

রাধারমণ। সে আজ তিন চার বৎসরের কথা। তোমার এই গুণধর ঠাকুর দাকে সঙ্গে করে আমাদের গ্রামের হরেন্দ্র গোঁসাই মেয়ের বিবাহের চেষ্টায় গিয়ে ছিলেন। কোন্নগরের রামতারণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নিকোষ কুলীন, বি. এ. পাশ। বেশ সুপাত্র। শিবু ও হরেন্দ্র দুজনেই রামতারণের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে হরেন্দ্রের মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করলেন।

রামতারণ মুখোপাধ্যায় বল্‌লেন—আচ্ছা, তার জন্য ভাবনা কি, যখন

আমার ছেলে আছে, আপনারও মেয়ে আছে, বিধাতার নির্ব্বন্ধ যদি থাকে, তবে অবশ্যই বিবাহ হইবে, কথাবার্ত্তা আহারাদির পর স্থির করলেই হবে, অনেক দূর থেকে এসেছেন, স্নান আহার করুন। তারপর অন্য কথা হবে।

ঠিক এমনই সময় খট্ খট্ করে শিকল বেজে উঠ্‌ল। রামতারণ দেখ্‌লেন, ঘর থেকে গৃহিণী সঙ্কেত করে ডাক্‌চেন। আপনারা বসুন, আমি এখনই আস্‌ছি, ব'লে তিনি বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

তখন গৃহিণী বল্‌লেন—তোমাকে নিয়ে ত আর পারিনে! তুমি সংসারটী উৎসন্ন দিলে।

রামতারণ। কেন, আমি করলেম কি?

গৃহিণী। আমার সোনার চাঁদ ছেলে, একে নিকেষ, তায় বি এ, পাস! এ রত্নের খোঁজে মধুর মাছির মত এখন ঝাঁক ঝাঁকে পাত্রী ক্ষের দল আস্‌বে। তুমি যদি সকলকেই আদর আপ্যায়ন করে খেতে দাও তবে দেউলে হয়ে যেতে হবে। বিয়ে হবে কিনা—কুলে শীলে মিলে কিনা—সে সব দেখা শুনা নেই, আগেই খেতে বলা কেমন! অমন বদ্ খরচ করলে সংসার ক'দিন চল্‌বে? তা'ছাড়া, তুমি যদি অমন করে অন্নছত্র খুলে দাও, তবে নিজে হাতা-বেড়া ধরে রাঁধো গে, আমি পার্‌ব না, আমি বাপের বাড়ী চ'লে যাই।

রামতারণ। দুপুর বেলা। ব্রাহ্মণ বাড়ীতে এসেছে! খেতে না বলি কেমন করে? একটা ভদ্রতা তো চাই!

গৃহিণী। এ কি পাড়া গাঁ পেয়েছ। পাড়া গাঁয়ে ওসব আদর আপ্যায়ন চলে। সেখানে জমির ধান, বিলের মাছ, গাছের নারিকেল, বাড়ীর শাক-সব্‌জী, বাগানের ফল-ফুলরি—অফুরন্ত। আর সহরে একটা বেগুন তিন পয়সায় কিন্‌তে হয়, একটা আম কিনে কেহ দেখে, কেহ শুঁকে; কেহ ছুঁয়ে, কেহ বা চেকে আম খাওয়ার সাধ পূর্ণ করে, এক পয়সার এক খুরি দই কিনে যেখানে সাড়ে সাত জনে খায়, উনুনের উপর হাড়ি দিয়ে যেখানে বাজারে চাউলের জন্য দৌড়াইতে হয়, যেখানে কোঁচার মোড়ে পাঁচ টাকার বাজার আসে, সেখানে কি আর ঐরূপ ভদ্রতা করা চলে? সহরের ভদ্রতা বলো—বন্ধুতা বলো—সব মুখে মুখে রাখ্‌বে। খুব হুস্ থাকে যেন—কাহাকেও মনের ভুলেও কোনদিন খেতে বল্‌বে না। খেতে বলা, কি কাহাকেও কিছু ভেট দেওয়া, সহুরে লোকের পক্ষে ভয়ানক বাঁদরামি ও বর্ব্বরতা। পাড়া গাঁয়ে লোক গেলে যত পার খেয়ে নিও, খবরদার খেতে বলোনা। আজ থেকে

তুমি আমার স্কুলের ছাত্র হও। পাড়াগাঁয়ের লোক গুলো অপব্যয়ী। বেগুনের যদি কোন স্থানে একটু পোকা লাগে অমনি তারা সেটাকে ফেলে দেয়, আর আমরা কেমন অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী দেখ ত! আমরা ঠিক পোকাটাকে ছেঁটে ছুঁটে ফেলে বেগুনটাকে নিয়ে ফেলি। বরং পোকার একপর্দ্দা চামড়া নিয়ে আসি তবু বেগুন ফেলিনে। এমন নৈলে কি গৃহিণীপনা। এই গুণেই তোমার সংসার ঠিক রেখেছি। এখন সোজা কথা শোনো ঐ দুটী লোককে জিজ্ঞেস ফরিদ করে দেখ, যদি বে-দেবার মত হয়,—তবে খেতে দিও, নচেৎ বিদায় করে দাও যেয়ে।

গৃহিণীর ভৎর্সনা মিশ্রিত উপদেশ পেয়ে রামতারণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একটা রূপাবাঁধা হুকায় তামাক সাজিয়া টানিতে টানিতে বাহিরে শিবু ও হরেন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিলেন।

ভদ্রতার অনুরোধে অল্পক্ষণেই শিবুর হাতে হুকাটা দিলেন। শিবু তামাক খেয়ে হুকাটী হরেন্দ্রকে দিল। হরেন্দ্র তামাক খাইতে লাগিল। তখন পাড়ার দুই তিন জন ভদ্রলোক এসে সেখানে বস্‌লেন। বেশ একটু ছোট খাটো মজলিস্ হয়ে উঠ্‌ল।

একজন আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলেন এরা? রামতারণ বল্‌লেন,—আমার পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করতে এসেছেন।

আগন্তুক শিবুর দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—মশায়ের নিবাস কোথায়?

শিবু। আমাদের উভয়েরই নিবাস জেলা ফরিদপুর গ্রাম রতনদিয়া।

আগন্তুক। মশায়ের নাম?

শিবু। আমার নাম, শ্রীশিবরাম অধিকারী। আর ওঁর নাম—

রামতারণ। আরে সর্ব্বনাশ! আর "ওঁর নামে" দরকার নেই বাবা! জাত্ মেরেছে হে, জাত্ মেরেছে। সর্ব্বনাশ করেছে হে সর্ব্বনাশ করেছে।

ঐরূপ বল্‌তে বল্‌তে রামতারণ তেলে আগুণে জ্বলে উঠে হরেন্দ্রের হাত থেকে একটা হেচ্‌কা টানে হুকাটা নিয়ে শানের উপরে এক আছাড়। হুকা ভেঙ্গে চুরমার! হেচ্‌কাটানে খানিকটা আগুণ ঠিক্‌রে এসে হরেন্দ্রের পায়ে পড়ল—হরেন্দ্র ঝাঁপিয়ে উঠল।

রামতারণ বল্‌লেন—কিরূপ ভদ্রলোক তুমি? তুমি জুয়াচোর! তোমাকে পুলিশে দেবো! তুমি ছদ্মবেশে জাত্‌মারতে এসেছ? আমার হুকোর জাত মেরেছ—ভাগ্যিস্ তোমার সঙ্গে বসে ভাত খাইনি হুকোটা দিয়ে গেল।

শিবু। মশাই! অত চট্‌ছেন কেন? আমিও নিকেষ কুলীন, আমিও ব্রাহ্মণ, আমিও সমাজের——

রামতারণ। আবারও জুয়াচুরি? অধিকারী আবার বামণ কোন কালে হে? অধিকারী বামুন তো কখন শুনিনি বাবা! সৃষ্টি ছাড়া কথা———

শিবু। মশাই! স্থির হউন—সৃষ্টি ছাড়া নয়, শিষ্যশাখা আছে বলে অধিকারী খেতাব—আসলটা আমরা কুলীন আমরা কাঞ্জীলাল, আমাদের মেল—

আগন্তুক। ওহে রামতারণ শুনেছ? ওঁরা কেঁজেল! কেঁজেল হে! কেঁজেল! কেঁজেলের আবার মেল! কেঁজেল আবার বামণ!

হরেন্দ্র। মশাই! আপনারা অন্যায় বল্‌ছেন কেন? কাঞ্জীলাল কুলীন—সে খবরও রাখেন না? শিষ্যশাখা আছে বলে আমার খেতাব যে গোসাই, তাই বলে কি———

রামতারণ। অ্যাঁ গোসাই? অ্যা—অ্যা! এ দুই শালাই পরামর্শ এটে আমার জাত মার্‌তে এসেছে!

বে-গতিক দেখে শিবু ও হরেন্দ্র সুড় সুড় করে সরে পড়্‌লেন।

নীলু। অমৃত কাহিনীই বটে! রামতারণের বাড়ী কিছু উত্তম মধ্যম হয়েছিল নাকি?

রাধারমণ। সেটা ঠিক্ জানিনে, কেহ বলে হয়েছিল। কেহ বলে না।

নীলু। হ্যা—হ্যা—এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি!

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জ্ঞাত আছি—এই ঠাকুর্‌দা শেষ জীবনে অতি কষ্ট পাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেকটা এই ইহজন্মেই হয়েছিল।

পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কোষ্ঠী-শিক্ষা।

লেখক,— শ্রীযুক্ত পাশুপতি সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অষ্টবর্গ চক্র।

অষ্টবর্গ চক্রে নয়টি পৃথক পৃথক চক্র অঙ্কিত করিয়া রবি, চন্দ্র, মঙ্গল বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও লগ্নের অষ্টবর্গ রেখাপাত করতঃ আটটি ঘরে এবং প্রত্যেক ঘরের রেখা সমষ্টি নবম ঘরে স্থাপন করিতে হয়। এই রেখা সমষ্টির দ্বারা গ্রহগণের শুদ্ধাশুদ্ধ ও জীবনের ফলাফল নির্ণীত হয়।

রেখা স্থাপন করিবার নিয়ম।

প্রত্যেক ঘরের রেখাগুলিকে ২ দিয়া গুণ করিয়া ৮ দ্বারা ভাগ করতঃ অবশিষ্টাকে সেই ঘরে এবং শূন্য অবশিষ্ট থাকিলে সম লিখিতে হয়। আর যদি ২ দিয়া গুণ করিয়া ৮এর কম হয় তবে যত কম হইবে ততবিন্দু লিখিতে হইবে।

মীন হইতে মিথুন পর্য্যন্ত রেখা সমষ্টির নাম বাল্যখণ্ড।

কর্কট হইতে তুলা পর্য্যন্ত ঘরের রেখা সমষ্টির নাম যৌবন খণ্ড, বৃশ্চিক হইতে কুম্ভ পর্য্যন্ত ঘরের রেখা সমিষ্টির নাম বৃদ্ধখণ্ড, যে খণ্ডে রেখা অধিক হইবে জীবনের সেই খণ্ড (ভাগ) শুভ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অষ্টবর্গ রেখা।

রবির রেখা।	চন্দ্রের রেখা।
রবি—১।২।৪।৭।৮।৯।১০।১১	রবি—৩।৬।৭।৮।১০।১১
চন্দ্র—৩।৬।১০।১১	চন্দ্র—১।[illegible]।৬।৭।১০।১১
মঙ্গল—১।২।৪।৭।৮।৯।১০।১১	মঙ্গল—২।৩।৫।৬।৯।১০।১১
বুধ—৩।৫।৬।৯।১০।১১।১২	বুধ—১।৩।৪।৫।৭।৮।১০।১১
বৃহস্পতি—৫।৬।৯।১১	বৃহস্পতি—১।২।৪।৭।৮।১০।১১
শুক্র—৬।৭।১২	শুক্র—৩।৪।৫।৭।৯।১০।১১
শনি—১।২।৪।৬।১০।১১।১২	শনি—৩।৫।৬।১১
লং—৩।৪।৬।১০।১১।১২	লং—৩।৬।১০।১১

মঙ্গলের রেখা।	বুধের রেখা।
রবি—৩।৭।৬।১০।১১	রবি—৫।৬।৯।১০।১২
চন্দ্র—৩।৬।১১	চন্দ্র—২।৪।৬।৮।১০।১১
মঙ্গল—১।২।৪।৭।৮।১০।১১	মঙ্গল—১।২।৪।৭।৮।৯।১০।১১
বুধ—৩।৫।৬।১১	বুধ—১।৩।৫।৬।৯।১০।১১
বৃহস্পতি—৬।১০।১১।১২	বৃহস্পতি—৬।৮।১১।১২
শুক্র—৬।৮।১১।১২	শুক্র—১।২।৪।৭।৮।৯।১০।১১।১২
শনি—১।৪।৭।৮।৯।১০।১১	শনি—১।২।৪।৭।৮।৯।১০।১১।১২
লং—১।৩।৬।১০।১১	লং—১।১।৪।৬।৮।১০।১১

বৃহস্পতির রেখা।	শুক্রের রেখা।
রবি—২।৩।৪।৭।৮।৯।১০।১১	রবি—৮।১১।১২
চন্দ্র—২।৫।৭।৯।১১	চন্দ্র—১।২।৩।৪।৫।৮।৯।১১।১২
মঙ্গল—১।২।৪।৭।৮।১০	মঙ্গল—৩।৪।৬।৯।১১।১২
বুধ—১।২।৪।৯।১০।১১	বুধ—৩।৫।৬।৯।১১
বৃহস্পতি—১।২।৩।৬।৭।৮।১০।১১	বৃহস্পতি—৫।৮।৯।১০।১২
শুক্র—২।৫।৯।১০।১১	শুক্র—১।২।৩।৪।৫।৮।৯।১০।১১
শনি—৩।৫।৬।১২	শনি—৩।৫।৬।৮।৯।১০।১১
লং—১।২।৪।৫।৬।৭।৯।১০।১১	লং—১।২।৩।৪।৫।৮।৯।১১

শনির রেখা।	লং রেখা।
রবি—১।২।৪।৭।৮।১০।১১	রবি—১।২।৪।৭।৮।১০।১১
চন্দ্র—৩।৬।১১	চন্দ্র—৩।৬।১১
মঙ্গল—৩।৫।৬।১০।১১।১২	মঙ্গল—৩।৫।৬।১১
বুধ—৬।৮।৯।১০।১১।১২	বুধ—৬।৮।৯।১০।১১
বৃহস্পতি—৫।৬।১১।১২	বৃহস্পতি—৫।৬।১১।১২
শুক্র—৬।১১।১২	শুক্র—৬।১১।১২
শনি—৩।৫।৬।১১	শনি—৩।৫।৮।১০।১১
লং—১।৩।৪।৬।১০।১১	লং—১।৩।৪।৬।১০।১১

পূর্ব্বোক্ত জাতকের অষ্টবর্গ চক্র দেখিলেই রেখা পাতের নিয়ম বুঝিতে পারিবেন তজ্জন্য এখানে আর উদাহরণ দেওয়া হইল না।

সপ্তম অধ্যায়।

গ্রহগণের দ্বাদশ ভাব।

শয়ন, উপবেশন, নেত্র পানি, প্রকাশক, গমনেচ্ছা, গমন, সভায় বসতি, আগমন, ভোজন, নৃত্যলিপ্সা, কৌতুক ও নিদ্রা গ্রহগণের এই দ্বাদশ ভাব জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন জাতকের শুভ ফল সত্ত্বেও যদি নানা মিল হয় তবে গ্রহ দ্বাদশ ভাব ফল অবশ্য বিচার্য্য।

দ্বাদশ ভাব নির্ণয়।

যে গ্রহের ভাব নির্ণয় করিতে হইবে সেই গ্রহ কোন রাশিতে অবস্থান করিতেছেন তাহা দেখিয়া সেই রাশির সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিতে হয়। পরে সেই দ্বিগুণিত সংখ্যাকে * ১৫ দিয়া গুণ করিবেন এবং যে নক্ষত্রে গ্রহ আছেন সেই নক্ষত্রকে পূর্ব্বগুণ লব্ধ অঙ্কে যোগ করিয়া ১২ দ্বারা ভাগ করিবেন। ভাগশেষে ১ থাকিলে শয়ন, ২ থাকিলে উপবেশন, ৩ থাকিলে নেত্রপানি, ৪ থাকিলে প্রকাশক, ৫ থাকিলে গমনেচ্ছা, ৬ থাকিলে গমন, ৭ থাকিলে সভায় বসতি, ৮ থাকিলে আগমন, ৯ থাকিলে ভোজন, ১০ থাকিলে নৃত্যলিপ্সা, ১১ থাকিলে কৌতুক, ০ থাকিলে গ্রহগণের নিদ্রাভাব বুঝিতে হইবে।

রবির ভাব ফল।

রবি শয়নভাবে থাকিলে জাতক অগ্নিমান্দ্য পিত্তশূল ও গুহ্যস্থানে পীড়া যুক্ত এবং শ্লীপদী (গোদা) হয়।

রবি নেত্র পানি ভাবে ৫।৭।৯।১০ গৃহে থাকিলে জাতক সুখী হয়। অন্য স্থানে ঐভাবে থাকলে জাতক ক্রুর প্রকৃতি বিশিষ্ট, জল দোষের পীড়াযুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

রবি প্রকাশন ভাবে থাকিলে নেত্ররোগী ক্রোধী, হিংস্রক, ক্রিয়াবান, ধার্ম্মিক ও ধনবান হয়। রবি উপবেশন ভাবে থাকিলে জাতক শিল্পী শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট দুখী সুবিদ্যাহীন ও পর সেবায় তৎপর হয়।

* রাশির সংখ্যা যথা- মেষ ১, বৃষ ২, মিথুন ৩, কর্কট ৪, সিংহ ৫, কন্যা ৬, তুলা ৭, বৃশ্চিক ৮, ধনু ৯, মকর ১০, কুম্ভ ১১, মীন ১২।

বন্ধন। দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হইলে প্রায় সকল বন্ধন শিথিল হইয়া আইসে, তবে রিপু দড়ী গুলা সহজে আল্‌গা হয় না। সে গুলার অংশ পাতলা নয়, বহু দিন ধরিয়া টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়ী করিতে হয়। গ্রীষ্মকালের প্রবল ঝড়ের মত মনের উন্মত্ত ভাব হওয়া চাই তবে যদি একটা আধটা দড়া ছিঁড়িতে পারে, 'লক্ষে ছুটো একটা কাটে, হেসে দেন মা হাত চাপুড়ী" পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য ও কৃপাময়ীর কৃপা ব্যতীত সে দড়ী কাটা অসম্ভব। সাধক জননী পুত্র ও বধূকে একাসনে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। দীর্ঘজীবি, পুত্রবান ও সংসারী হও বলিয়া নয়ন জলে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সাধকও জননীর পাদস্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিলেন, 'আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার ইচ্ছার অন্যথাচরণ করিতে না হয়।" সেদিন মহানন্দে ও কোলাহলে অতি বাহিত হইল। ফুলসজ্জা; অন্যান্য বিষয়ও আনন্দে শেষ হইল।

বিবাহের পর সাধক মাতৃ আজ্ঞায় সমস্ত দিন গৃহকর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করেন। "হাতে কর গৃহ কর্ম্ম, মুখে বল রাম," পরমার্থ চিন্তা তাঁহাকে মুহূর্ত্তকাল ত্যাগ করিল না। সেই বয়সেই তিনি শরীর মন চিন্ময়ীকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কৃত কর্ম্মের কর্ত্তা আমি, একথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

তৃতীয় অংশ।

(সাধকের দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে সঙ্গীত ও কালনায় তাঁহার ধনাঢ্য শিষ্যের সংসারিক ব্যয়ভার গ্রহণের অঙ্গীকার।)

সাধক সন্ধ্যার পর গ্রামস্থ একটী সঙ্গীত সমাজে যান। তথায় তাল মান র বিবিধ যন্ত্রের সহিত সা, রে, গা, মার ছড়াছড়ি চলে। কত হাস্য পরিহাস কৌতুক চলে। সকলেই বিদ্বান্ হইব, প্রতিপত্তি লাভ করিব, আপনার নাম জাহির করিয়া দিব, আপনার সুখ্যাতি শুনিয়া প্রাণ জুড়াইব ইত্যাদি বাসনায় উৎসাহিত, কিন্তু সাধকের মনের অবস্থা অন্যরূপ। তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার গরীব মন তাঁহার কাছেই থাকিবে, হৃদয় ছাড়িয়া কোথায়ও যাইবে না, হৃদপদ্মালয়া পরমা প্রকৃতির উপাসনায়, সংসারের মঙ্গল চিন্তায় রত হইবে, তাঁহার নাম জপিবে, নামে রূপে এক করিয়া পরমানন্দময়ীর পরমানন্দের ভাগী হইবে। পরমানন্দের বিঘ্ন হইলে মাতৃস্তন্য পিপাসু শিশুর ন্যায় কাঁদিবে। কাজেই তত্রস্থ অন্যান্য গায়কগণের সহিত তাঁহার মন মিশিল না। "অনেক মানুষ

মিলে মন মিলে না," মনের মানুষ পাওয়া বড় কঠিন। আমি বড় বক্তা, আমি বড় বিদ্বান, আমি বড় ধনী, আমি বড় কর্ম্মী, আমি বড় গায়ক ইত্যাদি শব্দে সংসারকে কোলাহল পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ধ্যান, ধারণা ও শান্তি সেইরূপ অভিমান পূর্ণ মানবের সহবাসে অসম্ভব। তাহাদের সহবাসে সংসারের বিবিধ পিপাসা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে, ক্রমে ঘোর পিপাসা যুক্ত বিকারগ্রস্ত মানবের ন্যায় জিহ্বা বিস্তার করিয়া স্থির নেত্রে অবসন্ন হইয়া পড়িবে। কাজেই তিনি সাধু সহবাস সন্ধান করিতে লাগিলেন। যাহারা সুখ দুঃখ মান অপমান, যশ অপযশ এক বস্তুতে সমর্পণ করিয়া মনের আনন্দে বসিয়া আছেন, এরূপ সহবাস সন্ধান করিতে লাগিলেন। "যস্য ভাবনা যাদৃশী, সিদ্ধির্ভবতু তাদৃশী।" চান্না গ্রামের প্রান্তস্থিত খড়ী নদীর তীরবর্ত্তী দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির মনে পড়িল, সেখানে অনেক সাধু অতিথির সমাগম হয়, সন্ধ্যার পর নিত্যই পরমার্থ সঙ্গীত হইয়া থাকে। খড়ী একটী উপনদী। সাধক বাল্যে যৌবনে, প্রৌঢ়ে এই খড়ী নদীর তীরে বহুস্থানে বহুভাবে বাস ও ক্রীড়া করিয়া ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার কোটা মানকর প্রভৃতি গ্রামের উত্তর দিকস্থিত বনভূমির জল প্রবাহ লইয়া খড়ী নদীর অবয়ব পুষ্ট হইয়াছে। খড়ী নদী প্রশস্ত শস্যক্ষেত্রের সলিল রাশি গ্রহণ করিয়া বিবিধ বক্রগতিতে কাটোয়ার নিকট পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। খড়ী নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি মূলক ইতিহাস আছে। কথিত আছে মাড়ো নামক গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। মাড়োগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মানকরের সন্নিকট। মাড়ো পুণ্যক্ষেত্র, তথায় কীর্ত্তন পদাবলি রচয়িতা বৈষ্ণব কবি শশীশেখর ও রাম রসায়ন প্রণেতা পণ্ডিত রঘুনন্দন গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা শশীশেখরের কীর্ত্তন পদ সকল বঙ্গবাসীর কর্ণ কুহরে চিরকালই পরিতৃপ্ত করিবে। পণ্ডিত রঘুনন্দনের রাম রসায়ন অমৃত তুল্য। মাড়ো গ্রামস্থ ঐ ব্রাহ্মণের দুই পত্নী ছিল। প্রথমা গৃহিণী গুণসম্পন্না হইলেও রূপ যৌবন অভাবে তদগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের প্রণয় ভাজন হইতে পারেন নাই, অতএব সপত্নী দ্বারা অনেক সময় লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হইতেন। পতি প্রতিকূল থাকায় সপত্নীর সহিত একত্র অবস্থানের উপায় না দেখিয়া প্রথমার সংসারে ঔদাস্য ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের পৈতৃক শ্যামা পূজাছিল ও পূজার জন্য একটী ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। ঐ শ্যামাগৃহের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিনী, বর্ষার সময় গ্রামের উত্তর প্রান্তস্থিত বনভূমির জলরাশি সেই

বন্ধন। দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হইলে প্রায় সকল বন্ধন শিথিল হইয়া আইসে, তবে রিপু দড়ী গুলা সহজে আল্‌গা হয় না। সে গুলার অংশ পাতলা নয়, বহু দিন ধরিয়া টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়ী করিতে হয়। গ্রীষ্মকালের প্রবল ঝড়ের মত মনের উন্মত্ত ভাব হওয়া চাই তবে যদি একটা আধটা দড়া ছিঁড়িতে পারে, 'লক্ষে দুটো একটা কাটে, হেসে দেন মা হাত চাপুড়ী" পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য ও কৃপাময়ীর কৃপা ব্যতীত সে দড়ী কাটা অসম্ভব। সাধক জননী পুত্র ও বধূকে একাসনে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। দীর্ঘজীবি, পুত্রবান ও সংসারী হও বলিয়া নয়ন জলে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সাধকও জননীর পাদস্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিলেন, 'আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার ইচ্ছার অন্যথাচরণ করিতে না হয়।" সেদিন মহানন্দে ও কোলাহলে অতিবাহিত হইল। ফুলসজ্জা; অন্যান্য বিষয়ও আনন্দে শেষ হইল।

বিবাহের পর সাধক মাতৃ আজ্ঞায় সমস্ত দিন গৃহকর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করেন। "হাতে কর গৃহ কর্ম্ম, মুখে বল রাম," পরমার্থ চিন্তা তাঁহাকে মুহূর্ত্তকাল ত্যাগ করিল না। সেই বয়সেই তিনি শরীর মন চিন্ময়ীকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কৃত কর্ম্মের কর্ত্তা আমি, একথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

তৃতীয় অংশ।

(সাধকের দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে সঙ্গীত ও কালনায় তাঁহার ধনাঢ্য শিষ্যের সংসারিক ব্যয়ভার গ্রহণের অঙ্গীকার।)

সাধক সন্ধ্যার পর গ্রামস্থ একটী সঙ্গীত সমাজে যান। তথায় তাল মান র বিবিধ যন্ত্রের সহিত সা, রে, গা, মার ছড়াছড়ি চলে। কত হাস্য পরিহাস কৌতুক চলে। সকলেই বিদ্বান্ হইব, প্রতিপত্তি লাভ করিব, আপনার নাম বিলাইয়া দিব, আপনার সুখ্যাতি শুনিয়া প্রাণ জুড়াইব ইত্যাদি বাসনায় উৎসাহিত, কিন্তু সাধকের মনের অবস্থা অন্যরূপ। তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার গরীব মন তাঁহার কাছেই থাকিবে, হৃদয় ছাড়িয়া কোথায়ও যাইবে না, হৃদপদ্মালয়া পরমা প্রকৃতির উপাসনায়, সংসারের মঙ্গল চিন্তায় রত হইবে, তাঁহার নাম জপিবে, নামে রূপে এক করিয়া পরমানন্দময়ীর পরমানন্দের ভাগী হইবে। পরমানন্দের বিঘ্ন হইলে মাতৃস্তন্য পিপাসু শিশুর ন্যায় কাঁদিবে। কাজেই তত্রস্থ অন্যান্য গায়কগণের সহিত তাঁহার মন মিশিল না। "অনেক মানুষ

মিলে মন মিলে না," মনের মানুষ পাওয়া বড় কঠিন। আমি, বড় বক্তা, আমি বড় বিদ্বান, আমি বড় ধনী, আমি বড় কর্ম্মী, আমি বড় গায়ক ইত্যাদি শব্দে সংসারকে কোলাহল পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ধ্যান, ধারণা ও শান্তি সেইরূপ অভিমান পূর্ণ মানবের সহবাসে অসম্ভব। তাহাদের সহবাসে সংসারের বিবিধ পিপাসা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে, ক্রমে ঘোর পিপাসা যুক্ত বিকারগ্রস্ত মানবের ন্যায় জিহ্বা বিস্তার করিয়া স্থির নেত্রে অবসন্ন হইয়া পড়িবে। কাজেই তিনি সাধু সহবাস সন্ধান করিতে লাগিলেন। যাহারা সুখ দুঃখ মান অপমান, যশ অপযশ এক বস্তুতে সমর্পণ করিয়া মনের আনন্দে বসিয়া আছেন, এরূপ সহবাস সন্ধান করিতে লাগিলেন। "যস্য ভাবনা যাদৃশী, সিদ্ধির্ভবতু তাদৃশী।" চান্না গ্রামের প্রান্তস্থিত খড়ী নদীর তীরবর্ত্তী দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির মনে পড়িল, সেখানে অনেক সাধু অতিথির সমাগম হয়, সন্ধ্যার পর নিত্যই পরমার্থ সঙ্গীত হইয়া থাকে। খড়ী একটী উপনদী। সাধক বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে এই খড়ী নদীর তীরে বহুস্থানে বহুভাবে বাস ও ক্রীড়া করিয়া ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার কোটা মানকর প্রভৃতি গ্রামের উত্তর দিকস্থিত বনভূমির জল প্রবাহ লইয়া খড়ী নদীর অবয়ব পুষ্টি হইয়াছে। খড়ী নদী প্রশস্ত শস্যক্ষেত্রের সলিল রাশি গ্রহণ করিয়া বিবিধ বক্রগতিতে কাটোয়ার নিকট পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। খড়ী নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি মূলক ইতিহাস আছে। কথিত আছে মাড়ো নামক গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। মাড়োগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মানকরের সন্নিকট। মাড়ো পুণ্যক্ষেত্র, তথায় কীর্ত্তন পদাবলি রচয়িতা বৈষ্ণব কবি শশীশেখর ও রাম রসায়ন প্রণেতা পণ্ডিত রঘুনন্দন গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা শশীশেখরের কীর্ত্তন পদ সকল বঙ্গবাসীর কর্ণ কুহরে চিরকালই পরিতৃপ্ত করিবে। পণ্ডিত রঘুনন্দনের রাম রসায়ন অমৃত তুল্য। মাড়ো গ্রামস্থ ঐ ব্রাহ্মণের দুই পত্নী ছিল। প্রথমা গৃহিণী গুণসম্পন্না হইলেও রূপ যৌবন অভাবে তমগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের প্রণয় ভাজন হইতে পারেন নাই, অতএব সপত্নী দ্বারা অনেক সময় লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হইতেন। পতি প্রতিকূল থাকায় সপত্নীর সহিত একত্র অবস্থানের উপায় না দেখিয়া প্রথমার সংসারে ঔদাস্য ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের পৈতৃক শ্যামা পূজা ছিল ও পূজার জন্য একটী ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। ঐ শ্যামাগৃহের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, বর্ষার সময় গ্রামের উত্তর প্রান্তস্থিত বনভূমির জলরাশি সেই

পুষ্করিণী প্লাবিত করিয়া মাঠে পড়িত। প্রথমাপত্নী মনোকষ্টে সেই শ্যামাগৃহে অবস্থান করিতেন, ক্রমে তাঁহার বৈরাগ্য ও ভক্তি গভীর হইল, তিনি ভৈরবী বেশ ধারণ করিলেন, এবং একটী শ্যামা প্রতিমা সেই গৃহে সংস্থাপন করিয়া দেবীর ধ্যান ও পূজায় নিরত হইলেন। প্রতিবেশীগণের মধ্যে তাঁহার সুখ্যাতি ও ভক্তির নানা প্রসঙ্গ উঠিতে লাগিল, সপত্নী ও পতির নির্য্যাতনও বৃদ্ধি হইতে লাগিল দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তাহার বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য কঠোর বাক্যে তিরস্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও সপত্নীর অত্যাচার ও তিরস্কার ক্রমে উচ্চ ও অসহ্য সীমায় উঠিল। একদিন সাধ্বী রমণী কয়েকজন প্রতিবাসী সমক্ষে লাঞ্ছিত হইয়া এই আমি চলিলাম, বলিয়া দেবীর হস্তস্থিত খড়্গ খুলিয়া লইয়া নিজের জিহ্বা ছেদন করিলেন, পূজাপাত্রে রক্তধারণ পূর্ব্বক তদ্বারা দেবীর উপাসনা পুর্ব্বক খড়্গ হস্তে উন্মাদিনীর ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে দ্রুতবেগে গৃহের বাহির হইয়া সেই ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে ঝম্ফ প্রদান করিলেন। সতী অঙ্গ স্পর্শ করিবা-মাত্র পুষ্করিণীর জল ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরম সৌভাগ্য শালিনী ভক্তির মূর্ত্তিমতী ব্রাহ্মণ পত্নী দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও বামহস্তে ত্রিশূল উত্তোলন পূর্ব্বক জলে ভাসিতে লাগিলেন। পুষ্করিণীর জল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গ্রামবাসীগণ এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার শ্রবণ করিয়া ত্বরিৎ বেগে পুষ্করিণীর নিকট আসিয়া অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিতে লাগিল। ক্রমে পুষ্করিণীর জল বৃদ্ধি পাইয়া তীব্র বেগে মাঠে পতিত হইয়া তত্রস্থ ক্ষুদ্র জলনালীকে দশগুণ প্রশস্ত করিয়া খরতর বেগে চলিতে লাগিল। পুণ্য স্বরূপা ব্রাহ্মণ পত্নী সেই খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক ভাসিতে ভাসিতে স্রোতের সহিত চলিতে লাগিলেন। যে স্থান দিয়া সেই স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল সেই স্থান নদীরূপে পরিণত হইল, প্রবাদ আছে এই কারণে এই নদীর নাম খড়্গেশ্বরী বা খড়্গী।

খড়্গেশ্বরী স্থানে স্থানে অতি গভীর। অশ্বত্থ, বট, অর্জ্জুন প্রভৃতি বনস্পতি ও বিশাল বৃক্ষ সকল তাহার উভয় কূলে বর্ত্তমান। সেই সকল বৃক্ষের হরিৎবর্ণ পত্র সকল বপন হিল্লোলে আকাশের কোলে নৃত্য করিয়া দূর হইতে খড়্গেশ্বরীর অবস্থানের পরিচয় দেয়। তাহার স্থানে স্থানে বেতসীকুঞ্জ বন কুসুম মণ্ডিত, মধুপগুঞ্জার ও সৌরভ সংযুক্ত। তাহার কূলে শীতল সলিল সেবিত, সৌরভ সংযুক্ত ধীর সমীর সেবন পরিশ্রম পীড়িত কৃষক ও রাখালের ভাগ্যেই অনেক

সময় ঘটিয়া থাকে। কৃষকগণ বসন্তে ও গ্রীষ্মে শস্যক্ষেত্রে পরিশ্রম পূর্ব্বক সেই সকল স্থানে আসিয়া শ্রম লাঘব করে, অঞ্জলি অঞ্জলি খড়্গেশ্বরীর জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়।

দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির খড়্গী নদীর কূলে সংস্থাপিত। স্থানটী অতি মনোরম, বনস্পতিগণ পরিশোভিত, স্থানে স্থানে স্বভাবজাত ব্রততী কুঞ্জ প্রকৃতির গৌরবে খড়্গেশ্বরীর জলরাশি চুম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে। মন্দিরের অনতিদূরে গ্রামের শ্মশান। দেবীর মন্দিরে একজন ত্যাগী পুরুষ অবস্থান করেন। মধ্যে মধ্যে অতিথি ও সন্ন্যাসীগণ আসেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অনেক লোক সমাগত হয়। সকলে দেবীর গুণানুকীর্ত্তনে দিন সার্থক করেন। সকল পার্ব্বণে দেবীর মন্দিরে সমারোহ হইত, নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের ভক্ত ও প্রবীণ অনেক লোক সমাগত হইতেন। সাধক গ্রামের বিবিধ বাদ্য প্রতিধ্বনিত, বিলাস বিজড়িত, আশা ও অহঙ্কারের অট্টহাস্য পরিপূর্ণ সঙ্গীতগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীণবাদ্য সংযুক্ত প্রেম ও ভক্তি পরিপূর্ণ, হৃদয় উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত, সুমধুর কণ্ঠনিনাদিত দেবীর মন্দির সংলগ্ন ক্ষুদ্র সঙ্গীতালয়ে যোগ দিলেন। সাধকের কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর, কৃতিত্বও বিস্তর, কাজেই তাঁহার বয়স নবীন হইলেও তত্রস্থ গায়কগণের অধিকারী হইলেন। সাধক যাহার ধ্যানে সর্ব্বদা বিভোর, শব্দে ও বর্ণে যাহার শক্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাননা, তাঁহার সমক্ষে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে সাধকের আনন্দ উচ্ছ্বাস দশগুণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নূতন ভাবে, নূতন ভাষায়, অহঙ্কার শূন্য হৃদয় নিঃসৃত স্বরচিত সঙ্গীতে সমাগত জনসমূহকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর দেবীর মন্দিরে গ্রামবাসীগণের সমাগম সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামের প্রবীণ ও ধার্ম্মিক লোক সকলও ভক্তিরসপূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ পিপাসায় পথক্লেশ ভুলিয়া পুণ্যাহ বিশেষে ও পার্ব্বণে দেবীর মন্দিরে সমাগত হইতে লাগিলেন কমলাকান্ত গায়ক ও সাধক, তাঁহার রচিত পদ সকল বিমল ও ভক্তি পূর্ণ, তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ ইত্যাদি তাঁহার সুনাম সত্বর চারিত হইতে লাগিল।

সংসার কি একটা বিচিত্র জিনিস। টানাটানি হ্যাঁচড়া হেঁচড়ী, মারামারী, কাঁদাকাঁদী কেমন একটা তাহার স্বভাব। কাহারও নিশ্চিন্ত নির্ব্বিঘ্নে, নির্ব্বিবাদে থাকিবার অধিকার নাই। যদি ভাগ্যক্রমে কখন উদারতা ও ঔদাস্য প্রযুক্ত একটু মনের আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি একটা বীভৎস

ব্যাপার আসিয়া মনের কাণে মন্ত্র করিতে থাকে, তাহাকেও সাদ মেধাবী মানব বধির হয়, মায়া আসিয়া তাহার মনকে টানাটানি করিতে থাকে। সে কখন পত্নী, কখন পিতা মাতা,—কখন পুত্র কন্যা হইয়া কত ভঙ্গি করিয়া তাহার কাছে আসিয়া তাহার চক্ষু উন্মিলিত করাইয়া তাহাদের দিকে নিরীক্ষণ করায় ও সুখ শান্তি নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। মহা সংযম ব্যতীত তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া বড় সুকঠিন। তাই দেখা যায়, শ্যাম ও কুল দুই রাখা বড় কঠিন। সংসারের ঐশ্বর্য্য সম্পদ, বিষয় ভোগ ও অহঙ্কারের পথ একদিকে, বৈরাগ্যের পথ অন্যদিকে। এক পথের সঙ্গী পত্নী পুত্র, পিতা, মাতা বন্ধু বান্ধব ধন পিপাসা। অন্য পথের সঙ্গী প্রেমানুরাগ, প্রেমালাপ। লক্ষ্য প্রেমলিপ্সা। স্বজনের বিনয় বাক্যে বধির, কাতর দৃষ্টিতে অন্ধ, উপভোগ পরমানন্দ। সাধক শেষোক্ত পথের পথিক। তাহার উপর বিবিধ অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল, তাঁহার মাতা সাংসারিক কার্য্যে অবহেলা পর্য্যন্ত যাহা অনিষ্ট ঘটিয়াছে নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্য ব্যতীত যে দিন যে কার্য্যে অকৃত কার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধকের সমক্ষে মাতার নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সাধক কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন ভাবিলেন, "উপায় কি করি, একদিকে হৃদয় বাসিনী অভয় বরদার সস্মিত বদনে কর্ম্মের নির্দ্দেশ, আত্মারামের তাহাতেই তৎপরতা অন্য দিকে দেবী স্বরূপিনী জননীর আজ্ঞা, সংসারের অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মে নিয়োগ, মাতৃ আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য, যথাসাধ্য গৃহকর্ম্ম করিব।" যিনি সকল কর্ম্মের বিধান কর্ত্তা তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। সাধক দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাতায়াত সংক্ষেপ করিলেন। কিন্তু মনের গতি, প্রাণের টান সেই সৎসঙ্গে, সদালাপে, দেবীর ধ্যানে, পরম বিদ্যার উপাসনায়। পরমা প্রকৃতির সেই হাস্য বদন, সেই প্রসন্ন ভাব সর্ব্বদা হৃদয়ে সন্দর্শন করিতে থাকেন। গমনে বন্ধুর ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি নাই। স্থাবর জঙ্গমে শ্যামাঙ্গিনীর প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন কিছুই দেখিতে পান না। সাধক অন্তর্দৃষ্টিতে হৃদয়পদ্মে মুক্তকেশীকে সন্দর্শন করিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে কর্ম্মের ভ্রম দেখিয়া মৃদুস্বরে গাহিতেছেন :—

মা! তব চরণাম্বুজে হেরিয়ে জীবন আছে।
নতুবা যাতনা যত ইথে কি মানব বাঁচে॥

জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন, বিরত থাকিতে প্রাণ অকৃতি বলিয়ে তারা
করতালি দিয়া নাচে।
কমলা কান্তের আর, কে আছে ভুবন মাঝে, আপনার বলিয়ে আনি,
যাব গো মা কার কাছে॥

সংসারের উপদ্রব হইতে দূরে থাকিব মনে করিলেই দূরে থাকা হায় না। ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া পরম সুকৃতির ফল। সেই সুকৃতি জীবন পটে অদৃশ্য ভাবে আসিয়া দৃশ্যমান ও কার্য্যকর হয়। পুরুষার্থ ও কৃতিত্ব অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া নয়ন আকর্ষণ করে। সাধকের সুকৃতি, অনুরাগ, প্রেম অকৃত্রিম। সাধক সেই সুকৃতি বলে সংসারের অভাব ও অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কমলাকান্তের জনৈক ধনাঢ্য শিষ্য তাঁহার সংসারের সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণের অঙ্গীকার।

আজ বৈশাখী সংক্রান্তি। ক্ষীরগ্রামে দেবী যোগাদ্যার উৎসব। ক্ষীরগ্রাম বর্দ্ধমানের উত্তর, কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী। ক্ষীরগ্রাম পীঠ স্থান, সতীর ছিন্ন অঙ্গ পতিত হইয়াছিল।

—•—

ক্রমশঃ

বিষাদ।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

(১)

বিষাদের সুরে টানা
গড়েছি বিষাদ বীণা
বিষাদের তার তার
সকল সে বিষাদের।

(২)

(আমি) বিষাদে উঠাব তান
বিষাদে গাহিব গান
বিষাদে মিলায়ে যাবে
বিষাদ বিষাদ সুরে॥

(৩)

আমার সে প্রতি অণু
বিষাদেরে দিয়েছিনু
বিষাদ আমার তায়
গড়েছে বিষাদ কায়॥

(৪)

বিষাদে জনম মোর
জীবনে বিষাদ ঘোর
রচি বিষাদ শ্মশান
যাচি বিষাদ মরণ॥

(৫)

বিষাদের রজ্জু দিয়া
বিষাদে বাঁধিবি হিয়া
বিষাদে টুটিয়ে যাবে
বিষাদে মরিব যবে॥

(৭)

হয়েছি বিষাদ কবি
সেজেছি বিষাদ ছবি
পেয়েছি বিষাদে মধু
গাহিব বিষাদ শুধু।

(৮)

আমার বিষাদ(ই) ভাল
বিষাদ আঁধারে আলো—
বিষাদ পরাণে মোর,
সে সুধার ধার।

(৯)

সুখতো মোহন বলে
ভুলায়ো কটাক্ষ ছলে
পাতিত করয়ে ধীরে
দুস্তর পঙ্কিল নীরে।

(১০)

বিষাদতো অবিরাম
শিখায় ভকতি প্রেম
অবিরল স্নেহ দানে
জাগায় চেতনা প্রাণে।

(১১)

তাই বলি বিভো মোরে
রাখিয়ো বিষাদ নীরে
হাসায়ো বিষাদ হানি
কাঁদায়ো বিষাদে বাণি!

(১২)

(আমি) বিষাদে উঠাব তান
বিষাদে গাহিব গান
বিষাদে মিলায়ে যাবে
বিষাদ—বিষাদ রবে।

———•———

কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

বি, এ, এল, এম, এস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

অথর্ব্ববেদ আয়ুর্ব্বেদের মূল। আয়ুর্ব্বেদের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অথর্ব্ববেদের অধ্যয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন, ইহা চিন্তা করিয়া কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ অসুস্থতা সত্ত্বেও পাঁচ ছয় বৎসর অহর্নিশ অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া সমগ্র অথর্ব্ববেদ ও তৎসহ ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন। কেবল অধ্যয়ন করিয়াই তিনি সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই, তাই উক্ত বেদদ্বয়ের টীকাদি-সহ অনুবাদ ও মুদ্রণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। এই কার্য্য অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ-বিধায়— এই অনুবাদ কেবল আংশিক মুদ্রিত হইয়াছিল মাত্র। তাঁহার দৈনিক

সংস্কৃতাভিজ্ঞতা ও বিশুদ্ধ অনুবাদ পরিদর্শন করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি বঙ্গের স্বনাম ধন্য পণ্ডিতগণ যে সকল অভিমত পত্র প্রদান করেন, তাহা পাঠ করিলে গোস্বামী মহাশয়ের বেদজ্ঞতা বিষয়ে কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে এইরূপ কয়েকখানি পত্রের সারাংশ মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম।

"... ... ... বর্ত্তমানে অনেক অনুবাদকের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই সকল অনুবাদকের প্রণীত অনুবাদ, অনেক স্থলে শব্দানুবাদ মাত্র,—অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু গোস্বামী মহোদয় প্রণীত অনুবাদ শব্দানুবাদ নহে। সম্পূর্ণ অর্থানুবাদ। এই অনুবাদ দ্বারা বেদের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। ... ..."

শ্রীকামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ।

"... ... ... গোস্বামী মহাশয়, কৃত বঙ্গানুবাদ বিশুদ্ধ ও অতি সরল; পাঠ করিলে উক্ত বেদের মর্ম্মার্থের সহজেই বোধ হইতে পারে। আমি বঙ্গানুবাদ কারীর পরিশ্রম অধ্যবসায় নৈপুণ্য ও বৈদিক সংস্কৃতাভিজ্ঞতা দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। ... ...।"

শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম।

গোস্বামী মহাশয় তাঁহার বেদের অনুবাদ সম্বন্ধে এই প্রকার অনেক অভিমত পত্র পাইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে—তাঁহার পাণ্ডিত্যে অতীব প্রীত হইয়া উক্ত পণ্ডিত মণ্ডলী কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথকে "আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাতীর্থ" ও "বিদ্যাবিনোদ" উপাধি প্রদান করেন। ইহার পর ১৯১৬ সালে ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে গোস্বামী মহাশয়কে "আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য" উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি নিজে কখনও স্বীয় গৌরব বর্দ্ধনার্থে উপাধির প্রভৃতির জন্য কোনদিন চেষ্টা করেন নাই। স্ব ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া কেহ কোনও অভিমত পত্র বা উপাধি প্রভৃতি প্রদান করিলে তিনি বিনীতভাবে গ্রহণ করিতেন মাত্র। ১৯১৮ সাল হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হইয়া যায়। তিনি নিজেই বেশ বুঝিয়া ছিলেন—তাঁহার ভগ্ন দেহের দ্বারা তাঁহার নীরব কর্ম্মের আর সুবিধা হইবে না। সে দেহের জীর্ণসংস্কারের জন্য অতি শীঘ্রই তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের সম্বন্ধে আরও অনেক

তত্ত্বগ্রন্থ প্রচার করিবার উদ্দেশ্য থাকায় এই দারুণ অসুস্থতার মধ্যেও তিনি অহর্নিশ পরিশ্রম করিয়া—এক সঙ্গে কতকগুলি পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করেন। বিলম্ব হইলে আর সে গুলি সমাপ্ত হইবে না, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া একসময়ে একখানি পুস্তকের পরিবর্ত্তে তিনি একযোগেই নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের চেষ্টা করেন। সুতরাং কোন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ ভাবে লেখা হয় নাই। সেই জন্য নিম্নলিখিত পুস্তক গুলির কতকাংশ মুদ্রিত বা অমুদ্রিত ভাবেই রহিয়া গিয়াছে,—যথা—

"The Biology of the Hindus" "বিজ্ঞান প্রবন্ধ" "প্রাণ বিদ্যা ও আয়ুর্ব্বেদ" "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস" "মসূরিকাধিকার" "যক্ষ্মাধিকার" "কুমারতন্ত্র" "ঋগ্বেদানুবাদ" ও "অথর্ব্ববেদানুবাদ" প্রভৃতি আরও কতক গুলি গ্রন্থ।

দিন দিন গোস্বামী মহাশয় ক্রমেই অধিকতর পীড়িত হইয়া পড়েন, তিনি বাটী হইতে আর বেশী বাহিরে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু এই অবস্থায়ও তাঁহার অধ্যয়ন স্পৃহা একটুও কমে নাই। শয্যার চতুঃপার্শ্বে পুস্তকের স্তূপ সাজাইয়া তিনি শয়ন বা সেই শয্যায় কখন উপবেশন করিয়া থাকিতেন। যখনই কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত—তখন প্রায় কখনও কখনও এক খানি গ্রন্থ বা লেখনীর সহিত তাঁহার হস্তকে কেহ নির্লিপ্ত থাকিতে দেখে নাই। তাঁহাকে দেখিলে সাধারণতঃ লোকে সুস্থ বলিয়াই মনে করিত। এই সময়ে তাঁহার চিকিৎসা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল ভারতের নানা স্থানে সুধীবৃন্দের নিকট বিশেষ আদৃত হইতে থাকে, অনেকেই গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্বের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দেশপূজ্য মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহোদয়—এই সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদ বিভাগের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিবার জন্য বলিতে আসেন। কিন্তু মালব্য মহোদয়—গোস্বামী মহাশয়ের শারীরিক অবস্থার বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার আরোগ্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। ইহার কয়েক মাস পরেই লাহোর সহরের নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য সম্মেলনী হইতে গোস্বামী মহাশয়কে সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তার প্রেরিত হয়। কিন্তু সে সময়ে তিনি

প্রায় শয্যাগত থাকায় উক্ত পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কেবল—"আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া তত্ত্ব" নামক একটী ইংরাজী ভাষায় লিখিত সারগর্ভ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ মাত্র সেই রুগ্নাবস্থাতেই লিখিয়া সম্মেলনীতে পঠিত হইবার জন্য প্রেরণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অসুস্থতার মধ্য দিয়া তাঁহার শেষ জীবনটির প্রায় সমুদয় অংশই অতিবাহিত হওয়ায় বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি সাংঘাতিক রূপে পীড়িত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তিনি কিঞ্চিদধিক এক মাস কাল জীবিত ছিলেন। এই সময়ে পারিবারিক বা অন্য বিষয়ক যাবতীয় চিন্তা সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া কেবল একমাত্র শ্রীভগবদ্‌চরণারবিন্দে চিত্তকে আকৃষ্ট করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমময় নাম ও লীলাদি শ্রবণ ব্যতীত আর কিছুই পছন্দ করিতেন না। 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠ করিতে বলিতেন ও তাহা শ্রবণ করিয়া কেবল নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেন। ব্যাধির যন্ত্রণা অসহ্য হইলেও—তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া প্রশান্তমনে তাহা সহ্য করিতেন। সময়ে সময়ে দেহ গেহাদির জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইত ও সেই সময়ে শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীভগবৎ লীলাদির কথা যেন স্বপ্নঘোরে বলিতেন, ১৩ই ফেব্রুয়ারীর প্রাতে, তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তিনি কেবল সেই দিনই জানাইলেন—আজ তাঁহার মহাপ্রস্থানের দিন। বেলা ৫৷৷০ টার সময় কিঞ্চিৎ ব্যস্তভাবে উঠিয়া শয্যার উপর যোগাসনের ন্যায় বসিলেন ও একখানি শ্লেটে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, গোবিন্দ গোপাল, হরে এই নাম কয়েকটি লিখিয়া কয়েক মিনিট পরেই দুই একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া সেইরূপ উপবিষ্ট ভাবেই দেহত্যাগ করিলেন,—মৃত্যুর পরে তাঁহার বদন মণ্ডলে স্নিগ্ধ শান্ত ও একটি পবিত্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীভগবৎ করুণার স্নিগ্ধালোকে নিজ জীবন বিকশিত করিয়া—নিষ্কলঙ্ক ও আদর্শ চরিত্রের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিয়া, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম মর্ত্তে সম্পন্ন করিয়া, ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার দয়াময়ের অনন্ত দয়ার রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তকে নিজ শ্রীচরণতলে আশ্রয় প্রদান করুন। আমরা তাঁহার পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করিয়া, আজ দুই বিন্দু বিষাদের অশ্রুর সহিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

সাধক-সঙ্গীত।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

পুনর্যাত্রা।

(রামপ্রসাদী সুর।)

কি লয়ে মন যাত্রা ক'রে
এসেছিলে ভবের বাসে।
হেথায় এসে কি করিলে,
(তোমার) পুনর্যাত্রা যে এ'ল ঘেঁসে॥
যাত্রাকালে দেখ'নি কি;
যোগিনী চক্রটী ক'সে।
(সে যে) মহামায়ার ফাঁদটী পেতে,
ছিল তোমার সাম্‌নে ব'সে॥
গ্রহ চক্রে জ্ঞান-গুরু তোমার
গোচরে ছিল দ্বাদশে।
(ছিল) অশুদ্ধ সে কর্ম্ম-চন্দ্র,
ভক্তি-তারা ভাগ্যাকাশে॥
তার(ই) ফলে ভাল মন্দ
বুঝ্‌লেনা মন্ মোহের বসে।
তুমি মজিলে সে, "পয়োমুখ
বিষকুম্ভ" বিষয় রসে॥
আত্ম কর্ম্ম গেলে ভুলে
মত্ত হলে রসোল্লাসে।
ভাব্‌লে মিত্র, স্বপ্নচিত্র—
অর্থ দারা অপত্য সে॥
দেখ্‌তে দেখ্‌তে অজপা যে,
(তোমার) ফুরাইলে শ্বাসে শ্বাসে।

আসল কাজে শূন্য দিলে
এ কূল ওকূল গেল ফেঁসে ॥
কালের হাতে প'ড়্বে তুমি.
জেন'রে মন এক নিমেষে।
(তোমার) বিষয় বিলাস ঘুচা'য়ে সে,
আছ্ড়ে ফেল্বে আর এক দেশে ॥
(তুমি) রথী হ'য়ে যে রথে মন
এসেছিলে এই পোড়া দেশে।
ভূতের গড়া সে রথখানাও
ভঙ্গবে শমন বিষম রোষে ॥
(তখন) লোকে দেখ্বে পুনর্যাত্রা,
(তোমার) পুনর্যাত্রা নহেত সে।
কর্ম্ম ফলের ভোগের ধারা,
জন্ম মরণ যাতনা সে ॥
মনে ভেবে দেখ'রে মন
(তোমার) মূলে জন্ম "ব্রহ্ম" দেশে।
(যদি) ফিরে যেতে পার' সেথায়,
পুনর্যাত্রা বলি তো সে ॥
সে সাধ যদি থাকে তোমার,
(তবে) আত্মতত্ত্ব-রথে ব'সে।
কৃষ্ণেরে সারথি ক'রে,
যাত্রা করা তার উদ্দেশে ॥
অধম শ্রীপদ বলে,
(তায়) ঘুর্বে না আর দেশ বিদেশে।
এ যাত্রাতেই পুনর্যাত্রা
সিদ্ধ হবে অনায়াসে ॥

গদা।

(গল্প)

লেখক,—সাহিত্য-রত্ন শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

"অকাল মেঘবদ্বিত্তমকস্মাদেতি যাতি চ।"

(১)

"কিং জীবিতেন পুরুষস্য নিরক্ষরেণ"—"মূর্খ ব্যক্তির জীবনে কি কাজ? তোর কিছু হবেনা,—তুই কুপুত্র, তুই বাড়া হইতে দূর হ—আজই দূর হ—এখনই দূর হ—যে দিকে তোর চোখ যায়, সে দিকে চলে যা। মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা—আমি মাত্র বারটী টাকা মাইনে পাই, এর মধ্যে কত কষ্টে যে আট দশজন পোষ্য প্রতিপালন করি,—তা ভগবান্‌ই জানেন। একটু পুরোহিতের ব্যবসা আছে তাই কলাটা মূলাটা খেয়ে কোন রকমে সংসার চালেই—তুই নির্ব্বংশের বেটা পড়া শুনা কিছুই কর্ব্বি না—কেবল ইয়ার্কি ক'রে বেড়াবি, আজ তিন বৎসর ফাষ্ট কেলাসে পড়্ছিস্ তবুও টেষ্ট্ পরীক্ষায় চার ব্রাঞ্চেই ফেল হলি—তুই বাড়ী থেকে দূর হ।"

গদাধর বাপের ঐ তিরস্কার গুলি চুপ করিয়া শুনিয়া মুখখানা আঁধার ক'রে মাথাটী নীচু করে সেখান থেকে চলে গেল।

গদা ভাবিল,—যদি কোন দিন অর্থ উপায় কর্‌তে পারি, তবেই আবার এই কাঞ্চন নগরে ফির্‌বো নচেৎ আমার আজকার যাত্রাই অগস্ত্য যাত্রায় পরিণত হইবে। বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, পিতৃ স্নেহ, মাতৃ স্নেহ, ভ্রাতৃ স্নেহ, দাম্পত্য প্রণয়, এ সব কিছুই নহে, এ সব ভাষার ছটা, কবির কল্পনা, বৃথা আড়ম্বর—ফাঁকা আওয়াজ, সংসার চক্র ঘুরাইবার তৈল বিশেষ। মাতা পিতা মিষ্টকথা মাখা স্নেহের একটু তৈল ঢালিয়া দেন, আর পুত্ররূপ চক্রবেশ ঘুরিতে থাকে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া টাকা আনিয়া তাঁদের অভাব মোচন করে; স্ত্রী একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া দুটো প্রণয়ের কথারূপ একটু তেল ঢালিয়া দেন, আর পতিরূপ চাকা বেশ ঘুরিতে থাকে, ঘুরিয় ঘুরিয়া টাকা আনিয়া পত্নীর অভাব দূর করে—তেল যত দিবে, চাকা তত ঘুরিবে। তেল কম হইলেই পুত্র চাকা, পতি চাকা প্রভৃতি সংসারের কোন চক্রই ভাল ঘুরিবে না—বিশৃঙ্খল হইবে

কলহ ও মনোমালিন্যের একটা জাম ধরিয়া উঠিবে। তাই দেখ্‌ছি—অর্থস্য পুরুষো দাসঃ। দেখ্‌ছি ঐহিক জীবনের মূল পদার্থই অর্থ।

এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে গদা ঘরে গিয়া একটা আধ ময়লা জামা গায়ে দিয়া বৈকালে একটু বেড়াইতে বাহির হইল। ভাবিল,—জন্মভূমি কাঞ্চন নগর ত্যাগ করিয়া যাইব, বিরাট জগতের সুবিশাল কর্ম্মভূমির মধ্যে ভোরেই যাইয়া উঠিব, কে জানে আবার ফিরিব কিনা, আজ একটু ভাল করিয়া জন্মভূমির উপর বেড়াইয়া যাই।

(২)

কাঞ্চন নগর নদীয়া জেলার মধ্যে একটী গণ্ডগ্রাম। এই গ্রাম খানির পশ্চিম দিক দিয়া কুমার নদ প্রবাহিত। হেমন্ত কাল; নদীর জল প্রসন্ন হইয়া আসিয়াছে, গ্রামের দক্ষিণে নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষ এখনও নীলকরদিগের স্মৃতি বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুঠীর ভগ্ন, ইষ্টকস্তূপ কতকটা জলের ভিতরে গিয়ে পড়েছে, কতকটা স্থলের উপরে আছে। স্বচ্ছ সলিল, কুল কুল শব্দ করিয়া চলিয়াছে, মনে হইতেছে,—যেন এই নীলকরের প্রভাবের মত সবই অনিত্য, এই কথাই ঐ কুল কুল সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইতেছে।

একখানি ইষ্টক স্তূপের উপরে গদা উপবিষ্ট! ধীরে ধীরে দিনমণি পশ্চিমে ডুবিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে সাঁজের পাতলা পাতলা আঁধার নামিয়া আসিতে লাগিল। কুমারের অপর তটবিসর্পী গ্রামের কৃষক ললনাগণ দুই চারিজন করিয়া জলে নামিয়া কত রকম গল্প গুজব করিতে করিতে গা ধুইতে লাগিল। ক্রমে অন্ধকার বেশ একটু ঘন হইয়া আসিল, তখন গদার চৈতন্য হইল। গদা এতক্ষণ একটী ভাবুকের মত বসিয়া ছিল। গদা দুরন্ত ছেলে, সে দু'দণ্ড কখন স্থির হইয়া ভাবে নাই। আজ সে শান্ত সুধীর; আজ সে দার্শনিকের মত ভাবছে। পাঠক ইহার কারণ কি বুঝাইয়া দিতে হইবে? মানুষ যখনই একটা মতলব আঁটে—যখনই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আশ্রয় লইয়া শুভ হউক, আর অশুভ হউক একটা সংকল্প করিয়া বসে, তখন সে বাহ্যতঃ একটু স্থির হয়। অন্তরে ভাবের বন্যা বহিয়া গেলে বাহিরের মূর্ত্তি স্থির ধীর হইয়া আইসে।

স্থির অচঞ্চল মূর্ত্তিতে গদাধর বাড়ী ফিরিল। লক্ষ্মী ছেলের মত দুটী ভাত খাইয়া, আধ ময়লা একটী জামা গায়ে দিয়া, আধ ময়লা একখানি উড়ানি লইয়া গ্রামের ভিতরে একজন বন্ধুর বাড়ীতে শয়ন করিতে গেল।

পদ্মলোচন শিরোমণির অবস্থা খুবই খারাপ—মাসে গ্রাম্য স্কুলে চাকুরী করিয়া বারটী টাকা পাইতেন। তাহার মধ্যে ঘর দোর করা বড়ই কঠিন। তাই ছেলে পুলে গুলি গ্রামের মধ্যেই এর বাড়ী ওর বাড়ী শুইত। পল্লীগ্রামে এরূপ সুবিধা এখনও আছে। কেহ তাহাতে বিরক্ত বোধ করে না। এ ওর বাড়ীতে খাচ্ছে, ও এর বাড়ীতে খাচ্ছে, এক বাড়ীর ছেলে যেন সকল বাড়ীরই ছেলে! সহরের লোকে এই প্রাণ খোলা ভাবের আস্বাদ পায় না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, পল্লীতে সচ্ছলতা আর শহরে অসচ্ছলতা। সহরে আলো-বাতাস-জল, যাহা ভগবান দত্ত বস্তু, তাহাও কিনিতে হয়, পল্লীতে তাহা পর্য্যাপ্ত। সহরের সবই কৃত্রিম, পল্লীতে সবই স্বাভাবিক। সহরের মেয়েরা গলা সাধিয়া সাধিয়া স্বর মিহি করে, স্বরের মধ্যে সুর মিশানো—একটা সা, রে, গা, মা—সাধার মত প্লুত ভঙ্গি করিয়া কথা বলে, সহরের মেয়েরা একটা ভঙ্গিতে দাঁড়ায়, একটা ভঙ্গিতে চলে, সহরের পুরুষ গুলো কথা বলে, তার মধ্যেও যেন একটা মাপা-জোপা আছে, একটা লেন্-দেনের হিসাব নিকাশ আছে, একটা লাভ লোকসানের খতিয়ান জমা খরচ আছে, সহরে বন্ধুগুলোর বন্ধুত্বের মধ্যে যেন একটা দোকানদারি—একটা লুকোচুরী, একটা আলো-আঁধারা ভাব, একটা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ, একটা আমি-বড়-তুমি-ছোট ভাব থাকে, পল্লীগ্রামে সে সব উৎপাত বিড়ম্বনা অসরল ভাব নাই। পল্লীগ্রাম সরল, উদার, বিশ্বপ্রেমিক; আর সহর কুটিল, অনুদার, আত্মসর্ব্বস্ব। তাই পদ্মলোচন শিরোমনির বাড়ীতে দু-খানি খড়ের ঘর হইলেও পরের বাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াই তাঁর ছেলে পুলে গুলি মানুষ হইতে ছিল। তাহাতে কোনরূপ অসুবিধা ছিলনা।

শুইতে যাইবার সময় গদা যে তার ময়লা উত্তরীয় খানি লইয়া গিয়াছে, তা তার পিতা মাতা কেহই লক্ষ্য করেন নাই।

পদ্মলোচন শিরোমনি গদাকে বৈকালের পূর্ব্বে ভৎর্সনা করিয়া ছিলেন বলিয়া যে চটিয়াই আছেন, তাহাও নহে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের রাগ খড়ের আগুণের মত, দপ্ করে জ্বলে উঠে, আবার তখনই নিভে যায়। লোকে বলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের রাগ কাছায় থাকে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ খুব চটেছে, যেই কাছাটা খুলিয়া একবার ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পরে, অমনি সব ঠাণ্ডা! তা'ছাড়া পদ্মলোচন শিরোমণি মাটীর মানুষ; ত্রি-সন্ধ্যা করেন, অতি প্রত্যুষে উঠেন,

স্ব হস্তে গো-সেবা করেন, ঘর গৃহস্থালির কাজ কর্ম্ম যতদূর পারেন সবই নিজের হাতে করেন। অবসর মত বৈকালে কখন কখন গ্রাম্য মজলিস্ কামার-দোকানে বসিয়া দাবা খেলা করেন! শিরোমণি মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত; তাঁর একটী মুদ্রাদোষ আছে। সেটী—"বুঝ্‌লে কিনা?" কথা বলিবার সময় প্রায় প্রতি কথার পরেই একটি করিয়া "বুঝ্‌লে কিনা?র" ক্রপ্ হইতে থাকে। এই "বুঝ্‌লে কিনা?র" ঘন বর্ষণে শ্রোতার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। তাই, ছেলেরা তাঁকে দেখ্‌লেই দূরে থেকে বলাবলি করিত—ঐ যে, "বুঝ্‌লে কিনা" আস্‌ছেন। ঐ টিপ্পনী যদি তাঁর কাণে কোন রূপে পঁহুছিত তাহা হইলে দন্তহীন হইলেও বত্রিশটী দন্ত বাহির করিয়া ধৃষ্ট-বালকগণের প্রতি তিনি সরোষে হুঙ্কার ছাড়িতেন। বালকগণ তখন রৌদ্র, বীভৎস হাস্য তিনটী রসের প্লাবনে সা করিয়া অন্তর্হিত হইয়া পড়িত।

পদ্মলোচন শিরোমণির যেমন ঐ "বুঝ্‌লে কিনা?" মুদ্রাদোষ ছিল, অনুসন্ধান করিয়া দেখ্‌লে ঐ রকম দোষ অনেকেরই পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও "তা বটেই তো" আছে; কেহ কেহ "যদি স্যাৎ" বলেন, এইরূপ "বুঝ্‌ছ," "মনে কর," "হ্যান ত্যান সাত সতের," "এক কালীন্" প্রভৃতি অনেক মুদ্রাদোষ আছে। এই সব মুদ্রাদোষের মধ্যে সব চেয়ে উপকারে লাগে—এই "ইয়ে" কথাটী। তোমার কোন একটা কথা হয় তো স্মরণ হচ্ছে না, তখন একটা "ইয়ে" বলে নিয়ে তুমি চার দণ্ড ভাবিয়া লইতে পার। শ্রোতা ঐ "ইয়ে"র মোহে মুগ্ধ হইয়া বেশ খানিকটা সময় অপেক্ষা কর্‌বে। ততক্ষণ তুমিও সাম্‌লে নিয়ে আবার আরম্ভ কর্‌তে পার। আবার আট্‌কাইলে, পুনরায় একটা "ইয়ে" ক্রপ কর! ঐ "ইয়ে" এবং গুটী কতক মুদ্রাদোষের ব্যবহারে গল্প বেশ গুল্‌জার হ'য়ে জমিয়ে উঠ্‌বে।

তাই বল্‌ছিলাম—গদা যে উড়ানি খানাও শুইবার সময় বাড়ী থেকে ল'য়ে গিয়েছিল, তা সরল প্রকৃতি পদ্মলোচন বা বাড়ীর অন্য কেহই সেটা লক্ষ্য করেন নাই।

(৩)

উৎকণ্ঠা থাক্‌লে শীঘ্রই ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাই, রাত্রি ৪টার সময় গদার ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাতমুখ ধুয়ে, শৌচাদি শেষ করে, গদা বিনা সম্বলে কাহা-

কেও কিছু না বলিয়া গৃহের বাহির হইয়া পড়িল। অল্প সময়ের মধ্যেই কাঞ্চন নগরের বাহিরে উপস্থিত। তখন গ্রাম্য কুকুরের দুই একটা উচ্চ রব, দুই একটা মোরগের ডাক, শুনা যাইতেছিল; ক্রমে কোকিলের ঝঙ্কার, পাপীয়ার পিয়া পিয়া তান, বায়সের কা—কা, এবং অন্যান্য বিহগকুলের কল কল কাকলি বিটপী বহুল লোকালয় হইতে লহরী তুলিয়া নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দিল। গদা ষ্টেশন অভিমুখে চলিয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের শীতল সমীরে তার প্রাণে যেন স্বর্গীয় সজীবতা আনিয়া দিতে ছিল; পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করিয়া তরুণ অরুণ রশ্মি দিনমণির আগমনের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে গদার মনেও একটা আশার নবীন রাগ ফুটিয়া উঠিল।

গদা মনে করিল—রেলের ভাড়া নাই, তথাচ ষ্টেশনে চলিতেছি। দেখা যাউক, ভগবান্ কি করেন! শুনিয়াছি, মুর্শিদাবাদ জেলায় পাটিকাবাটী নামক স্থানে আর্চ্চি হীল্ থাকেন। শুনিয়াছি, তার অধীনে আমার দাদা মহাশয় কুঠীতে চাকরী করিতেন। শুনিয়াছি—সাহেবেরা বিশ্বাসী চাকরের আত্মীয় স্বজন পাইলে আনন্দের সঙ্গে চাকরি দিয়া থাকেন। বাস্, ভাগ্য পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে সেখানেই যাওয়া যাউক। রেলের মাশুল নাই; নাই, তার কি হবে? বাস্ রেলের ধার দিয়া ধার দিয়া হাটিয়া যাইব, যত দিনে হয়, এক দিন না একদিন হিলের কাছে পঁহুছাইবই। ব্রাহ্মণের ছেলে তো বটে, চোর দস্যুও নাহি, খিদে পেলে কোন ভদ্রলোকের কাছে যাইয়া অতিথি হইব, রাত্রি হইলে কোন গ্রামে, কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে অবশ্যই একটু আশ্রয় পাইব। কেন যাইতে পারিব না, অবশ্যই পারিব।

এইরূপ স্থির করিয়া গদা ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। ঠিক তখনই কলিকাতা হইতে একখানা ট্রেণ আসিয়া পঁহুছিল। গদা ভাবিল,—দেখা যাউক, আমাদের গ্রামের কেহ এই ট্রেণে এসেছে কিনা। দেখিল—তার একজন সহাধ্যায়ী নামিয়াছে! সহাধ্যয়ীটি অন্য গ্রামের হইলেও গদার সঙ্গে কাঞ্চন নগরের হাই স্কুলে পড়িত; জাতিতে সাহা—বেশ অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে। স্কুলে গদার সঙ্গে বেশ ভাব ছিল। নাম নরেশ।

গদাকে দেখিয়াই বলিল,—হ্যালো, ডিয়ার গদা! এখানে এ মলিন বেশে কেন ভাই? গদা বলিল,—মুর্শিদাবাদে একটী চাকুরীর চেষ্টায় যাচ্ছি।

নরেশ। এখন তো ট্রেণ নাই; তবে এ অসময়ে বোকার মত, নিতান্ত সেকেলে বাঙ্গালগুলোর মত, বা টীকিধারী উত্তর পূর্ব্ব জ্ঞান বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতের মত এসে পড়েছ কেন? হাঁ, হাঁ, হবে না কেন? আরে তুমি যে শিরোমণি মশায়ের ছেলে, তোমার তো একটু টীকির গুণ থাকা চাই। ঠিক্ ঠিক্, তাই একটু সৃষ্টিছাড়া রকমেই এসেছ; কেমন?

গদা। না—হে—না; তুমি এক নিশ্বাসে ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ করে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি! আগে আমার এজাহারটা শোন তারপর তো রায় দেবে? আমি বরাবর রেল লাইন ধরিয়া পদব্রজে যাইতে কৃতসংকল্প। তাই সকাল সকাল এসেছি।

নরেশ। সে কি। রেল কোম্পানীর উপর এত নির্দ্দয় কেন? এমন ধনুর্ভাঙ্গা পণের কারণ কি ভাই?

গদা চুপ করিল।

নরেশ চতুর ছোক্‌রা; গদার মুখ দেখিয়াই সব বুঝিতে পারিল। বলিল, "—দাদা, আমাকে যে তুমি সহোদরের মত ভালবাসো—আজ সঙ্কুচিত কেন? আমি সবই বুঝিয়াছি—আমি আর কিছু শুন্‌তে চাই না। ভগবান্ তোমাকে নিশ্চয়ই সুখী কর্‌বেন—আমায় মাঝে মাঝে পত্র লিখিও—যার এমন দৃঢ় সংকল্প ভগবান্ নিশ্চয়ই তার সহায় হন।" এই বলিয়া নরেশ গদার পকেটের মধ্যে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বিলম্ব না করিয়াই চলিয়া গেল। আর বলিয়া গেল—যখনই অভাবে পড়িবে আমায় পত্র লিখিও।

গদা অপ্রত্যাশিত ভাবে সহাধ্যায়ীর নিকট এইরূপে দশটী টাকা সাহায্য পাইয়া ভাবিল, ভগবান্ তুমি সত্যই আছ, বাস্তবিকই তুমি দুর্ব্বলের বল, দীনের আশ্রয়। তুমি পদে পদে জীবের কল্যাণ সাধন করিয়া তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছ!

যথা সময়ে ট্রেণ আসিলে গদা সোৎসাহে গাড়ীতে আরোহণ করিল। আরোহীদের সঙ্গে নানারূপ গল্প স্বল্প করিতে করিতে চলিল।

(৪)

আর্চ্চি হীল্। টোমার নিবাস কোন্ থানে আছে?

গদা। কাঞ্চন নগর।

হীল। গুড্ হেভ্‌ন্‌স্—কাঞ্চন্ নগার্, হ্যালো টুমি জগ্‌ডীশ্ মুখার্জ্জিকে জানে?

গদা। তিনি আমার দাদা মশায়।

হীল। ও! টা হ'লে টুমি হামার নাটি আছে। ভেরি গুড্—হামারা পাছ রহো যেত্‌না রোজ টোমারা খুসী।

হিল্ সাহেব তখন মেমের কাছে গদাকে পরিচয় করিয়া দিয়া বলিলেন,—"এটা কাঞ্চন নগরে জগদীশ মুখুজ্জের নাতি। জগদীশ আমার প্রিয় কর্ম্মচারী ছিল। তা হইলে এই ছোকরা আমাদের নাতি হইল। একে বিশেষ যত্ন করিয়া রাখ। এর বেশ ভূষা ময়লা দেখ্‌ছি; বোধ হয় কষ্টে প'ড়েছে। এখনই এর পোষাক পরিচ্ছদের ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দাও।"

হিলের স্ত্রীও অতি সুশীলা ও স্নেহ পরায়ণা। তখনই চাকরের দ্বারা গদার ভাল কাপড় চোপড়, ভাল ভাল কোট প্যাণ্টালুন, ওয়েষ্ট কোট নেকটাই গ্যালিস্ প্রভৃতি সাহেবী ড্রেস ও একসুট বাঙ্গালী ড্রেস আনাইয়া দিলেন। শুইবার একটা সুরম্য প্রকোষ্ঠ ঠিক করিয়া দিলেন।

গদা মুহূর্ত্তের মধ্যে সাহেবী পোষাকে সাহেব হইল! ময়লা কাপড় পরা ন্যাষ্টি গদা এখন হ্যাট্ কোট্-প্যাণ্ট—বুট সজ্জিত সাহেব! বলিহারি ভাগ্যের পরিবর্ত্তন!

বয়সের অনুপাতে গদার শরীর বেঁটে। তাকে দেখ্‌লে খুব ছেলে মানুষ বলেই মনে হইত। তাই হীল্ ও তাঁর পত্নী তাকে ছেলে মানুষ মনে করিয়া খুব স্নেহের চোখে দেখ্‌তেন, যথেষ্ট ভাল বাসিতেন।

বেঁটে মানুষ গুলো বাঙ্গালী সমাজে এইরূপ একটা মস্ত বড় সুবিধে পেয়ে বসে। বাইশ বছরে ম্যাট্রিকিউলেসন পাশ ক'রেও ধন্যি ধন্যি সুখ্যাতি। লোকে গুজরাটি এলাচির দেহ দেখে মনে ক'রে বসে—বাঃ একটুখানি এক রত্তি ছেলে, কেমন সুন্দর পাশ করেছে। আবার বেঁটেরাও ঐ সুখ্যাতি ভোগ করে করে ভারি মজা পায়, কেউ বয়স জিজ্ঞাসা করলে অবাধে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে বসে আমার বয়স সতের বৎসর।

গদা আর্চ্চি হীলের কাছে বেশ সুখে আছে। তার নাম যে গদা, তা অল্প সময়ের মধ্যেই হীল ও হীলপত্নী জানিতে পারিয়া ছিলেন। তাঁরা তাকে—গডা, গডা বলিয়া ডাকিতেন। গদাকে কাছে বসাইয়া গল্প স্বল্প করিতেন, হাসি কৌতুক করিতেন; গদাও হীলের বড় বড় আরবদেশীয় ঘোড়ায় চড়িত, হীলের বন্দুক লইয়া পাখী শীকার করিত। হীলের দুই তিনটী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ছিল—তাহাদিগকে বাঙ্গালা পড়াইত। এইরূপে থাকিতে থাকিতে

গদা একজন পাকা ঘোড়-সোয়ার হইল; শিকার করা, সাহেব জাতির সঙ্গে অনর্গল ইংরেজি বলিতে পারা, তাদের দুর্ব্বোধ্য অস্পষ্ট কথা বুঝিতে পারা, এতগুলি ব্যাপারে সে পাকা ওস্তাদ হইয়া উঠিল।

পাড়া গাঁয়ের ছেলেরা বেশ লেখা পড়া শেখে, কিন্তু তাদের মুখ হয় না। লিখ্‌তে দাও বেশ সুন্দর ইংরেজি লিখ্‌বে কিন্তু আদৌ বল্‌তে পারে না। ইহার কারণ পাড়াগাঁয়ে ইংরেজী কেহই বলে না—কেহ বলিলেও সেকেলে বুড়োরা বিদ্রূপ করে। তাই না বলে বলে, আর না শুনে শুনে, ইংরেজি বল্‌বার বৃত্তিটা একদম ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীর হাতের মত শুকিয়ে যায়। আর আম কাঁঠালের বাগান ও খুড়ী মামী—পিসি দিদির কাছ ছেড়ে সে বৈদ্যুতিক আলোকোদ্ভাষিত "হলে" কোন সাহেব পুঙ্গবের "খমা," "খ্যারাক্‌টার," "খাম," "ভেন্" প্রভৃতি উচ্চারণ ভঙ্গি শুন্‌লে কিছুতেই ঐ কথাগুলি ধরিয়া লইতে পারে না। যতবড় ভাল ছেলেই হউক প্রথম প্রথম তাকে থতমত খাইতেই হয়। তাই প্রতিযোগী পরীক্ষায় ডিক্‌টেশনের বেলায় অনেক ছেলেকেই ফেল হইতে হয়। তাই বলিতেছি, গদার আর এ অসুবিধা রহিল না! সাহেবের কথা যত অস্পষ্টই হউক, গদা তাহা বেশ বুঝিতে শিখিল। সাহেবের সঙ্গে মিশিবার মস্ত বড় অসুবিধা দূর হইল। এইরূপে গদার ভাবী জীবনের পথ পরিষ্কৃত হইল।

পদ্মলোচন শিরোমণি গোঁড়া ব্রাহ্মণ; ত্রি-সন্ধ্যা না করিয়া জল হগ্রণ করিতেন না। তাঁর পুত্র গদা ঘোর সাহেব। শুধু পোষাক পরিচ্ছদে সাহেব নয়, পান ভোজনেও সাহেব। সাহেবের বাবুর্চ্চি যাহা রাঁধিত গদা অবাধে, বিনা ওজরে, তাহা গলাধঃকরণ করিত। অ-ব্রাহ্মণের হাতে অ-খাদ্য খেয়ে গদার জীবন কাটিতে লাগিল। গদা ইহাতে দৃক্‌পাত করিল না। সে জানে—অর্থই ঐহিক জীবনের সার বস্তু; জাতি দিয়া হউক, ধর্ম্ম দিয়া হউক, যেমন করিয়াই হউক, অর্থ উপার্জ্জন করিতেই হইবে। গদার নিকটে অর্থই একমাত্র উপাস্য দেবতা।

(৫)

হীল পত্নীকে গদা একদিন বলিল,—"আমি এমন করিয়া আর কত দিন আপনাদের অন্ন ধ্বংস করব? আমার বল্‌তে কেমন লজ্জা করে, মিঃ হীলকে বলে আমার কোন স্থানে একটা চাকুরী করে দেন ত বড়ই উপকার হয়।"

হীল-পত্নী সস্নেহে বলিলেন,—"তার জন্য ভাবনা কি গদা? আমি আজই তাঁকে বলিব। গবর্ণমেণ্টের কাছে মিঃ হীলের খুব খাতির আছে। উনি সুপারিশ কর্‌লে তোমার ভাল চাকুরির অভাব কি?"

হীল-পত্নী সেই দিনই মিঃ হীলকে গদার প্রার্থনা জানাইয়া একটু জিদ্ করিয়া ধরিলেন। সেই সময় শিমলা পাহাড়ে জরিপ বিভাগে একটা চাকুরী খালি ছিল। হীলের সুপারিশ লইয়া গদা হীল ও হীল-পত্নীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

স্নেহের এমনই প্রভাব যে, হীল ও হীল-পত্নী ভিন্ন জাতীয় লোক হইলেও গদাকে বিদায় দেওয়ার সময় তাঁরা কষ্ট অনুভব করিলেন। গদাকে পোষাক পরিচ্ছদ বিদেশ ভ্রমণোপযোগী আসবাব পত্র ও যথেষ্ট টাকা কড়ি দিয়া বিদায় দিলেন।

গদা শিমলা শৈলে মিঃ হীলের সুপারিশ লইয়া উপস্থিত হইবামাত্রই তার চাকুরী হইল।

চাকুরির প্রথম দিন কতকগুলি ভাল ভাল পাকা লোকের সঙ্গে জরিপ করিয়া বেড়াইতে হইবে। গদা ভাবিয়া ছিল—পিঃ ঘোষের পাটিগণিতে ত দৈর্ঘ্য প্রস্থ গুণ করিলেই বর্গ বাহির হয়, জানিয়াছি, তবে জরিপ করা আর কঠিন ব্যাপার কি? চট্ করিয়া গুণ করিব, আর বর্গ বাহির হইয়া পড়িবে! এ কেন পারব না? খুব পার্ব্বো। এই বিশ্বাসেই গদা চাকুরী লইয়া শিমলা শৈলে গিয়াছিল।

জরিপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম দিনেই যখন গদা জরিপের শিকল ধরিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই দলের অন্যান্য পাকা লোকগুলা হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গদা জিজ্ঞাসা করিল,—"হাস্‌ছেন কেন?" তাঁরা বলিল,—"বাহাদুর ছোকরা! জরিপের "জ" জান না, অথচ মস্ত বড় সুপারিশ সংগ্রহ করিয়া একটা বড় চাকুরী হাত করিয়াছ! বেশ চতুর বটে!"

"যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে"র মত এতক্ষণ বড় একটা মুরুব্বি সেজে থাক্‌লেও শিকল হাতে কর্‌তেই গদার বিদ্যা বুদ্ধি ধরা পড়ে গেল। গদা অপ্রতিভ হ'ল না। সে অপ্রতিভ হইবার ছেলে নহে। গদাও সঙ্গীদের সঙ্গে সমান হেসে বল্‌লে—ভাই! আমি খুব ভাল সত্যিই জানি না। তোমরা অনুগ্রহ করে আমায় একটু শিখিয়ে পড়িয়ে দাও।"

গদা মিঃ হীলের লোক; তাকে কিছু জানে না বলে চুকলী কেটে তাড়ানো সহজ নহে; তাই সঙ্গীরা তাড়ানর কল্পনা ত্যাগ করলে, পরন্তু বেঁটে গদাকে সকলেই ছেলে মানুষ মনে করে একটু স্নেহের চোখে দেখিল। তা ছাড়া যে বিনীত হয় সকলেই তাকে ভালবাসে। গদা বিনীতভাবে তাদের আনুকূল্য প্রার্থনা করায় সকলেই তাকে জরিপের কাজ শিখাইতে লাগিল।

সেই সিমলা শৈলে গদার চাকুরী ও জরিপ শিক্ষা দুইই হইতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই হাতে কলমে গদা জরিপের কাজ বেশ শিখিয়া ফেলিল। গদার বেতন হইল দেড় শত টাকা।

(৬)

পাঠক! চল আমরা একবার গদার জন্মভূমি সেই কাঞ্চন নগরে যাই। গদা বাড়ী হইতে রাত্রে শুইতে গেল, তা তোমরা শুনিয়াছ। পর দিন আহারের সময় গদা যখন বাড়ী আসিল না, তখন গদার জননী মোক্ষদা ঠাকুরাণী অস্থিরা হইয়া পড়িলেন। কু-পুত্র হইলেও, কু-মাতা কখনই হয় না। স্বামী পদ্মলোচনকে বলিলেন, "তুমি কাল বাছাকে রাগান্ধ হয়ে তিরস্কার করেছ, তাই সে মনের কষ্টে কোথায় চলে গেল! বিয়ে হওয়া ছেলে, মনে ঘেন্না হয়েছে এখন কি আর অমন ক'রে বকে? দেখ দেখি এখন ছেলে কোথায় গেল, এখন কি করি?"

পদ্মলোচন। আরে বুঝ্‌লে কিনা? রাগ কর না লক্ষ্মী! বুঝ্‌লে কিনা কোথায় আর যাবে, বলি, বুঝ্‌লে কিনা, দুই এক দিনের মধ্যেই আবার বাড়ী ফিরে আস্‌বে, বল্‌ছি কথাটা বুঝ্‌লে কিনা?

মোক্ষদা। বাছা এক কাপড়ে গেল, একটা পয়সা হাতে নেই—কে আছে, কার কাছে যাবে, কোথায় খাবে? তোমাকে বাহাত্তরে ধরেছে—তুমিই বলে থাক ষোল বছর পেরিয়ে গেলে ছেলের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন কর্‌তে নেই, আবার তুমিই তার ঘাড়ে চেপে যা'ইচ্ছে তাই বল্‌লে!

পদ্মলোচন। আরে বুঝ্‌লে কিনা—বলি বুঝ্‌লে কিনা—

মোক্ষদা। বুঝ্‌ব কি আমার মাথামুণ্ডু? ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়ে এখন কেবল বুঝ্‌লে কিনা!

পদ্মলোচন। তুমি ভেবো না, বুঝ্‌লে কিনা। আমি এদিক্ ওদিক্ সংবাদ পাঠাচ্ছি বুঝ্‌লে কিনা। গদা আমার সাহসী ছেলে, বুঝ্‌লে কিনা—তার জন্য ভাবনা নাই।

স্বামীর উপর অভিমান করিয়া, তাঁহার অশান্তি ঘটান বৃথা মনে করিয়া, মোক্ষদা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সংসারের কাজে মনোনিবেশ করিলেন। পরে দুই চার দিনের মধ্যেই তাঁরা মিঃ হীলের পত্র পাইলেন। গদা তিরস্কৃত হইয়া অভিমান ভরে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, সংসার অভিজ্ঞ বৃদ্ধ হীল অল্প সময়ের মধ্যেই জানিতে পারিয়া তিনি পদ্মলোচনকে তার কুশল সংবাদ লেখেন। তদবধি পদ্মলোচন ও মোক্ষদা ঠাকুরাণীর আর কোন দুশ্চিন্তা ছিল না।

সিমলা শৈলে চাকুরী হইবার পর হইতেই গদা পিতাকে মাসে মাসে যথেষ্ট টাকা পাঠাইতে লাগিল। পদ্মলোচনের অবস্থা ক্রমে স্বচ্ছল হইয়া উঠিল। অনেক গুলি খড়ের ঘর হইল, কূপ হইল, বাড়ীখানি বেশ ভাল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত হইয়া উঠিল।

সিমলায় কাজ করিতে করিতে গদা মাঝে মাঝে বাড়ী আসিত। তখন তার আদর দেখে কে? এখন আর সে গদা নহে—এখন গদাধর! গদাধর বল্‌তে পদ্মলোচনের মুখে জল আসে, এখন পদ্মলোচন সকল বিষয়েই গদাধরের উপদেশ লয়, গদাধর যাহা বল্‌বে সেইটাই শাস্ত্র সেইটাই যুক্তি, সেইটাই কর্ত্তব্য। গদাধরের আরও পাঁচ সাতটী সহোদর সহোদরা ছিল। পদ্মলোচন সে গুলিকে গর্ভস্রাব মনে করিতেন,—তাদের কুপিণ্ড ব'লে ডাক্‌তেন, কেন না তারা অর্থ উপায় কর্ত্তে পারে না। কুপিণ্ড; কেননা, অথাদ্য খাইতে শেখে নাই, অজাতির হাতে খাইতে ঘৃণাবোধ করে।

গদাধর বাড়ী এলে পদ্মলোচন কোথায় দুধ, কোথায় মাছ, কোথায় লুচি, কোথায় সন্দেশ, করিয়া ছুটিয়া বেড়ান। মোক্ষদা ঠাকুরাণী মেয়ে মজলিসের মধ্যে সগর্ব্বে মস্তক দুলিয়া, হাত নাড়িয়া, দোক্তা খাইতে খাইতে গদাধরের কত গল্প করেন। বলেন,—"আমার গদাধর যে হীল সাহেবের কাছে ছিল সে সাহেবের ঘোড়ার দুটো লেজ—তিনটে চোখ—সে কি কম সাহেব?" এইরূপ গল্প শুনে শুনে একজন এসিষ্টেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের পরিবার ব'লে ফেল্‌লেন,—"তাও কি কখন হয়, একটা ঘোড়ার কি আর দুটো লেজ হয়?" এই কথা শুনে মোক্ষদা ঠাকুরাণী বল্‌লেন,—"কি লা! দুটো লেজ হয় না? আমি মিথ্যে বল্‌ছি? যারা রেলে চাকরী কোরে খায়—তাহাদের এত অহঙ্কার যে, আমার কথা বিশ্বাস করে না? তারা তো জরিপের কাজ শেখে নি! আমার

গদাধরের সঙ্গে সাহেবেরা হাত ধরাধরি কোরে বেড়ায়, জানিস্? ভয়ে তখন অন্যান্য রমণীরা বলিয়া উঠিল,—"তা ত সত্যি—তা ত সত্যি! তিনি কি কম ব্যক্তি?"

(৭)

গদাধর যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে তখনই গ্রামের হরিশ্চন্দ্র মুখুজ্যের তৃতীয়া কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। হরিশ্চন্দ্র কন্যাভাগ্যে দক্ষপ্রজাপতি বলিলেও চলে। অনেক গুলি কন্যা। পুত্র সন্তানও অনেকগুলি।

হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রে একটু দেদীপ্যমান বৈশিষ্ট্য আছে। সেটী এই যে তাঁর অপত্যস্নেহ নাই—ঠিক যেন নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত আত্মা। স্নেহ মমতার লেশও কখন তাঁহাতে দেখা যায় নাই। গদাধরের উপর বা তার স্ত্রীর প্রতি বিশেষ নিষ্ঠুর বা উদাসীন; কেননা গদা গরীবের ছেলে। মাত্র কৌলিন্যের খাতিরে এ মেয়েটাকে জলে টান দিয়া ফেলিয়াছেন, বলিয়া হরিশের ধারণা। পদ্মলোচনকে বৈবাহিক বলিয়া সম্বোধন করিতেও কে হ কখন শোনে নাই।

হরিশ্চন্দ্র যৌবনে নীলকুঠীর চাকুরী করিয়া দু'পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন। তৎকালে অর্থশালী হইলে যাকে তাকে গালাগালি করা একটা বাহাদুরী বা পুরুষত্ব বলিয়া প্রচলিত ছিল। হরিশ্চন্দ্রের এ পুরুষত্ব ষোল আনাই ফুটিয়াছিল। ভালকথা বলিবার সময়ও তাঁর কথায় মধ্যে শকার ষকারের পাণিনীর সূত্রের অবতারণা আপ্‌সে হইয়া যাইত। কাজেই এ যুগের কোন ভদ্র ব্যক্তি পার্য্যমানে মুখুজ্যে মশায়কে ঘাঁটাইয়া কথা বলিতে চেষ্টা করিত না।

হরিশ্চন্দ্রের সহিত পদ্মলোচন শিরোমনির পূর্ব্বে মাখামাখি না থাকিলেও গদাধর যখন বাড়ীতে মাসে মাসে বিস্তর টাকা পাঠাইতে আরম্ভ করিল, যখন স্ত্রী সরোজিনীর সাতনর সোণার বিছে, কড়ি নেক্‌লেস্ প্রভৃতি দুই চার হাজার টাকার গহনা হইল; তখন হরিশ্চন্দ্র প্রায়ই বৈকালে বৈবাহিকের বাড়ীতে যাইয়া গল্প গুজব আরম্ভ করিতেন।

বৈবাহিক পদ্মলোচন শিরোমনি মুখে মিষ্ট আলাপ করিলেও হরিশ্চন্দ্রকে বসন্তের কোকিল বলিয়া মনে মনে তাঁকে যথেষ্ট ঘৃণা করিতেন। কন্যা সরোজিনীও তাঁহাকে যে না চিনিয়াছিল, তাহা নয়। গদাধরের অর্থাগমের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের ও তার ছেলে মেয়েদের আত্মীয়তা খুব বাড়িয়া গেল।

(৮)

গদাধরে পদোন্নতি হইতে হইতে সে ক্রমে অ্যাসিসষ্টেণ্ট ইন্‌জিনিয়ার হইয়া উঠিল।

সেই চারি ব্রাঞ্চে ফেল করা, স্থূল বুদ্ধি গদা হাতে কলমে কাজ শিখিতে শিখিতে ক্রমে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইন্‌জিনয়ার। ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। এরূপ কেন হয়? ইহা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল কি, এই জন্মেরই পুরুষকার, এ সব তত্ত্ব ধর্ম্মোপদেষ্টারা স্থির করুন। আমরা সে বিষয়ের মীমাংসা করিব না। আমরা মাত্র এটুকু জানি যে, গদা সত্য সত্যই ঐরূপ আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হইল।

উন্নতির ঠিক এমনই সময়ে আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের একটা রেল লাইন করিবার জন্য কয়েকজন ইন্‌জিনিয়ারের আবশ্যক হইল।

পাঠক! তুমি তো জানই যে অর্থের জন্য গদা সব করিতে পারে। আবশ্যক হইলে মেরু যাত্রা করিতে বা গৌরীশঙ্করে আরোহণ করিতেও সে কুণ্ঠিত নহে।

তাই গদা শাস্ত্রাদেশ দেশাচার প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া আফ্রিকায় যাত্রা করিল। ভারত মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মালা ভেদ করিয়া, গদার জাহাজ ছুটিয়া চলিয়াছে। সে অনন্ত অকূল সমুদ্রের সৌন্দর্য্য নবীনত্ব, ভীষণত্ব কিছুই গদার মনে স্থান পাইতেছে না। সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্যোদয় একটা অতি চমৎকার দৃশ্য, সে দিকেও গদার দৃষ্টি নাই; সরোজিনীর প্রণয় স্মৃতিও তার মনে কোমল ভাব আন্‌ছে না। গদা কেবল ঐশ্বর্য্যের আকাশ কুসুমে বিভোর। অর্থের এমন একনিষ্ঠ সেবক আর নাই।

যথা সময়ে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া আরও কয়েকটী বাঙ্গালী ও সাহেব ইন্‌জিনিয়ারের সঙ্গে একটা সিংহবহুল প্রদেশে গদা প্রাণটা হাতে করিয়া চাকুরী করিতে লাগিল।

তার সাক্ষাতে আফ্রিকার প্রকাণ্ড সিংহ কত লোককে খাইয়া ফেলিল, নিজেও কত বড় বড় সিংহ দেখিল, তবুও ভয় নাই। অর্থের উপাসনায় গদা নির্ভীক সাধক।

একদিন বন্দুক লইয়া কয়েকজন সাহেবের সঙ্গে একটী শৈল সংকুল বৃক্ষ লতা গুল্ম সমাচ্ছন্ন জলার নিকটে গদা শিকার করিতে গেল। শিকারের সুবিধা

হইবে, ভাবিয়া গদা একটা উচু স্থান হইতে চার পাঁচ হাত নিম্নে লাফাইয়া পড়িল। মাটিতে না পড়িয়া গদা একটা বন্য গণ্ডারের পিঠের উপর যাইয়া পড়িল, আর মহারোষে গণ্ডার যেমন উঠিয়াছে, গদা তাড়াতাড়ি একটা গাছের ডাল ধরিয়া বাদুড় ঝোলার মত ঝুলিয়া উপরে উঠিয়া পরিত্রাণ পাইল।

উপস্থিত বুদ্ধি না থাকিলে, সেই দিনই গদার জীবন নাট্যের শেষ যবনিকা পড়িয়া যাইত।

এইরূপ গদাধর তিনটী বৎসর প্রবাসে কাটাইল। যতদিন সেখানে থাকিল, তত দিন পিতা পদ্মলোচনকে প্রতি মাসে পাঁচ শত হইতে হাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতে লাগিল এবং আসিবার সময় চৌদ্দ হাজার টাকা লইয়া কলিকাতায় একটা ব্যাঙ্কে জমা রাখিল।

(৯)

গদাধর আফ্রিকা হইতে বাড়ী আসিলে কাঞ্চন নগরের ব্রাহ্মণ মণ্ডলী তার সঙ্গে আহারাদি বন্ধ করিল, তাহাকে সমাজচ্যুত করিল। কাঞ্চন নগর নদীয়া জেলার অন্তর্গত। রঘুনন্দন মরিয়া গেলেও তাঁর প্রভাব যায় নাই। তাঁরই ব্যবস্থায় এখনও বঙ্গদেশ বিশেষতঃ নদীয়া জেলাটা অনুশাসিত, পরিচালিত। তাঁরই ব্যবস্থায় বিধবারা একাদশীর দিন জর্জ্জরিত, এক বিন্দু জল পান করিবার যো নাই। কত দেশে "খয়ে বিধবা" আছে, অর্থাৎ একাদশীর দিন "খই দই" খায়, কত দেশে বিধবারা "বাসী" হাঁড়িতে খায়, পুঁই মসূরির ডাইল খায়, কিন্তু নদীয়ায় ওসব প্রথা চালাইবার উপায় ছিল না।

তাই বলছি, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্র নিসিদ্ধ বলিয়া কাঞ্চন নগরের গোড়ারা গদাকে সমাজচ্যুত করিলেন।

পদ্মলোচন শিরোমণি শাস্ত্রের অনেক কূট ব্যাখা করিলেন, "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়" রকমের অনেক ব্যবস্থাই দিলেন, পুরাকালের অনেক দোহাই পাড়িলেন, পথে ঘাটে অনেককে ধরিয়া অনেক গুলি "বুঝ্‌লে কিনা" শুনাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সমষ্টির শক্তির কাছে ব্যষ্টির শক্তি অতীব তুচ্ছ। পদ্মলোচন সপুত্র তিন বৎসরকাল সমাজচ্যুত থা লেন। বলা বাহুল্য এ তিন বৎসরের মধ্যে গদার শ্বশুর হরিশ্চন্দ্র মুখুজ্যে ও শু লকবৃন্দ প্রভৃতি অনেকে গদার বাড়িতে চোরা গোপ্তা ভাবে পাঁঠা পলান্নের সহিত স সন সম্পর্ক রাখিতে ভুলিলেন না।

নদীয়া সমাজের এক বিষয়ে খুব উদারতা দেখা যায়। আর না যাইবেই বা কেন, যেখানে বিশ্বপ্রেমিক মহাপ্রভুর আবির্ভাব, সেখানে এমনটী ত খুবই স্বাভাবিক। উদারতাটী এই যে, তুমি পেঁয়াজ খাও, রসুন খাও, রাম পাখী খাও, রাম পাখী বৃক্ষের ফল খাও, যবনান্ন খাও ধুনীপিঠে খাও, প্রকাশ্যতঃ খাওয়া অস্বীকার করিলেই বস্, আর কোন দোষ নাই। খাইয়াছি বলিলেই মরিয়াছ ; খাই নাই, বলিলেই নিস্তার।

কাঞ্চন নগরের গোঁড়ারা বিশ্রী পেটুক। তাঁদের এই দুর্ব্বলতাটুকু আমাদের গদাধর কতকটা জানিতে পারিল। অমনি ঘোষণা করিয়া দিল,—তার ছেলের উপনয়নে গোল্লা রসগোল্লা—পানতুয়া—লালমোহন প্রভৃতি মিষ্টান্নের শিলাবৃষ্টি হইবে। পেটুক দল চঞ্চল হইয়া পড়িল। তখন কলার পাতার নল পাকাইয়া বৃদ্ধেরা হুকায় লাগাইয়া সেই হুকা টানিতে টানিতে স্থির করিল,—পদ্মলোচন শিরোমণির গৃহে খাওয়াই কর্ত্তব্য, গদা আফ্রিকা দেশে নিশ্চয়ই আলু ভাতে ভাত খাইয়াছে, জাহাজের মধ্যে সে ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া কখনই অখাদ্য খায় নাই—গঙ্গাজল ও বাতাসা খাইয়াই ছিল ; বিশেষ বৃহৎ জলাশয়ে তো কোন দোষই হইতে পারে না। আর শূকর মাংস গোমাংস খাইয়াছে বলিয়া যে, একটা কথা রটিয়াছে ওটাও কিছু নয়, বরাহ মাংস তো খাইবার ব্যবস্থাই রহিয়াছে—বিশেষ ভগবান্ যখন বরাহ মূর্ত্তি ধরিয়া ছিলেন, তখন বরাহমাংস তো পবিত্র মাংস। বোধ করি, গদাধর আফ্রিকা মহাদেশে শালগ্রামের পূজা করিত, না করিবে কেন, পদ্মলোচন শিরোমণির পুত্র ত। বিশেষ সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম—সবই তো ব্রহ্মের বিকাশ—খাদ্য খাদক বিচার নিষ্প্রয়োজন—অতএব পদ্মলোচনের বাড়ী খাওয়াই স্থির।

ফলারের প্রভাবে গদা আবার জাতিতে উঠিল। কাঞ্চন নগরের ব্রাহ্মণেরা তাঁহার সহিত আহার বিহার করিলেও অন্যান্য গ্রাম তাহাকে লইল না। গদার কূলে আফ্রিকা কলঙ্ক রহিয়াই গেল।

গদা আট দশ বার গ্রামের ব্রাহ্মণদিগকে বড় বড় ভোজ—বড় বড় ফলার দিল। দিলে কি হইবে,—কলঙ্ক গেল না ; কারণ "কলঙ্কের লেখা কভু মুছিবার নহে।"

গদাধরের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে পাঁঠা হইতেছে, পোলাও হইতেছে, দু'বেলা চায়ের আড্ডা বসিয়েছে, হরদম্ খরচ হইতেছে। চাটুকার দল নিরন্তর

গদার আসর গরম রাখিতেছে। গদার গুণগানে দিগন্ত মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। তবুও কলঙ্ক যাইতেছে না।

গদা কিছু দিনের মধ্যেই সুন্দর পাকা বাড়ী করিয়া ফেলিয়া ছিল। আফ্রিকা হইতে কত রকমের আস্‌বাব পত্র আনিয়া ঘরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া ছিল। সেই ঘরের রোয়াকে উদয়-অস্ত মজ্‌লিস্—সেই ঘরেরই দৌড় বারাণ্ডায় পাঁঠা পলান্নের নিত্য প্রীতি ভোজ।

এইরূপে কিছুদিন কাটাইয়া গদা পুনরায় চাকুরী লইয়া রেঙ্গুণে গেল। সেবার সরোজিনী তাহার সঙ্গিনী হইল। সঙ্গে রূপসী নাম্নী তের বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা ও দুই তিনটী শিশু পুত্র। তিন বৎসর পরে গদা সে চাকুরী ছাড়িয়া আবার বাড়ী আসিল।

এবার সরোজিনীর গূঢ় মন্ত্রণায়, কিম্বা কিসে আমরা জানি না, গদার একটু ভাবান্তর ঘটিল। গদার ইচ্ছা যে, অন্যান্য সহোদর গুলির সহিত সে পৃথক হয়। স্ত্রী কন্যাকে বাড়ী রাখিয়া গদা পুনরায় চাকুরির সন্ধানে পুনায়, পরে এডেনে, পরিশেষে বোগ্‌দাদে গিয়া উঠিল। বিস্তর টাকা উপায় হইতে লাগিল।

এ দিকে রূপসীর কপাল পুড়িল। গ্রামের কোন একটী যুবক তার নয়ন পথের পথিক হইল। পাপ চাপা থাকিল না। অবশেষে কাঞ্চন নগরের গোঁড়ারা রূপসীকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিল। রূপসী কাশী বাসিনী হইল। দেশময় টী—টী পড়িয়া গেল। আফ্রিকার কলঙ্কের উপর আবার এই নূতন কলঙ্ক চাপিয়া পড়িল।

রূপসীর চাল চলন দেখিয়া পদ্মলোচন শিরোমণি পূর্ব্বেই তার পরিণাম কি দাঁড়াইবে তাহা বুঝ্‌তে পেরে ছিলেন। তিনি তাহাতে এবং গদাধরের ফাঁক্ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া রূপসীর এ সব দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই দেহ ত্যাগ করেন। পদ্মলোচনের স্বর্গারোহণের পর, গদা সহোদরদিগের সহিত পৃথক্ হইল। বাসের জন্য পৃথক্ প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করাইল। মাতা মোক্ষদা গদাধরের ও পুত্রবধু সরোজিনীর এইরূপ হৃদয় হীনতায় ব্যথিতা হইয়া অক্ষম পুত্র-পৌত্র গুলিকে লইয়া একাহারে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছেন। গদাধর সম্বন্ধে এক দিন তাঁর গর্ব্বের অবধি ছিল না—এখন সে গর্ব্ব চুর্ণ! সমাজের মনোরঞ্জনার্থে পুনঃ পুনঃ ভোজ ফলার দিতে অনেক অর্থ বিনষ্ট হইল, রূপসীর

ব্যভিচারে বংশে চির কলঙ্কের ছাপ পড়িল, দেশময় অখ্যাতি রটিল, গৃহ বিচ্ছেদে বিমল শান্তি অন্তর্হিত হইল। চোখের জল মোক্ষদা ঠাকুরাণীর এখন জীবন সম্বল।

গদাধর সরোজিনীকে লইয়া কলিকাতা সহরে একটা এঁধো গলির মধ্যে বাস করিতেছে। আর একটী মেয়ে অনূঢ়া, পোনের ষোল বৎসর বয়স হইয়াছে। বিবাহ না দিলেই নহে। রূপসীর কাহিনী ও আফ্রিকা বার্ত্তা যতদূর পঁহুছিয়াছে ততদূর বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই।

গদাধর এখন ভগ্ন হৃদয়! মধ্যে মধ্যে সেই নরেশ নামে সহাধ্যায়ীটী আসিয়া গদাধরের হৃদয়ে শান্তি আনিবার চেষ্টা করে! কিন্তু গদাধরের মনে তবুও শান্তি নাই।

এক দিন আক্ষেপ করিয়া গদাধর নরেশকে এইরূপ বলিতে ছিল—ভাই, সেই দিন, আর এই দিন! মলিল বেশে শূন্য প্রাণে—রিক্ত হস্তে যাচ্ছিলাম তখন তুমিই সেই দুঃসময়ে দশটী টাকা দিয়াছিলে; আবার এখন হৃদয় নানা কারণে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—এ দুঃসময়েও তুমি আসিয়া প্রবোধ দিচ্ছ। তুমিই যথার্থ বন্ধু!

সুসময়ে তোমায় দেখিতে না পাইলেও দুঃসময়ে তুমি ছায়ার মত কাছে আসিয়া উপস্থিত হও। ভাই ভেবে ছিলাম—স্নেহ মমতা অলীক ব্যাপার, আর অর্থই ঐহিক জীবনের সার। এখন দেখিতেছি, সে ধারণা ভুল। অর্থ উপার্জ্জন করিতে বসিয়া শূকর মাংস, গোমাংস কিছুই বাদ দিই নাই, মেথর মুর্দ্দফরাস সকল জাতিরই খাইলাম, অর্থও যথেষ্ট উপায় করিলাম, কিন্তু কই শান্তি তো পাইলাম না। লাভের মধ্যে কলঙ্কের পসরা মাথায় বহিলাম—অকলঙ্ক কূলে কালি দিলাম—প্রাণের দুহিতা কলঙ্কিনী হইয়া দেশত্যাগিনী হইল। আমি যদি উন্মাদের মত দেশে বিদেশে অর্থের জন্য না ছুটিতাম, তাহা হইলে আজ রূপসীর এরূপ পতন হইবে কেন? কই অর্থ তো সুখ শান্তি দিতে পারিল না! আমি দেশে তিষ্ঠিতে পারি না, আমার মনে হয়, দেশের প্রত্যেক বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত আমাকে অর্থ পিশাচ বলিয়া যেন বিদ্রূপ করিতেছে। হাওয়া বহিয়া গেলে মনে হয়, ব্যথিত পূর্ব্ব পুরুষগণের জীবাত্মা আমার পতনের জন্য হাই হাই—করিয়া যাইতেছে। দেখ্‌ছি, অর্থই অনর্থের মূল ভাই নরেশ! কপালঃ কপালঃ কপালং মূলং।

প্রাচীন।

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী।

নাহি পিতা মাতা ভ্রাতা—নাহিক বান্ধব,
লুপ্ত সবে অতীতের আঁধার কুক্ষিতে—
বৃদ্ধ হ'য়ে আজ আমি বৃদ্ধা পৃথিবীতে—
এ নয়নে দেখিতেছি শোভাহীন সব!
কামনা বাসনা আশা প্রায় সব মৃত;
অমৃত আমার মুখে হয়েছে গরল—
ক্রমে সঙ্কুচিত শুষ্ক হৃদি শতদল
ঝ'রে পড়ে পলে পলে সৌরভ বঞ্চিত!
যে বাঁশরী-ছিদ্র দিয়ে হায় এক দিন
উঠিল কতই গান—বিশ্ব বিমোহিয়া!
আজিকে শোণিত ধারা ছুটে তাহা দিয়া,
নাহি স্বর—দীর্ঘশ্বাস ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ!
যেন কহিতেছে কাল সতত ইঙ্গিতে,
প্রাচীনের নাহি স্থান এই পৃথিবীতে।

—•—

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা বিখ্যাত মিঃ বি, কে, পাল কোম্পানীর ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মেডিক্যাল ডায়েরী ও বসন্তের পুষ্প সুরঞ্জিত চিত্র পঞ্জিকা উপহার পাইয়াছি। এই মেডিক্যাল ডায়েরীতে সাধারণ গৃহস্থলোকের নিত্য জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে—লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারগণের নাম ও ঠিকানা সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা ডায়েরী ও চিত্র পঞ্জিকা প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিলাভ করিলাম।

—•—

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৭শ, বর্ষ। | ১৩২৮ সাল, পৌষ। | ৯ম, সংখ্যা।

ঈশ্বর ও পরলোক।

লেখক,—শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

(দার্শনিক গবেষণা)

ভারত বর্ষে সৃষ্টিতত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদ, লক্ষ্য করিয়া দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম প্রশ্ন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্ট কি অসৃষ্ট, দ্বিতীয় প্রশ্ন, প্রাণীর উদ্ভব ও বিলয়ের পর আর কোন অস্তিত্ব থাকে কিনা? উক্ত প্রশ্নদ্বয় অবলম্বন করিয়া অশেষ তর্ক মীমাংসা প্রচার হইয়াছে। কিন্তু মানব মন অদ্যাপি সংশয় রাহু গ্রাস হইতে বিমুক্ত হয় নাই। কোন দিন হইবে কিনা, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সুতরাং কোন দার্শনিকের মতই আজ পর্য্যন্ত অভ্রান্ত এবং সর্ব্ববাদী সম্মত বলিয়া সমাদৃত হয় নাই। মনস্বী দার্শনিকেরা পক্ষ সমর্থনার্থ মানবচক্ষে কতিপয় প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পক্ষে কাহারও বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু বাদরায়ণ ঋষি শ্রুতি অর্থাৎ বেদবাক্যই প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। উহাকে শাব্দ প্রমাণ কহে। গৌতম ঋষি স্বকৃত সূত্রগ্রন্থে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, এই তিনটীই প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্য সূত্রকার শাব্দ ও অনুমিতি

প্রধানতঃ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। যদিও কোন দার্শনিক চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া ঈশ্বর দর্শন করাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহাদিগের সুদূর প্রসারিণী প্রতিভাময়ী কল্পনা সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। তাঁহারা যে, জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাহা অক্ষয় ও অদ্ভুত। আত্মা বা ঈশ্বর কিম্বা জন্মান্তর সমস্তই প্রত্যক্ষ প্রমাণের অতীত বিষয়। উক্ত স্থলে যুক্তি বা অনুমান অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু অনুমানও প্রত্যক্ষ মূলক। পূর্ব্বে ধূম ও বহ্নির একত্রাবস্থান জ্ঞান না থাকিলে, ধূম দর্শনে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমাণ হইতে পারে না। দুই চারিজন মনুষ্যের মৃত্যু না দেখিলে মনুষ্যের মরনশীলতার নিশ্চয় হয় না। সুতরাং যে স্থলে প্রত্যক্ষ পরাভূত, সেখানে অনুমাণ কিরূপে হইতে পারে?

বৈদান্তিক ঈশ্বরতত্ত্ব বাক্য মনের অগোচর বলিয়া আবার শাস্ত্রগম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র, মনগম্য বা জ্ঞানগম্য, হইলে ব্রহ্মও মনগম্য হইবেন, ইহাই বুঝা যায়। তাহা হইলে মনের অগোচর কথাটি কিরূপে প্রযুক্ত হয় বুঝি না। বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্বও যখন সর্ব্ববাদী সম্মত নহে, তখন তাহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া কিরূপে নির্দ্দেশ করা যায়? আর একটী কথা, সৃজন ইচ্ছা, নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, প্রয়োজনাভাব বিশিষ্ট ব্রহ্মের কিরূপে সম্ভব পর হয় বুঝি না। যাহার কিছু প্রয়োজন থাকে, সেই কিছু করে, কিন্তু যাহার কোন যত্ন নাই, ইচ্ছা নাই, আবশ্যক নাই, সে কিছু করিবে কেন? যদি বলা যায়, ব্রহ্ম স্বাধীন ইচ্ছাবান। তাহা হইলেও নির্দ্দোষ উত্তর হয় না। প্রবৃত্তি হইতে হইলে মূলে ইচ্ছা থাকা আবশ্যক; ইচ্ছা ও প্রয়োজন ব্যতীত হয় না, বা ইষ্ট সাধন জ্ঞান ব্যতীত হয় না। ব্রহ্মের ইষ্টানিষ্ট বোধ কিরূপে হইতে পারে? যে কোন কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ না করিতে পারিলে, অকারণ কার্য্যোৎপত্তিরূপ দোষ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় কথা, কোন দার্শনিক বলেন জগৎ আদৌ সৃষ্ট নহে, সর্ব্বকালেই বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মের বিক্ষেপ ও বিকর্ষণ শক্তি বলে বিশ্বের বিকাশ ও তিরোভাব মাত্র ঘটে, বিলয় হয় না। উক্ত শক্তি, মত ভেদে মায়া বা প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহা হউক, বস্তুতই যদি বিশ্বের আত্যন্তাভাব নাই ঘটে, তবে তাহার সৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্ত্তারূপে ঈশ্বরের প্রয়োজন কি? এইরূপ তর্ক স্বতই মনে না আসিয়া থাকিতে পারে না। জন্মান্তর সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ মূলক কোন প্রমাণ নাই।

যাঁহারা বলেন, প্রকৃতি হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাদের মতও সমীচীন বোধ হয় না। কারণ, ক্রিয়াশীলতা স্বীকার করিলেও সুশৃঙ্খলা বিধান রূপ ক্রিয়াশীলতা জড়প্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব! অন্ধ প্রকৃতি কখনই বিশ্ব বৈচিত্র্য বিধান করিতে পারে না। স্পন্দন, গতি, বেগ, পতন প্রভৃতি জড়ের সম্ভব, কিন্তু বৈবিত্র্য বিধান বা শৃঙ্খলা বিধান জড়ের কার্য্য নহে। কণাদ ও গৌতম পরমাণু স্বীকার করতঃ পরমাণু গত নিত্য বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেন। বেদান্তমতে একব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থ অসৎ। একমাত্র ব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। কিন্তু একটি কথা যদি ব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান কারণ হন, তাহা হইলে, বিশ্বপ্রপঞ্চ অনিত্য; এ কথা কিরূপে সঙ্গত হইবে? নিত্য ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বিশ্ব নিত্য হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। সুতরাং বিশ্ব, মায়া কল্পিত, ক্ষণ ভঙ্গুর ইত্যাদি বলা কিরূপে সঙ্গত হয়? মায়া অর্থে ঈশ্বরের শক্তি রচিত, ক্ষণ ভঙ্গুর অর্থে স্থূলের নাশ ইত্যাদি অর্থ করিলে তবে সঙ্গত হয়। অথবা আসক্তি নাশের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলেও সঙ্গত হইতে পারে। নচেৎ ব্রহ্ম সত্য, তিনিই জগতের উপাদান কারণ, অথচ জগৎ মিথ্যা ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহাও কথিত আছে যে, অদৃষ্টসহ প্রাণী জগৎ সচরাচর বিশ্ব প্রলয়ে ব্রহ্মে লীন হয় ও পুনরায় তথা হইতে বিকশিত হয়। তাহা হইলে জগৎ মিথ্যা ইহার অর্থ স্থূল জগৎই ধরিতে হয়। নচেৎ সূক্ষ্ম জগৎ মিথ্যা বলিলে বহু বিরোধ উৎপন্ন হয়। ভারতীয় দর্শনচয় ঈশ্বর নিরূপণে যতদূর অগ্রসর হউন বা না হউন, কিন্তু মুক্তি বা শান্তি লাভ ও দুঃখ নিবৃত্তির পথ প্রদর্শনে সবিশেষ যত্নবান, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের উৎকট বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং অবিশ্বাসেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ইত্যাদি কপিল সূত্রই তাহার প্রমাণ। কেহ বা স্পষ্টই বলিয়া ফেলিয়াছেন, যে, নিরর্থক ঈশ্বর মানিতে চাও মান, কিন্তু তাঁর কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই। কিন্তু দেখা যায়, ভারতীয় পৌরাণিকেরা মানব চিত্তে শান্তি ও আশ্বাস দেবার জন্য ঈশ্বরে সরল ও অকপট বিশ্বাস স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন! সে জন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ভারতীয় দার্শনিকদিগের দেহাতিরিক্ত চৈতন্যের প্রমাণ প্রয়াস ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শন রীতি অগণ্য প্রশংসার যোগ্য। যদিও লোকায়তিক তর্ক ও যুক্তি হৃদয় গ্রাহিণী, তথাপি তাহা শান্তি-প্রদ নহে। সৌরজগৎ কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী যেমন স্বীয় কক্ষ পথে আবর্ত্তিত হইতেছে, এই দৃশ্যমান

বিশ্বও অবশ্যই তদ্রূপ একটা কিছু লক্ষ্য করিয়া আছে। নচেৎ বিশাল সৌর-জগৎ সচরাচর বিশ্ব শৃঙ্খলার অভাবে এতদিন কথা মাত্রে পর্য্যবসিত হইত। সেই নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র নির্ণয়ে মনুষ্য বুদ্ধি পরিশ্রান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মনুষ্য কল্পিত প্রমাণ রজ্জু সেই গভীর তত্ত্ব মহার্ণবের তলস্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং সেই দূরদধিগম্য তত্ত্ব সাগরের বেলায় বিচরণ শীল মানব কিরূপে যথার্থ বস্তু দেখাইতে সমর্থ হইবে?

যদি এই বিশ্ব সৃষ্ট বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃত্ব মনুষ্যের অসম্ভব বিধায় অবশ্যই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বীকার করা যায়। কিন্তু সে বিষয়ে সুদৃঢ় যুক্তি লক্ষিত হয় না। নৈয়ায়িক বলেন, এই জগৎ কার্য্য, সুতরাং ইহার অবশ্যই কারণ বা কর্ত্তা আছে। কিন্তু এ যুক্তি সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। যাঁহারা জন্মান্তর প্রমাণ করিতে চান, তাঁহারা বলেন, দেহের চৈতন্য নাই, সুতরাং দেহাতিরিক্ত চৈতন্য অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই চৈতন্যই মন, প্রাণ, বুদ্ধির সমষ্টি-ভূত জীব পদ বাচ্য। এবং জীবই অদৃষ্টের আশ্রয় ও সেই অদৃষ্ট বশেই প্রাণীর বিচিত্র প্রকৃতি হয়। জীবের জীবন কারণ প্রযত্ন ও স্তনপান প্রবৃত্তি প্রভৃতি তাঁহারা জন্মান্তরের সূচক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। নাস্তিকেরা বলেন, উক্ত প্রবৃত্তি সচেতন দেহের স্বাভাবিক। জন্মান্তর বাদীরা বলেন, দেহের চৈতন্য স্বীকার করিলে বাল্য শরীর নাশে যৌবনে বাল্য দৃষ্ট বস্তু স্মরণ হইতে পারে না। অন্য দৃষ্ট বস্তু অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। নাস্তিক বলেন, বাসনা বা সংস্কারের সংক্রম হয়, অর্থাৎ বাল্যের সংস্কার যৌবন দেহে সংক্রামিত হয়। আস্তিক বলেন, তাহা হইলে মাতার সংস্কারও পুত্রে সংক্রান্ত হইতে পারে। যখন তাহা হয় না, তখন বাসনার সংক্রম স্বীকার করা যায় না। নাস্তিক চৈতন্যকে জীবনী শক্তি বলেন। আস্তিক বলেন, তাহা হইলে তাহার প্রাগ্‌ভাব ধ্বংস প্রভৃতি অনন্ত কল্পনা স্বীকার করিতে হয়। তাহাপেক্ষা সংক্ষেপেতঃ দেহাতিরিক্ত চৈতন্য স্বীকার করাই সঙ্গত। এইরূপে আত্মার প্রামাণ্য স্থির করিয়া তাঁহারা ব্যষ্টি আত্মার কেন্দ্ররূপে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত।

নৈয়ায়িকেরা প্রত্যেক ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র আত্মা স্বীকার করেন এবং কর্ম্ম ক্ষয়ে আত্মার মুক্তি স্বীকার করেন। বৈদান্তিক, ব্যক্তিগত আত্মাকে জলে

প্রতিবিম্বিত চন্দ্রবৎ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং পরব্রহ্মে বিলীন হওয়াই নির্ব্বাণ মুক্তি বলেন। দ্বৈতবাদীর জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করেন না। বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ ও নিরাকার ব্রহ্ম হইতে জগৎ বিকাশের তুল্য। কেহ বা নিরাকার চৈতন্য অলীক বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কিন্তু চক্ষুর অগোচর বহু জীবাণু আছে, কার্য্যের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। চক্ষুর অগোচর বস্তুই যে অলীক, তাহা বলা যায় না। মাত্র চক্ষু দ্বারাই যাবতীয় জ্ঞান লাভ হয় না। অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়াদির সত্তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব অতীন্দ্রিয় পদার্থও যখন ফল দেখিয়া স্বীকার করা যায়; তখন পরোক্ষ তত্ত্ব জীবাত্মাদিইবা স্বীকার না করিব কেন? দেহের পরিচালক যেমন ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের পরিচালক মন, সেইরূপ মনেরও পরিচালক অবশ্যই কিছু স্বীকার করা কর্ত্তব্য। তাহাই আস্তিকের আত্মাপদ বাচ্য। সর্ব্বত্র জড়ের সহিত চৈতন্যের মিলন দেখা যায়, সুতরাং বোধ হয়, চৈতন্যই জড়ের পরিচালক। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সহকৃত চেতনই সম্যক্ পরিস্ফুট অবস্থা প্রাপ্ত। আর তদিতর স্থানবর্ত্তী চেতন অস্ফুট ভাবে স্থিত। উদ্ভিজ্জ মহীরুহাদিতেও চেতনের কার্য্য কারিতা পরিলক্ষিত হয়। ক্রমশঃ বিজ্ঞান অধ্যাত্ম জ্ঞানের সহকারী হইতে প্রস্তুত হইতেছে। মহানুভব ভারতীয় দার্শনিকদিগের চিন্তা প্রসূত পদার্থ এখন বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছে। মহাজ্ঞানী দার্শনিকেরা সন্দেহ জড়িত ভাবে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। আকাশ শব্দের কারণ, বায়ু শব্দবহ, এই যে দার্শনিক দিগের বাক্য এখন বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহারা তন্ন তন্ন রূপে গুণ বিচার পূর্ব্বক পদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন এবং কোন্ পদার্থে কত গুণ আছে, তাহাও নির্ণয় করিয়ছেন। সত্য স্বরূপ পদার্থ নির্ণয় দর্শনে যেন স্বতই মনে হয় যে, সেই মহাত্মা জ্ঞানীরা প্রকৃত সত্য নিরূপণে সমর্থ হইয়া ছিলেন। যে অজ্ঞাত প্রদেশে আমরা শশঙ্কচিত্তে পদবিক্ষেপ করি, তথায় তাঁহারা নির্ভয় হৃদয়ে বিচরণ করিতেন। যাঁহারা মনে করেন, অত্যধিক আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনায় ভারতের অবনতি ঘটিয়াছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই একদেশ দর্শী। যে উচ্চতম বিজ্ঞানালোচনায় আজ পাশ্চাত্য দেশ ধন মদে গর্ব্বিত, জগৎ তৃণীকৃত, সেই পাশ্চাত্য ভূমি আজ শান্তিহারা হইয়া অপথে পদার্পণ পূর্ব্বক হাহাকার করিতেছে। কে বলিবে বহির্বিজ্ঞানে সুখ শান্তি বৃদ্ধি করিয়াছে না লোপ করিয়াছে, আর্য্যাবর্ত্ত বাসীরা খুঁজিয়া দেখিয়াছেন, যে সুখের উৎস হৃদয়ে। পাশ্চাত্যেরা খুঁজিলেন বাহিরে, সুতরাং উৎস

খুঁজিয়া পাইলেন না। শান্তিও পাইলেন না। যদিও তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন পণ্ডিত সন্মার্গে ধাবিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত সত্য মূলে উপনীত হইতে পারেন নাই। ভারতীয় ধর্ম্ম মত বিদ্বেষ বুদ্ধি বিলোপ করতঃ সাম্প্রদায়িক বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছে। আবার কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতীয় দর্শনের প্রতিধ্বনি করিয়াই নীরব হইয়াছেন।

প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর্য্যগণ প্রথমেই অনন্তশক্তি বিশ্ব পতির বিভূতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া ছিলেন। এবং জড়ের অন্তর্ভেদ করিয়া শক্তি-মানের সন্নিহিত হইয়া ছিলেন। পাশ্চাত্যেরা জড়ের শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহা লইয়া পুতুল খেলা করিতেছেন। বিজ্ঞান ধন দিতে পারে, কিন্তু শান্তি দিতে পারে না।

ধনের পিপাসা দুরপনেয়; এবং শেষ ফল ধ্বংস। অতৃপ্ত বাসনার তাড়নায় মানব হিতাহিত বিচার শূন্য হইয়া যথেচ্ছাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

ধর্ম্মের বিশ্বাস ভ্রান্তি প্রণোদিত হইলেও অন্ততঃপক্ষে ঐহিক জীবনে শান্তি ধারা বর্ষণ করে। অন্য ফল না থাকিলেও ধার্ম্মিক আদর্শ মানব হইতে পারে। কিন্তু আসুরিক প্রকৃতি ব্যক্তির অশান্তি অগ্নি শিখা ভিন্ন আর কি পুরস্কারের আশা আছে?

শ্রোতব্যো মন্তব্যো ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য স্মরণ রাখিয়া শ্রুতি বাক্য হইতে শ্রবণ ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক মনন বা চিন্তা করিতে থাক. অবশ্যই বিমল দর্পণবৎ বিমল অন্তঃকরণে যাথার্থ প্রতিবিম্বিত হইবে। তাহা হইলে কৃত কৃতার্থতা লাভ হইবে।

কেহ কেহ বলেন, মানব বুদ্ধি যতদূর ধাবমান হইতে পারিয়াছে, তাহার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু উহা সসীম বস্তুর পরপারে আর কিছু বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু কল্পনা, প্রমাণের অতীত স্থান বিশ্বাস করিতে পারে অসীম সৌরজগৎ সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। সেই দূর প্রসারিণী কল্পনা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু সত্বা কি ধারণা করিতে পারে না? যদি করিতে সমর্থ হয়, স্বীকার করা যায়, তবে তাহা শ্রুতির মননের অন্তর্গত বলাই সঙ্গত। বিশাল বিশ্ব প্রপঞ্চ, অগণ্য কার্য্য গুণ পরম্পরা, সংযোগ বিয়োগ, উদ্ভব, বিলয় স্থিতি, গুণান্তরাধান, সৌরকিরণে বর্ণসত্বা জীবাণু পুঞ্জ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চেতন,

বিবেক, জড়, অজড়, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্বতই বলিতে ইচ্ছা হয় যে, অন্ধ জড় প্রকৃতিই মাত্র এই রঙ্গভূমির একমাত্র অভিনেত্রী নহে। যুক্তি তর্ক দুরে থাক, মানব মন স্থির চিত্তে গভীরতম প্রদেশে নিমগ্ন হইয়া গেলে, তর্কাতীত কোন অজ্ঞাত জ্যোতিষ্কের ক্ষীণালোক ক্রমশঃ দেখিতে পায়। অন্ধ তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে যখন কোন ভাগ্যবান সেই গাঢ় তিমিরে বিমলজ্যোতি দর্শনে হর্ষনির্ভর হইয়া উঠেন, তখন আর সে তৎকালীন হৃদগতভাব ভাষায় বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় না। তখন সে আত্মবশ্য বুদ্ধি শুষ্কতর্কের তাড়নায় দুর করিতে চায়না। তখন সে আপনিই বুঝিতে পারে যে, তর্কমূল সুদৃঢ় নহে, প্রবল প্রতিকুল তর্ক বাক্যা তাড়নায় তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। সুতরাং ক্ষীণ যুক্তি তর্ক অনেক সময় সরল বিশ্বাসী অগ্রসর মানব মনকে প্রতারিত করে।

ক্ষীণশক্তি ক্ষীণ সহায় মানবই হতাশ্বাস হইয়া পিছাইয়া পড়ে। কিন্তু বীর হৃদয় তত্ত্বান্বেষণের জন্য ভীষণ অশনি পাতও তুচ্ছ বোধ করতঃ রত্নাকরের রত্ন সংগ্রহে অগ্রসর হয়। সেই রত্ন ব্যবসায়ী স্বয়ং ধন্য হইয়া প্রিয়জনদিগকেও কৃত কৃতার্থ করেন। দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা সকল মানব চিত্তেই উদিত হয় না। হইলেও অনেকে সন্দেহাকুল চিত্তে প্রমাণ মান রজ্জু ধারণ করিয়া অগভীর জলে প্রবেশ করতঃ অকৃত কার্য্য হইয়া নিরাশ চিত্তে ফিরিয়া আসেন। এবং স্বীয় পুরস্কারের ফল স্বরূপ কঠোর লোকায়তিক মত প্রচার করেন। মানব চিত্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস শূন্য হইলে, ভীষণ নরকে পরিণত হইয়া উঠে। তাদৃশ মানব দানব মনুষ্য সমাজের প্রার্থিত শান্তি বিনষ্ট করে। সুতরাং যাহারা বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালন শ্রান্তি ক্লেশ পরিহারার্থ আপাত মধুর লোকায়তিক মত গ্রহণ করেন ও উদ্ধত দানব মদে বিশ্ব ধ্বংস করিতে উদ্যত হন তাঁহাদের অপেক্ষা অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তি নিজের ও জগতের কল্যাণ বিধান করেন। পারত্রিকের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসী মনুষ্য, মরুপ্রায় অশান্ত প্রাণে অনেকাংশে সান্তনা লাভ করিয়া থাকে। লোকায়তিক অশান্তির অরুন্তুদ শিখী শিখায় দহ্যমান হইয়া সান্ত্বনার অভাবে হতাশ প্রাণে জীবন বিসর্জ্জন করে। প্রিয় পাঠক! অবসরক্রমে এ বিষয়ে আরও অনেক বলিবার ইচ্ছা রহিল, অদ্য এই তুচ্ছ উপহার আপনারা সাদরে গ্রহণ করিলে চরিতার্থ জ্ঞান করিব

দুঃখাভিসার।

লেখক,—ডঃ শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

সম্পদে তোমারে পাইনা খুজিয়া—
বিপদেতে পাই হৃদয় মাঝারে ;
আশার আশ্বাসে হারাইয়া ফেলি—
নিরাশায় পুনঃ পাই হে তোমারে।
দীন হীন হৃদি আসন তোমার,
দীন প্রিয় তুমি, হে দীন তারণ ;
গর্ব্বিত স্পর্দ্ধিত উদ্ধত হৃদয়ে,
কভু তুমি বিভো পাতনা আসন।
তৃষিত তাপিত দগধ হৃদয়ে,
আহ্বানে যে জন, সতত তোমারে ;
জীবিকা যে জন করিছে অর্জ্জন,
ভিজাইয়া বক্ষ নয়ন আসারে ;
তুমি তারি বিভো, সেই প্রিয় তব,
ভাগ্যবান সেই এ জগতী তলে ;
তোমার করুণা চন্দন পরশে,
সব জ্বালা তার দূরে যায় চলে।
সে সম্পদ শিরে করি পদাঘাত,
যে সম্পদে তোমা ভুলিয়া যাই ;
মোহ বিজড়িত সুপথ বিচ্যুত—
আমাতে তোমারে খুজিয়া না পাই।
তাই আমি আজ করিয়াছি পণ,
চাহিব না সুখ থাকিতে জীবন,
আসুক দুঃখ আসুক দৈন্য,
চরণে আমারে করিতে দলন ;
দুঃখ ঝঞ্ঝা বহুক সতত—
শিরেতে অশনি হউক পতন ;

ছুটিয়া আসুক পরশি বিমান,
ডুবাতে আমারে সিন্ধু ভীষণ ;
সবারে(ই) আমি লইব বরিয়া,—
হাসি মুখে আমি সকলি সব।
সে সব তোমার করুণা ভাবিয়া,
হৃষ্ট পরাণে শিরে তুলি লব।
এক ভিক্ষা শুধু মাগি তব ঠাই—
দুঃখ দৈন্য শোক করিবারে জয়,
সহিষ্ণুতা গুণে মণ্ডিত করিয়া।
জীবন সংগ্রামে পাঠাও আমায়॥

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পাষাণময়ী দেবী মূর্ত্তি একটী পুষ্করিণীতে সমুদয় বৎসর জলে নিমগ্ন থাকেন। ঐ দিন জল হইতে উত্তোলিত হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন, বিশেষ সমারোহে বহু ছাগ পশু বলি হয়। শুদ্ধ ক্ষীরগ্রাম নহে, বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামে যোগাদ্যা দেবীর উৎসব ও পূজা হয়। ক্ষীরগ্রামে সমুদয় বৈশাখ মাস দেবীর উৎসবের মাস বলিয়া স্ত্রীলোকেরা অনেকে গৃহ কর্ম্ম করেন না। কুম্ভকার নিজকর্ম্ম বন্ধ রাখে, গ্রামের মধ্যে কেহ ছত্র ব্যবহার করেন না। অন্যান্য গ্রামেও বিবিধ প্রকারে উৎসবের দিন সম্মানিত হইয়া থাকে, স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রাদি পরিষ্কার করেন না, শুদ্ধাচারে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম করেন, কৃষকেরা হল চালনা করে না। নিকটবর্ত্তী গ্রামেও সমুদয় দেব দেবীর মন্দিরে পূজা ও উৎসব হয়। দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে আজ সেই উৎসবের দিন। সূর্য্যদেব ভীষণ করজাল বিস্তার করিয়া অস্তাচলে শয়ন করিতেছেন। বায়ু অগ্নি কণার ন্যায় অনুভূত হইতেছে। নব বিকশিত তরুরাজির অঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক ও ক্ষীণ

কলেবর পুষ্করিণী ও খড়্গেশ্বরীর জলরাশি চুম্বন করিয়া সমীরণ ক্রমে শীতল ভাব ধারণ করিতেছেন। চন্না ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে বহু লোকের সমাগম হইতেছে। দেবীর মন্দির ও তৎসম্মুখবর্ত্তী স্থান সুশোভিত হইয়াছে। যাত্রা, কবি ও শ্যামা সঙ্গীত হইবে। শ্যামা সঙ্গীতের অধিকারী সাধক কমলাকান্ত। বয়স নবীন হইলেও কবিত্বে প্রবীণ। দেবীর মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত স্থানে শ্রোতাগণ উপবিষ্ট। মুক্ত কোকিল কণ্ঠে, প্রাণের উচ্ছ্বাসে সঙ্গীত আরম্ভ হইল। শ্রোতাগণের হৃদয়ে অমিয়ধারা নিপতিত হইতে লাগিল। সুরের মাধুর্য্য শ্রোতাগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের ধমনী ও শিরা সকলকে শিথিল করিতে লাগিল। দেবীর মন্দির, দেবীর মহিমা স্তবে ও সুমধুর স্বরে পরিপূর্ণ হইল। বিবিধ পাদপ ও লতা বৃক্ষ পরিশোভিত খড়্গেশ্বরীর তীরে সঙ্গীত-সুধা বর্ষিত হইতে লাগিল। সাধক নূতন নূতন সুরে, স্বরচিত নূতন নূতন পদাবলিতে সমাগত জনগণকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন। ধন্য কমলাকান্ত মাতের বর পুত্র ইত্যাদি শব্দে তাঁহার স্তুতিবাদ চতুর্দ্দিক হইতে শ্রুত হইতে লাগিল।

সেই দিন অম্বিকা হইতে সাধকের জনৈক ধনাঢ্য শিষ্য চান্নায় আসিয়াছিলেন। তিনি গুরুপুত্রের অসাধারণ শক্তি, অপরিসীম ভক্তি, কণ্ঠের মাধুর্য্য, লোক বিমোহনের অপূর্ব্ব ক্ষমতা সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। ইষ্টদেবের পুণ্যের মূর্ত্তিমান ফলস্বরূপ গুরুপুত্রকে দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ স্বর্গীয় গুরুদেবের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক গুরুপুত্রের মুখ মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে গুরুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক মাতা ঠাকুরাণীর নিকট গুরুপুত্রের অমানুষিক ক্ষমতা, অপার ভক্তি এবং তিনি যেরূপে সমাগত লোকদিগকে বিমোহিত করিয়া ছিলেন, তৎসমুদয় অতি আহ্লাদের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাতা ও পুত্রের সুখ্যাতি শ্রবণে সুখী হইলেন। শিষ্য কহিলেন, গুরু ও তাঁহার সন্তান আদি ভক্তিমান, ধার্ম্মিক, বিদ্বান, যশ ও প্রতিভাশালী হইলে তাঁহার বংশাবলির শ্রেয়োলাভ হইবে; বংশাবলি ধার্ম্মিক হইবে, সাত্বিক হইবে, এই জন্যই আজ আমার বড় আনন্দ হইতেছে। আমি সৎগুরুর শিষ্য বলিয়া আমাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিতেছি। আজ আমার গুরুদেব জীবিত থাকিলে না জানি কতই আনন্দ অনুভব করিতেন। মা! তোমার এই পুত্র তোমার পুণ্যের ফলস্বরূপ।

ইনি বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। সাধক অবনত বদনে উপবিষ্ট ছিলেন, ভুবন মোহিনীর ধ্যান মগ্ন, নয়নে প্রেমাশ্রু, শিষ্যের সকল কথা তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। মাতা কহিলেন, "বাবা? তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য, কিন্তু আমরা সংসারী, অর্থ বিনা আমাদের সম্মান রক্ষা হয় না। সংসার ধর্ম্মে ব্যাঘাত হয়। তোমার গুরুদেব সংসার চলিবার উপযুক্ত তেমন কিছু রাখিয়া যান নাই, কেবল তোমরাই আমাদের সম্পত্তি, কিন্তু তোমাদের নিকট যখন তখন যাওয়া প্রয়োজন, তোমাদের মঙ্গল কামনায় দেব পূজা, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন আদিও মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন। কমল আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, পার্শ্বে উপবিষ্ট, অপরটীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এইটী নাবালক। সংসারের ব্যয়ভার বিস্তর, কমলের মনের অবস্থা ভাবিয়া আমাকে অনেক সময় চিন্তিত হইতে হয়। সংসারের শত দুঃখে কমলের হাস্য বদনের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাইনা। আনন্দময়ী নিশ্চয়ই কমলের মনের অবস্থা অন্যরূপ করিয়াছেন।" সাধক কহিলেন, "মা আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আপনার আদেশ যথাসাধ্য প্রতি পালন করি। যে কার্য্যে আপনি দুঃখিত হইবেন তাহা আমি ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করি। ইহা নিশ্চয় জানিবেন এ জীবনে কখনও আপনার কথায় অবহেলা করিব না।" সাধকের কনিষ্ঠ কহিলেন, "মা যা বলেন, দাদা তাই করেন, কিন্তু কাজ কর্ত্তে দেরী হয়ে যায়, আমি সঙ্গে গিয়ে দেখেছি, দাদা বড় আস্তে আস্তে যান, ভাল গাছ পালা দেখ্‌লে সেই দিকে তাকিয়ে কি ভাব্‌তে থাকেন, যদি পাখী ডাকে, কাণ পেতে শোনেন, হয় ত সেই খানেই গান ধরিয়া বসেন, কখন বা গাছের দিকে চেয়ে তাঁহার চোকের জল পড়ে; কাজেই দেরী হয়ে যায়।" শিষ্য কহিলেন, "তোমার দাদার মত তুমি হতে পার্ব্বে না।" বালক বলিল, "আমার অমন সুর নাই কি করে হব।" শিষ্য কহিলেন, "দেখুন মা! আজ হইতে আমি এ সংসারের সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিব। আপনার মাসিক ব্যয় ও সাময়িক ব্যয়, যখন যাহা হইবে আমি আহ্লাদের সহিত নির্ব্বাহ করিব।" কমলাকান্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কমলাকান্ত আপনাকে আর সংসারের অর্থ চিন্তায় মনকে দুঃখিত করিতে হইবে না। আপনি পরমার্থ চিন্তা করুন। পরমার্থ চিন্তা বহু সুকৃতি সাধ্য। আপনি মহামায়ার উপসনায় নিরত থাকুন। আপনার তপঃপ্রভাবে পর্জ্জন্যদেব প্রসন্ন হইয়া সময়ে বারি বর্ষণ করুন। পৃথিবী শস্যশালিনী হন, রোগ শোক অকাল মৃত্যু অন্তর্হিত হক, প্রকৃতি পুঞ্জ

রাম রাজ্য সুখ ভোগ করুক। পুণ্যকর্ম্ম সংসার বৃক্ষের মূল স্বরূপ, সুখ ও শান্তি তাহার ফল ও পুষ্প, যোগী সাধক ও ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ তাহার বীজ ও রস।" সাধক কহিলেন, "আপনার জয় হ'ক। মা আমার সংসারের অভাব জন্য অনেক সময় দুঃখিত থাকেন, সেই জন্য আমার প্রাণ কাতর হয়, কিন্তু দাদা সত্য বলিতেছি, সে দুঃখ আমার হৃদয়ে মেঘের বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দেয়, মুহূর্ত্ত মধ্যে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়। মা আমার হাসিভরা মুখে মনের বাঝে আসিয়া হৃদয় আসন অধিকার করেন।" শিষ্য কহিলেন, "ভাই কমলাকান্ত আপনিই ধন্য। সকল লোকেরই মুখে শুনিতেছি, "কমলাকান্ত মায়ের ছেলে" আমারও তাই বিশ্বাস, আপনি মায়ের বর পুত্র, আপনার শ্রেয়োলাভ হউক, শিষ্য আপনার প্রসন্নতার প্রার্থী। শিষ্যের বদান্যতার কথা শুনিয়া শুনিয়া জননীর নয়নে জলকণা দৃষ্ট হইল। তিনি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি তোমাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব জানি না, জননীর কণ্ঠরোধ হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "এই দুটী সন্তানকে লইয়া আমাকে অনেক সময় চিন্তিত হইতে হয়। আমার ভ্রাতার আয় অধিক নহে, সাংসারিক ব্যয়ও বিস্তর, আমার সমুদয় ব্যয় ভার তাঁহার উপর দিতে আমার কষ্ট বোধ হয়। তুমি দীর্ঘজীবি হও, তোমার জয় হউক। আমার আর একটী অনুরোধ আছে, তুমি কমলকে অম্বিকায় লইয়া যাও, তোমার নিকট নাথ, যাহাতে সে গৃহস্থ হইতে পারে, সে বিষয়ে চেষ্টা কর। কমলের বিবাহ হইয়াছে, তাহার সন্ন্যাস বেশ আমি কখনই দেখিতে পারিব না! ভগবৎ চিন্তার নানাবিঘ্ন, সংসারী লোকের একাগ্রতা হওয়া বড় কঠিন, কিন্তু যাহাদের উপর ভগবানের কৃপা হয়, তাঁহাদিগকে সংসারে রাখা বড় শক্ত। বিশুদ্ধ ভক্তিমান বিষয়ী লোকের সামান্য অবস্থাপন্ন লোকের কথাও তুমি শুনিয়াছ, সোণার সংসার সোণার পরিবার, সোণার বৈভব ছাড়িয়া দিয়া, ঝুলি স্কন্ধে করিয়া ভেক লইয়াছেন। পাছে আমার কমলও ঘর বাড়ী ছাড়িয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়, বাবা! আমার এই ভয় সর্ব্বদা হয়। জননীর বাক্য শেষ হইবামাত্র সাধক বিনীত স্বরে কহিলেন, "মা! আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি, আমি দেশ ত্যাগ করিব না, আপনার চরণ দর্শন ও আজ্ঞা প্রতি পালন করিব, তাহার কখনই অন্যথাহ ইবে না।" শিষ্য কহিলেন, "মা! পৃথিবী না থাকিতে পারে, সূর্য্য চন্দ্রের উদয় অস্তের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, কিন্তু সংযত সাধক পুরুষের বাক্য কখনও অন্যথা হইবার নহে, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, তিনি

কখনই দেশ ত্যাগ করিবেন না, কমলাকান্ত অধিকাংশ সময়ই অম্বিকায় থাকিবেন, তাঁহাকে কোন নিয়মের বশীভূত করা আপনার ও আমার কর্ত্তব্য নহে। মেধাবী ধার্ম্মিক পুরুষ দিগের মনকে ভারাক্রান্ত করা উচিত নহে।" জননী কহিলেন, "বাবা! তুমি যাহা উচিত তাহাই করিবে। এই পিতৃহীন বালক দুটীকে সহোদরের ন্যায় দেখিবে, আমার এই মাত্র অনুরোধ। অনন্তর মাতা বিদায় গ্রহণ করিলেন। সাধক ও শিষ্য পরমার্থ বিষয়ে কথোপকথন করিয়া সুখী হইতে লাগিলেন।

সাধকের কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয়।

আজ শুনুড়ে রক্ষা কালীর পূজা। শুনুড়ে গ্রাম বর্দ্ধমানের উত্তর, চারা হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ। শুনুড়ে বিশিষ্ট ধনাঢ্য লোকের বাস না থাকিলেও অনেকগুলি মধ্যবর্ত্তী লোকের বাস ছিল। প্রায় সকলেরই কৃষি বৃত্তি, প্রত্যেক গৃহই ধনধান্যে পরিপূর্ণ, গোধন সকল সুকায় হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ, জলাশয় সকল স্বচ্ছ সলিল পূর্ণ, বৃক্ষ সকল ফল পুষ্প পরিশোভিত, অতএব গ্রামে সুখ ও শান্তি সুলভ ছিল, অভাব ও ব্যাধির প্রবেশের অধিকার ছিল না। পূর্ব্বে বঙ্গে প্রায় সকল গ্রামেরই অবস্থা এইরূপ ছিল। এমন গ্রাম দৃষ্ট হইত না, যেখানে অন্ততঃ বৎসরে একবার মহোৎসাহ না হইত। হিন্দুর সকল কর্ম্মই ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হিন্দুর মহোসাহও ধর্ম্ম কর্ম্ম অবলম্বনে সম্পাদিত হইত! সাধকগণের যেমন সর্ব্ব কর্ম্মই "তদর্থং" বিশ্বরূপ পরমাত্মার প্রসন্নতার জন্য, হিন্দু গৃহীর সর্ব্ব কর্ম্মই বৈদিক ক্রিয়া কলাপ সংযুক্ত, চিত্তশুদ্ধি কারক, জ্ঞান ও ভক্তি প্রদায়ক ও মুক্তিমার্গ প্রদর্শক। মহোৎসাহের প্রধান অঙ্গ শ্যামাপূজা, হরিনাম সংকীর্ত্তন তৎসঙ্গে লৌকিক বিদ্যা সকলের উৎকর্ষ সাধন, যথা শিল্প প্রদর্শন, মূর্ত্তি সকলের অনুরূপ গঠন, যাত্রা, কবি ও পাঁচালী প্রভৃতি দ্বারা কবি কুলের পরিপোষণ ও উৎসাহ দান। এই সকল সমাজ হিতকারী কর্ম্মদ্বারা হিন্দু সাধারণকে ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট না রাখিলে পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম বিপ্লবে এতকালে কোন দিন হিন্দু ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইত। মহোৎসাহ সকল ধর্ম্ম ভিত্তির উপর সংস্থাপিত বলিয়া প্রত্যেক মহোৎসাহে ধর্ম্ম যাজক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধক, কবি, বৈষ্ণব, অতিথি প্রভৃতি বিবিধ লোকের সমাগত হইত। শুনুড়ে আজ উৎসবের সীমা নাই। উৎসব ক্ষেত্রের একধারের মধ্যস্থান অবলম্বন করিয়া গৃহ মধ্যে মঙ্গলময়ীর প্রতিমা সংস্থাপিত। গৃহটী রঞ্জিত বাতাতপ নিবারণ যোগ্য বস্ত্রখণ্ড সকল

দ্বারা মণ্ডিত। গৃহ দ্বারে আম্র পল্লব সংযুক্ত মাঙ্গলিক ঘট ও কদলী বৃক্ষ। প্রতিমার সম্মুখে কিয়ৎদূরে শ্যামা সঙ্গীত. যাত্রা, কবি, পাঁচালী প্রভৃতির জন্য বৈঠক স্থান। সেই বৈঠক স্থানের উপরের আচ্ছাদন রঞ্জিত তাল পত্র অতি সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত, শীত বাত আতপ জল নিবারণ উপযোগী সেই স্থানে স্তম্ভ সকল রঞ্জিত বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত, প্রত্যেক স্তম্ভে এক এক খানি চিত্র এবং এক একটী কাচ নির্ম্মিত দীপ সন্নিবেশিত। মহোৎসবের চারিধারে শিল্প প্রদর্শনের স্থল। কোথাও রাজসূয় যজ্ঞ, রাম রাবণের যুদ্ধ, কীচক বধ, ছবি দ্বারা অভিনীত হইতেছে, স্থানে স্থানে প্রহসন চিত্র, শিল্পকারগণের শিল্প চাতুর্য্য প্রকাশ করিতেছে। দাম্পত্য কলহ, মদ্যপায়ীদিগের মত্ততার পরিণাম প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক পূর্ণ ঘটনা সকল অবিকল প্রতিকৃতি দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে. কোন স্থানে দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বিতরণ, কোন স্থানে হরিনাম সংকীর্ত্তন, কোন স্থানে মল্লদিগের ক্রীড়া, বহুলোকের সমাগমে ও তাহাদিগের হাস্যময় বদনে মহোৎসবের স্থানটির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। গ্রামবাসীগণের আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্বগণের গমাগম হওয়াতে প্রত্যেক গৃহই বিবাহ গৃহের ন্যায় আনন্দ উৎসাহে পরিপূর্ণ। গ্রামের প্রান্তভাগে আতস বাজী সকল পরিদর্শিত হইতেছে, নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের অধিবাসীগণকে শুনুড়ের আনন্দে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিয়া আতস বাজীর শব্দ দিগন্তরে ছুটিতেছে ও অগ্নিকণা সকল নভোমণ্ডল আলোকিত করিতেছে। ক্রমশঃ

কবি।

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী।

নবনী কোমল শিশু অঙ্গ পরশন—
সম স্নিগ্ধ লাগে দেহে প্রভাত সমীর!
চলে কবি গাহি গান, প্রবেশিয়া বন—
চরণ ক্ষেপণ তার ধীর—অতি ধীর!
কবিরে হেরিয়া তরু করে নমস্কার—
পত্র ফুল ঝরে পড়ে কবির চরণে!

লয় কবি হাসি মুখে এই পূজাভার—
হাসি চলে গাহি গান, আপনার মনে!
শুনিয়া কবির গাথা পিকের কাকলী—
থেমে যায়—থেমে যায়, প্রবাহিনী ধারা।
শিকার ত্যজিয়া অহি হয়ে কুতূহলী,
ফণা দুলাইয়া তাল, রাখে মাতুয়ারা!
গাহে কবি, কাঁপাইয়া কানন নির্জ্জন—
সেই গানে হয়, ব্যোমে বিশ্বের সৃজন!

প্রার্থিনী।

(গল্প)

সাহিত্য-রত্ন—শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

(১)

"কন্যা নরয়তে রূপং"

অস্তাচল চূড়াবলম্বী মরীচিমালীর শেষ কিরণটী আকাশ পট হইতে মুছিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে কুমার নদের তীরে আনন্দধামের শ্মশানে চিতাগ্নির শেষ অগ্নি স্ফুলিঙ্গটুকু নির্ব্বাপিত হইল। অদূরে বৃক্ষ বল্লরীর মাঝে একটা সান্ধ্য হাওয়া মর্ম্মর শব্দে পরেশ বাবুর সঙ্গে যেন একটা মর্ম্মন্তুদ সমবেদনা জানাইয়া দিল।

রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, সরলাকে সর্ব্বগ্রামিনী শ্মশান রাক্ষসীর কবলে উৎসর্গ করে পরেশ বাবু অস্থির হয়ে পড়্‌লেন।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম্ম বোঝা যায় না—স্ত্রী যে কত ভালবাসার বস্তু, জীবন বীণার কতখানি সুর যে, ঐ তারটীতে বাঁধা থাকে—জীবন তরণীর ঐটীই যে প্রধান মাস্তুল, তাহা আগে জানা যায় না। স্ত্রী মরিলে সেটুকু মানুষ বুঝিতে পারে। তাই যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী—শ্মশান বাসী, সাক্ষাৎ নির্লেপ, দেবাদিদেব স্বয়ং শম্ভু পর্য্যন্ত সতী শোকে ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত হ'য়ে পড়্‌লেন। অন্যে পরে কা কথা।

পতি পরায়ণা সরলার চিতাভস্মের স্পর্শে কুমার পবিত্র হইয়া কুল কুল স্বরে সতীর মাহাত্ম্য সঙ্গীত গাইতে গাইতে অনন্তের দিকে ছুটে গেল। এদিকে পরেশের সকল বন্ধন টুটে গেল—অল্প ঘেরা প্রাণটুকুর মধ্যে সহসা বিশ্বের অনন্ত আয়তন অনন্ত ফাকা—অনন্ত ব্যোম ঐশ্বর্য্য ঢুকে পড়্‌ল। সে মহা মাহমা—সে বিরাট গাম্ভীর্য্য, জাগতিক একত্বের সে বিরাট ঝঙ্কার—মহান্ অভিব্যক্তি পরেশ সহ্য করিতে পার্‌লেন না। সত্য সত্যই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের মত পরেশ অভিভূত হয়ে পড়্‌লেন। দারুণ অবসাদের গিরি নিতম্বের গুরু ভার তাঁর প্রাণের উপর চেপে পড়্‌ল।

অনন্যোপায় হয়ে দেব চরিত্র পরেশ বাবু সুরার আশ্রয় লইলেন। শোকে যখন মানুষ মৃতপ্রায় হয়ে উঠে, তখন সুরাপানের ব্যবস্থা আছে। তখন সুরাপানে মহাপাতক হয় না।

দুই পাঁচ বৎসর পরই এই বিষ পানের ফল ফলিতে আরম্ভ হইল। চর্ম্মের অসাড়ত্ব দেখা দিল—সে এমন অসাড়ত্ব যে, একখানি জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ড শরীরে পড়িলেও তাহাতে চৈতন্য হইত না; শুধু তাই নহে, হাতে পায়ে অকারণে বড় বড় ফোস্‌কা উঠ্‌তে লাগ্‌ল, ফোস্‌কা গুলি গলে গলে ঘা হয়ে গেল। সে ঘা আর সার্‌তে চায় না—এইরূপে ক্রমে রক্তাল্পতা দেখা দিল, ক্রমে রক্ত দুষ্টি হয়ে পড়্‌ল।

বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাঙ্গালায় এসেছিলেন, নানা কারণে তাঁকে দেখাইবার সুবিধা হওয়ায় পরেশ বাবু তাঁকে নিজের দেহটা দেখাইলেন। ডাক্তার গর্জ্জন তৈল মাখিবার ও খাইবার ব্যবস্থা দিলেন।

গর্জ্জন তেল কিনে নিয়ে পরেশ বাবু গায়ে মাখ্‌তে গিয়ে দেখ্‌লেন—বিশ্রী আঠা। এমন আঠা যে দুখানা হাতে জুড়ে গেলে আর খুল্‌তে চায় না। আনন্দধাম পল্লীগ্রাম—সেখানে ভাল ডাক্তার নাই। গর্জ্জন তেলের এ অসুবিধা কিরূপে যেতে পারে সে কথা সেখানে কেহই জানে না। কাজে কাজেই পরেশ বাবুর ঐ তেল খাওয়া বা ব্যবহার করা হইল না। বোতলের তেল বোতলেই রহিল। পরেশ বাবু দুরারোগ্য ক্ষতরোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়্‌লেন।

শয্যাশায়ী হইবার পর পরেশ আর মদের নামও কর্‌তেন না। মদেই যে আজ তাঁর ঐরূপ দুর্দ্দশা, তা বেশ বুঝে ছিলেন। পূর্ব্বে বুঝিলে কাজ

হইত, এখন বুঝিবার ফলে অনুতাপ ভিন্ন আর কি? "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।"

(২)

ভবসিন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের ভূসম্পত্তি নেহাৎ কম নহে। লাখেরাজ জমি ৮০ বিঘা, তাছাড়া মৌরসি জোতও প্রায় ৪০ বিঘা, মাল খাজানা অতি সামান্য, মাত্র ১২৶০ বার টাকা তিন আনা দিতে হয়। সুতরাং এ জোতও দেখ্‌তে গেলে লাখেরাজের সামিল।

অতটা ভূসম্পত্তি থাক্‌লে পাড়াগাঁয়ে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের আর অচল হয় না। বেশ মানুষ মান্‌বেতাই করে সংসার চলে। ওর মধ্যে আয়ের গায়ের সবই হয়।

কাল মাহাত্ম্যে ভবসিন্ধু বাবু অত সম্পত্তি থাক্‌তেও কষ্ট পেলেন। সে কালের রেওয়াজ ছিল ভদ্র লোকের একটী বা দুইটী করিয়া রক্ষিতা থাকা চাই। ভবসিন্ধু চট্টোপাধ্যায় ভদ্রলোক, সুতরাং রক্ষিতার শৃঙ্খল হইতে নিষ্কৃতি পেলেন না। সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চরিত্র সঙ্গীও যথেষ্ট জুটিয়া গেল।

জমা জমির আয় অধিকাংশই মেনকা সুন্দরীর পাদপদ্মে উৎসৃষ্ট হইল। এইরূপে ষোড়শোপচারে অনঙ্গদেবের পূজার্চ্চনা কর্‌তে কর্‌তে ভবসিন্ধু প্রেম-সিন্ধুতে ডুবে গেলেন। পুত্র কলত্রের দিকে আর দৃষ্টি রহিল না। সাতটী পুত্রের মধ্যে দুইটী মাত্র বেঁচে রহিল, আর পাঁচটী অযত্নে অকালে কাল-কবলে কবলিত হল।

ভবসিন্ধুর সাধ্বী স্ত্রী দারুণ পুত্রশোকে জর্জ্জরিত হয়ে মাত্র দুইটী রুগ্ন পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে শোক ভুলিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

ক্রিয়ার একটা প্রতিক্রিয়া আছে। প্রবৃত্তির বেগ চরমে উঠ্‌লেই আবার নিবৃত্তি দেখা দেয়—চরম পাপের পর মানুষ আবার ফেরে। দস্যু রত্নাকর, বিল্বমঙ্গল, জগাই মাধাই সকলেই ফিরিয়াছিল। ভবসিন্ধুর মতিও কালক্রমে ফিরিল।

যখন ভবসিন্ধুর সুমতি দেখা দিল, তখন তাঁর জীবন গগনে আর বেলা নাই—স্বাস্থ্যের ম্লান রশ্মি নিভে যায়,—যায় হয়ে এসেছে।

ক্রমে ক্রমে কালের ছায়া এসে পড়্‌ল। ভবসিন্ধু সজ্ঞানে চক্ষু বুঁজিলেন—বুঁজিবার সময়, জেষ্ঠ পুত্র পরেশকে ডেকে ফোস্ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলে বল্‌লেন,—"বাবা! আমি প্রবৃত্তির তাড়নায়—কু সঙ্গের মোহে তোমাদিগের দিকে কোন দিন চাইতে পারি নাই, আমি আজ চির দিনের মত তোমাদের স্নেহ বন্ধন কেটে চল্‌লেম। তুমি বড় হয়েছ, তোমার জন্য আর ভাবিনে— পরিমল বড় শিশু, ওর কিছুই কর্‌তে পারিনি, ওকে মানুষ কর্‌বার ভার তোমার উপরে থাক্‌ল—সর্ব্বস্ব বিক্রয় করেও ওকে মানুষ করো—"

পরেশ প্রাপ্ত বয়স্ক হইলেও কেঁদে ফেল্‌লেন—পিতার অন্তিম কালের ঐ খেদমাখা কথাগুলি সহ্য করিতে পার্‌লেন না। পরেশ আকুল প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌লেন—"বাবা! বাবা! বাবা! আমাদের কি হবে,—আমাদের আর কে আছে, বাবা! বাবা! বাবা!"

ভবসিন্ধু! বাবা! আকুল হয়োনা—স্থির হও—ভয় কি? বিপদে ভগবানকে ডেকো—তিনিই তোমাদিগকে দেখ্‌বেন—আমাকে আর মায়ায় জড়িও না—তোমরা কাঁদ্‌লে আমার ঊর্দ্ধগতিতে বাধা পড়্‌বে—বাবা আমার, এখন পুত্রের কাজ কর, আমাকে বাহিরে কর, ভগবানের নাম দাও, শেষ কথা—পরিমলকে মানুষ করো।

ভবসিন্ধু আর কথা বল্‌লেন না। চক্ষু মুদিলেন। পাঁচ সাত মিনিট পরেই তাঁর জীবাত্মা সমবেত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মুখে "ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" ধ্বনি শুনতে শুনতে অনন্ত ধামে প্রস্থান করিলেন।

ভবসিন্ধুর মৃত্যুর সাত আট বৎসর পরে পরেশের মাও সংসার বন্ধন ছিন্ন কর্‌লেন। মহাযাত্রার সময়ে তিনিও পরেশকে বলে গেলেন—বাবা! কালপূর্ণ হইলে সকলকেই যেতে হয়; কাতর হইও না; পুত্রবধূ নিয়ে সংসার কর্‌বার সাধ পূর্ণ হলনা, বড় ইচ্ছা ছিল, পরিমলের বিয়ে দিয়ে বৌ দেখ্‌বো—ভগবান্ সে ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌লেন না—তুমি অবিশ্যি অবিশ্যি পরিমলেয় একটা ভাল বিয়ে দিয়ে উহার সংসার পাতিয়ে দিও—তুমিই এখন উহার জীবনের প্রধান অবলম্বন—উহাকে কোন দিন তাড়না করনা—সর্ব্বদা মিষ্টিকথা বোলো—স্নেহের সঙ্গে মানুষ কোরো—অবিশ্যি অবিশ্যি বিয়ে দিও।

ঐ কথাগুলি বলিয়া, দুই ভাইকে মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন; তারপর চিরদিনের মত চোখ বুঁজ্‌লেন—সঙ্গে সঙ্গে দর্ দর্ ধারে চোখের কোন্ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ল

পরেশ ও পরিমল মা—মা—মা—মা বলে কেঁদে ফেল্‌লেন। পরিমল

ছেলে মানুষ, সে কেঁদে আকুল! তার কান্না আর থামে না! পরিমল একেবারে ভেঙ্গে পড়্‌ল।

পরকে উপদেশ দেওয়া খুব সহজ—"পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাম্।" শোক করিও না, বলা খুব সহজ। শোকের ব্যাপার যখন ঘটিয়া উঠে, খুব কম লোকই স্থির থাক্‌তে পারে। যুধিষ্ঠিরের মত জীবন্মুক্ত মহাত্মাও অভিমন্যুর শোকে বিহ্বল হয়ে ছিলেন।

সুতরাং পরিমল মা—মা বলে কেঁদে আকুল হবে, সেটা আশ্চর্য্য কি?

(৩)

সংসারে পরেশ, পরিমলের; পরিমল পরেশের। পরিমল দাদা ভিন্ন আর কিছু জানে না; পরেশেরও সমস্ত প্রাণটুকু পরিমলের মধ্যে।

পরেশ শয্যাগত থেকেও পরিমলকে হাই স্কুলে পড়াইলেন। যথা সময়ে পরিমল পাশ হইল।

পরিমল বেশ স্ফুর্ত্তিতে দাদার কাছে গল্প শোনে—নবীন যৌবনে পরিমলের কত কি কল্পনা খেলে; পরিমল ভাল ভাল পদ্য লেখে, লিখিয়া তার দাদাকে দেখায়, দু'ভায়ে কত হাসে, পরেশ তাকে প্রতিপদেই উৎসাহ দেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরিমল দুই তিন খানা খাতা পদ্য লিখে পূর্ণ কর্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে দাদাও ভাল সমালোচনা করিয়া দিলেন। পরেশের আনন্দ তাঁর ছোট ভাই স্নেহের পুতুল পদ্য লিখ্‌তে শিখেছে! পরিমলের আনন্দ—তার শিক্ষিত দাদা ভাল বলেছেন।

এইরূপে দুই ভাই লেখা পড়ার আনন্দে দিন কাটে। আর দুজনেরই ঝোঁক ফুল গাছ রোপণের দিকে, পরামর্শ করে এমন ভাবে ফুল গাছ বসায়, যাতে ত্রিভুজ, বৃত্ত প্রভৃতি জ্যামিতির কোন না কোন মূর্ত্তি প্রকাশ হয়।

ফুল গাছে ক'টী কুঁড়ি হইল, কোন্ কুঁড়িটা আজ ফুট্‌বে, কাল কোন্‌টা কোন্‌টা ফুট্‌বে, তাই ভেবে ঠিক করে; ফুল ফুট্‌লে স্ফূর্ত্তির অবধি থাকে না। তীব্র দৃষ্টিতে—কড়া পাহারায় দুভায়ে ফোটা ফুলগুলি পাহারা দেয়—কেহ তুলিতে এলে, পরেশ বাবু বলেন,—গাছ থেকে তুলে ভগবানকে দিলে তাতে তাঁর অর্চ্চনা হয় না, তিনি তাতে অসন্তুষ্টই হন, তাঁর সৌন্দর্য্য নষ্ট কর্‌লে তাতে তাঁর তৃপ্তি হতে পারে না। গাছের ফুল গাছে থাক্‌লেই ভাল, তার সৃষ্টি নৈপুণ্য দেখে লোকে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করুক, ফুলের সৌন্দর্য্য দেখে

লোকে উপলব্ধি করুক, যে তিনি অনন্ত, অফুরন্ত, অচিন্ত্য, অতুলনীয় অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের আধার। গাছের ফুলকে গাছে রেখে ভগবানকে ভাবতে শেখাই অর্চ্চনা—সেখানেই ফুলের যথার্থ ব্যবহার।

পরেশের ঐরূপ টিপ্পনীতে কেহ ফুল লইতে সাহস করিত না। অথচ যে গাঁদা ফুলটী ফোটে বা নিশ্চয় ফুটিবে বলে জানা আছে, প্রাতে দু'ভাই দেখে যে, কে সেটা নিয়ে গিয়েছে! এইরূপ প্রত্যহই ফুল চুরি যেতে লাগ্‌ল।

পরেশকে দুঃখিত দেখে, পরিমল বলিল—"দাদা আজ আমি চোর ধরব।"

স্কুল বাগানের মধ্যে একটা ঝাঁকড়া বাতাবি লেবু গাছ ছিল। গাঁদা ফুল গাছগুলি ঐ গাছের ঠিক তলায়।

পরিমল রাত্রি তিনটার সময় কতকগুলি কালো কাপড় নিয়ে লেবু গাছের একটা ডালে বসে রহিল। রাত্রি চারটার সময় পরিমল দেখিল, একটী ছায়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে লেবু গাছের নীচে সেই গাঁদা ফুল গাছের মধ্যে ঘুরিয়া পট্ পট্ শব্দে ফুল তুল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল।

রাত্রি ঝাঁ-ঝাঁ করছে—নীরব নীথর; কেবল ঝিল্লীর একতান সুর ও পত্র হইতে পত্রান্তরে শিশির বিন্দুর টুপ্ টাপ্ পতন শব্দ শুনা যাচ্ছে। আর মধ্যে মধ্যে রাত্রিচর পাখীর পক্ষ সঞ্চালন শব্দও হচ্ছে। ঠিক সেই সময় ঐ ছায়ামূর্ত্তি ফুল বাগানে দেখা দিল।

পরিমলের বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে দুই তিন গৃহস্থ নির্ব্বংশ হয়ে গিয়েছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা এঁধো এঁধো ঘর পড়ে আছে; সে ঘরের মধ্যে চামচিকে, বনবিড়াল ও সাপের আড্ডা। ঐ সব পড়ো বাড়ীর উঠান জঙ্গল; সেই জঙ্গলে গোক্ষুর সাপ, বন্য শূকর ও শজারু অবাধে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। সাধারণের বিশ্বাস ঐ পড়ো বাড়ীতে মড়ার অস্থি পোতা আছে, আর ঐ বাড়ীতে অপদেবতা বাস করে।

সহরের চেয়ে পাড়াগাঁয়ের লোকেরা বেশী ভূত বিশ্বাস করে।

যে মূর্ত্তিটী ফুল তুল্‌তে অত রাত্রে ঐ পড়োবাড়ীর সংলগ্ন ফুল বাগানে গিয়ে উঠেছিল—তারও যথেষ্ট ভূতের ভয় আছে। কিন্তু কি করে? ভয়ের চেয়ে লোভই বেশী হওয়ায়, যেতে পেরেছিল। সাহসে ভর করে ফুল তুল্‌লেও অপদেবতার ভয়, ফল্গু প্রবাহের মত তার মনের মধ্যে বিরাজ কর্‌ছিল।

মূর্ত্তির প্রাণ পরিমল একটু খাঁদাসুরে সহসা লেবুর ডাল ঝাঁকাইয়া বলে

উঠ্‌ল হুঁ—উঁ উঁ ফুঁল্—ফুঁল্‌ছিস্! ফুঁল তুঁল্‌ছস্ ফুঁল তুঁল্‌ছিস—হুঁ উঁ উঁ—উঁ।

যেমন ঐরূপ করা আর সেই ছায়াটী থর্—থর্—থর্ করে কেঁপে উঠ্‌ল। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। পরিমল তখন খুব জোরে হাঁ—হাঁ—হাঁ শব্দ করে তার গায়ে ধূলোগুলি ছিটিয়ে দিল। তখন সেই ছায়া অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ কর্‌তে কর্‌তে আরও বেগে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। অদূরে একটা মোটা শিকড় ছিল উহাতে বেধে মূর্ত্তিটী পপাত ধরণীতলে—ভয়ানক আছাড় খেয়ে পড়্‌ল। হাতের ফুলের সাজী ঠিক্‌রিয়ে ছুটে গেল।

কিছু আগে একটা শেয়াল ফুলবাগানে মলত্যাগ করে গিয়েছিল। পড়্‌বি তো পড়, সেই সদ্যজাত তাজা বিষ্ঠার উপর মুখ থুব্‌ড়ে গিয়ে পড়্‌ল।

পরিমল হাস্‌তে হাস্‌তে গাছ থেকে নেমে এল, গোলমালে পরেশ বাবুর ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায়, তিনিও আলো নিয়ে বেরিয়ে এলেন। আলোকে দেখা গেল—ইনি পাড়ার এক বিধবা ভট্‌চাজ ঠাকুরাণী। নাকে মুখে শেয়ালের বিষ্ঠা মাখা।

গ্রাম সম্পর্কে পরেশ এঁকে পিসি বলে ডাক্‌তেন। এর নাম সাবিত্রী।

পরেশ। পিসিমা! এ দুর্গতি কেন?

সাবিত্রী। বাবা! তোমার ভাই যে, এমন গেছো ছেলে, তা জানিতাম না বাবা। আমি তোমাদের ঘুম না ভাঙ্গে এমন সাবধান হয়ে গোপালের জন্যে দুটো ফুল নিতে এসেছিলেম বাবা! তারপর তোমার ভাই গাছের উপর থেকে ভূতের মত কথা বলে, আমার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল, আর আমি শেয়ালের গূয়ের বাবা! গূয়ের উপরে বাবা—গূয়ে পড়ে বাবা, এই দ্যাখ্ বাবা পড়ে গিয়েছি বাবা, গূ বুঝি খেয়ে ফেলেছি বাবা—দেখ্‌তো বাবা, খেইছি কিনা। পিসির সঙ্গে একি বাবা! আমার সকল গায়ে—সকল মাথায় শেয়ালের গূ—আমি এখন কি করি গো, মা—ওরে আমার কি হল রে বাবা—

পরেশ। পিসিমা! এখন আর চেঁচাচেঁচী করে কাঁদ্‌লে কি হবে, নেয়ে ফেল গিয়ে। দিনের বেলায় ফুল দুটো চেয়ে নিলেই হয়, এরূপ করে চুরি কর্‌তে আসাই অন্যায়। চুরি করে ঠাকুরের অর্চ্চনা?

সাবিত্রী ঠাকুরাণী মুখ বুজে রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে সেখান হতে চলে গেলেন।

এরা দুভাই ঘরে এলেন। ওদিকে দূরে গিয়ে সাবিত্রী ঠাকুরুণ পরিমলের বাড়ীর দিকে ফিরে আঙ্গুল মট্‌কিয়ে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে, অনুচ্চৈঃস্বরে পরিমলের উদ্দেশে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"মরে যাও, গোল্লায় যাও—গোল্লায় যাও—গোল্লায় যাও, বাসী হাতে বাসী মুখে বল্‌ছি, ওলাউঠায় ধরুক—তিন রাত যেন যায় না—হে ভগবান্ তুই দিন রাত কর্‌ছিস্—তুই-ই এর বিচের করিস্—বিচের করিস্, বিচের করিস্, বিচের করিস্।

এইরূপ অভিসম্পাত করে সাবিত্রী ঠাকুরাণী বাড়ী গেলেন। বলা বাহুল্য ফুলের সাজীটী পরেশের আলোয় তিনি দেখে নিতে ভুলেন নাই।

(৪)

রামধন চট্টোপাধ্যায় পরেশের জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাত। তিনি খুব সাহসী ছিলেন। তাঁর অনেক বীরত্বের গল্প শুনা যায়। এক সময়ে তিনি একা নাকি একগাছি লাঠি নিয়ে একদল দস্যুকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার একদিন অনেক রাত্রে একটা চোরের পশ্চাদনুসরণ করে ছিলেন—চোর তার সিঁদ কাটি ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে কোন রকমে ভদ্দর লোকের মত সেযাত্রা মান বাঁচিয়ে ছিল।

রামধন পরেশের ছ'পুরুষ তফাৎ জ্ঞাতি। রামধনের অবস্থা খুবই অসচ্ছল। তাঁর তিনটী পুত্র একটী কন্যা!

কন্যার বিবাহ হইল না—বয়স সতের আঠার হইল। সমাজে নিন্দা হইতে লাগিল। এমন সময় রামধনের মৃত্যু হইল। তিনটী পুত্রের মধ্যে বড়টী ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ল। তারপর একদিন গ্রামে নিমন্ত্রণে গিয়া আকণ্ঠ চিড়ে-দই ফলার খেয়ে এল। সেই খাওয়াই তার শেষ খাওয়া—খেয়ে আশার অল্পক্ষণ পরেই পেট ফুলিতে লাগিল—বায়ু সরিল না—উদ্গার উঠিল না, পেট ক্রমেই ফুলিয়া উঠিল।

নশু কবিরাজ বিজ্ঞ-বিচক্ষণ; আস্তে আস্তে পা ফেলে চলে; সংস্কৃত শ্লোকের বুক্‌নী দিয়ে দিয়ে কথা বলে; ধীর—অতি ধীর, তাই বলে কুড়ের সর্দ্দার নহে; স্থির—অতি, স্থির, তাই বলে খুঁটো বা খুঁটি নহে। সঙ্গে একটী লেজ থাকে, তাই বলে হনুমান নহে, লেজটী অনুচর, অবশ্য সে খেচর বা জলচর নহে, সেটী ভু-চর, ভৃত্যরূপী ছাত্র।

রোগীর ঐ অবস্থা দেখে পাড়ার লোকে দয়াপরবশ হয়ে নশুকে ডাকাইল। ছাত্রসহ নশুর আগমন হইল। আসিয়াই নশু নাড়ী টিপিলেন—খানিক পরে ছেড়ে দিলেন—আবার টিপিলেন—আবার ছাড়িলেন।

বার কতক ঐরূপ করিয়া নশু চরকের একটী সমাস বহুল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা—তাহার অন্বয়—তাহার ফলিতার্থ—সরলার্থ তাৎপর্য্যার্থ ইত্যাদি বলিতে আরম্ভ করিলেন; নশু কবিরাজী শাস্ত্র কোন্ সালের কোন্ তারিখে কোন্ স্থানের কোন্ পণ্ডিতের কাছে কয়জন সতীর্থের সঙ্গে পাড়য়া ছিলেন, সে পণ্ডিতের শিখাতে কয়গাছি কেশ ছিল ইত্যাদি টীকা টিপ্পনী পাদ টিপ্পনী করিতে করিতে বলিলেন—ভয় নাই ভাল হলেই সেরে যাবে, সেরে গেলেই রোগা ঠিক উঠে বস্‌বে। এ ত সহজ ব্যাধি—এটা কিছুই নয়, এর জন্য কোন ভাবনা নাই, বড় জোর রোগী মরে যায়, তার চেয়ে বড় একটা খারাপ হয় না।

ঠিক সেই সময় পরেশ গিয়ে দেখ্‌লেন রোগীর অন্তিম কাল উপস্থিত। তিনি রোগীর মেজো ভাইকে বল্‌লেন—ধরো, আর সময় নেই। এই বলেই তাঁকে বাহির করিয়া ফেলিলেন।

নশু বলে উঠ্‌লেন—হাঁ, হাঁ, কর কি! কর কি! আরে অন্বয়টা শোনো—আরে ঐ যে সপ্তমী বিভক্তি হওয়ায়——

পরেশ। চলে যাও, কবরেজ! চলে যাও, তোমার বড়ি নিয়ে আর সপ্তমীর বিভক্তি নিয়ে রোগীর শিয়রে বসে ব্যাকরণের টোল খুলে দিয়েছ—চলে যাও!

নশু। তা যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি, সপ্তমীর কথাটা——

পরেশ। আবার সপ্তমী!

নশু কবিরাজ ছাত্রকে সঙ্গে করে সরে পড়্‌লেন। যেতে যেতে একবার ডান্ নাকে, একবার বাঁ নাকে হাত দিতে দিতে চল্‌লেন। তাই দেখে ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনার নাকে কি অসুখ হয়েছে।

কবিরাজ। না—হে—বাপু না। দেখ্‌ছি নিঃশ্বাসটা কোন পথে চল্‌ছে।

ছাত্র। তা দেখ্‌ছেন কেন?

কবিরাজ। ওহে যোগ-শাস্ত্রের ব্যবস্থা আছে যে, যে নাকে নিঃশ্বাস বইতে থাকে, কোন কার্য্যের উদ্দেশে যাত্রা কর্‌বার সময় সেই দিকের পা বাড়াইলে

সিদ্ধি লাভ হয়। আমি বাড়ী থেকে বেরোনর সময় বাঁ পা বাড়িয়ে ছিলাম। সেটা দেখ্‌ছি ভুল হয়েছিল, এখন দেখ্‌ছি ডান্ নাকে নিঃশ্বাস্ বইছে। সেই জন্যই এই দুর্গতি—দর্শনীর টাকাটা তো পেলামই না, লাভের মধ্যে অপমানিত হইলাম।

ছাত্র! কেন, নিঃশ্বাসটা আর তখন ঠিক করে উঠ্‌তে পার্‌লেন না?

কবিরাজ। পার্‌ব কি করে বল? ছাগলাদ্য ঘৃতের পাক্‌টা ঠিক্ হল কিনা, তাই দেখবার জন্য ঐ হতশ্রী তেলট শুঁকে শুঁকে নাক হয়ে গেল ভোঁতা —আর বুদ্ধিও হয়ে গেল রাম ছাগলের মত!

ছাত্র। তা ছাড়া, আপনি যখন বাহির হন, তখন সাড়ে তিনখানা টিক্‌-টিকিও ডেকে উঠে ছিল, আর বেড়খানা হাঁচিও শুন্‌লেম।

কবিরাজ। দুর বেটা বেকুব! টিক্‌টিকি আবার কখনো সাড়ে তিন্‌টে হয়, না হাঁচিই কখনো দেড়খানা হয়ে থাকে? বেটা আস্ত বেকুব!

ছাত্র। আজ্ঞে টিক্‌টিকীর বড় ডাক শুনে ছিলেম তিনটে, আর একটা ছোট ডাকও শুনে ছিলাম, বোধ করি সেটা বাচ্চা টিক্‌টিকী। বাড়ীর মধ্যে দিদিমণি হেঁচে ছিলেন—হাঁচি কি কাশি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, যা হোক ঐ দুয়োই যখন এক গোত্র তখন ধরে নিলাম যে ওটা হাঁচিই, তারপর আমিও হাঁচ্‌বো হাঁচ্‌বো করে ছিলাম—সেটাও মনে মনে হাঁচি অর্থাৎ অর্দ্ধেক হাঁচি—দেখুন দেখি, খতিয়ে ঠিক দেড়খানি হাচি হল কি না?

কবিরাজ। ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্! তুমি বেশ হুসিয়ার ছাত্র। ঠিক্ যেন কাণা রঘুনাথ। তুমি করে খেতে পার্‌বে—তোমারও আমার মত পসার হবে।

ছাত্র। তা হলেই হয়েছে! মনে মনে এইরূপ বলে, প্রকাশ্যে বলিল,—আপনার আশীর্ব্বাদ।

(৫)

রামধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোট ছেলেটীও কিছু দিন পরে মৃত্যু মুখে পতিত হইল। তাঁর কন্যা মেজো পুত্রের কাছেই পালিত হইতে লাগিল। মেয়েটীর নাম পদ্মময়ী। লোকে পদী বলে ডাকত।

গ্রামের লোকে চাঁদা করে পদীর একটা বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল; এখনকার হিসাবে বরের অত বয়সে বিবাহ করা ভুল হয়ে ছিল।

কিন্তু কৌলীন্যের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে তখন ঐরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল। গঙ্গাযাত্রী হয়েও নাকি লোকে বিবাহ করিত।

অত বয়সে বিবাহ কর্‌তে আসা দেশাচার মতে ভুল না হলেও বিবেকের মতে বর রামগোপাল মুখুজ্যে একটা মস্ত বড় ভুল করে ছিল, তিনি কাঁচা কলা ও হবিষ্যির মালসা বেঁধে আনেন নি। ঐটেই তাঁর ভুল। পদীকে অচিরাৎ মহা হবিষ্যির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, এটা যে তিনি কেন বুঝ্‌তে পার্‌লেন না, তাহা আমরা মনস্তত্ত্ব মহাসমুদ্র মন্থন করেও বুঝ্‌তে পারি নাই।

অতি অল্প দিনেই রামগোপাল ভবের পটোল তুলে বস্‌লেন। কুলীনের কন্যাদের যে অবস্থা হয়, পদীরও সেই অবস্থা দাঁড়াল। অর্থাৎ পদী পিত্তালয়ে মৌরসী সত্ত্বে সত্ত্ববতী হয়ে কায়েম মোকাম হয়ে বস্‌লেন।

তামাকের গুঁড়ো মুখে টিপে পদী পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া-কোন্দল করে পর-নিন্দা, পরচর্চ্চা করে, মাঝে মাঝে কুড়ি বাইশ ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে গঙ্গা স্নান করে জীবন কাটতে লাগল। তার এই একঘেয়ে জীবনের মধ্যে মাত্র একটী বৈচিত্র্য ছিল। সেটী এই যে সে মাঝে মাঝে পনের কুড়ি দিনের জন্য কখনও বা চার পাঁচ দিনের জন্য শ্বশুর বাড়ী যেত। গিয়া দেবর পুতের কাছ থেকে পান তামাকের জন্য টাকাটা সিকেটা আন্‌ত। আমি কি কেহ নই? আমাকে কিছু দাও না কেন? ইত্যাদি রূপ অনুযোগ অভিযোগ আরম্ভ করিত। পদীর দেবর পুত্রের নাম—জয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

(৬)

পরিমল। দাদা কি কর্‌ব?

পরেশ। তা, যা;—জ্ঞাতি বোন্‌ত বটে! যখন শ্বশুর বাড়ী যাবার জন্য ক্ষেপেছে তখন পদী দিদির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার যো নাই। আর কেউ সঙ্গে করে বা নিয়ে গেলেই না কি করে যায়?

পরদিন পদীকে সঙ্গে করে পরিমল যাত্রা করিল। রেল থেকে নেবে চার পাঁচ ক্রোশ পথ হেটে দুজনে বৈকালে গোপালনগরে জয় নারায়ণ মুখুজ্যের বাড়ী গিয়া উঠ্‌ল।

পাড়াগাঁয়ের প্রবীণারা দুই চার ক্রোশ পথ চলিতে কাতর হন না, বা অপমান বোধও করেন না। বর্দ্ধমান জেলায় এরূপ ব্যাপার আক্‌সারই দেখা যায়। দুরন্ত মাঠের মধ্যে একটা বৃহৎকায় টুপ্‌লা কাঁধে করে মাঠাক

বর্দ্ধমেনে কড়া রৌদ্রকেও তাচ্ছিল্য করে মেল-রনারের মত হন্ হন্ করে হয় তো চলেছেন। পল্লী বাসিনী পিঞ্জরাবদ্ধা, নবনীত কায়ারা এ কথা শুনে লাগাম দেওয়া নাসিকা কুঞ্চিত কর্‌লেও সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে ঐ কথা গুলি বল্‌তে হইল।

জয় নারায়ণ মুখুজ্যের স্ত্রী কন্যা পদী ও পরিমলকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিলেন।

জয় নারায়ণ অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়ীতে এসে পদীকে দেখে হেসে বল্‌লেন,—জ্যেঠাই মা যে! বেশ বেশ, অনেক দিন পরে পায়ের ধূলো দিয়েছেন। তা বেশ, এটী কে?

পদী। দেবো না কেন? আমি কি কেউ নই—আমাকে কিছুই দাও না কেন, পান টুকু তামাক টুকুর জন্যও আমাকে ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তে হয়—বলি, আমি তোমাদের কেউ নই?

জয় নারায়ণ। জ্যেঠাই মা! সবই তো আপনার। আপনি আসুন—থাকুন—যান, সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। পদী এক গাল হাসি হেসে বল্‌লে,—"বেঁচে থাক বাবা, তুমি অতি সুবোধ ছেলে—তোমার এখন ছেলে পুলে কয়টী? মেয়েদের বিয়ে হয়েছে ত? হ্যা তুমি এই ছেলেটীর কথা জিজ্ঞেস কর্‌ছিলে—এর নাম পরিমল, আনন্দ ধামের পরেশের ছোট ভাই, আমার জ্ঞাতি খুড়তুতো ভাই, দুই তিন বৎসর হইল পাস হয়েছে, চাকরি বাকরি আজও করে নি, জমা জমি আছে, বেশ চলে যায়।

জয় নারায়ণ যখন তার জ্যেঠাই মার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন কন্যাদ্বয়ের ছোটটী একদৃষ্টে একটু আড়াল থেকে পরিমলকে দেখ্‌ছিল।

পরিমল পদী ও জয় নারায়ণের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে একবার এদিক ওদিক চাহিতেই চারুর চোখে চোখে পড়্‌ল। চারু সলজ্জভাবে মাটীর দিকে চাহিল—লজ্জায় তার মুখখানি লাল হইল।

হাসি দেখ্‌লে হাসি পায়। অতর্কিত ভাবে পরিমলও একটু হেসে ফেল্‌ল। হাসি দুইটীতে একটু রকমারি ছিল। নির্ম্মল সরল শ্বেত শেফালিকার মত একেবারে নিষ্কাম নয়। সে হাসির মধ্যে যেন স্থল পদ্মের ঈষৎ লোহিত রাগ, যেন প্রণয়ের একটু শেড্, একটু তুলিকা স্পর্শ দেখা দিল। দুইটী হৃদয়েই যেন যুগপৎ একটা মিষ্ট রাগিণী বেজে উঠ্‌ল—দুইটী প্রাণেই যেন একটা নবীন

জোয়ারের টান পড়্‌ল। দুজনেই সেটা বুঝ্‌ল—চারুর মাও সেটী লক্ষ্য কর্‌লেন। পদী আর জয় নারায়ণ কথায় মত্ত ছিলেন—তাঁরা চারুর প্রাণের এই গান্ধর্ব্ব মিলন টের পেলেন না।

(৭)

অমৃত লাল চৌধুরী গোপাল নগরের জমিদার। বেশ সুরুচি সম্পন্ন যুবক, দিব্য সদালাপী; হাস্য পরিহাস পরায়ণ, লেখাপড়াও বেশ জানেন। বয়সে পরিমলের চেয়ে চার পাঁচ বৎসরের বড়।

পরিমল জয় নারায়ণের বাড়ীতে যাইবার পর এক আধ দিনের মধ্যেই অমৃত বাবুর সঙ্গে পরিমলের প্রণয় হইল। পরিমল অবসর পাইলেই অমৃত বাবুর বৈঠক খানায় এসে গল্প স্বল্প করে।

আজও পাঁচজন সমান বয়সীর সঙ্গে বসে পরিমল অমৃত বাবুর বৈঠকখানায় গল্প কর্‌ছে, এমন সময় একটী অল্প বয়স্কা ঝি সেখানে এসে বল্‌লে—"পরিমল বাবু! একটু এদিকে আসুন।"

অমৃত এবং ইয়ার বন্ধু সকলেই বলে উঠ্‌ল—কেন, কি হয়েছে, কে ডাক্‌ছে? ঝি উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

এখনি আস্‌ছি ভাই! বলে পরিমল বাহিরে দুই তিন হাত এলেই একটা দরজার ভিতর হইতে চারু জল খাবারের থালা পান ও এক গেলাস জল আনিয়া দিল। জলযোগান্তে চারু বলিল, "এইবার যাও, আর থাকিবার দরকার নাই লোকে নিন্দা কর্‌বে।"

পরিমল। আমায় যদি কেহ নিন্দা করে, তাহাতে কি তোমার কষ্ট হয়?

লজ্জায় চারুর মুখখানি আরক্তিম হইল; সে কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই পরিমল পুনরায় বৈঠকখানায় আসিয়া হাজির। অমৃত বাবুকে জলযোগের ব্যাপারখানা বলিল। শুনিয়া সকলেই বলিয়া উঠিল,—তুমি ভাই অমত করো না। জয় নারায়ণের অবস্থা ভাল নয়, বয়স্থা মেয়ে নিয়ে বেচারী ফাপরে পড়েছে, কিছু দিতে থুতে পার্‌বে না, তা হোক শ্বশুরের টাকায় আর কে কবে বড় মানুষ হয়েছে? তুমি ভাই বিবাহে মত দিও, তোমাকে পেলে আমরা সুখী হব।

পরিমল। আচ্ছা ভাই সে যখন যা হবে, তখন তা দেখা যাবে। বিয়ে বলে কি? আপনাদের সৌহার্দ্য চিরদিনই আমার মনে থাকবে।

স্নানের বেলা উপস্থিত। পরিমল জয় নারায়ণের বাড়ী ফিরছে। পুকুরের ধার দিয়ে পথ। আস্‌তে পথের কাছেই ফুলের সাজী হাতে চারুর সঙ্গে দেখা।

চারু। বেড়ান হল?

পরিমল। হ্যা, তুমি এখানে কেন?

চারু। দিদি আহ্নিক কর্‌বেন, পুকুরের ধারে ফুল নিতে এসে ছিলাম। ঐ কাঁটা গাছটায় কাপড় জড়িয়ে গিয়ে ছিল তাই খুল্‌তে দেরী হয়ে গিয়েছে।

ঠিক এমনই সময় চারুর মা পুকুরে জল নিতে এলেন। জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, বেলা হয়েছে বাড়ী যাও। কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলে?

চারু। এমন কিছু নয়, জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম গ্রামটী কেমন দেখ্‌লে? চারুর মা হর্ষ বিষাদে নিমগ্ন হইয়া জলে নামিলেন।

(৮)

জয় নারায়ণ। তা কেমন করে হয়? পরিমল তোমার বাপের জ্ঞাতি। সম্পর্কে তুমি ওর পিসি। চারু হইল ওর বোন। ভাই বোনে কি কখন বিয়ে হয়? এ যে সৃষ্টি ছাড়া অনুরোধ।

স্ত্রী। না হলে কি আমি বলছি? মাতৃপক্ষ পঞ্চমী কন্যা বাদ দিয়ে বিবাহ হইতে পারে। তোমার আমার কথা নহে—সাক্ষাৎ মনুর কথা। আমি বাবার কাছে শুনিছি। বাবাও ঐ পাত্রের সঙ্গে চারুর বিয়ে দিবার কল্পন, কর্‌ছেন।

জয় নারায়ণ। এ তো কখন শুনিনি বাবা যে, ভাই বোনে বিয়ে।

স্ত্রী। আচ্ছা, ঐ যে ফণী বাড়ুজ্যের বিয়েটা হল, ওটা কি অশাস্ত্রীয় নয়?

জয় নারায়ণ। হ্যা, ওটা একেবারেই স্বজনের মধ্যে হয়ে গিয়েছে—চতুর্থী কন্যাও বাদ পড়েনি।

স্ত্রী। তারপর, আনন্দ ধামের বিজয় অধিকারী যে বিয়েটা করলে, সেটকি?

জয় নারায়ণ। হ্যা, হ্যা, সেটা একেবারেই গর্হিত! একেবারেই এক প্রবরে বিবাহ। কাশী-কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মিথিলা, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কোন স্থানের পণ্ডিতই মত দিলেন না। সকলেই বলিলেন, ঐ স্ত্রী মাতৃবৎ পরিত্যাজ্যা। সন্তান হইলে, সে সন্তান চণ্ডালবৎ হইবে।

স্ত্রী। তবে দেখ ত তোমার শাস্ত্র থাকে কোথায়? তা'ছাড়া, পরিমলের সঙ্গে চারুর বিবাহে ঐরূপ কোন দোষ হচ্ছে না। পুকুরের ধারে জল আন্‌তে গিয়ে দেখি, দুজনে গল্প কর্‌ছে। আমি বেশ দেখ্‌লেম, আমার চোখে বেশ লাগল। বেশ মানাবে! এ বিয়েতে অমত করনা।

জয় নারায়ণ। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! দেখা যাক কি হয়!

(৯)

পরেশ। পরিমল! বাবা মরিবার সময় আমায় বলে ছিলেন, পরিমলকে লেখাপড়া শিখিও; মা মরিবার সময় বলে ছিলেন, পরিমলের ভাল একটী বিবাহ দিও। ভাই! মাতা পিতার দুইটী আদেশ অহরহ প্রাণে জাগে। বাবার আদেশ পালন করেছি, তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। এখন মার আদেশ আজও প্রতিপালিত হয় নাই। আবদাল পুরে যে বিবাহের স্থির করা গেল ঐ বিবাহে মত দাও।

পরিমল। দাদা! বিবাহ আর কর্‌ব না। আমায় ও আদেশ আর কর্‌বেন না। চির কৌমার ব্রত গ্রহণ কর্‌ব।

পরেশ। সেটা কি হয়? দার পরিগ্রহ করাই শাস্ত্রের অনুশাসন। শাস্ত্রানুগামী পিতার সন্তান হইয়া আমরা শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন করিলে বংশের অগৌরব হইবে। আমি পদী দিদির কাছে সবই শুনেছি। জয় নারায়ণের স্ত্রীরও আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে চারুর বিবাহ হয়। জয় নারায়ণ অর্থ পিশাচ। তাই পাঁচ শত টাকা লইয়া ঐ গ্রামেই একটা শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়াছে। ঐরূপ অর্থ লইয়া বিবাহ দেওয়াকে শাস্ত্রে আসুর বিবাহ বলে। ও একটা অর্থ পিশাচের পৈশাচিক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। আট প্রকার বিবাহের মধ্যে এখন মাত্র প্রাজাপত্য বিবাহই চল্‌ছে। আসুর বিবাহ চল্‌তি নাই। দুই একটী যাহা হচ্ছে, শাস্ত্র ধরলে তাহা অসিদ্ধ।

পরিমল। দাদা, আপনার ইচ্ছা মতই কাজ করিব, কিন্তু এখনকার বিবাহ আমার কায়িক বিবাহ হইবে, আত্মিক নহে।

দাদার আদেশে পরিমল আবদাল পুরে বিবাহ করিল। সংসারী হইলেও পরিমল উদাসীন। প্রাণের ফাঁকা স্থানটী যেন পূর্ণ হয় নাই। পরেশ লক্ষ্য করিলেন। করিয়া কি করিবেন? উপায় নাই।

কয়েক বৎসর পরে জয় নারায়ণের শ্বশুর বাড়ীতে সামাজিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দুই দশ হাজার লোকের সমাগম হইল। পরিমলের তাঁরা জ্ঞাতি—সুতরাং পরিমলও গেল। ওদিকে চারুও মাতা পিতার সহিত এসেছিল।

বাহিরে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হইতেছে পরিমল শানের উপর দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে দেখছে; এদিকে চারু এখন পূর্ণ যৌবনা—এক পায় দু'পায় এসে পরিমলের কাছে দাঁড়াইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লজ্জা সরম ত্যাগ করে একদৃষ্টে পরিমলকে দেখ্‌তে লাগল। পরিমল সহসা পার্শ্বে চাইতেই দেখে—চারু!

পরিমল বলিয়া উঠিল আঁ্যা চারু যে! চারু! চারু! চারু!

চারু বলিল,—চারু নয়—চারু নয়—তোমার সেই প্রা—র্থি—নী।

ঐ কথা বলেই চারু মুর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল। সেখানে বিস্তর লোক, সকলেই শুনিল,—প্রা—র্থি—নী। সকলে ধরাধরি করে চারুকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল—চোখে মুখে জল দিল—সংজ্ঞা হইল না। চারু মারা গেল।

জয় নারায়ণের অপরিণামদর্শিতায় সকলেই তাঁকে তিরস্কার করতে লাগ্‌লেন। চারুর মা উন্মত্তার ন্যায় কেঁদে উঠ্‌লেন, আমার সোনার কলি, আমার প্রার্থিনী! দিক কন্যারা উত্তর দিল, সে এখনও প্রার্থিনী! দেবতারা স্বর্গে থেকে আশ্বাস দিলেন, জন্মান্তরে পূরিবে বাসনা, প্রার্থিনী!

দুইটী গান।

রচয়িত্রী—৺সুশীলাবালা দেবী।

(১)

সুর—কীর্ত্তনাঙ্গ।

আমার হৃদয় রতন নহে ত' কঠিন
সে যে সরলতা মাখা।
তার শ্রীচরণ তলে করুণার ছবি
র'য়েছে কেমন আঁকা॥
ত্রিভঙ্গিম ঠাম মোহন মূরতি,
ভাসে জগজন প্রেমেতে তার,—
আমি বড় ভালবাসি, সেই কালশশী,
সে মম জীবন সখা॥

শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন।

(২)

বাউলের সুর।

"হরে কৃষ্ণ হরে" ব'ল মন্ পাখী আমার।
কেন ভবরঙ্গে প'ড়ে মিছে রঙ্গ কর' বারেবার॥
(ভোলা মন্ পাখী রে—)
ঢুকে বিষয় বনেতে
ব'সে আশা-তরুতে,
পাপে ভরা মায়ার ফল পাখী খাচ্ছ' সুখেতে,
(আবার) 'আমার' 'আমার' 'আমার' বুলি সাধছ' তুমি অনিবার॥
মোহ বাতাসের ভরে
পাখী বেড়াচ্ছ' উড়ে

(একবার) ভাবছ না রে মন বিহঙ্গ কি হবে পরে,—
শমন বাণে সকল রঙ্গ ভঙ্গ যে হবে তোমার ॥
তাই সাধি'রে পাখী
ভেবে দ্যাখ মুদে আঁখি,
"কৃষ্ণ" বিনে এ ভুবনে সব বোলই ফাঁকি,
যদি শমন ভয় এড়াতে চাও মন কর "কৃষ্ণ" নাম্‌টী সার ॥*

সমালোচনা।

অমর-স্মৃতি।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মিত্র। নট কবি স্বর্গীয় অমরেন্দ্র নাথ দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে লেখক এই ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। স্বর্গীয় অমরেন্দ্র নাথের হৃদয় মন, কেমন উন্নত, তাঁহার স্মৃতি-কীর্ত্তি কেমন মহান্ এই অমর স্মৃতি ক্ষুদ্র পুস্তকে কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা অমর-স্মৃতি পাঠ করিয়া স্মৃতির উদ্দেশ্যে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

* শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "জন্মভূমি"র সহৃদয় পাঠক বৃন্দের নিকট সুপরিচিত। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই স্পষ্টভাষী সংবাদ পত্র "সুলভ দৈনিক" হইতে বর্ত্তমানের "হিতবাদী" প্রমুখ বঙ্গের মুখ পত্র সমূহে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধীয় গভীর গবেষণাপূর্ণ লেখনী পরিচালনে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ। তদ্ভিন্ন বঙ্গের বর্ত্তমান সাহিত্যরথীগণও তাঁহার প্রতিভাময়ী কবিত্ব শক্তির অখণ্ড পক্ষপাতী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী সুশীলা বালা দেবী আজ কয়েক বৎসর হইল, ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। বলিতে কি, তিনিও কবির অনুরূপ কবিত্ব শক্তি লাভে সমর্থা হইয়া ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বিস্তৃত সংসারের বিশাল কার্য্যভার বহন করিয়াও তিনি সাহিত্যালোচনায় অবশিষ্ট সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন। কবিতা রচনায় তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহারই অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত দুইটী গান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষার্থে আজ আমরা পত্রস্থ করিলাম।

জন্মভূমি-সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

জন্মভূমি।

২৭শ বর্ষ, } ১৩২৮ সাল, মাঘ। { ১০ম, সংখ্যা।

মিলন-বৈচিত্র।

লেখক— ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

কত উচ্চে শোভে চাঁদ আকাশ নীলিমা কোলে।
কত নীচে সরোজিনী সরসীর বুকে খেলে ॥
তবু দেখ বিধাতার দিব্য বিচিত্র বিধান।
দোঁহে দোঁহা করিয়াছে প্রাণ মন প্রতিদান ॥

ক্ষুদ্র ফুল সূর্য্যমুখী নীরবে ফুটিয়া উঠে।
নিয়তি অঞ্চল বায়ে ধরণীর বুকে লোটে ॥
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড দেব সুদূর গগনে বসি।
দগ্ধ করে জীবকুল বরষি কিরণরাশি ॥
একে ভীম রুদ্রমূর্ত্তি অন্যে সুকোমল অতি।
তবু তারা লভিয়াছে মিলনের পূর্ণ-প্রীতি ॥

জন্ম লভি গিরিশৃঙ্গে পাষাণ পিঞ্জর টুটি।
বয়ে যায় নির্ঝরিণী সাগরের পানে ছুটি ॥
কোথায় জনম তার কোথা তার পরিণতি।
কে বুঝাবে এই মর্ম্ম কে বুঝিবে এই রীতি ॥

রসাল বিশাল বৃক্ষ কঠিন কর্কশ দেহ।
তবু সুকুমারী লতা তারি সনে বাঁধে গেহ॥
তবু তারা মিশে রয় প্রণয় উচ্ছ্বাসভরে।
মিলনের সুধামাখা প্রতিধ্বনি বুকে ধরে॥

কোমলে কঠোরে কেন করে নিতি আলিঙ্গন।
কেন তারা করে নিতি প্রাণ মন প্রতিদান।
মিলন বৈচিত্র এই বিষম সমস্যাময়।
চিত্র-চিত্রকর বিনা কে বুঝিবে এ ধরায়॥

আমরা ও আমাদের ভাষা।

লেখক—স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খমুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনাণ্ড বিলসন্নীতাংশুতুল্যপ্রভাম্,
গৌরীদেহ সমুদ্ভবাং ত্রিনয়নামাধারভূতাং
মহাপূর্ব্বামত্র স্বরস্বতীমনুভজেচ্ছুম্ভাদিদৈত্যার্দ্দিনীম্॥

আলোচনা দ্বারা যদি কোন বিষয়ের উন্নতি সাধিতে পারে, এইরূপ নিয়ম ধ্রুব হয়, তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা যে, বিষয়টী সাধারণের আলোচনা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হইবে। সেই আলোচ্য বিষয়টী আমরা ও আমাদের ভাষা বাঙ্গালা। এই আলোচ্য বিষয়টীকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছি, প্রথম—বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টি ও পরবর্ত্তী সাহিত্যিকগণের কাল বা প্রাচীনযুগ; দ্বিতীয়—গুপ্ত কবির কাল বা মধ্যযুগ; তৃতীয়—আধুনিক যুগ বা ভাষা সংগ্রাম। এই তিনটী পরিচ্ছেদ দ্বারা আমাদের ভাষা সম্বন্ধে যতদূর প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে উন্নতিবিধায়ক পন্থা প্রদর্শন করান যাইতে পারে, তাহা আমাদের অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যিকগণের অভিমত প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

এক্ষণে আমাদের বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা আবশ্যক, এজন্য আমরা তৎপথে অগ্রসর হইতেছি।

১। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি।

কোন লোক বা জাতি সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে ঐ সকল দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির আলোচনা আবশ্যক। এস্থলেও বাঙ্গালাভাষার কথা বলিতে গিয়া বাঙ্গালা দেশকে নির্দ্দেশ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। হিন্দুর ইতিহাস মহাভারত পাঠে জানা যায়। মহারাজ মান্ধাতার "গৌড়" নামে এক দৌহিত্র ও মহারাজ বলির "বঙ্গ" নামে এক ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মে, ঐ দুইজনের রাজত্বই তাঁহাদের নামানুসারে "বঙ্গ ও গৌড়" নামে অভিহিত হয়।

ইউরোপীয়গণের মত—পূর্ব্বদেশে "বোঙ্গাল" নামে একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল। তাহার নাম হইতে "বাঙ্গালা" নামের উৎপত্তি। ইহাতে বোধ হয়, ঐ বঙ্গরাজের বংশধরগণই কালক্রমে বহুশাখায় বিস্তৃত হওয়ায় আত্মপোষণ ও সমৃদ্ধিসাধনার্থ সকলে ব্যবসা বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করেন এবং তাঁহারা যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানই "বাঙ্গালা" নামে অভিহিত হয়।

আইনী আকবরী পাঠে জানা যায়—এই দেশ রক্ষার্থে এদেশে গভীর খাত খনন করা হয়, ঐ দেশ—বঙ্গ ও খাত—আল, এই দুই শব্দ একত্র মিলিত হইয়া "বাঙ্গালা" নাম ধারণ করিয়াছে।

এখন আমরা বুঝিতেছি যে, বঙ্গ ও গৌড় অতি প্রাচীন নগর, ইহা নিঃসন্দেহ এবং সেই নিমিত্ত মহামতি আকবর স্বীয় অধিকৃত ভূভাগ পঞ্চদশ সুবায় বিভক্ত করিলেও প্রাচীনত্ব-হেতু "বাঙ্গালা" তাঁহার একটী সুবা বলিয়া পরিগণিত হয়। ঐ গৌড়রাজ্য এক্ষণে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এই "বাঙ্গালা" যে সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন ও পূজনীয়া, ইহা নিঃসন্দেহ।

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালা-ভাষা সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাই, আর্য্যগণ যখন মধ্য এসিয়ার প্রান্তর ত্যাগ করিয়া এই ধরা বক্ষে আসিয়া দেখা দিলেন ও পঞ্চনদের তীরে বাস করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে বৈদিক ভাষার প্রচলন ছিল। উহা নিতান্ত কঠিন বোধে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল এবং সেই ভাষায় পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্রাদি গ্রন্থ প্রণীত হইল। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসন সময়ে ইহার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল। ইহাই—সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সহিত এই ভাষারও পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল এবং ক্রমে তাহাই জালী, মারহাটী, মাগধী প্রভৃতি

ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হইতে লাগিল। সকলেই ঐ সংস্কৃত ভাষা হইতে যখন দেশভেদে তদ্দেশবাসীগণ আত্ম উচ্চারণ সুগমার্থ নানা নামান্তর ভাষার সৃষ্টি করিল, তখন বঙ্গদেশেও সেই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল; তাহারই ফল স্বরূপ বাঙ্গালা-ভাষা।

ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের এস্থলে জার্ম্মাণ পণ্ডিত ম্যাকসমূলারের কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করি। তিনি তাঁহার ভাষা-সমুদ্র মন্থনকালে একস্থলে বলিয়াছেন :—

Thus we find that the Science of Language, in the only countries where we can watch its origin and History in India and Greece. Max Science of Language. Vol. I. P. 72.

আমরা পৃথিবীর মধ্যে দুইটী জনপদে কেবল ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহাস দেখাইতে পারি, উহা ভারতবর্ষ ও গ্রীস্।

জার্ম্মাণ পণ্ডিতের এই উক্তি বাস্তবিকই আমাদিগকে গৌরবান্বিত না করিয়া থাকিতে পারে না, এবং তাহা জ্ঞাত হইয়া আমরা ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অদ্ভুত গবেষণা ও তেজস্বিতার পরিচয় লাভ করিয়া আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান না করিয়া থাকা দুরূহ। সেই জ্ঞানগুরু ভারত, কেবল যে বর্ত্তমান জাতির পক্ষে তাহা নহে, সর্ব্বপ্রাচীন-জাতির গুরু এই ভারত, তজ্জন্য আমরা ধন্য! কিন্তু সেই ধন্যবাদ লাভ করিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকা কি আমাদের কর্ত্তব্য? তাহা নহে। কিন্তু আমরা সে ধন্যবাদ লাভের পর কয়েক বৎসর বাস্তবিকই নিদ্রিত ছিলাম, ভাবিয়াছিলাম—ভাষাগত গৌরব চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে, কিন্তু তাহা অসম্ভব! হ্রাস-বৃদ্ধি সৃষ্টি-সংহার জগতের কার্য্য। চিরদিন সমান যায় না, সেই মহাবাণী আজ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, জগৎপূজ্য জাতির বংশধর হইয়া আমরা কিছুদিন নিদ্রিত থাকায়, আমরা ভাষার গৌরব হারাইয়া ফেলিয়াছি, আজ আমাদের ভাষাকে গ্রাস করিতে জরা উন্মুক্তগ্রীব! বিষধর সর্প বিষস্খলনে অক্ষম হইলে যেমন দশাপ্রাপ্ত হয়, আজ আমরা তাঁহাদেরই বংশধর হইয়া সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা দূরে থাকুক, ভাষার সম্পদ্ সুসম্পাদন করিতে সক্ষম নহি। ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

সেই নিমিত্ত আজ আমরা সে গৌরব লাভে অক্ষম, সে যশঃ এখন আর আমাদের নিজস্ব নহে—সে সেই পূজ্যপাদ জ্ঞানগুরু ভারতীয় ঋষিগণেরই

আছে। আর বাস্তবিক সে দায়িত্বও আমাদের যুক্তিসঙ্গত নহে। নিধিরামের পিতামহ কোনকালে অম্ল ভক্ষণ করিয়াছিল বলিয়া যে, নিধিরাম জন্মে অম্ল না খাইয়া তাহার স্বাদ জানিবে, ইহা অসম্ভব। পণ্ডিতের পুত্র হইলেই যে পণ্ডিত, তাহা কোন দেশ কখনও স্বীকার করে না, এবং তাহার জ্ঞান অভিজ্ঞতা তাহার পিতার ন্যায় হইবে এমন কি কথা! তাহা হইলে এত বিদ্যালয়, এত শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন হইত না, সকলেই আপনা আপনি পণ্ডিত ও বিচক্ষণ হইত। তবে ইহাও স্থির যে, পণ্ডিতের পুত্র মূর্খ ও জ্ঞানীর পুত্র অজ্ঞানী বিরল। কারণ, জন্মজগুণ ঐ সন্তানে থাকিয়া যায়, তাহা ক্রমে যেরূপ আয়াস পায়; তেমনি ভাবে বিকশিত হইতে থাকে। গুণপুষ্টি সম্বন্ধে আয়াস লাভের হ্রাস বৃদ্ধি হেতু বংশজগুণ গুলির সন্তানে তারতম্য প্রতীয়মান হয়। সময়বিশেষে সে আয়াস লাভে বঞ্চিত হইলে তখন সন্তান যদৃচ্ছাগামী বা আয়াসলভ্য পথে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়। উহাই জীব-জীবনের মাহাত্ম্য।

সুতরাং সে দাবী আমাদের কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তবে উপায়? নন্দনকাননচ্যুত পারিজাত শাপগ্রস্থ হইয়া চিরদিন মর্ত্ত্যে কি পালিতা মাদার হইয়াই অবস্থিতি করিবে, ইহাই কি বিধাতার নিয়ম? বীণাপাণির যে মধুর বীণ বেদের মধুরধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পুলকিত করিত, বৃদ্ধ হইতে শিশু মাতৃস্তন্য পানে বিরত থাকিয়া যে গীতধ্বনি শ্রবণ করিত,—আজ সে বীণ কি এইখানেই লয় তান লইয়া চিরদিনের জন্য বিদায় লইবে? আর কি সে তপোবনের তরুতলে বসিয়া বৃদ্ধ গুরু যুবা শিষ্যকে নানা ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন না? আর কি সে যজ্ঞ, সে ঋষি-সম্মিলন, সে ঋষিগণের বীণহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া সভাসদ্গণের তুষ্টির জন্য, আত্মার উৎকর্ষ সাধনের জন্য, মধুর বেদ-গানে সমুদয় শোক বিষাদ দূরে নিক্ষেপ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সচ্চিদানন্দ প্রেমে সকলকে মাতোয়ারা করিবে না? ভারতবাসি, আর কি সে বেদগানে পার্থিব বিষয় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ভাব-সাগরে এ দেহতরী নিমজ্জিত হইবে না? কিসের গৌরব, কিসের ঐশ্বর্য্য, কি জন্য এ সকল, কামিনীকাঞ্চন সমস্ত অপার্থিব পথে যাত্রার কোন শুভসাধক তাহা জ্ঞাত হইবে, চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে কিরূপে তাহার ধৈর্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারিত হইবে। সুরথের ন্যায় শ্রান্ত, সুশীতল জ্ঞানী মেধসের কৃপাচ্ছায়ায় সমুদয় যন্ত্রণার উপসংহার করিবে না? ভারতের সে সব বৃত্তান্ত আজ কি

কাহিনীতেই পরিণত হইয়া রহিবে মাত্র ? সেই মুনির বংশধর, সেই ঋষি-বংশধরগণ কি তাহা দেখিবেন ? সেই সংযমশীলতা, তেজস্বিতা, ন্যায়পরায়ণতা, ধীরত্ব, বীরত্ব, গাম্ভীর্য্য সকলি কি অতীতের কল্পনা বলিয়া কথিত হইবে ? কখনই নহে। আজি তাঁহাদের শত শত বংশধর বিদ্যমান, তাঁহারা থাকিতে ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। তাঁহারা জাগিয়াছেন, সে কীর্ত্তি তাঁহাদের দ্বারাই রক্ষিত হইবে। যাহা এক্ষণে কল্পনা বলিয়া অনুভূত হইতেছে, বাস্তবিক তাহা একদিন সত্য হইবেই। সে শক্তির জাগরণ হইলেই কার্য্য, কার্য্য হইলেই তাহার কর্ম্ম-সম্পাদনশক্তির পূর্ণপ্রভাব প্রকাশ পাইয়া এই ভারতীয় জ্ঞান-গুরুর যথার্থ বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে জগতের ইতিহাস পরিচিত করিবে। মক্ষমূলার দেখাইতেছেন যে, অতি প্রাচীনকালে দুইজাতি প্রধান ছিল, তাহা ভারতবাসী ও গ্রীক। ঐ গ্রীকও আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য ভারতবাসীর নিকট কোন বিষয় শিক্ষা লাভ করেন কি না তৎসম্বন্ধে ইনি বলেন,—

"It is curious, however, to observe the striking caincidences between the grammatical terminology of the Greeks and the Hindus, which would seem to prove that there must be some true and natural foundation for the much abused Grammatical system of the Schools. The Hindus are the only nation that cultivate the Science of grammar without having received any impulse, directly or indirectly from the Greeks." P. 152.

মানব পরস্পরের নিকট হইতে অন্য কোন বিষয়ে ঋণী না হইলেও (বিশেষ তৎকালে) ভাষা সম্বন্ধে ঋণী হয় কিন্তু ভারত তাহাতেও স্বাধীন। সেই জন্য ম্যাক্সমূলার বলিলেন, "হিন্দু ও গ্রীক জাতির ব্যাকরণ-সমতাদৃষ্টে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, ইহাতে মনে হয়, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সত্য ও প্রকৃত ভিত্তি বর্ত্তমান আছে। হিন্দুজাতি ব্যাকরণ সম্বন্ধে স্বতঃপরতোভাবে সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ইহারা স্বাধীন ভাবেই বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাকরণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

এই ভাষা সমুদ্রমন্থনকালে তিনি আমাদের আর একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, সে তাঁহার উক্তিতেই আছে :—

"But believing, as he (Harvar) did, that the Greeks derived their Philosophy and Mythology from India, he supposed that they had likewise borrowed from the Hindus some of their words, and learnt the art of distinguishing the genders of words." P. 157.

"হারবার সাহেব বিশ্বাস করেন, গ্রীকরা হিন্দুদের নিকট হইতে বিজ্ঞান ও পৌরাণিক গল্প সকল পাইয়াছেন, অধিকন্তু ইহাও মনে করেন যে, উহারা যেমন কতকগুলি শব্দ লইয়াছেন, তেমনি চিহ্নবিধানও হিন্দুদের নিকট হইতে পাইয়াছেন।"

তাঁহার ঐ কথা বলার কারণ, প্রাচীন-হিন্দুরা গ্রীকগণের নিকট হইতে লিঙ্গবিধান প্রাপ্ত হন। কারণ, তাঁহার মতে পাণিনির পূর্ব্বে কোন ব্যাকরণ-বিদ্যা হিন্দুর ছিল না, এবং পাণিনিকে ধরিলে হিন্দুর ব্যাকরণ গ্রীকদের ব্যাকরণের বহু পরে আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাহার প্রতিকূলে যে শাকটায়ন, শাকল্য, অপিশলি, স্ফোটায়ন, চাক্রবর্ম্মণ, গার্গ্য ও গালব নামে কয়েকজন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণ বিদ্যমান ছিলেন, তাহা কে দেখিবে ? এতদ্ব্যতীত "আচার্য্য" ও "উদীচাং" নামে বৈয়াকরণ ছিলেন। পাণিনিতেই উঁহাদের নামোল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং এমত খণ্ডন যে সহজসাধ্য তাহা বলাই বাহুল্য।

গ্রীকদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেও জানা যায় যে, উহারাও ভারতীয় জাতির শাখামাত্র; উহাদের ভাষা হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। গ্রীকভাষার Ionian, Ionic, ও Ioni, পারস্যভাষার Unan, সংস্কৃতে যাহা "যাবনীন," যাবনীক ও যবন" শব্দের অপভ্রংশ। মুসলমানি "ইউনানি" শব্দ সংস্কৃত "যুনান" শব্দ হইতে উদ্ভূত এবং গ্রীকরা যে যবনবংশজাত তৎসম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে—

"তুর্ব্বাশোর্থ যবনাজাতা
অনোস্তু ম্লেহজাতয়ঃ।"

এবং নামের শেষে "নহুষের" নাম কীর্ত্তনও দ্বিতীয় কারণ। সুতরাং ভাষা-তত্ত্বের আকর—একমাত্র ভারত !

তুহুঁ।

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী।

যে প্রেম মানবে করে দেবত্ব প্রদান—
বিরহের কীট যেই প্রেম-শতদলে
নাহি পশে ভুলে কভু—সে প্রেমের স্থান
নহে লোকালয়! নর-নয়ন-গরলে
হয় মৃত! তুমি আমি চল দুই জনে—
সংসারের আবিলতা করিয়া বর্জ্জন,
চল যাই সে নীরব গহন কাননে—
সেথা নাহি ঈর্ষা-দ্বেষ-ক্রোধের গর্জ্জন!
কপোত-কপোতী সম র'ব সেথা দুটি—
নিশিদিন কেটে যাবে অধরে অধরে—
নয়নে নয়নে। হিয়ায় হিয়ায় লুটি
যাবে সুধানদী দিবা লহরে লহরে।
রবি-শশী হারা যদি হয় সে বিজন—
আরোরা-আলোক হয়ে রহিব দু'জন।
নদ নদী পারাবার নহে কি প্রাচীন?
নহে কি প্রাচীন হায় এ জড়-জগৎ?
রবি-শশী তারারাজি—এ বিশ্ব বৃহৎ
নহে কি প্রাচীন? কাল ধর্ম্মে শক্তিহীন
বৃদ্ধ বিমলিন! নহে যদি ওরা কেহ—
ক্ষয় যদি উহাদের নহে দিন দিন
উঠে মনে ঘোরতর বিষম সন্দেহ!
দুর্লভ মানব-জন্ম নহে সমীচীন
বাক্য এই! মুহূর্ত্তের বিদ্যুৎ-স্ফুরণ
মানবের এই জন্ম! আঁখি পালটিতে—
চ'লে যায় আয়ু হায় মিশায় মাটীতে!
জীবন—মৃত্যুর শুধু করিতে বরণ?

কমলা।

(লেখিকা—শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী।)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ভূপেন্দ্র। আত্মা অবিনাশী, এ কথা সকল শাস্ত্রেই বলে; হিন্দুশাস্ত্র বিশেষরূপেই বলিয়াছে। তা ছাড়া, এখনকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা আমেরিকায় সভা-সমিতি করিয়া—আত্মা, পরকাল, সূক্ষ্মজগৎ প্রভৃতির খোঁজ-খবর লইতেছেন। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, মরণের পর আত্মীয়-স্বজনকে দেখা যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দেওয়ান হরমোহনবাবু নানাস্থানে পাত্রান্বেষণ করিয়া, অবশেষে হরিহরপুরে উপস্থিত হইলেন। অনুসন্ধানে জানিয়াছিলেন, এখানে সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটী সুপাত্র আছে।

তিনি পাত্রের পিতা ভূপেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে যাইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। সলিলের বিবাহ এত শীঘ্র দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। ভাবিয়াছিলেন, এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই পুত্রের বিবাহ দিবেন। কিন্তু হৈমের শোকে স্ত্রী কাতরা; তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই বিবাহ-প্রস্তাবে রাজী হইলেন।

ভূপেন্দ্রবাবুর আদর-আপ্যায়নে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, হরমোহনবাবু ২৫শে বৈশাখ বিবাহের দিনস্থির করিয়া, সানন্দচিত্তে প্রত্যাগমন করিয়া, অবিনাশ বাবুকে সবিশেষ বলিলেন। অবিনাশবাবু আদ্যন্ত শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন, এবং বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

গণা দিনগুলি দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। আজ ২৫শে বৈশাখ। অবিনাশবাবুর বাড়ীতে মহাধূম। অতবড় বাড়ী লোকাকীর্ণ! হইবারই কথা; কেন না, বিবাহে আত্মীয়-কুটুম্ব যে যেখানে আছেন—সকলেই আসিয়াছেন। একটীমাত্র মেয়ে; সুতরাং তিনি আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

গোধূলি-লগ্নে বিবাহ। চকের উঠানে ছাম্‌লা তলা, বরাসন প্রভৃতি সাজান হইতেছে। অন্দরেও কনে সাজানর ধূম পড়িয়াছে।

লগ্ন আগতপ্রায়, কিন্তু পাত্রের খোঁজ নাই। সকলেই উৎকণ্ঠিত, বিষণ্ণ। এমন সময় দূরে বাজনার শব্দ শ্রুত হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই বরযাত্রীসহ বর আসিলেন। যথাসময়ে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভূপেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আজ বৌ-ভাতের ধূম। শোকাতুরা লাবণ্যময়ী আজ হর্ষ-বিষাদে অভিভূতা। এই আনন্দের দিনেও হৈমের শোকে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল, অশ্রু নয়নদ্বয়ে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অশ্রুপাত মঙ্গলের দিনে অমঙ্গলের নিদর্শন। তাই পাড়ার প্রবীণারা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করিলেন। লাবণ্য অতিকষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া, পাষাণে বুক বাঁধিয়া বৌ-ভাত যথারীতি সম্পাদন করিলেন।

শোকে মুহ্যমান থাকিলেও ভূপেন্দ্রবাবু বৌ-ভাতের আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই: অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাছ ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ভোজের প্রধান অঙ্গই মৎস্য,—তা যথেষ্ট হইয়াছিল। সকলের মুখেই হাসি, সকলেই উৎফুল্ল।

ভূপেন্দ্রবাবু পাড়ার একজন প্রবীণকে কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি খুব হুঁসিয়ার লোক। ভূপেনবাবুকে একটু তফাৎ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, কাঁচা মাছের বিষম লোভ। যারা কুটিয়া দেয়, তা'রা চুরি করে; যা'রা পুকুরে ধুইতে যায়, তা'রা চুরি করে; আবার যা'রা রাঁধে, তা'রা চুরি করে; আবার যা'রা পরিবেশন করে, তা'রাও সুযোগ পাইলে চুরি করে। আমি এদিকে দেখি, তুমি রন্ধনশালার দিকে তোমার স্ত্রীকে দৃষ্টি রাখিতে বলিবে।"

ভূপেনবাবু চলিয়া গেলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণভোজন, পরে স্ত্রীলোক প্রভৃতির ভোজন ব্যাপার সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

জামাই ষষ্ঠী। সলিল শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। ষষ্ঠী কাল হইয়া গিয়াছে, সলিল আজই যাইতে চাহে। শাশুড়ী বলিতেছেন,—"সে কি বাবা! এখন গরমের ছুটী আছে, কিছুদিন এখানে থাক।"

সলিল। না, আমি থাকিতে পারিব না। মা শোকে অধীরা, আমি গেলে মা অনেকটা সান্ত্বনা পাইবেন।

শাশুড়ী। তা' ত সত্যি, বাবা! তুমি কলিকাতায় থাকিলে তিনি ত একাই থাকেন! দু'চার দিন থাকিয়া গেলে, তিনি বিশেষ অস্থির হইবেন না।

সলিল। সে যেন উপায় নাই! এখন যখন ছুটি আছে, তখন অনর্থক এখানে থাকিয়া তাঁ'কে অস্থির করা আমার উচিত নহে।

প্রফুল্লমুখী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। সলিল বাড়ী রওনা হইল। সলিল চলিয়া গেলে প্রফুল্ল মনে মনে ভাবিলেন, "তাই ত, শিক্ষিত জামাই আনিলাম, অথচ কথাবার্ত্তাগুলি যেন কেমন চড়া চড়া! মেয়েটী সুখী হইলে বাঁচি!"

দশম পরিচ্ছেদ।

বৈকাল বেলা। সলিল কলিকাতায় গোলদীঘির ধারে হাওয়া খাইয়া পায়চারী করিতেছে। এমন সময় একজন সম-বয়সী সহপাঠী আসিয়া বলিল, "সলিল, নতুন বিয়ে ক'রেছ, বিয়েতে কিছু খাওয়াইলে না, সে কথাও বল্‌তে চাইনে; কিন্তু এতদিন বাড়ী ও শ্বশুরবাড়ীতে কাটিয়ে এলে, তবুও সর্ব্বদা তোমার মুখখানি ম্লান দেখিতে পাই কেন?"

সলিল। ভাই অজিত! আমার প্রাণে বড়ই অশান্তি। এ বিয়েতে আমি সুখী হই নাই। কখনও যে সুখী হ'ব তাহারও সম্ভাবনা নাই।

অজিত। কেন?

সলিল। সেকেলে মামুলী লজ্জাটা আমার আদৌ ভাল লাগে না।

অজিত। তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। কাল বিয়ে কর্‌লে,

আর আজই বৌএর লজ্জা যাবে! বাঙ্গালীর ঘরে কি কখন এটা হয়, না হওয়া বাঞ্ছনীয়?

সলিল। হবে না কেন? যারা অশিক্ষিতা, তারাই সাত হাত ঘোম্‌টা টেনে কলা-বৌ সেজে থাকে। আহা, প্রভাতকুমারী ম্যাট্রিকিউলেশন পাশ করিয়াছে, বেশ আধুনিক ফ্যাসানে চলে, ঘোম্‌টা-ফোম্‌টার ধার ধারে না, যেন ফুটন্ত জ্যোৎস্না! তাকে বিয়ে করা আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল।

অজিত। তবে তাকে বিয়ে না ক'রে এ বিয়ে কল্লে কেন? আর যখন করেছ, তখন একে লয়েই সুখী হ'বার চেষ্টা কর।

সলিল। না ভাই, আমি সুখী হতে পার্ব্ব না।

অজিত। সে কি! সুখী হ'তে পার্ব্বে না? তবে আগে তোমার বাপকে জানাও নাই কেন?

সলিল। বাবাকে বল্‌বার সুযোগ পাই নাই। বিয়ের দুদিন আগে শুন্‌লাম যে, আমার বিয়ে।

সলিলের কথাগুলি অজিতের ভাল লাগিল না। অজিত বলিল,—"আমি ভাই যাই; ঐ দেখ, ভয়ানক মেঘ ক'রেছে, এখনি বৃষ্টি নাম্‌বে।"

অজিত চলিয়া গেলে সলিল শষ্পাস্তীর্ণক্ষেত্রে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। অস্ফুটস্বরে একবার বলিয়া উঠিল, "বিয়ে করেছি ব'লে নিজের জীবনটাকে মাটী কর্‌তে পারিনে, আমি প্রভাতকে বিয়ে কর্ব্বই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্বিন মাস পড়িতেই ভূপেন্দ্রবাবু কমলাকে বাড়ী আনিয়াছেন। পূজার সময় একটীমাত্র মেয়েকে পাঠাইতে কষ্ট হইলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে অবিনাশবাবু ও প্রফুল্লমুখী মেয়েকে পাঠিয়েছেন।

আজ পঞ্চমী। পূজার আর দু'দিন বিলম্ব আছে। কমলার বাপের বাড়ী থেকে প্রায় দুইশত টাকার তত্ত্ব আসিয়াছে। লাবণ্যময়ী ও ভূপেন্দ্রবাবু কুটুম্ববাড়ী কি তত্ত্ব পাঠাইবেন, তাহার পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময় পিয়ন একখানি পত্র দিয়া গেল। ভূপেন্দ্রবাবু পত্রখানি লইয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্র এই:—

শ্রীচরণেষু—

মা, আমার কলেজ বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমি বাড়ী যাই নাই কেন, বাবা জানিতে চাহিয়াছেন এবং শীঘ্র আমাকে বাড়ী যাইতে লিখিয়াছেন। আপনারা তাড়াতাড়ি আমার বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া, আমার মনের কথা কিছুই বলিতে পারি নাই। অশিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করা বড়ই অন্যায় হয়েছিল। তাই গত শ্রাবণ মাসে আমি একটী শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করিয়াছি। আপনারা পাছে অমত করেন, এইজন্য এ বিবাহের কথা পূর্ব্বে আপনাদিগকে জানাই নাই। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। যদি মার্জ্জনা করেন এবং বাড়ী গেলে আমায় তিরস্কার না করেন, তবে আপনার পুত্র-বধূকে সঙ্গে লইয়া অষ্টমীর দিন বাড়ী যাইব। পত্রপাঠ উত্তর দিবেন। আমার প্রণাম জানিবেন। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

সেবক—শ্রীসলিল।

পত্র পড়িয়া ভূপেন্দ্রবাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। লাবণ্যময়ীর চক্ষুও অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। দু'জনেই কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পরে লাবণ্যময়ী বলিলেন, "আমার অদৃষ্টে এতও ছিল! হৈমকে হারাইলাম, মনে ক'রেছিলাম, সোণার-বৌমার হাসিতে মনের আগুন চাপা দিব, সে হাসি দেখাও আমার অদৃষ্টে নাই।"

ভূপেন্দ্র। অদৃষ্টে যাহাই থাক্, এখন বৌমার সঙ্গে ঝি এসেছে, এর মধ্যে তোমার গুণধর পুত্রের আস্‌বার প্রয়োজন নাই; আমি এখনই লিখে দিচ্ছি, আস্‌তে হবে না।

লাবণ্য। এখনই লিখ না, অনেক সময় আছে, ভেবে চিন্তে যা' হোক একটা জবাব দিলেই হবে।

কমলা পাশের ঘর থেকে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা সবই শুনিতে পাইয়াছিল। সে ছেলেমানুষ হইলেও বড়-ঘরের মেয়ে—বুদ্ধিমতী, ব্যাপারটা সবই বুঝিয়া ফেলিল। ভাবিল, ঝি যদি আমার কাছে থাকে, তাহা হইলে তাঁহার আসা হইবে না। একটু পরেই যখন ঝি ঘরে আসিল, তখন তাহাকে বলিল, "যা'রা তত্ত্ব নিয়ে এসেছে, তারা দু'টার ট্রেণে বাড়ী যাবে, তুমিও তাদের সঙ্গে যাও। এখানে আমার অযত্ন হবে না, বরং তুমি বাড়ী গেলে, মার অনেক কষ্ট দূর হবে।" ঝিও বাড়ী যাইবার জন্য মনে মনে ব্যস্ত হ'য়েছিল। সে

আনন্দিতচিত্তে বলিল, "আচ্ছা দিদিমণি, তোমার শাশুড়ীকে বলিয়া, আমি আজই যাইব।"

এমন সময় লাবণ্যময়ী আসিয়া বলিলেন, "বৌমা এস, বেলা হ'য়েছে, খাবে।"

ঝি বলিল, "মাঠাক্‌রুণ! আমি আজ বাড়ী যা'ব।"

লাবণ্য। কেন মা, তুমি গেলে বৌমার একা থাক্‌তে কষ্ট হবে!

ঝি। না মা, দিদিমণি বলেছেন, কষ্ট হবে না।

লাবণ্য। তোমার কি এখানে কষ্ট হচ্ছে?

ঝি। না মা, কষ্ট হবে কেন? আপনি যে মানুষ, আপনার কাছে আবার কষ্ট কি? আপনি তো আমাকে ঝি-এর মত দেখেন না!

লাবণ্য মনে মনে বুঝিলেন, বৌমা সমস্ত শুনে কৌশলে ঝিকে বিদায় করছে। প্রকাশ্যে ঝিকে বলিলেন,—"তোমার যদি যেতে ইচ্ছে হয়, তবে যাও।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আজ শারদীয়া অষ্টমী। সলিল নূতন স্ত্রী প্রভাতকুমারীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিল।

প্রভাতকুমারীর বাঁকাসিঁথা, চোখে চশমা, পায়ে জুতা, হাতে রিষ্ট-ওয়াচ, এক হাতে এসেন্সমাখা রুমাল, অন্য হাতে একখানি সংবাদ-পত্র, লজ্জার লেশও নাই, ঘোম্‌টা সরিয়া মাথার উপর উঠিয়াছে, চাল-চলনে বিবিয়ানা।

লাবণ্যময়ী হিন্দুর ঘরে এই সৃষ্টিছাড়া রকমের গৃহলক্ষ্মী দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। ছেলেকে কিছু বলিবেন না, লিখিয়াছিলেন, তাই নীরব রহিলেন।

সলিল বাড়ী আসিয়া অবধি প্রভাতকুমরীর কাছেই অধিকাংশ সময় থাকে। শয়নে স্বপনে, ধ্যানে জ্ঞানে কেবল প্রভাতের চিন্তায় বিভোর! সলিল এখন প্রভাতময়। কমলা প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় ঘর আলো করিয়া থাকে। প্রভাত রূপে গুণে কমলার পদ-প্রান্তেও দাঁড়াইবার যোগ্য নহে। কিন্তু এ তুলনা সলিলের মনের এক কোণেও স্থান পায় নাই। না পাইবারই কথা! কারণ সে প্রথম থেকেই কমলাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছিল।

কমলার হাস্যময়ী মূর্ত্তি দিন দিন বিষাদ-কালিমায় মলিন হইতে লাগিল। সলিলের চোখে এ পরিবর্ত্তন না পড়িলেও লাবণ্যময়ী লক্ষ্য করিলেন।

লাবণ্যময়ী ভাবিলেন, ইহার একটা প্রতীকারের আবশ্যক হইয়াছে।

তিনি কমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমা, সলিলের খাওয়া হয়েছে, তুমি পান দিয়ে এস।"

শ্বশ্রূর কথা শুনিয়া কমলার মুখ লজ্জায় দুঃখে অবনত হইল। বিস্ময়ের স্বরে বলিল, "আমি!"

লাবণ্য। হাঁ, তুমি। যাও, বেলা হয়েছে, শীঘ্র পান দিয়ে এসে, খেতে বস। দাঁড়িয়ে ভাবছো কি? যাও।

কমলা শাশুড়ীর আদেশে পান হাতে লইয়া সলিলের কক্ষদ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। পরে সলজ্জভাবে মৃদুপদসঞ্চারে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। কিন্তু সলিলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। মনের মধ্যে আবেগ উদ্বেগ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

কমলার এই ভাব দেখিয়া সলিল বলিল, "কি, পান এনেছ, টেবিলের উপর রেখে যাও। সঙের মত দাঁড়িয়ে কেন? এই জন্যই আমি পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা জঙ্গলী মেয়েগুলোর উপর বিরক্ত। আমার সাম্‌নে সঙের মত দাঁড়িয়ে থেকো না; পান রেখে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। আর, তুমি আমার পান দিতে এসো না, আমি নোঙরা মানুষের হাতে পান খেতে ইচ্ছা করি না।"

কমলা অপ্রত্যাশিতভাবে এইরূপ লাঞ্ছিতা হইয়া টেবিলের উপর পান রাখিয়া সজলনেত্রে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার বাসায় একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে মুক্ত-বাতায়নের নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়া প্রভাতকুমারী পড়িতেছে।

বাহির হইতে সলিল বলিল, "প্রভাত, কি করছো?"

প্রভাত। কি করছি দেখে যাও।

"আমার দেখ্‌তে যাওয়া অপেক্ষা তোমার ব'লে ফেলাটা কি সহজ নহে?"

এই বলিতে বলিতে সলিল প্রকোষ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিল। বলিল, "বাঃ, পড়ছো যে! কি পড়ছো?"

প্রভাত। দেখ, আমার পড়ার সময় বাজে বকিয়ে জ্বালাতন ক'র না।

সলিল। জ্বালাতন আর কি করছি। এখন কি পড়ার সময়? আমি অফিস থেকে তেতে-পুড়ে এলাম, এখন কি পড়া উচিত? পড়াটাই কি উচ্চতর কর্ত্তব্য?

প্রভাত। আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আমিই নির্ণয় করবো। ভারি চাকুরে বাবু! পড়বো না কি রাতদিন হাতাবেড়ী নিয়ে থাকবো? তা' হলে তুমি সন্তুষ্ট হও। কিন্তু আমি তা কখনই পার্ব্ব না। আমার আত্মোন্নতির পথে যে বাধা দেয়, তাকে আমি ঘোর শত্রু মনে করি।

সলিল। বাঃ! অনেক কথাই বল্‌ছ দেখ্‌ছি, আমি কি তাই বল্‌ছি যে, তুমি রাতদিন হাতাবেড়ী নিয়ে বসে থাক! উড়ে বামুন কি ছাই-মাটী আমায় খেতে দেয়, সেটা কি তোমার দাঁড়িয়ে দেখা উচিত নহে? তোমার ইচ্ছায় আমি আজ ৩ বৎসর বাড়ী যাই নাই, মাকে বাবাকে দেখি নাই; যখনই ছুটি পাই, তখনই দার্জ্জিলিং, মূসরী, এলাহাবাদ, ওয়ালটিয়ার প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে তোমার ফরমায়েস মত যাই। আর আমার সম্বন্ধে তুমি এতই উদাসীন! চাকুরে বাবু বলিয়া প্রায়ই ঠাট্টা করিয়া থাক! আমার সঙ্গে কি তোমার উপহাসের সম্পর্ক? আমি কি টাকা কম উপায় করিয়া থাকি? তোমার ফরমায়েস মত চলিতেই ত আমার সমস্তই ব্যয় হইয়া যায়। মাসে প্রায় তিনশত টাকা উপায় করি, কাহাকেও এক পয়সা দিই না, নিজেও কিছু রাখি না, সমস্তই ঐ পাদপদ্মে ঢালিয়া দিই, তবুও যে মন পাই না।

"তিনশত টাকায় কি চলে? খাওয়া পরা, ধোপা নাপিত, ঝি-চাকর সবই উহার মধ্যে! এ মাসে কুড়িখানির বেশী নভেল কেনা হইল না। মোটে এক বাক্স সাবান আর এক ডজন এসেন্স কিনেছি, ইহাতে কি করিয়া চলে? আজ ১৫দিন হইল থিয়েটার বায়স্কোপ দেখ্‌তে পেলুম না। প্রাণটা আঁই-ঢাই করছে। তোমার পোড়া সংসারে যেন বন্দিনী হ'য়ে আছি। বলিলে ত তুমি ছোটলোকের মত অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠ!"

প্রভাতকুমারী ঐরূপ বলিয়াই পুনরায় পাঠে মনঃসংযোগ করিল। সলিলও গম্ভীরমূর্ত্তিতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত কুমারীর আচরণে সলিল দিন দিন তাহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক অশান্তিতে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিল। হঠাৎ একদিন তার জ্বর হইল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "টাইফয়েড্ ফীবার!" ঔষধ সেবন চলিতে লাগিল।

প্রভাত কুমারী ঔষধ সেবন করাইবার ভার চাকরদিকের উপর ন্যস্ত করিয়া নিরুদ্বেগে নভেল পড়িতে লাগিল। সলিলের পীড়া প্রভাত কুমারীর আহার বিহার. পাঠ নিদ্রা প্রভৃতি কার্য্যের পক্ষে কোন রূপ ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারিল না।

সলিল সারা রাত অচেতন অবস্থায় ছিল। ভোরের সময় চাকর ডাকিল, "বাবু! ঔষধ খান।"

সলিল প্রভাত কুমারীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, "তুমি ঔষধটা দেখিয়া দাও, উহারা কি খাওয়াইতে কি খাওয়াইবে।"

প্রভাত বলিল, "তা ঠিক; ওরা ঠিক খাওয়াতে পার্ব্বে না। আমারও রাত জাগলে অসুখ করবে। একটী নার্স ঠিক করবার প্রয়োজন হয়েছে।"

এই কথা শুনিয়া সলিলের যুগপৎ রাগ ও দুঃখের উদয় হইল। বলিল, "নার্স আর ঠিক করতে হবে না। আমি বাড়ী যাব। তোমার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে যাইতে পার, নচেৎ বাপের বাড়ী যাও। তুমি ব্যতীত আমার অনেক আত্মীয় আছে। আমি কি মোহান্ধ। হীরক ভ্রমে কাচ লইয়া ছিলাম! গুরু জনকে অপমানিত করার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সলিল। কমলা! তোমার চোখে এখনও জল কেন? আমি আজ অন্ন পথ্য করিব; আমার জীবনের আর কোন আশঙ্কা নাই। আজ তিন মাস তুমি আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া আমার শুশ্রূষা করিয়াছ। তোমারই যত্নে এবার বাঁচিয়া উঠিলাম। তুমিই আমাকে জীবন দিয়াছ। আমি তোমার নিকট চির ঋণী।

কমলা। আপনি ওসব বল্‌ছেন কেন? আমি দাসী, আমি জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যই করিয়াছি। স্বামীই হিন্দু রমণীর সাক্ষাৎ দেবতা। স্বামী সেবাই হিন্দু নারীর শ্রেষ্ঠ ব্রত।

সলিল। কমলা! তুমি দেবী, আমি পিশাচ। তাই তোমাকে এত দিন চিনি নাই। তোমার প্রাণে ব্যথা দেওয়াতেই আমার এই দুর্গতি। আমি মণি পাইবার আশায় ফণিনীর আশ্রয় লইয়া ছিলাম। এখন দেখিতেছি, সতীত্বের মণি তোমারই করতলে! তুমিই সতীর শিরোমণি! বুঝিতে না পারিয়া শান্তি সরোবর উপেক্ষা করিয়া পুতিগন্ধ পঙ্কিল জলাশয়ে অবগাহন করিয়া ছিলাম। তাই আজ বৃশ্চিক দংশন-জ্বালা ভুগিতেছি। তোমার ঐ পবিত্র শীতল স্নিগ্ধ মুর্ত্তিই এ জ্বালা নিবারণ করিতে সমর্থ।

এই বলিয়া সলিল কমলাকে বুকে লইয়া বলিল, "তুমিই আমার শান্তি প্রলেপ।"

ষোড়ষ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে আরও দেড় বৎসর চলিয়া গেল। কমলার অনুরোধে সলিল প্রভাত কুমারীকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিল। উত্তরে প্রভাত লিখিল, "আমি দাসী নহি যে, সকল সময়ই হুকুম তামিল করিব! আমি এখানেই থাকিব, যাইব না।"

কমলা খুব মোলায়েম ভাবে পত্র লিখিয়া প্রভাতকে আনিল। কমলার অনন্ত উদার প্রশস্ত হৃদয়ের সংস্পর্শে প্রভাতের রুক্ষ মেজাজ নরম হইয়া পড়িল। কমলার অকপট স্নেহ-ভালবাসায়, আন্তরিকতায় ও মিষ্ট কথায় প্রভাত মুগ্ধ হইয়া ক্রমে তাহার মত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কমলার কোলে একটী সাত মাসের ছেলে। আজ সেই ছেলের অন্ন-প্রাশন। কমলার মা-বাপ আসিয়াছেন। কমলার কিশোর বয়সের সেই খেলার সাথী অনিলও এসেছে। আজ সকলেই একত্র। মহা আনন্দের দিন। সকলের মুখেই হাসি। আনন্দে কমলার ঘর-সংসার সত্য সত্যই কমলার নিকেতন বলিয়া বোধ হইতেছে। মহা সমারোহে অন্নপ্রাশন হইয়া গেল।

সেই নিরানন্দ হা-হুতাশের বাড়ী খানি আজ কমলার গুণে—সতীর সতীত্ব গৌরবে হাস্য মুখরিত নন্দন-কাননের মলয় হিল্লোলের মত সুমিষ্ট নীল নীরধির শুভ্র ফেণরাশির মত সুন্দর, প্রভাত সূর্য্যকিরণস্নাত মন্দাকিনীর ন্যায় পবিত্র।

বাণী-বন্দনা।

লেখিকা,—শ্রীমতী হরিদাসী সিংহ।

স্বর্ণ-বীণাটি করে ল'য়ে তুমি
এস গো করুণা ময়ি!
আমার হৃদি ভূধরের মাঝে
এস মা, জননী অয়ি!

মেঘে ঢাকা ছিল আমার জীবন,
চপলা দীপ্তি হাসেনি কখন,
আজি কি শুভ্র অরুণ কিরণ
বিকশি' উঠিছে ওই।
স্বর্ণ-বীণাটি করে ল'য়ে তুমি
এস সঙ্গীত ময়ি!

আমার চিত্ত নির্ঝর পাশে
ওগো সঙ্গীত রাণী
ক্ষণেক বসনা শুভ্র—বসনা
কোলে রাখি বীণা খানি।

নির্ঝর তানে মিলা'য়ে রাগিণী,
বাজাও তন্ত্রী সুচারু হাসিনী,
মধুর কণ্ঠে অয়ি শুভাষিণী
ঢাল গীত ধারা বাণি।
ক্ষণেক বসনা হৃদয়ের পাশে
বীণা ল'য়ে বীণাপাণি।

হেথায় বারেক এস গো জননী—
মানস সরস কূলে,
চরণ দু'খানি সাজাই তোমার
অমল কমল ফুলে!

রাশি রাশি ফুল উঠেছে ফুটিয়া,
তৃষিত মরাল আসিছে ছুটিয়া,
পবন বহিছে সুবাস লুটিয়া,
জাগায়ে ভ্রমর কুলে।
তোমারি আলোকে আমারই হাসি
(মোর) শান্ত মানস ভূলে।
যেওনা মা আর, ত্যজিয়া আমারে
ভাসায়ে নয়ন নীরে।
চিরদিন দেবী করিও ভ্রমণ
হৃদয় নির্ঝর তীরে।

কভু এ সরসে শতদলোপরি,
বসিও জননী করে বীণা ধরি',
ভক্ত তোমার দেখি' আঁখি ভরি,
গাহিবে চরণ ঘিরে।
যেওনা মা আর ভুলা'য়ে আমারে
কাঁদায়ে নয়ন নীরে।

কৌলীন্য।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায় সিংহ।

(১)

মণীন্দ্রের কোন নব চিন্তার অবসান হইতে না হইতেই নীহার আসিয়া বিরক্তি অথচ করুণ ভাবনিশ্রিত কণ্ঠে বলিলেন, "আর ত সইতে পারি না, আমার যা হয়, একটা উপায় কর!" মণীন্দ্র এ চিন্তার অভিনয় এইখানেই শেষ করিয়া বলিলেন, "আমার কি সাধ্য আছে, কি উপায় করব বল? মাতা পিতার বিপক্ষে কথা বলা কি উচিত?"

নিহার। তার অন্যায় দেখা ত উচিত।

মণীন্দ্র। তাঁদের মত ন্যায় অন্যায়ের বিচার শক্তি কি আমার আছে?

নীহার। তোমার না থাক, তাঁদের ত আছে—দিন রাত খেটে মরছি, প্রাণ দিয়ে মন যোগাচ্ছি তবু গঞ্জনা! যাতনা! আর ত সহ্য হয় না!

মণীন্দ্র। ও গঞ্জনা যাতনা যে শুধু তোমার তা নয়; ও লাউ গড় দিয়ে কুমড়া কোটা পর্য্যন্ত প্রত্যেকে তোমার দোষ দর্শান পরোক্ষে আমার উপর ক্রোধ। কি করব ভাই, এই এক বছর ঘুরে ঘুরে মরলেম্ কোথাও চাকরী জুটল না। দশ টাকার গোলামী জুটলেও ত আর বাড়ী আস্‌তেম না। একবেলা খেয়ে পড়ে থাকতেম।

নীহার। একবেলা খেয়ে মানুষ ক'দিন পারে?

মণীন্দ্র। ক'দিন পারে? ছ'মাস একবেলা খেয়ে ছিলেম।

নীহার অশ্রু মুছিলেন। মণীন্দ্রও চোখ মুছিয়া আবার বলিলেন, "তাতেও ত মাতা পিতাকে সন্তুষ্ট করতে পাল্লেম না। আবার বল্‌লেন, কিনা, তোমার মনে রয়েছে বাড়ী, কাজেই ও চেষ্টা চেষ্টাই হয় নাই। আসিব না, মনে ভেবে ছিলেম কিন্তু দেহ যে আর সহ্য কর্ত্তে পার্‌ল না, অনাহারে চিন্তায়, পরিশ্রমে, নিরাশায় মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল পা কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, ভাবলেম, একটু সুস্থ সবল হয়ে আবার যাইব। তা আর সুস্থ সবলতায় কাজ নাই।

নীহার। তোমার জন্য কি ভগবান্ মা বাপের প্রাণে একটু স্নেহও দেন নাই।

নীহারের সঙ্গে মণীন্দ্র আবার চক্ষু মুছিলেন। দুজনে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন; পরে রমণীগণের যে বৃথা আশা, অহঙ্কার, নির্ভরের স্থল পিত্রালয়, নীহার তাহারই দোহাই দিয়া আবার বলিলেন, "না হয় আমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও, ও রাগ যত আমারই উপর।

মণীন্দ্র। সেখানে কার কাছে যাবে? মাবাপ আছেন না উপযুক্ত ভাই আছে? কার কাছে দাঁড়াবে? এক অপগণ্ড ভাই সেও ত পরের আশ্রয়ে।

শিশু সরমা স্তন্য পান ছাড়িয়া মাতা পিতার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকাইতেছিল; বার বার তাহাদের অশ্রু দেখিয়া সেও কাঁদিয়া ফেলিল। মণীন্দ্র

তাকে নীহারের কোল হইতে নিজের কোলে আনিয়া স্নেহ চুম্বন করিলেন। সে একটু ধৈর্য্য ধরিলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মণীন্দ্র পুনর্ব্বার বলিলেন, "নীহার! কালই কলিকাতায় যাইব।

নীহার। কাল দিন আছে?

মণীন্দ্র। দিন দেখে আর কি কর্‌ব, মৃত্যুর বেশী ত কিছু ঘট্‌তে পার্‌বে না।

নীহার। বালাই অমন কথা আর বলো না।

মণীন্দ্র। কেন বল্‌ব না, এর চেয়ে মৃত্যু কি ভাল নয়?

নীহার। আর তোমাকে আমি কিছু বল্‌ব না—নীরবে সব সহ্য কর্‌ব।

মণীন্দ্র। তুমি কি বল্‌বে, আমি কি কিছু জানিনা, বুঝিনা, শুনি না? আমি কচি খোকা নয়। কাল নিশ্চয়ই চাকরীর চেষ্টায় বেরুবো, চাকরী জুট্‌লে আসিব, আর না জুটিলে এই শেষ বিদায়!

নীহার বিদ্যুতের ন্যায় অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

শেষ বিদায় কথাটী নীহারবালার কোমল প্রাণে বৃশ্চিকের মতন দংশন করিতে ছিল, এজন্য তাঁহার গৃহকর্ম্ম আহার, নিদ্রা উত্তমরূপে সম্পন্ন হইল না, নিদ্রান্তে শেষ বিদায় অথবা শেষ বিদায়ের তীব্র দংশনে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।

রাত্র ঠিক প্রভাত হয় নাই। কেবল দু একটা কাক ডাকিয়া আবার নীরব হইতেছে। নীহারের স্মরণে 'শেষ বিদায়' রবটী জাগরিত হইয়া ভাবী বিভীষিকায় হৃদয় কম্পিত করিতেছে। এ জন্য সে উপাধানে মুখ লুকাইয়া কপট নিদ্রাবেশে ভগবৎ পদে স্বামীর বিদেশ যাত্রা বাসনা নিবৃত্তি কামনা করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে ভাবিতেছেন, এই রূপে ট্রেণের সময়টা কাটিয়া গেলেই হয়। আজ না হয়, একটু বেলায় উঠিব। তাতে ক্ষতি কি, দুটো বকুনি খাবত; তাতেইবা ভয় কি? সমুদ্রে শয্যায় শিশিরের ভয় কি?

এমন সময় মণীন্দ্র ডাকিলেন, "নীহার!" নীহারের শরীর দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ হল্কা বাহির হইয়া গেল—উত্তর দিলেন না। মণীন্দ্র আবার ডাকিলেন, শেষে পাশ ফিরিয়া জাগাইতে গেলেন, দেখিলেন, নীহার ঘর্ম্মে সিক্তা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি? মাঘ মাসের শীতেও যে তোমার ঘাম হইতেছে! তোমার কোন অসুখ করেছে নাকি?"

নীহার ভাবিল, না হয় একটু মিথ্যা বলি। আবার ভাবিল, না, আমি জাতি ওঁর চেয়ে কখন আমার বুদ্ধি বেশী নয়। শেষে হয় ত না খেয়েই

রওনা হবেন। মণীন্দ্র নীহারের গা-মাথার তাপ দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসুখ করেছে নাকি?"

নীহার। না।

মণীন্দ্র। (প্রাতঃকালে) দুটো ভাতের যোগাড় কর্‌তে পার্‌বে?

নীহার। নিশ্চয়ই যাবে?

মণীন্দ্র। নিশ্চয়।

নীহার উঠিয়া গা-মাথায় কাপড় দিলেন। মণীন্দ্র তাহাকে স্নেহে ও প্রেমে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, যেন চাকরী জোটে।" নীহারও পতি পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"অসহায়ের সহায় তিনি,—তিনিই আশা পূর্ণ কর্‌বেন।" ঘুমন্ত সরমাকে মণীন্দ্র আশীর্ব্বাদ করিলেন, ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া শেষে বলিলেন, "এ অনাথা দুটীকে রক্ষা করিও, আমার অবর্ত্তমানে তুমিই এদের কৃপা করিও প্রভু! এদের আর কেহ নাই দয়াময়!" উভয়ে মঙ্গল ময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া দুর্গা নাম উচ্চারণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

মণীন্দ্র যথা সময়ে চলিয়া গেলেন। নীহার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সরমাকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কতক্ষণ কাঁদিয়া শেষে ভাবিলেন, কাঁদিয়া আর তাঁর অমঙ্গল করিব না; অদৃষ্টে দুঃখ, কাঁদিয়া কি করিব! ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "অসহায়ের সহায় তুমি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি, দুঃখ নিবারণে উপায় তুমি, ঠাকুর! তুমি দুঃখিনীর স্বামীকে রক্ষা করিও, আর দুঃখ দিওনা! দয়াময়! কৃপাকর!

(২)

এক মাস পরে মণীন্দ্রের একখানি পত্র আসিল। মণীন্দ্র কোন এক সওদাগরী আফিসে কুড়ি টাকা বেতনে একটী চাকরী পাইয়াছেন। শুনিয়া পিতা মাতা সন্তুষ্ট হইলেন, নীহার হরিদ্বর্ণ ও অন্তরে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

পর মাসের পত্রে মণীন্দ্রের পিতা জানিলেন, মেস্ জলখাবার, জামা জুতা প্রভৃতির খরচ দিয়া মণীর কিছুই বাঁচে না। তিনি গিন্নীকে ডাকিয়া পুত্রের পত্রের মর্ম্ম শুনাইলেন এবং উপসংহারে বলিয়া দিলেন, ছেলে তাঁহাদিগকে সব গোপন করিতেছে। গিন্নী বলিলেন, "মণী ত সে রকম ছেলে নয়।"

কর্ত্তা। ছেলে কি আর এখন তোমার আছে? আমার কথা বিশ্বাস না হয় বউমার পত্রের মর্ম্ম জানো।

গৃহিণী গোঁপনে নীহারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণীর কত মাইনে হল গা বউমা?"

নীহার। কুড়ি টাকা।

গৃহিণী। কর্ত্তাকে যে লিখেছে পঁচিশ।

নীহার। আমার কাছে ত কুড়ি লিখেছেন।

গৃহিণী। আমাদের গোপন কর কেন বাছা? ভাগ বসাব নাকি?

নীহার বিস্ময় ও ভীতি পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "মা! এই খুকীর দিব্যি করে বলছি কুড়ি টাকার বেশী আমি জানি না।" গৃহিণী অমনি বায়ুবেগে গিয়া পুত্র বধুর মাতা পিতার উর্দ্ধারার্থ—সকারাদি বেদ মন্ত্র বারম্বার উচ্চারণ করিলেন। নীহারের একমাত্র ভ্রাতাটির শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু কামনা করিতেও কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করিলেন না।

নীহার একথা মণীন্দ্রকে বিস্তারিত রূপে পত্রে লিখিবে কিনা ভাবিলেন, কিন্তু প্রকাশ হইবে, সন্দেহ করিয়া আর সাহস করিলেন না। অন্য পত্রে যেরূপ সকলের মঙ্গল, খুকীর আব্দার, পিতা মাতা প্রভৃতি সকলের কুশল বার্ত্তা যেরূপ লেখা থাকিত. এ পত্রেও তাহাই রহিল, বেশী রহিল মাত্র, খুকীর একটা পোষাকের কথা।

মণীন্দ্রের প্রতিবাসী শৈলেশ্বর পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা হইতে বাটী আসিতে ছিল; মণীন্দ্র তাহার নিকট সরমা ও ছোট ভাই দুটীর জন্য তিনটী পোষাক পাঠাইয়া দিলেন। যথা সময়ে তাহা পাইয়া কর্ত্তা গিন্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার ছেলের নাকি, এক পয়সাও বাঁচে না? এই দেখ খুকীর জন্য কেমন পোষাক পাঠিয়েছে।"

গৃহিণী। আর কার জন্য কিছু পাঠায় নি?

কর্ত্তা। পাঠাবেনা কেন, সে কি সোকা? তিনটী বালক, এর ভিতর মাত্র একটিকে দিলে যে দোষ হয়, সে জ্ঞান তার যথেষ্ট আছে। নরা সুরার জন্যও জামা জুতা পাঠিয়েছে; সে বোধ হয়, নিলামের খরিদ।

শৈলেশ্বর সেখানে উপস্থিত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ বলিল, "তা হবে কেন

জ্যেঠা মহাশয়! ওযে একই দোকানের কেনা; আর নরা সুরার জিনিষের দামই বেশী।

কর্ত্তা। তোকে বুঝি বলতে বারণ করে দিয়েছে?

শৈলেশ্বর। না, তা হবে কেন।

কর্ত্তা। তবে বুঝি ঘুস দিয়েছে।

শৈলেন আর কথা বলিল না। গিন্নী ও শৈলেশ ভিন্ন দিকে চলিয়া গেলেন।

তিনটী পোষাকের সমষ্টি পুলিন্দাটী লইয়া কর্ত্তা অবিলম্বে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই পুত্র বধুর সম্মুখে দূর হইতে হস্ত নিক্ষেপে ফেলিয়া দিলেন। ভাব দেখিয়া নীহার বুঝিলেন, একটা যেন কি ঘটিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি বাবা?"

কর্ত্তা। তোমার মেয়ের পোষাক।

নীহার। এযে অনেক তিনটা, খুকী এত নিয়ে কি করবে? এ দুটো বুঝি ওদের দু ভাইয়ের।

কর্ত্তা। না ও সব তোমার মেয়ের।

নীহার। এযে খোকাদের জামা!

কর্ত্তা আর কিছু না বলিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য নীহারের বহু চেষ্টায় যত্নে কাকুতি মিনতিতেও নরেন সুরেনের অদৃষ্টে জামাজুতা আর পরা হইল না।

মণীন্দ্রের বাটীর নিকটেই শৈলেশ্বরের বাটী। পরীক্ষার পর তিন মাস বাটী থাকিয়া মণীন্দ্রের পারিবারিক অবস্থা যা কিছু অবগত হইয়া ছিল, তাহা যথা সময়ে মণীন্দ্রকে আসিয়া জানাইল। তিনি শুনিয়া অশ্রু মুছিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "হায়, কি অদৃষ্ট আমার! না খেয়ে না পরে কত কষ্ট করে মাতা পিতার মনস্তুষ্টি করিতে গেলাম, তাতেও নিরাশ হলাম!

শারদীয়া পূজায় মণীন্দ্রের আফিস বন্ধ হইল না; কিন্তু এই তিন দিনে বক্সিসাদি উপরি পাওনায় প্রায় এক মাসের বেতন বেশী পাইল। উঁহার কর্ম্ম দক্ষতায় সেপ্টেম্বর মাসেই সওদাগর সাহেব পাঁচ টাকা মাসিক বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ঐ আশ্বিন মাসে আবার ঐ আফিসের ম্যানেজার মহাশয়ের পুত্রের শিক্ষকতাও আসিয়া জুটিল। এইরূপে আশ্বিন মাসে মণীন্দ্রের আয় ষাট টাকা দাঁড়াইল। এ সময় ভাবিলেন; বিদায় লইয়া এক সপ্তাহের জন্য একবার বাড়ী যাই। কি ভাবিয়া, আবার সে বাসনা তখনই ত্যাগ

করিলেন। পিতার নিকট চল্লিশটী টাকা পাঠাইয়া লিখিলেন, "আমার আয় এখন মাসিক ষাট টাকা করিয়া হইতেছে।" পিতা অনুমান দক্ষতায় বুঝিলেন, ষাট টাকা কখনই নয়, আশী টাকা হইতে পারে। এইরূপে দু তিন মাস অতিবাহিত হইল।

গৃহিণী একদিন কর্ত্তাকে বলিলেন, "মণীকে একবার বাটী আসিতে লেখ।"

কর্ত্তা। কেন? সেখানে বেশ আছে, এখানে খাবার দাবার সে রকম জোটে না, স্বাস্থ্য নাই, সুখ নাই, এসে কি করবে? পূজার সময় ছুটি পাইলে না হয় একবার আসিবে।

গৃহিণী। পূজায় তার ছুটী নাই।

কর্ত্তা। না থাকলে এখন কি হবে— অসময় ছুটী দেবে কেন?

গৃহিণী। আজ এক বছর বাড়ী ছাড়া, আহা একবার তাকে আসতে লেখ।

কর্ত্তা। পুরুষ ছেলে এক বছর দু বছর বিদেশে না থাকলে মা বাপের সংসার প্রতি পালনের জন্য স্ত্রী পুত্রের কি করলে? আমাদের সময় বিদেশে যাওয়ার নিয়ম কম ছিল, তাতে পিতারও একটু জমীদারী ছিল, একটু আদুরে ছিলেম, কাযে কাযেই প্রবাস কর্ত্তে হয় নাই। দরকার হলে কি, আর বাড়ী বসে থাকতেম? আর দুচার বছরে বাড়ী আসবার নাম কর্ত্তেম।

গৃহিণী মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন, দু চার বছর কেন দুচার দিনও প্রবাস কর্ত্তে পারতে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ।

মাঘ মাসের শেষে পত্র আসিল—মণীন্দ্রের ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে। গৃহিণী কাঁদিয়া পাড়া ফাটাইলেন, আগন্তুকগণ জানিলেন, পুত্রাপেক্ষা তার যে চাকরী যাবে, আবার বাটী আসিয়া বসিয়া থাকিবে, ইত্যাদির জন্যই কষ্ট বেশী বোধ করিতেছে। কর্ত্তা উপদেশ দিলেন, ভয় কি? কল্‌কাতায় কত ডাক্তার কবিরাজ আছেন।

গৃহিণী বলিলেন, "তবে তুমি একবার যাও। না হয়, আমাকে একবার নিয়ে চল।"

কর্ত্তা। আমি গিয়ে কি করব? ঈশ্বর না করুন, আমার একটা অসুখ বিসুখ হলে কে দেখবে? সেখানে সবই ত পর, আমার কে আছে?

নীহার বালা মাতা পিতার স্নেহের মাত্রা উপকারের আশা, কর্ত্তব্যের দশা বেশ বুঝিয়া লইলেন। পর দিন আবার পত্র আসিল, অসুখ বেশী, টাকার ও লোকের দরকার। কর্ত্তা দশ টাকা পাঠাইলেন। নীহার তাঁর গায়ের গহনা শৈলেশের মার নিকট বাঁধা রাখিয়া, এক শত টাকা লইয়া শৈলেশের সঙ্গে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিলেন।

জ্বর হইবার পর মণীন্দ্র তাঁর আফিসের ম্যানেজার শিব রতন সরকারের বাটীতে আশ্রয় পাইয়া ছিলেন। পাইবার কারণ—সরকার মহাশয় একে ত হৃদয়বান, তাহাতে বল্লালী নিয়মে বংশমর্য্যাদায় মণীন্দ্র ঘোষ তাঁর শীর্ষ স্থানীয়, আবার মণীন্দ্র যে ছেলেটীকে পড়াইতেন, ঐ ছেলের সঙ্গে সরমার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া ম্যানেজার পত্নী ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। মণীন্দ্রের সৎস্বভাবের পরিচয় পাইয়া দম্পতি মোহিত হইয়াই এরূপ অসময়ে আশ্রয় দিয়া ছিলেন। রোগের সপ্তম দিনে নীহার ও সরমা আসিয়া পৌছিল।

নীহার ছ'দিন পর্য্যন্ত অর্দ্ধাহারে অনিদ্রায় কঠোর পরিচর্য্যা করিলেন, দেবতাকে ডাকিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল লাভ করিতে পারিলেন না। ডাক্তার সপ্তদশ দিনের ভাব দেখিয়া আশা ছাড়িয়া দিলেন। কবিরাজ দেখিয়া বলিলেন,—"ঘোর সন্নিপাত, পূর্ব্বে চিকিৎসা করিলে হয় ত ফল হইত। অসময়ে বুঝি কবিরাজকে স্মরণ পড়ল?"

নিশান্তে মণীন্দ্র ম্যানেজার ও তাঁহার পত্নীকে ডাকিয়া স্ত্রী কন্যাকে তাঁহাদের হাতে সমর্পণ করিলেন। নীহার বুকে আঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মণীন্দ্র অতি কষ্টের সহিত বলিলেন, "ভয় নাই, সত্য ও ধর্ম্ম পথে থাকিও, ভগবান তোমাদের সহায় হইবেন।" আরও কি বলিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

মণীন্দ্রের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। নীহারের জীবনের সকল আশা ভরসা ফুরাইল। পরদিন প্রাতে কন্যাকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রায় মাসান্তের চার পাঁচ দিবস পূর্ব্বে পুরোহিত ঠাকুর কর্ত্তাকে বলিলেন, "যা হয় কিছু শ্রাদ্ধ ক্রিয়া দ্বারা বউমাকে শুদ্ধ করুন, আর তারও একটু পরকাল হউক।"

কর্ত্তা। কিসের শ্রাদ্ধ, কিসের পরকাল? যে আমাদের এরূপ জ্বালায়ে গেল, তার আবার শ্রাদ্ধ, তার আবার পরকাল? এখন সে আমার কে? তার জন্য আমি কি দায়ী?

গৃহিণী ও বধূমাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গৃহিণী বলিলেন, "আমাদের মন যেমন জ্বালাইল, তার মনও যেন জন্মে জন্মে এমনি ভাবে জ্বলে। তার আবার শ্রাদ্ধ শান্তি! শান্তিই যদি চাইত, তবে মা বাপকে যে ভাবে প্রতিপালন কচ্ছিল, সেই ভাবেই কর্ত্তো।"

পুরোহিত। আপনাদের সঙ্গে বুঝি মাত্র টাকা পয়সারই সম্বন্ধ ছিল? ভাল আত্মীয়তা!

নীহার কাতর কণ্ঠে পুরোহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! আমরা কিছু কর্‌লে কি তাঁর শান্তি হবে? ইহ জন্মের রোগ যাতনা কি তিনি ভুল্‌তে পার্‌বেন? সেখানে তার কেউ নাই—আমরা খাদ্য জল দিলে কি তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হবে?

পুরোহিত। অবশ্য হবে—সর্ব্ব শাস্ত্রে, সর্ব্ব ধর্ম্মে, সর্ব্ব জাতিতে, সর্ব্ব দেশে যখন এই শান্তির প্রথা অবলম্বন করে, তখন অবশ্য ইহার ফল আছে, অবশ্য ইহা করণীয়।

নীহার। বাবা না দেন, তবে আমার ভবিষ্যের চাউল কলা, আর যে দুএক খানা গহনা আছে, তা বেঁচিয়া তাঁর শ্রাদ্ধ কর্‌ব, শান্তির উপায় দেখ্‌ব, আপনি সেদিন দয়াকরে আস্‌বেন—মন্ত্র পড়াবেন।

পাঁচ ছয় মাস পরে কর্ত্তা গিন্নীকে একদিন বলিলেন, "বিধবা পুত্র বধুকে ফেলিয়া তোমার অমন সাজ গোছ, আমিষ খাওয়াটা আর ভাল দেখায় না, লোকে বড় নিন্দা কর্‌ছে।

কর্ত্তা গিন্নী উভয়ে পরামর্শ করিয়া পুত্র বধুকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

ম্যানেজার পত্নী নীহারের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া গঙ্গা স্নানের দোহাই দিয়া তাঁকে নিজের বাসায় আনিলেন। শ্বশুরের দুর্নাম হইবে ভাবিয়া নীহার সেখানে বেশী দিন থাকিতে চাহিলেন না। ম্যানেজার পত্নী তাহা বুঝিয়া বলিলেন, "আমি সাম্‌নের বৈশাখ মাসেই সুবোধের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দিব, আমাদের অন্য ভেবোনা।"

নীহার ভাবিলেন, আজ কৌলিন্যই বুঝি আমার এই অসময়ের সহায় হইয়া দাঁড়াইল।

সুবোধ ও সরমার বাল্য প্রীতি দেখিয়া ম্যানেজার মহাশয় ও তাঁর পত্নী অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেন। নীহার প্রতি দিন গঙ্গা স্নান ও গঙ্গাজলে স্বামীর তর্পণ ও ইষ্টদেবতার নাম জপ করিয়া সেই রূপ স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিতেন।

কাবেরীর জল প্রপাত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৃথিবীর সর্ব্ব দেশীয় সভ্য ও অসভ্য জাতি প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ; কিন্তু ভারতের আর্য্যঋষিগণের চক্ষে ভারতের প্রত্যেক নদী, প্রত্যেক পর্ব্বত, প্রত্যেক প্রস্রবন, প্রত্যেক প্রস্তর মূর্ত্তি অতি পবিত্র। যেখানে প্রকৃতির রম্য নিকেতন, যেখানে শান্তির স্নিগ্ধধারা, সেই স্থানেই তাঁহারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ। যেখানে অবস্থান করিলে চিত্ত পবিত্র, সরল ও ঈশ্বর সেবানুরক্ত হয়, যেখানে কোন প্রলোভন নাই, পাপের দৃশ্য নাই, পার্থিব আকর্ষণ নাই, কোনও রূপ চঞ্চলতা নাই, ভারতের আর্য্যঋষির চক্ষে সেই স্থানই পবিত্র। তাঁহারা প্রকৃতির রমণীয় সৌন্দর্য্যকে প্রকৃতির প্রত্যেক লীলা-নিকেতনে পবিত্র তীর্থ মনে করিয়া একান্ত মনে তাঁহার পূজা করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই ভারতবর্ষ এক দিন পবিত্রতায়, মহত্ত্বে ও আধ্যাত্মিকতায় এত বড় হইয়াছিল।

আমাদের দেশে অনেক জল প্রপাত আছে। পশ্চিমঘাট গিরিতে সর্ব্বতী নদীর একটি জল প্রপাত আছে, তাহাও এক অদ্ভুত ব্যাপার। ঐ জল প্রপাতের নাম গৈরসপা। গৈরসপার প্রপাত দ্বারা প্রচুর জল পতিত হয়। ইহার আয়তন অতিশয় বৃহৎ। ঐ জল প্রপাতের প্রবহমান বারিরাশি গৈরসপা নদীর সান্নিধ্যে ৮৮৮ ফিট নিম্নে পতিত হইতেছে। বুন্দেল খণ্ডের চাচৈএর নিকটবর্ত্তী তংশনদীর প্রপাতই বৃহৎ। খাসিয়া পর্ব্বতে তরাপুঞ্জিতে ময়মৈন নামে এক জল প্রপাত আছে। ডাক্তার ওল্ডহান্ বলেন, উহার জল প্রথমে ১৮৮০০ ফিট নিম্নে পতিত হইয়া সেস্থান হইতে ১০০০ ফিট বক্রগতিতে পতিত হইতেছে।

যে কাবেরীর জল প্রপাত বর্ণনীয় বিষয়, সেই কাবেরী নদী হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র। কত কাল পূর্ব্ব হইতে আর্য্যঋষিগণ গঙ্গা, যমুনা, গোদবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী এই সপ্তনদীর জল পবিত্র মনে করিতেছেন, কত কাল পূর্ব্ব হইতে এই সপ্ত নদীকে অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞানে হিন্দুগণ বন্দনা করিতেছেন। কাবেরী দক্ষিণাপথের একটি নদী। এই কাবেরী নদীও

কুর্গের অন্তর্গত পশ্চিমঘাট গিরির শৃঙ্গ ব্রহ্মগিরি হইতে উৎপন্ন। পশ্চিমঘাট বিশাল পর্ব্বত, তাহার শৃঙ্গ ব্রহ্মগিরি কাবেরীর জন্মদাতা। পিতৃ পরায়ণা তনয়ার মত কাবেরী ব্রহ্মগিরির পদ বন্দনা করিতে করিতে মহিশূরের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে, তাই মহিশূরের আবিলতা পরিধৌত করিতে দয়াবতী রমণীর মত কাবেরী ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া ছিল। মহিশূরকে পরিধৌত করিয়া বঙ্গোপসাগরের ঊর্ম্মিমালার গম্ভীর গর্জ্জনে মুগ্ধ হইয়া, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তাঞ্জোর বক্ষে মুগ্ধা কাবেরী বঙ্গোপসাগরে সম্মিলিত হইয়াছে।

এক দিকে জন্মদাতা ব্রহ্মগিরি, অন্য দিকে প্রার্থনীয় বঙ্গোপসাগর, মধ্য স্থানে বসিয়া কাবেরী উভয়ের পদ বন্দনায় নিযুক্ত। কাবেরীর তীরে সন্তান সম কৃষকগণ তাহার বক্ষনিঃসৃত পবিত্র সলিল ক্ষেত্রে সেচন করিয়া প্রচুর শস্য উৎপাদন করিতেছে। কুর্গে কাবেরী বক্রগতি, নদীগর্ভ উপলখণ্ডে পরিপূর্ণ, গিরিগাত্র বিচ্যুত প্রস্তরখণ্ড যেন আশ্রয় শূন্য হইয়া কাবেরীর বক্ষে পড়িয়া আছে, উভয় তীরের মনোহারিণী শোভা।

মহিশূরের নিকটেই কাবেরী একটি সঙ্কীর্ণ গিরি সঙ্কট হইতে ৩০।৩৫ ফুট নিম্নে পতিত হইতেছে। কাবেরী মহিশূর পরিধৌত করিতে করিতে শিরিঙ্গপট্টম ও শিবসমুদ্রম নামক দুইটি চমৎকার দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই দ্বীপদ্বয়ই হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র। দ্বীপ দুইটির শোভা বাস্তবিকই মনোহারিণী। নদী তীর হইতে দ্বীপ মধ্যে উপস্থিত হইবার জন্য সুন্দর ও বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই শিবসমুদ্রম দ্বীপেই বিখ্যাত কাবেরী প্রপাত। যে কাবেরী প্রপাত গৈরসপা প্রপাত দর্শনাভিলাষী সন্ন্যাসীগণ মুগ্ধ হইয়া দক্ষিণাপথ ভ্রমণ করিয়াছেন, যাহার পবিত্র সৌন্দর্য্য দর্শন কারতে বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ দক্ষিণাপথে পদার্পণ করিয়াছেন, যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া জগতের ভ্রমণেচ্ছু সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য পাশ্চাত্য পর্য্যটকগণ এই জল প্রপাতের সহিত বিখ্যাত নায়গারা প্রপাতের* তুলনা করিয়াছেন, সেই কাবেরী প্রপাত এই রমণীয় দ্বীপ বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত। এই স্থানে নদী দুই শাখায় বিভক্ত। এই বিভক্ত শাখায় ৩২০ ফুট উচু হইতে নদীস্থ জল যেন প্রাচীরের মত হইয়া

* ইরাই হইতে অণ্টেরিও হ্রদে সেণ্টলরেন্স নদীর জল প্রবাহিত হইতেছে, এই প্রবাহই নায়েগ্রা নামে বিখ্যাত। নায়েগ্রা দৈর্ঘ্যে ৩৭০ মাইল। এই প্রপাতে প্রতি মিনিটে ১৭৫ কোটী মণ জল পতিত হইতেছে।

নিম্নে পতিত হইতেছে। তাহার শব্দ কি গম্ভীর! কেহ চীৎকার করিয়া ডাকিলেও বোধ হয়, সে শব্দে তাহা শ্রুতিগোচর হওয়া সম্ভব নয়। এই শাখাদ্বয়ের যে শাখাটি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত, তাহার নাম গগনচাকী, যে শাখাটি পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত, তাহার নাম ভারচাকী।

জল প্রপাতের জলরাশির পতন শব্দও যেমন গম্ভীর, তাহার পতন দৃশ্যও তেমনি মনোহর। যখন স্রোতাবর্ত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড সবেগে নিম্নস্থ পর্ব্বতে পতিত হয়, তখন সে দৃশ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক ও নয়ন রঞ্জন হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড ভাসিয়া যাইতেছে, কোথাও বা পাত মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে, কোথাও বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর স্তূপ পড়িয়া আছে, স্রোতগতি প্রতিহত হইয়া আবার ছুটিতেছে। ঐ সমস্ত স্রোতাবর্ত্তের অদূরে পার্শ্বস্থ স্থানে ভ্রমণকারীদিগের সহিত নকুল জাতীয় এক প্রকার জীবের মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। যে সমস্ত পক্ষী মনুষ্য বা অন্য কোন হিংস্রজন্তুর পদ সঞ্চালন শব্দ শুনিলে সন্ত্রস্ত হয়, তাহারা জল প্রপাতের ভৈরব কল্লোল শুনিয়াও নির্ভয়ে তথায় বিচরণ করে। শ্রুতিকঠোর ভীষণ শব্দের সহিত তাহারা অভ্যস্ত, বিশেষতঃ যে হিংসা তাহাদিগের ভয়ের কারণ, জল প্রপাতের ভৈরব কল্লোলেও সে হিংসার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি তাহারা দেখিতে পায় না।

গগনচাকী উপরিস্থিত পর্ব্বত হইতে নিম্নস্থ পর্ব্বতে পতিত হইতেছে, বারিরাশি পতনবেগে চুর্ণীকৃত হইয়া যাইতেছে। সেই চুর্ণীকৃত বারিরাশি বহু উর্দ্ধে উত্থিত হয়। তাহার শোভা চমৎকার! জলরাশি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে ও স্থানটী বাষ্পময় হইয়া পড়ে; সেই বাষ্পে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে রামধনুর মত অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। বহুদূর হইতে ঐ উৎক্ষিপ্ত বাষ্পরাশি দৃষ্ট হয়। মেঘ অপেক্ষা লঘু, অথচ জলকণার অপূর্ব্ব সম্মিলনে সৃষ্ট বাষ্পরাশি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। ভ্রমণ কারিগণ উহার বিচিত্র শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হন।

ভারচাকী শান্ত। উহার ভৈরব গর্জ্জন নাই, প্রবল জলোচ্ছ্বাস নাই, নিরন্তরই সে শান্ত। কিন্তু বর্ষাকালে যখন উচ্চ শৈলদেশ হইতে নিম্নে প্রবাহিত হয়, তখন সে একটু উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। তখন প্রায় এক চতুর্থ মাইল বিস্তৃত হইয়া জলরাশি নিম্নদেশে নিঃসৃত হয়। তখন তাহার আকৃতির স্থিরতা নাই, উন্মাদের মত অস্থির হইয়া পড়ে। অন্যান্য সময়ে জল প্রপাতের আকৃতি

অশ্ব খুরের ন্যায় অর্দ্ধ বৃত্তাকার। নিম্নে যে স্থানে জলরাশি উৎক্ষিপ্ত হয় এবং চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, সে স্থানে ঊর্দ্ধে যেমন উচ্ছ্বলিত জলরাশি বাষ্পাকারে শোভমান, নিম্নস্থ জলরাশিও তেমন ঘূর্ণায়মান ও ফেণিল। ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয় দিকের শোভাই সর্ব্বাধিক চিত্তাকর্ষক।

ভারতে আরও অনেক জল প্রপাত আছে। পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-ভাগেও অনেক জল প্রপাত বর্ত্তমান। পৃথিবীর সমস্ত ভূ-ভাগের জল প্রপাত অপেক্ষা বোধ হয় সুইজারলণ্ডের জল প্রপাত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ভারতের ঋষিগণ যদিও এই সমস্ত বিবরণ ভারতবাসীকে প্রদান করিয়া যান নাই, তথাপি ভারতের যে যে স্থানে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহারা উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান অথবা তন্নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থান গুলিকে যে পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়া গিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের মহতী কীর্ত্তি।

—•—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সমালোচনা।

প্রধীকর্ম্মকার বা কর্ম্মার-ক্ষত্রিয়—নামক পুস্তক খানি পাঠ করিলাম। জাতিতত্ত্বের আলোচনায় বর্ত্তমান কালে সকল জাতিই ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত হইয়াছেন। এই পুস্তকে প্রধী শ্রেণীর কর্ম্মকার দিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে গ্রন্থকার পুরাণ, সংহিতা ও ইতিহাসের সাহায্য লইয়াছেন। গ্রন্থকার অন্যান্য জাতিতত্ত্বের আলোচনায় পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় কায়স্থ জাতিকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য কি? কর্ম্মকারগণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিলে কায়স্থগণ কিছু মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না, একথা গ্রন্থকারের স্মরণ করা উচিত ছিল;—কায়স্থগণ চিরদিন উন্নত,—উদার ও মহান।

পুস্তক খানিতে জাতিতত্ত্বে আলোচনা পূর্ণ অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কর্ম্মকারদিগের শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে অন্যান্য জাতিকে আক্রমণ করা, এ নীতির পোষকতা করিতে আমরা চিরদিন অক্ষম।

—•—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৭শ, বর্ষ। } ১৩২৮ সাল, ফাল্গুন। { ১১শ, সংখ্যা।

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

যেমন বসন্ত সমাগমে মৃদু মলয়পবন, মুহুর্মুহু কোকিল ধ্বনি, নব পল্লব, কুসুম বিকাশ, ভ্রমর গুঞ্জন ভিন্ন বসন্ত সমাগম শোভা পায় না, তেমতি বর্দ্ধমান ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে সাধক কমলাকান্ত ও তাঁহার অনুগামী গণের সমাগম ব্যতীত কোন মহোৎসাহই শোভা পাইত না। সাধনা ও সঙ্গীত সময়ে সময়ে একাসনে উপবেশন করে। নির্জ্জনে বসিয়া প্রেমাশ্রুপাত অপেক্ষা বহু লোকের সমক্ষে একাগ্রতা ও প্রেমাশ্রুপাত উত্তম কারণ ইহাতে বহু লোকের হৃদয়কে প্রেমার্দ্র করিতে পারে, শান্তিসুখ অনুভব করাইতে পারে। মহোৎসাহে মহৎ লোকের সমাগমই প্রার্থনীয়, তাহাতে শিক্ষা শুভ ফলও বিস্তর। তখন প্রত্যেক মহোৎসাহে প্রাদেশিক গুণবান ধার্ম্মিক লোক সকলের সমাগম হইত। তাঁহারা পরস্পর আলাপ পরিচয় করিতেন। গুপ্তপাড়ের মহোৎসাহে নানা স্থান হইতে বিশিষ্ট লোকের সমাগম হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের নাম উল্লেখ যোগ্য, কারণ তাঁহার সহিত সাধকের সৌহৃদ্দ

করিয়াছিল, সাধকের কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক উল্লেখ যোগ্য ঘটনায় তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার নাম কেনারাম চট্টোপাধ্যায়, নিবাস অমরারগড়, বর্দ্ধমান জেলার মানকরের নিকটবর্ত্তী, স্বভাব কুলীন, সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, সংসারী হইয়াও সাধক। তাহার ইষ্টদেবের নিবাস গুনুড়ে। সন্ধ্যার পর সাধকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। প্রথম দর্শনে পরস্পরের চক্ষু সম্মিলিত হইবামাত্র উভয়ের হৃদয় আকর্ষণ করিল। কেনারাম কহিলেন, "আপনার যশোরাশি শুনিয়া অনেক দিন হইতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা ছিল, জগদম্বা আজ সে আশা পূর্ণ করিলেন, আজ আমার দিন সার্থক।" সাধক সম্মুখস্থিত ইচ্ছাময়ীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "সকলি মায়ের ইচ্ছা, আমিও আপনাকে মায়ের চরণতলে দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছি।" পার্শ্ববর্ত্তী কেনারামের ইষ্টদেবতা কেনারামের পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "ইনি সৎগুণ সম্পন্ন, সংযমী ও বাদ্যযন্ত্র সুনিপুণ।" কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ পরিচয়ের পর বহুলোক সমক্ষে সাধকের সঙ্গীত আরম্ভ হইল। তখন বৈঠক গানে পাখওয়াজ ঢোলের প্রচলন ছিল, তবলা বাঁওয়া টপ্পা প্রভৃতি গানে ব্যবহৃত হইত। কেনারাম বাদ্যযন্ত্র বাঁধিয়া সঙ্গত আরম্ভ করিলেন, সাধক পরমাবিদ্যা জগদম্বার প্রতি দৃষ্টি করিয়া গাহিতে লাগিলেন :—

নিশি জাগিয়ে পোহাও জননীর গুণ গেয়ে,
কি সুখ চৈতন্য দেহে অচৈতন্য হয়ে রে ॥
নিদ্রায় কি আছে ফল, মহা নিদ্রা নিকট হইল,
মন! তখনি মনের সাধ পুরাবে ঘুমায়ে রে।
যদি না ঘুমালে নয়, যোগ নিদ্রা উচিত হয়,
শ্যামা স্বপনে দেখ নয়ন মুদিয়ে ॥
কমলাকান্তের চিত, মিছে সুখে অনুগত,
সকল সুখের সুধানিধি গিরিরাজের মেয়ে ॥

সমাগত জনগণ স্থিরভাবে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বাল বনিতা শিক্ষিত অশিক্ষিত, বিবিধ জনাকীর্ণ, কোলাহল পূর্ণ মহোৎসবের স্থান নির্ব্বাত, নিবিড় অটবীর ন্যায় নীরব হইল। সকলেই কখন সাধক কখন সঙ্গত কর্ত্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সুন্দর তাল মান সহ সঙ্গীত তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের শরীরকে শিথিল করিতে লাগিল।

ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া যাহাদের কখনও ভাবান্তর হয় নাই আজ তাহাদেরও হৃদয় প্রেমরসে পরিপূর্ণ হইল। এক এক খানি সঙ্গীতের পর আবার কখন সঙ্গীত আরম্ভ হইবে, সেই প্রতীক্ষায় চঞ্চল ও উৎগ্রীব হইতে লাগিল। সঙ্গীতের এমনি মোহিনী শক্তি বালকগণও নিস্তব্ধ। এইরূপ অনেকক্ষণ আনন্দ উপভোগের পর সঙ্গীত শেষ হইল। শ্রোতাগণ কেহ সাধকের অপরিসীম ভক্তি, কেহ পদ সমূহের সুন্দর পদ বিন্যাস, কেহ তাঁহার সুন্দর কণ্ঠস্বর, কেহ বা সঙ্গত কর্ত্তার নৈপুণ্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত শ্রবণের লালসা পরিতৃপ্ত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইল, পরদিন যথা সময়ে প্রত্যাগত হইবেন স্থির করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

সঙ্গীত শেষ হইবার পর কেণারাম চট্টোপাধ্যায়ের ইষ্ট দেবতা অভুময়ের সহিত সাধককে কহিলেন, "আজ আপনাকে আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া গৃহ পবিত্র করিতে হইবে।" সাধক তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া আতিথ্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার গৃহে আগমন ও পান ভোজনের পর কেণারামের সহিত নানাবিধ তত্ত্ববোধিনী কথা প্রসঙ্গে রজনী অতিবাহিত করিলেন। সংসার পীড়িত মানব যেমন বিদেশ হইতে স্বগৃহে আগমন পূর্ব্বক সুখ ও শান্তি ভোগ করে, সংসার ভারাক্রান্ত ভক্তগণও সাধুসঙ্গ পাইলে সেইরূপ আহ্লাদিত হন। প্রেম কি পরম বস্তু? সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণের এমন পরম ঔষধি আর নাই। যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই হৃদয়ে প্রেম নাই, তাহার হৃদয় মরুভূমি। সে ব্যক্তি নিবীড় কানন মধ্যে পথ ভ্রান্ত লোকের ন্যায় বিপন্ন, শান্তি তাহার হৃদয়ে কখনও স্থান পায় না। যাঁহারা প্রেমিক ও প্রেমালাপী, তাঁহারাই ধন্য। বর্ষাঋতু যেমন জলদ জালকে আকর্ষণ করে প্রেমালাপীগণ তেমনি পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। প্রাতঃক্রিয়া সমাধানের পর সাধক ও কেণারাম পুনর্ব্বার সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রেমালাপের পূর্ব্বেই কোণারাম সাধককে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়া গৃহ পবিত্র করিবার জন্য অন্তরের সহিত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাধক স্বীকৃত হইলেন, কহিলেন, "সময় ও সুযোগ পাইলে অমরার গড়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। সময় ও সুযোগ সন্ধান করিতে হইবে। মনপাখী আমার এখনও বাধা আছে, কখন কখন শিকলী কাটিয়া এ গাছ ও গাছ, এখান সেখান করিয়া বেড়ায় কিন্তু আবার অনিচ্ছায় আসিয়া ধরা দেয়, খাঁচার

ভিতর প্রবেশ করে, পায়ে শিকলী পরে। সতত শিকলী কাটিবার ইচ্ছা কিন্তু তাহাতে তাড়না সহিতে হয়, ভাই স্বীকার করিতেছি, সংসার শিকলী একটু আলগা পাইলেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" কেণারাম কহিলেন, "আমি ধন্য হইলাম, মানস বিহঙ্গ ধরা দেয় কেন? মুক্ত জীব হওয়া বড় কঠিন, তাহা জানি। সংসারে বদ্ধ হওয়া জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; মাতৃ উদর হইতে জীব বদ্ধ হওয়া জন্ম গ্রহণ করে। বদ্ধ থাকা জীবের স্বভাব ও সংস্কার। জীব মাত্রেরই আবাস স্থান আছে, সে যেখানে থাকুক, তাহার নিজ আবাস স্থানের প্রতি দৃষ্টি থাকে, আপনি বদ্ধ হইয়াও মুক্ত, আপনি ধন্য। ব্যাস জনকাদি ঋষিগণ বদ্ধ হইয়াও মুক্ত।" সাধক কহিলেন, "আমাদের মুক্তভাবে ও তাঁহাদের মুক্তভাবে প্রভেদ বিস্তর। ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য, লোক শিক্ষার জন্য, তাঁহারা মুক্ত হইয়াও মানব চক্ষে বদ্ধভাবে অবস্থান করিয়া ছিলেন। ভাই আমাদের বন্ধন কঠিন। আমাদের মুক্তভাব কৃপাময়ী কৃপা ব্যতীত হওয়া অসম্ভব, কই সে হৃদয় ভরা প্রেম, কই সে ভালবাসা, কই সে আত্ম সমর্পণ! আমরা আত্মাকে সঙ্কীর্ণভাবে দেখিতেছি. চারিদিকে অহং অহং বলিয়া অবিদ্যা ঘোর রবে নৃত্য করিতেছে। ভাই সকলি কালীর ইচ্ছা, এ বদ্ধভাব মোচনের ক্ষমতা আর কাহারও নাই।" সাধক গাহিলেন—

কালীর ইচ্ছা যেমন, রে মন! বৃথা কর বাসনা।
মন! তুমি কি করিবে; কোথা পাবে; কালী না পূরালে কামনা॥

কেণারাম কহিলেন; "ইচ্ছাময়ীর যেমন ইচ্ছা, সংসারে তেমনি ঘটে। তাঁহার ইচ্ছার সমভাব নাই কেন? বুঝিতে পারি না। তাঁহার নিতান্ত শরণাগত; পরম ভক্ত; পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু দেখিতে পাই যে, ব্যক্তি ভ্রমেও তাঁহার নাম গ্রহণ করে না, এমন কি তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় সে পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।" সাধক আবার মৃদু স্বরে গাহিলেন;—

জন্মান্তর ক্রিয়া অনুচর জীবের যে কিছু যন্ত্রণা।
তুমি এই কর মন! ভাব শ্রীচরণ মহতের এই মন্ত্রণা॥

কেণারাম কহিলেন, 'সংসারের সুখ দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা যদি জন্মান্তরের কর্ম্মের ফল স্বরূপ হয়, তাহা হইলে জগদম্বা কি ইহ জগতের সুখ দুঃখের বিধাত্রী নন? কর্ম্মই প্রধান; এবং সেই কর্ম্মের কর্ত্তা আমি?" সাধক হিসতো হাসিতে আবার গাহিলেন;—

তুমি যে ভাবছ দেহ অভিমান সকলই তাঁর বঞ্চনা।
সেই সে কর্ত্রী, ধাত্রী, হর্ত্রী, আর যত সে বিড়ম্বনা॥
কমলাকান্ত মান অপমান, দূরে ত্যজ ওরু গঞ্জনা।
তুমি ভাব ভব গৃহিণী, ভবানী না রবে ভবের যন্ত্রণা॥

সাধক কহিলেন, "ভাইরে সংসারের যন্ত্রণা, শারীরিক মানসিক ক্লেশ, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, প্রিয়জন পিয়াসা প্রভৃতি অনিবার্য্য নিরন্তর চলিতেছে, মানব কর্ম্ম ফলে তাহা ভোগ করিবে কিন্তু সদানন্দময়ীর চিন্তায় যে পরমানন্দ আছে তাহা হইতে মানবকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সংসারীর চক্ষে মহাপাপী বাহ্যিক অকিঞ্চিৎকর সংসারের সুখ ভোগ করিতে পারে কিন্তু মায়াবদ্ধ মানবের প্রেমিকের হৃদয়ের সুখের অনুমান করিবার ক্ষমতা নাই। দয়াময়ীর ধ্যান ধারণায় যখন প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিবে তখন সংসারের জঞ্জাল সকল কোন দিকে ছুটিয়া চলিয়া যাইবে। প্রেমিকের হৃদয় ত্যাগ করিয়া সেই সকল জঞ্জাল সংসার মহানদীর আবর্জ্জনা যুক্ত স্থানে ঘূর্ণমান হইয়া দাঁড়াইয়া নিশ্চল হইবে।" কেণারাম কহিলেন, "বিপদ ও দুঃখ সঙ্কুল সংসার মধ্যে থাকিয়া মনকে একবারে মমতা শূন্য, সুখ দুঃখকে নিরপেক্ষ করা আমি অতিশয় দুঃসাধ্য বিবেচনা করি। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, পুত্র কন্যার কাতর দৃষ্টি, তথাপি মন ধ্যান ধারণায় রত, পরমানন্দময় প্রেম সাগরে মগ্ন, তাহা কিরূপে সম্ভব, আমি ধারণা করিতে পারিতেছি না।" সাধক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "যিনি কখনও ভূমিকম্প দেখেন নাই, শৈল সমুদ্র শালিনী বসুন্ধরা ভূমিকম্পে ক্ষুদ্র লতিকার ন্যায় কম্পিত হন, একথা তাঁহাকে বিশ্বাস করান কঠিন। যিনি যোগবলে বিশ্বাস করেন না, মানব দেহ তৃণ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করিতে পারে, একথা তাঁহাকে কিরূপে বিশ্বাস করান যাইতে পারে! এ সংসারে মানব বিচিত্র পদার্থ, মনের ক্রিয়া অত্যাশ্চর্য্য। মানব অভ্যাস যোগে না করিতে পারে কি? একবারে কোন কর্ম্ম হয় না। অভ্যাসে সাধনার পথে অগ্রসর হও। পরমা প্রকৃতি সদয় হইয়া সাহায্য করিবেন। তোমার কর্ম্ম তাঁহার ইচ্ছার অনুরূপ হইবে।" এইরূপ কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর সাধক কেণারামের সহিত সময় ক্রমে পুনর্ব্বার তাঁহার গৃহে সাক্ষাৎ করিবেন স্বীকার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রেম।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, বি।

কারে বলে ভালবাসা ?
সেকি শুধু কামতৃষা ?
এ নহেরে আকাঙ্ক্ষার জ্বালাময়ী তৃষা—
কিম্বা শুধু কামুকের অতৃপ্ত পিয়াসা ;
এ নহেরে আঁখিপাশে কাম-অভিব্যক্তি
নহে শুধু কামুকের বাড়ায় আসক্তি
এ যে তীর্থ যাত্রা পথে অভয় সঙ্গীত—
বলশালী করিবারে মানবের চিত—
এ যে স্বর্ণ রজ্জু স্বর্ণ সম দীপ্তিমান—
যেই প্রেম সূত্রে গাঁথা প্রেমিক পরাণ।
পার্থিব নহে তো ইহা বিধি দত্ত ধন
স্বর্গের অমিয়া যাহে লভয়ে জনম।
প্রেমেতে নরক হয়, স্বর্গ সম স্থান—
প্রেম বিনা স্বর্গ, সে যে নরক সমান।
প্রেমোদ্ভূত এ জগৎ প্রেমে পাবে লয়—
প্রেমিকের স্মৃতি সদা রহিবে অক্ষয়—
প্রেমাষ্পদ মোরা সবে তাঁহার সন্তান।
সে প্রেমের উৎস তিনি নিজে ভগবান।

পতিব্রতা।

(গল্প।)

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

(১)

"বড্ড খিদে পায় যে মা !"

"খিদে পাচ্ছে ধন ? একটু সবুর কর মাণিক।

একটু সবুর করিলে যে, পুত্রকে আজ কি দিবে, সুহাস তাহা ভাবিয়া পাইল না। উত্থিত দীর্ঘশ্বাসটি চাপিয়া সুহাস অন্তরে আকুল হইয়া উঠিল, সত্যই কি বিনু আমার আজ উপবাসী থাকিবে ? হে কাঁঙালের ঠাকুর ! দীনবন্ধু ! তুমি ভিন্ন দুঃখীর আর কে আছে নারায়ণ। আজ পাঁচ দিবস হইতে সুহাস এক বেলা অর্দ্ধাহারি থাকিয়া পুত্রটির মুখে শাক অন্ন তুলিয়া কতকটা আশ্বস্ত ছিল, কিন্তু আজ যে আর ঘরে কিছুই নাই—সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এই "কিছুই নাই" চিন্তা তাহার নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মও যে কিছুই নাই, তাহা বুঝাইয়া তাহাকে নিশ্চেষ্ট করিয়া বসাইয়া দিল, গতি নিশ্চেষ্ট থাকিলে কি হইবে, মন তাহার চেষ্টা অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। সুহাস ভাবিয়াছিল, আজ যদি দুটো খুদও থাকিত, তাহা হইলে সে পুকুরের কলমী শাক তুলিয়া তাহারই সাহায্যে পুত্রের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত, কিন্তু তাহাও যে নাই,—তবে কি হবে ?

কি হইবে, ভাবিবার সময় নাই, বিনুর জন্য আজ আমি ভিক্ষা করিব, কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগিনীদের ভিক্ষাও যদি কেহ না দেয় ? মাতার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া বিনয় ছুটিয়া আসিয়া ধপ্ করিয়া মাতার কোলের উপর বসিয়া পড়িল, তাহার ক্ষুদ্র বাহু দ্বারা মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া জলভরা চোখ দুটী মায়ের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া ব্যথিতস্বরে বলিল, "মা ! আমি বোসেদের হরিশের সঙ্গে খেলা করিতে ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম,—হরিশ মুড়ির মোয়া খাচ্ছিল, আমাকে একটু মোয়া ভেঙ্গে দিতে এল, আমি মা চাইনি, সত্যি বল্‌ছি মা, সে আমার হাতে মোয়া দিলে, দেখ্‌তে পেয়ে তার বড় দিদি তার হাত থেকে সব মোয়া কেড়ে ফেলে দিয়ে বল্‌লে কি, ওকে ছুঁয়ে খেলে জাত যাবে যে রে বাঁদর। হরিশ ধুলোয় পড়ে কাঁদ্‌ছে।" বালক [illegible]

মুখখানি লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। একটী দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত পুত্রের অশ্রুসিক্ত মুখখানি চুম্বন করিয়া সুহাস সহজ স্বরেই বলিল, "বোকা ছেলে তাতে তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন ?"

তোর বাপের যে জাত নেই বিনু! বিনয় তাহার বাবার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছে, হরিশের নিকট হইতে গোপনে সে তাহার বাবার বিষয়ে অনেক বড় বড় কথা সংগ্রহ করিয়াছে, তাহার বাবা সাহেব, মুরগী খায়, বড় সাহেবের বাড়ী বড় চাকুরী করে, তাহার আর একটী সাদা দুধের মত মেম সাহেব মা আছে, এইরূপ অনেক সংবাদ সে রাখে, কিন্তু তাহার মায়ের মুখে তাহার বাবার কথা সে কখনও শুনে নাই, সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে মাতা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া কাঁদিয়া ফেলেন, তাই সেও মায়ের কাছে প্রাণ খুলিয়া বাবার কথা আলোচনা করিতে পায় না। জীবনে সে পিতাকে কখনও চোখে দেখে নাই, কিরূপ অবয়ব তাহা সে কিছুই জানে না, তথাপি ক্ষুদ্র বালক নিজ মনোনিত চিত্র মনে মনে গড়িয়া তাহাকে পিতৃপদে বসাইয়া, নিভৃত মনোমন্দিরে সংগোপনে প্রতিষ্ঠা করিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া ছিল। জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র শিশুর হৃদয়ে কে এই পিতৃভক্তি বীজ বপন করিল? তাই সে আজ অকস্মাৎ মাতার মুখে পিতার নাম শুনিয়া বিস্মিত হইল; অভিমান ভুলিয়া উৎসাহের সহিত বিনয় বলিল, "কেন মা! আমার বাবা কি? হাঁ মা আমার বাবা সাহেব, মুরগী খায়?" সুহাস বুঝিল, লোক বর্ণিত বাক্যাবলী সত্য হউক, মিথ্যা হউক, শুধু তাহাকেই বিদ্ধ করে নাই, আরও একটা কোমল চিত্ত আহত করিয়াছে। পুত্রকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সুহাস জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "পাগল আর কি, সাহেব হবেন কেন, মুরগী খাবেন কেন, তবে তিনি হিন্দু নন।"

উপেক্ষা রসহিত বিনয় বলিল, "তা হক্ না কেন, তিনি সাহেব হন্ আর যাই হন্ না কেন, তাতে কি, তিনি তো আমার বাবা? কেমন মা?" সুহাস এ কথার উত্তর যোগাইতে পারিল না, অথবা তাহার মতন শক্তি তাহাতে এখন ছিল না, সে ভাবিতে ছিল, জন্মাবধি যাহার অস্তিত্ব জানেনা, তাহার প্রতি এত খানি দৃঢ়তা সে কি করিয়া ধারণা করিল, কোন অলক্ষ্য শক্তিতে শিশুর হৃদয় শক্তিমান, কোন অলক্ষ্য মায়ায় মুগ্ধ শিশু হৃদয়। বিনয় মাতার বিচলিত ভাব লক্ষ্য না করিয়া উৎসাহের সহিত বলিয়া যাইতে ছিল, "হেঁ মা! বাবা আমাকে খুব ভাল বাসেন নয় মা? মা আমার বাবা দেখতে কার বাবার মতন মা?"

"বৌদি!"

সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই পুলিন বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। উদ্বেলিত অশ্রু চাপিয়া সুহাস মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল, পুলিনের পশ্চাতে এক ব্যক্তি মোট স্কন্ধে বাটী ঢুকিতেছে, পুলিন তাহার মাথা হইতে বোঝা নামাইয়া, তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া, বিদায় করিয়া দিল। পুলিন কল্য রাত্রে বাটী আসিয়াছে—প্রভাতে তাহার প্রধান কর্ত্তব্য বৌদিদির পদধূলী লওয়া, কিন্তু একটা বাধা পড়ায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া খানিকটা বেলা হইয়া পড়িল, সে ব্যস্ততার সহিত বিনয়দের বাটীতে প্রবেশ করিতে ছিল, কিন্তু পুত্রের ক্ষুধা পীড়িত কাতরতা, মাতার উপায়বিহীন মুখমণ্ডলের আকুল ভাব খোলাদ্বার পথে দেখিয়া তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, আজ তেজস্বিতার মহাসংগ্রামের দিন ইতি পূর্ব্ব হইতেও কি তাহা নয়? নয় কেন? কিন্তু তখনও তাহার তেজের উজ্জ্বলে তাহা জয় করিয়া আসিতেছে। আজ পাঁচ বৎসরের আত্মসংগ্রামে সে বিধ্বস্ত হইয়া একান্তই অনুপায় হইয়া পড়িয়াছে, তাই সে উজ্জ্বল আনন মলিনতায় ছাইয়া গিয়াছে।

পুলিন আর বাটী প্রবেশ না করিয়া সমান হাটে চলিয়া গেল, সে দিন ছিল গ্রামের হাটবার; হাটে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল অল্প বিস্তর কিনিয়া লইয়া আবার এ বাটীতে ফিরিল, অর্থের স্বল্পতা বশতঃ অধিক সামগ্রী সে ক্রয় করিতে পারে নাই। যতই বাটীর নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, ততই তাহার মনে কেমন একটা লজ্জা জাগিয়া, সেই সঙ্গে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া তুলিল, অধিক হউক, অথবা অল্পই হউক, তাহার এ সঞ্চিত অর্থ যদি দয়ার দান মনে করিয়া ঘৃণায় গ্রহণ না করেন যদি আমার এ সমবেদনা নয় কর্ত্তব্য, না বুঝিয়া নিজেকে অপমান জ্ঞান করেন, আর—আর— যদি কিছু——

পুলিন বৌদির সাক্ষাতে থাকিতে পারিল না, একটা শঙ্কা, একটা লজ্জা, লইয়া সে তাড়াতাড়ি বাটীর বাহির হইয়া পড়িল, কি একটু ভাবিয়া বাহির হইতে হাঁকিয়া বলিল, "ওরে বিনে আমার জন্য একটা মুড়ো রাঁধতে বলিস্।"

সুহাস চিত্রার্পিতের ন্যায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, সত্যই তবে আজ পরানুগ্রহ ব্যতিরেকে তাহার চলিল না। সুহাস করিতেছে কি?

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে, সে পুত্রের জন্য ভিক্ষা করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইতে ছিল, আর এ অযাচিত করুণার দান তাহার দ্বারে লুণ্ঠিত, সে তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, একি সঙ্কোচ তাহার। বিনয় ছুটিয়া গিয়া ঝাঁকা হাঁটকাইয়া দেখিয়া হর্ষোদ্দীপক স্বরে মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা! মা! দেখ্‌বে এস। কাকাবাবু কত বড় রুই মাছ এনেছেন, আর এই দেখ মা, মস্ত বড় একটা কাঁঠাল,—একটু ভেঙ্গে দেওনা মা, খাই, বড় খিদে পেয়েছে যে মা! কিন্তু মাতার উদাসীনতা দেখিয়া সে অস্থির হইয়া মাতার অঞ্চল আকর্ষণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পুত্রের অনাহার ক্লিষ্ট বিশুষ্ক মুখের প্রতি চাহিয়া আত্মভিমানী হৃদয়কে ধিক্কার দিয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় সুহাস আকর্ষণে অগ্রসর হইল। স্নান করিয়া আসিয়া সুহাস তাড়াতাড়ি পাক চড়াইয়া দিল। পল্লীস্থ প্রতিবেশিনীরা প্রত্যহই এই অলাগাদের উনুনে হাড়ি চড়িবে না—মাতা পুত্রে অনাহারে থাকিবে, অথবা ঐ দাম্ভিকা ছেলেটির হাত ধরিয়া কাহারও না কাহারও বাটী ভিক্ষা করিতে আসিবে, তাহারাও কেমন মধুর আপ্যায়িতে তাহাকে বিদায় করিবে, এমনই একটা শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, এত দিনের প্রতীক্ষা, প্রত্যাশা, আজ যে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে,—তাহা তাহারা বুঝিয়া সুহাসের কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া মনে মনে অপার আনন্দ পাইতে ছিল। অকস্মাৎ একি? উপাদেয় ব্যঞ্জনের সৌরভে তাহাদের নাসারন্ধ্র জ্বালা করিয়া উঠিল, হতভাগী মসলা পিষে যে, তাহারা হতাশায় এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিজের নিজের কার্য্যে মন দিল। বিশুর মা, সুহাসের জ্ঞাতি খুড়শাশুড়ী কিন্তু শুধু হতাশের নিশ্বাস লইয়া শান্তি পাইলেন না—স্নেহধিক্য বশতঃই বোধ হয়, তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া সুহাসের বাটীতে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "ও বৌমা!"

সুহাস মাছের কালিয়া নাবাইয়া পাত্রে ঢালিতেছিল, বিস্ময়ের সহিত উত্তর দিল, "কেগা মা?" বিশুর মা ডিঙ্গিমারিয়া—ডিঙ্গিমারিয়া রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সন্তর্পণে নূতন পায়ের কাপড় গুটাইয়া শুচিতা রক্ষা করতঃ একটু সৌজন্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এই এসেছিলাম, তোমার কাছে বৌমা; যদি দুটো লাউশাক দিতে একটু চর্চ্চড়ী করিতাম, কদিন ধরে কেবল শাক শাক ননটা কর্‌ছে, মনে কর্‌লাম দেখি বউমার কাছে যাই,—রাঁধ্‌তে আজ এত বেলা কেন গা, কাউকে নেমতন্ন করেছ নাকি? সুহাস বুঝিয়াছিল, রঙ্গ দেখিতেই ঠাকুরুণের আবির্ভাব, নচেৎ এতটা সৌজন্য কিসের। তাহাতেই

তাহার অন্তর তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে পষ্টাপষ্টি এ বিদ্রূপে সে ঠোঁট চাপিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিল। বিনা বাক্যব্যয়ে কতকগুলা শাক কাটিয়া বিশুর মা উঠানে রাখিল। সুহাস বলিল, "কি করিবেন, শাকগুলো কি এ পুকুর থেকে ধুয়ে নিয়ে যাবেন নাকি, আমাদের পুকুরেরও পবিত্রতা নেই, দেখুন যাতে অনাচার না হয়।" সাম্‌না সাম্‌নী পাল্টা বিদ্রূপে বিশুর মা একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "না না, তা কেন, শাকে কি দোষ আছে, তানেই—তানেই—তবে কিনা,"—জবাব শেষ না করিবার পূর্ব্বেই সুহাস বিদ্রূপ স্বরে বলিল, "দরকারী জিনিষের দোষ থাক্‌লেও উপায় নেই যে, তাতেই আমরা দরকারী জিনিষের দোষ বুঝ্‌তে পারিনে খুড়িমা!" বিপক্ষের তীব্রবাণে বিশুর মা তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন, আর সমস্ত অন্তরাত্মা-টুকু রাখিয়া গেলেন, পাত্রস্থিত মৎস্যের ব্যঞ্জনে।

সুহাস ক্রোধান্বিত নয়নে তাহার প্রত্যাগমন পথের প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পুলিন গলা ঝাড়া দিয়া বাটী প্রবেশ করিল, রান্না ঘরের র'কে দড়ি বাঁধা ঘটিটা বসাইয়া বলিল, "বৌদি! একটু দুধ নিয়ে এলাম, আম দিয়ে বেশ খাওয়া হবে, ওরে বিনু দেখ্‌বি আয়, কেমন আম এনেছি, নে বসে কটা খাবি আয়!" সুহাস দুধের ঘটী ঘরে তুলিয়া রাখিয়া বলিল, "বেলা অনেকটা হয়েছে ঠাকুরপো। নাইবে কখন?" ব্যস্ততার সহিত পুলিন গাত্র হইতে পিরাণ খুলিতে খুলিতে বলিল, "এই যে একটু তেল পেলেই হয়।" সুহাস তৈলের বাটী রাখিয়া ব্যস্ত ভাবে চলিয়া গেল, পুলিন চকিতে একবার বৌদির মুখ ভাব লক্ষ্য করিল, কিন্তু পাষাণে যেমন রেখা পড়ে না—তেমনই কোনই ভাব সে বুঝিয়া উঠিল না, তবু তাহার উৎকণ্ঠা দূর হইল, বৌদির তিরস্কার পূর্ণ দৃষ্টির পরিবর্ত্তে স্নিগ্ধতা দেখিয়া, আশ্বস্ত চিত্তে পুলিন স্নানে গেল। সুহাস পায়সের হাঁড়ীতে ঘন ঘন কাঠি দিতে দিতে ভাবিতেছিল, ভক্ত ঠাকুরপো নিজের জন্যই যে, এত আয়োজন করিতেছে, অন্য কাহার জন্য নয়, ইহা বুঝাইবার জন্য কি চেষ্টাই না করিতেছে,—কিন্তু সে জানে না, আমার এখন আর ভিক্ষা ভিন্ন উপায় নাই। আহারে বসিয়া বিনয় যখন চীৎকার করিয়া অনুযোগের স্বরে বলিয়া উঠিল, "দেখ মা! কাকাবাবু সব মাছ আমার পাতে তুলে দিলেন, নিজে কিছুই খেলেন না," রন্ধনাগারে বসিয়া সুহাস অসম্বরণীয় অশ্রু আঁচলে মুছিয়া পরিবেশনে অগ্রসর হইল। সে দিন কিন্তু কিছুতেই

সুহাস ভাতের কাছে বসিতে পারিল না,—তাহার বিরোধী চিত্তকে এত শীঘ্র সে বশে আনিতে পারিল না।

(২)

সে অনেক দিনের কথা।

যে দিন গৃহিণী একমাত্র পঞ্চম বর্ষীয় শিশু পুত্রকে মাতৃহীন করিয়া অসময়েই অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন, সেই দিন হইতেই গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অভাগা মোহিতকে জীবনের কেন্দ্র স্বরূপে বক্ষে লইয়া দুর্ব্বহ জীবন ভার যাপন করিতে লাগিলেন, পৈত্রিক কয়েক ঘর যজমান ও দুই এক বিঘা জমি; পাকা একতালা ক্ষুদ্র বাটী,—ইহাই তাহার সম্পত্তি. জমির শস্যে বাটীর তরকারিতে, পুকুরের মৎস্যে যজমানের বাটীর কলাটা মূলাটায়, চিনি সন্দেশে, বাটীর গাভীটির দুগ্ধে দুটী প্রাণীর বেশ সচ্ছন্দেই চলিয়া যাইত, অভাব অনাটন কখনো গিরীশচন্দ্র বুঝিতে পারেন নাই, আর গ্রামে তাঁহার একটা বেশ সুনাম ছিল,—"কৃপণ" যে হেতু যজমানের দান দক্ষিণা কখন তাঁহার হস্তান্তরিত হয় নাই,—সমস্তই লক্ষ্মী কোটকে প্রবেশ করিয়া সার্থকতা লাভ করিত, তিনি কখন পয়সা খরচ করিয়া কোন সামগ্রী ক্রয় করিতে ভাল বাসিতেন না, অথচ হিংসুক লোক তাঁহার পাতে মাছের মুড়ো, দুধের বাটী জল খাবারে মুড়ি খইয়ের পরিবর্ত্তে মিষ্টান্ন দেখিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতেও ছাড়িত না।

একটী কৈবর্ত্তের মেয়ে তাঁহার সংসারের সকল পাটই সম্পাদন করিয়া দিত, বলা অনাবশ্যক, বিনা মাহিনায়, তবে কখন কখন ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদে অবশ্য বঞ্চিত হইত না।

গ্রামের অনেক ভদ্র ব্যক্তি বৈকালে তাঁহার ক্ষুদ্র বৈঠকখানাটী সরগরম করিয়া তামাকুর সদ্‌ব্যবহার করিতেন, এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ মুক্ত হস্ত ছিলেন, দুষ্টলোকে বলিতে ছাড়িত না যে, কোন ভক্তের বাটী হইতে তামাকু সরবরাহ হইত, যাহা হউক, এ বিষয়ে কেহ তাঁহাকে কৃপণ বলিতে পারে নাই। কেহ কেহ আত্মীয়তা দেখাইয়া সখেদে বলিতেন, "ভট্‌চাজ অনেক দিন বাঁচতে ...বে ভায়া, বিয়ের বয়স গড়াই নিতো? কত দিন আর হাত পুড়িয়ে রেঁধে" ...ল? আমরা বলি কি, একটা বয়স্থা দেখে বিয়ে থা কর!" কিন্তু ...এ বিষয়ে কোন চাড়ই নাই, বেশি কেহ নাড়াচাড়া করিলে তাহার ...ন, "বাঁচবো না কেন হে? আমার তাহার সই হলেও

মোহিতের জন্যে বাঁচিতেই হবে। কষ্ট আর কটা দিন, আর বছর দশেক পরেই বউ ঘরে আন্‌ব, বউরান্না ভাত খাবো, এখন রক্তের জোর আছে, খাটব, অকালে নিঃসম্বল করে তো আর গিন্নি আমায় ফেলে যান্‌নি পুত্ররত্ন দিয়ে গিয়েছেন।" বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্যের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইত, সকলেই সে প্রসঙ্গ বন্ধ করিত।

কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তাঁহাকে সাধ্য সাধনা করিয়া ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া গিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে যজমানের বাটী হইতে খাটিয়া খুটিয়া যখন বাসায় ফিরিতেন তখন ক্ষুধা জ্বলিত, উদরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত, তখন উনুনে হাঁড়ী চাপাইতে ব্রাহ্মণের চিত্ত বিরোধী হইয়া উঠিত, তখন তাঁহার মনে হইত, এবার বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিলে আর তিনি তাহা উপেক্ষা করিবেন না, কিন্তু রন্ধন শেষে ক্ষুধাতুর পুত্রের পাতে অন্ন দিয়া নিজে যখন আহারে বসিতেন, তখন পুত্রের একান্ত পিতৃনির্ভরতায় সে সংকল্প ভাসিয়া যাইত, অন্তরে ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিতেন, যদি মোহিত আমা ছাড়া অন্তর হয়ে পড়ে। রাত্রে বুকের ভিতর শিশুকে লইয়া ব্রাহ্মণ রজনী অতিবাহিত করিতেন, নিদ্রাঘোরেও বক্ষ ছাড়া করিতেন না।

স্নেহাধিক্য বশতঃ ব্রাহ্মণ কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই, পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন মোহিতও গ্রামের ছেলেদের মধ্যে রত্ন বিশেষ, কখনও কেহ মোহিতের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিত না; এ জন্য মোহিত সর্ব্বজন প্রিয় ছিল। মোহিতের গ্রামের পাঠ সুচারু রূপে সম্পন্ন হইলে তাহার সহরে পড়িবার কাল উপস্থিত হইল, ব্রাহ্মণ পুত্রকে শীঘ্র বিদেশ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিলেন না, বাৎসল্য স্নেহ তাঁহার হৃদয়ে দুর্ব্বলতা বিস্তার করিতে ছিল। একদিন মোহিত পিতাকে জানাইল, বাবা আমায় অনেক দিন বসে থাকতে হয়েছে—আমাকে একটা স্কুলে ভর্ত্তি করে দিন। আর ব্রাহ্মণ অবহেলা করিতে পারিলেন না,—সঞ্চারিত বৃক্ষ তিনি অঙ্কুরে বিনাশ করিতে পারেন না। তাঁহার পিতার কালকাতা প্রবাসী বর্দ্ধিষ্ণু যজমানের বাড়ীতে রাখিয়া পুত্রের শিক্ষাভার স্বীয় স্কন্ধে বহন করিলেন। বিদেশাগত পুত্রের জন্য অনেক দিন তিনি বিমনা ছিলেন, যজমানের বাটীর কলামূলা উপেক্ষা করিতেন, কৈবর্ত্তের মেয়ে পাড়ায় বলিত, তিনি উনানে হাঁড়িও চড়ান না, অনেক দিন বৈঠকখানার ঘরের চাবি দেওয়া ছিল।

মোহিত সম্মানের সহিত এফ, এ, পাশ করিয়া যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় লইয়া পিতার পদে আসিয়া প্রণাম করিল, বৃদ্ধ তখন যুবা পুত্রকে শিশুর মতন বক্ষে চাপিয়া অধীর ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন।

ব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহের জন্য ছুটাছুটী আরম্ভ করিলেন, কিন্তু মোহিত গোঁ ধরিল, "বাবা আমি ডাক্তারি পড়ব।" কলিকাতা প্রবাসী যজমানের সাহায্যে কলিকাতাবাসী কোন মোক্তারের সুরূপা কন্যার সহিত মোহিতের বিবাহ দিয়া বধু ঘরে আনিয়া ব্রাহ্মণ দশ জনের পদধুলিতে তাঁহার কৃপণ নামের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, সকলেই বউ দেখিয়া এক বাক্যে প্রশংসা করিল, বৃদ্ধের তখন আনন্দের গর্ব্বে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাঁহার বৈবাহিক জামাতার ডাক্তারী শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন, সে কারণে অলঙ্কারে নগদে থাস্তা পড়িল। গিরীশ চট্টাচার্য্যের বড় শান্তিতেই দিন কাটিতে লাগিল গুণবতী পুত্রবধু তাঁহার সংসারে লক্ষ্মীর আসন বিছাইয়া দিল। সহরের বয়স্থা কন্যা আনিয়া বৃদ্ধের হৃদয়ে একটু ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল, যদি ব্যসনপ্রিয়া মুখরা লজ্জাবর্জ্জিতা হয়। কিন্তু ঘর বসতে আনিয়াই তিনি তাঁহার চিন্তা যে অমূলক তাহা বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। বধু সুহাস নববধুর ন্যায় জড়সড় থাকিত না, সে তাহার যেন কত কালের পরিচিত ঘর সংসার, এমনই ভাবে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া প্রশংসা লাভ করিল, পাড়ার বর্ষীয়সীরা সুহাসকে লক্ষ্য করিয়া নিজ নিজ বধূকে ধিক্কার দিয়া খেদ করিতেন।

মোহিত মেডিক্যাল কলেজে পড়িত—মেসে থাকিত, শ্বশুর বাড়ী থাকা সে পছন্দ করিত না, শ্বশুর যাহা সাহায্য করিতেন, তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ কুলাইত না, কাজেই সে চেষ্টা করিয়া এক ধনীর কন্যাকে সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা প্রাইভেট্ শিক্ষা দিতে ব্রতী হইল। মাসে মাসে সে বাটী আসিত, গুণবতী রূপবতী সুহাসিনী তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল, নব প্রস্ফুটিত যৌবন কুসুমের আনন্দের উৎসাহে বাসন্তী সৌরভে তাহার মন প্রাণ মাতাইয়া তুলিল, সে কতই না সুখের চিত্র কল্পনায় গড়িয়া তুলিল, আর চার বৎসর ব্যবধান। সুশীলা সুহাসেরও সুখের আনন্দের অন্ত নাই, তাহার মতন সৌভাগ্য কাহার, স্নেহময় শ্বশুর, দেব চরিত্র স্বামী, সুখের সংসার, পিতামাতার একমাত্র কন্যা, বাপের বাটীর শ্বশুর বাটীর সর্ব্বত্রেই আদরণীয়া। স্বামী

যখন বিদেশ হইতে বাটী আসিয়া তাহাকে কত কত উপহার দান করিয়া তাহার সহিত গল্প করিতে, সর্ব্বদা তাহাকে দেখিতে ভালবাসিত, সুহাসের তখন আনন্দে হৃদয় সংকোচে জড়সড় হইয়া পড়িত।

কত কত দিন স্বামীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িত, হঠাৎ কোন সুখস্বপ্নে জাগরিত হইয়া দেখিত, স্বামী তাহার মুখখানি বুকে করিয়া নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া বিনিদ্র আছেন, সুখে আনন্দে লজ্জায় সে কণ্টকিত হইয়া পড়িত, এমনই কত কত সুখ কত সৌভাগ্য তাহার হৃদয় স্ফূর্ত্তিতে মগ্ন করিয়া দিত, আর কিছু দিন পরেই ডাক্তারি পাশ করিয়া কপোত কপোতীর ন্যায় সুখের নীড়ে অভিন্ন থাকিয়া শান্তি উপভোগ করিবে, কখনও বিভিন্ন থাকিবে না। কিন্তু সুহাসের এত সুখ শান্তি ভগবানের প্রাণে সহ্য হইল না, অথবা বালিকার আত্মাহঙ্কারের সাজা দিবার অভিপ্রায়ে বোধ হয়, তাহার সুখের শান্তির কুঞ্জে আগুণ লাগাইয়া দিলেন।

সুহাস অন্তঃস্বত্বাবস্থায় অকস্মাৎ সংবাদ পাইল, তাহার মাতা অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। শোকাবেগ সম্বরণ না করিতেই সে দেখিল, স্বামী তাহার তাহাকে দেখিলেই আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রেমানন্দে আনন্দিত হন না, কথা কহিতে কহিতে কেমন বিমনা হইয়া পড়েন, আহারাদিতেও তত ইচ্ছা নাই,—জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "শরীর ভয়ানক খারাপ হইয়া পড়িতেছে, তাই মনে প্রাণে কেমন অসুস্থি লেগে আছে।" মোহিত অধিকাংশ সময় গম্ভীর ভাবে থাকে, সুহাসেরও আর সেই হাস্য চপলতা নাই, স্বামী-স্ত্রীর রজনীর আলাপে আর এখন রজনী প্রভাত হয় না,—কথাবার্ত্তা খুবই স্বল্প, সুহাস শোকে অভিমানে আপন মনে বিদগ্ধ হইতে লাগিল, শোকে দুঃখে সুহাসের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, আর সে পূর্ব্ব শান্তি ফিরিয়া পাইল না। আর এক বৎসর পরেই মোহিত ডাক্তার হইয়া, বাটী আসিয়া বসিবে, বড় একটী বৈঠক খানার দরকার, ছোট কোঠায় চলিবে না,—গিরীশ ভট্টাচার্য্য একটী ইটের পাঁজা পুড়াইয়া রাখিলেন, শীঘ্রই কোঠা তৈয়ার করিবেন, কিছু দিন হইল, তাঁহার নীরব প্রাঙ্গন পৌত্রের কল কাকলিতে মুখরিত হইয়া বৃদ্ধের প্রাণ আনন্দ রসে মাতাইয়া তুলিয়াছে। পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কিছু খরচান্ত হইয়া কোঠা তৈয়ারির বিলম্ব হইয়া পড়িল।

মোহিত ডুবিয়াছে, আপনাকে হারাইয়াছে, সুহাসের প্রেম বিস্মৃত হইতে

বসিয়াছে। হাবভাবশালিনী তরুণী ছাত্রীর মধ্যে কি পাইয়াছে, মোহিত মাতিয়া গিয়াছে,—ছাত্রীকে পাঠ বলিতে গেলে ছাত্রীর মুখের রঞ্জিত ভাব তাহাকে সব ভুলাইয়া দেয়, একটা বলিতে কি একটা বলিয়া বসে, ছাত্রী পুস্তকের দিকে দৃষ্টি না করিয়া তাহার ঐ চিন্তিত শঙ্কিত মদিরা জড়িত মুখের দিকে চাহিয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া থাকে। পাঠাগারের পাঠের অভিনয়ের অন্তরালে প্রেমের অভিনয় চলে, কিন্তু বাক্যে বা কার্য্যে নহে, শিক্ষকের তুষ্টির নিমিত্ত ছাত্রী নিজ হস্তে মুখরোচক কত উত্তম উত্তম খাবার তৈয়ার করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া তৃপ্ত হইত, শিক্ষকের প্রীতির নিমিত্ত সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তাহাকে উপহার দিত, তাহার অদর্শনে আকুল হইয়া পড়িত। রবিবারের দিন পড়াইতে আসিবে না বলিয়া চায়ের টেবিলে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিত। শকটারোহণে বেড়াইতে শিক্ষককে সঙ্গে লইয়া যাইত, আবার সুললিত অমিয় সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় শিক্ষকের চিত্ত লইয়া স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিত। বেড়াইতে হোঁচট্ লাগিয়া শিক্ষকের গাত্র সংলগ্ন হইয়া পড়িলে পশ্চাত্য মহিলাদের ন্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করিত, আর সে শিক্ষকের পারিবারিক বিষয়ে সংবাদ লইয়া জানিয়াছে,—এক পিতা ভিন্ন আর তাহার কেহই নাই।

উভয়ে উভয়ের প্রতি অগ্রসর হইতে লাগিল। অরুণা নিকটে থাকিলেই তাহাতেই মোহিত বিমুগ্ধ হইয়া যায়, কোন কিছুই তাহার মনে থাকে না, আবার অরুণার নিকট বিদায় লইয়া মেসে আসিলে সুহাসের শান্ত স্নিগ্ধ মুখখানি মনে করিয়া তাহার হৃদয় সমুদ্র তোলপাড় করিয়া উঠে, সুকুমার শিশুর মুখখানি, বৃদ্ধ পিতার কথা মনে করিয়া ভাবে শিক্ষকতা কার্য্যে ইস্তফা দিয়া আমার স্বদেশে শান্তি কুঞ্জে ফিরিয়া যাই। যতই শান্তি কুঞ্জে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প মনে করিত, ততই শান্তি কুঞ্জে যাওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়িল, এমনই এ নৌকা সে নৌকায় পা দিয়া ক্রমাগত ভাসিয়া চলিল। হঠাৎ সংবাদ পাইল, পিতা রোগাক্রান্ত, মোহিতের সমস্ত চিন্তা এলো মেলো হইয়া গেল, স্নেহময় পিতার স্নেহ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল।

পুত্রের মুখে তারক ব্রহ্ম হরি নাম শুনিতে শুনিতে পুত্র বধুর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া পৌত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ জীবন ব্যাপী শ্রমের চিরশান্তি লাভ করিলেন। পিতার শেষ কার্য্য শেষে উত্তরীয় ধারণ করিয়া মোহিত

বাটী ফিরিয়া আসিল, শোকাতুরা পত্নীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে গিয়া, সে নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইল, পতি নিজে কাঁদে, আর পত্নীর চোখের জল মুছায়, পত্নী কাঁদে পতির চোখের জল মুছায়, অনেক দিনের পর দুটী প্রাণ আবার এক হইয়া গেল, শোকে শান্তি সমব্যথী না থাকিলে বুঝি পাওয়া যায় না। মোহিত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া দেখিল, পিতার তহবিলে দুই শত পাঁচ টাকা সাত আনা অবশিষ্ট রহিয়াছে,—মোহিতের কার্য্যে গ্রামের শত্রু মিত্র সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রশংসা করিল। মোহিত অনেক দিনের পর আবার দুঃখের ভিতর দিয়া শান্তি ফিরিয়া পাইল, সুহাসের লজ্জানতা বধূভাবের পরিবর্ত্তে গৃহিনীর গৌরব মণ্ডিত উজ্জ্বল মুখের প্রতি চাহিয়া সে মুগ্ধ হইয়া যাইত, পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া যে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিত, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কলিকাতা যাইতে আর তাহার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি তাহাকে যাইতে হইবে, এতদিনের পরিশ্রম, অর্থব্যয়, সাফল্য করিবার জন্য, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা,—আর সে অরুণার বাটীর দিকে যাইবে না।

সুহাসের অশ্রুজলে অভিসিক্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল বটে—কিন্তু কিছুতেই তাহার শান্তি নাই, এক দিকে অরুণার মোহিনী শক্তির আকর্ষণ, অপর দিকে পতিগতপ্রাণা সতী সাধ্বী প্রেমময়ী সুহাসিনী,—সে বিদায় কালে সুহাসের প্রেমপূর্ণ আবেদন কি করিয়া উপেক্ষা করে, সে যে, তাহারই সান্ত্বনায় আশা পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, আর তিন মাস পরেই স্বামী তাহার স্বদেশে স্থায়ীরূপে বসবাস করিবেন, এই আশায় যে, কাতরা সমস্ত দুঃখ সংযত রাখিয়া একান্ত তাহারই নির্ভরা।

মোহিত হৃদয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, হৃদয় বলিতেছে, একবার চল না,—একবার তাকে দেখিয়া এস না,—সেও যে, তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, কিন্তু মোহিত ভাবিতেছে,—আমার জন্য কেন সে বসিয়া থাকিবে, আমি নগন্য হীন বেতনভোগী দাস মাত্র, তাহার কিসের অভাব, হৃদয় বলিতেছে, হোক্ না—তার অভাব না হলেও তোমার তো দেখে সুখ, তাই কেন যাও না, মুহূর্ত্ত কাল দর্শনে সুহাসের কি অনিষ্ট ঘটিবে! প্রায় মাসাবধি হৃদয়ের সহিত দ্বন্দ্বে মোহিত প্রাণপণে সংযত রহিল, কিন্তু ঘটনা চক্র যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটাইয়া দিল। কলেজ ফেরত মোহিত মেসে ফিরিতেছিল,

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া দেখে, অরুণার পিতা। তাহার শুষ্ক মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবারে সে কি করিবে? বিস্মৃত ভাবে—অরুণার পিতা মোহিতের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জ্ঞাত হইলেন, তাহাতে তিনি দুঃখিত চিত্তে মোহিতকে সান্ত্বনা দিয়া স্বীয় গাড়িতে তুলিয়া বাটী লইয়া আসিলেন। যন্ত্র চালিতের ন্যায় মোহিত অরুণার সহিত সাক্ষাৎ করিল, অরুণা তাহার কাতর অসংযত উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িল, সঙ্কোচ সম্ভ্রম ভুলিয়া একান্ত আপন জনের ন্যায় মোহিতের হাত ধরিয়া বসাইয়া নিজে তাহার সন্নিকটে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। অরুণা ও হৃদয়ে বড় আঘাত পাইল, আহা! এক পিতা ভিন্ন যে মোহিতের কেহই ছিল না। মোহিত অনেকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া কোন উপায় নির্ণয় করিতে পারিল না, সে ধীরে ধীরে অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, অরুণা কাঁদিতেছে—সে অস্থির হইয়া উঠিল, অশ্রু? সেই অশ্রু, অরুণার নয়নে অশ্রু কেন? কি হয়েছে তোমার? অরুণা অশ্রু মুছিয়া লজ্জিত ভাবে মস্তক নত করিয়া মোহিতের হাত খানি ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, আবার তাহার নয়ন কোণে মুক্তা বিন্দু দুলিয়া পড়িল, বিস্মৃত মোহিত নিজের হাত সরাইয়া লইয়া বলিল, "কি আঘাত তোমাকে দিলাম, অরুণা কেন কাদ্‌ছ তুমি?" অরুণার নয়নের অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, সে ধীরে ধীরে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "না আপনি কষ্ট দেবেন কেন? আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় আমি হয়ত কেঁদে ফেলেছি আপনার দুঃখের অংশ যদি গ্রহণ করিতে পেতাম, তাহা হলেও তো আমার প্রাণে অনেক শান্তি আস্‌ত, আমি"—অরুণা আবেগে অতগুলি অসংলগ্ন কথা বলিয়া নিজের কাছে রাঙিয়া পড়িল, তাই সে হঠাৎ চুপ করিয়া রঞ্জিত মুখ খানি যে কোথায় লুকাইবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু তাহাকে সে অবসর না দিয়া তাহার লজ্জা পীড়িত নতমুখ খানি তুলিয়া মোহিত বলিল, "থাম্‌লে কেন অরুণ! বল বল, আমার ব্যথার ব্যথা নিতে তুমি কেন এত ব্যস্ত, আমার ব্যথা মুছাতে ভগবান আমায়"——মোহিতের বাক্য মুখেই থামিয়া গেল, কাতরা কম্পিতা অরুণার মস্তক তাহার বক্ষে ঝুলিয়া পড়িল। মোহিত অরুণাকে ঠেলিয়া দিতে পারিল না, তাহার মোহিনী স্পর্শে মোহিতের চিত্ত বিফল হইয়া সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল।

অনেক ভাবিয়া মোহিত দেখিল, অরুণার করুণা ব্যতীত জীবনে সে সুখী হইতে পারিবে না। অরুণাও তাহাকে না পাইলে বাঁচিবে না। উভয়তুটি

এক সূত্রে গ্রথিত, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই; ছিন্ন করিবার দুঃসাহস করিয়াছিল বটে, কৃতকার্য্য হইল না। সুহাসিনী ও শিশু পুত্রকে সে ভাবিবার অবসর পায় নাই। কোন প্রতিবন্ধকই হইল না,—কেহই জানিল না, মোহিত স্বীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আধুনিক গান্ধর্ব্ব মতে অরুণাকে ধর্ম্মপত্নী পাইয়া কৃতার্থ হইল।

কিন্তু সুহাসিনীকে ভুলিতে পারিল না,—মোহের মাদকতায় অরুণাকে লাভ করিল, দুদিন পরেই নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া সে অস্থির হইয়া পড়িল, সুহাস কি, তাহার এ অপরাধের মার্জ্জনা করিবে না? সুহাসের নিকট যদি মার্জ্জনা পায়, তবে আর তাহার কিসের ভাবনা, সে আত্মীয় চায় না, সমাজ চায় না, চায় শুধু সুহাসকে।

যদি অরুণা বিপদ বাধায়, তাহার পিতা প্রতারক বলিয়া তাহার সহিত বঞ্চনার শাস্তি লইতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে কি হইবে, সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অরুণাকে বলিয়া এত সত্বরেই তাহার প্রেম মুকুল বিনষ্ট করিয়া তাহায় অমৃতময় প্রেমে সে কালকূট ঢালিয়া দিতে পারিল না। নব দম্পতীর সহস্র ভোগ বিলাসের মধ্যেও কেমন একটা অতৃপ্ততায় উভয়ের হৃদয় আচ্ছন্ন, অরুণা ভাবে—স্বামী তাহার নিকট কি একটা যেন প্রচ্ছন্ন করিতে চাহেন, কেমন একটা গোপন ব্যথা স্বামীর মুখে মাখান, তাহা ভাবিয়া পায় না, তাহার সহিত হাস্যালাপে যেন সে মধুরতা নাই, কি একটা বেদনা যেন তাঁহার হৃদয়ে পুঞ্জিত। এ উৎকণ্ঠা ও তাহার সহজে দূর হইল। মোহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কোন জমিদার বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বেড়াইতে যাইতেছেন, তাহারই পারিবারিক চিকিৎসক হইয়া সে তাহাদের সহিত, দেশে প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইবে, সুহাসিনীকে লিখিয়া প্রতারণার আশ্রয় লইয়া, কিছু দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, কখন কোথায় থাকে স্থিরতা নাই, সুহাসিনীকে পত্রাদি দিতে নিষেধ করিয়া ছিল, নিজে পত্রাদি দিত, মাসে মাসে খরচ পাঠাইয়া কতকটা শান্তিতে সাত মাস সে নব বিবাহিত জীবনে সুখের মাদকতায় কাটাইয়া দিল। অকস্মাৎ তাহার বিড়ম্বিত জীবনের আর এক পরদা উত্তোলন হইয়া তাহার স্বমূর্ত্তী সর্ব্বজন সমক্ষে জাহির করিয়া দিল। মোহিত সুহাসকে টাকা পাঠাইত, তাহারই একখানি রসিদ এক দিন অরুণার হাতে পড়ে, বিস্ময়ের সহিত অরুণা দেখিল, স্বজন হীন স্বামী তাঁহার দুটি

টাকা কাহাকে দান করিয়াছেন, বিস্মিত ভাবে অরুণা মোহিতকে রসিদ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুহাসিনী দেবী তোমার কে হন? মোহিতের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে অপ্রস্তুত ভাবে আক্রান্ত হইয়া মোহিতের হৃদয় সাম্রাজ্যে বিপ্লব বাধিয়া গেল, কিছুতেই উপস্থিত বুদ্ধি যোগাইতে পারিল না, পরিচয় দিয়া অকপটে স্বীকার করিল, তাহার সহধর্ম্মিনী।

অরুণা যে এমন একটা অসম্ভাবিত বাণী শুনিবে, তাহার জন্যও সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না অকস্মাৎ তাহার চোখের সম্মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন উল্টাইয়া গেল, সে মূর্চ্ছিত ভাবে ঢলিয়া পড়িল, বক্ষ পাতিয়া স্বীয় বক্ষে অরুণাকে লইয়া মোহিত নিজ দোষ স্বীকার করিয়া অমার্জ্জনীয় নিতান্ত অসহায় ভাবেই যেন কাঁদিয়া ফেলিল। অরুণার উদার প্রাণে মোহিতের অপরাধ হইতে ব্যথাটাই অধিক ভাবে বাজিল, তাহাকে ভালবাসিয়াই যে স্বামী তাঁহার এতটা ত্যাগ করিয়াছেন, কতখানি কষ্ট পাইয়াছেন, পাইতেছেন, সে তাহা বুঝিয়া মোহিতের আত্মত্যাগের কাছে তাহার অপরাধটা স্বীকার করিল না। সে সহজেই স্বামীর প্রতারণায় মার্জ্জনা করিল। মোহিতকে অরুণা এক দিন জানাইল, তুমি আমাকে যতখানি জানাও আমার নিকট তুমি অপরাধি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমা হইতে আর এক জনের নিকট সত্যই অপরাধী, তোমার এখন প্রধান কর্ত্তব্য তাঁহার নিকট মার্জ্জনা লওয়া, আর তোমার অপরাধের মধ্যে যাহা তুমি পাইয়াছ,—তাহা তাঁহার হাতে সমর্পণ করা। সরলতার উদারতায় অরুণা মোহিতের হৃদয় স্বীয় প্রভাব দৃঢ় করিল।

সুহাসিনীর বড়ই দুঃসময়। চারি বৎসর বিবাহিত জীবনের অতীত না হইতেই মহা মহা তিনটী শোক পাইল, পিতা তাহার অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে মারা গিয়াছেন, শোকের ঘাত প্রতিঘাতে সুহাসিনী মুহ্যমান হইয়া পড়িল, তাহার উপর স্বামীর কোনই সংবাদ নাই। গ্রামে জনরব তিনি জাতি হারাইয়া ভিন্ন জাতীয় কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অন্তর তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না,—প্রেমময় স্বামী তাহার কখন সেরূপ হইতে পারেন না, তাহাকে বঞ্চনা করিতে পারেন না, সে এ রটনা মিথ্যা, এই হৃদয়কে প্রবোধ দিয়া স্বামীর প্রত্যাগমন পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মাসের পর মাস, দিনের পর দিন, কাটাইয়া, যখন শুনিল, এ মিথ্যাটা প্রকৃতই সত্য, তখন আর সে নিজের চিত্তকে ঠিক রাখিতে পারিল না, দারুণ দুঃখে অভিমানে অশান্ত

চিত্ত তাহার বিরোধী হইয়া পড়িল, সে তাহার স্বামীকে ক্ষমা করিতে পারিল না। যখন স্বামী তাহাকে নিজের বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহাকে মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করিল, তাহার সহগামিনী হইতে অনুনয় করিল, তখন সে নীরবে সকলই শুনিয়া ধীরে ধীরে স্বামীবক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল।

কাতরা সুহাস সমস্ত শোকের প্রজ্জ্বলিত বহ্নির মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া লুটাইয়া পড়িল, কে আর আছে তাহার দুঃখে সান্ত্বনা দিতে, কে আর আছে তাহার নয়নের অশ্রু মুছাইতে। মোহিত বাটী থাকিতে সুহাস স্বীয় কক্ষের অর্গল মোচন করিল না। মোহিত অনেকটা আশা আনন্দ আশঙ্কা লইয়া সুহাসের নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিল, আর সে ফিরিয়া গেল, ব্যর্থ বেদনার বোঝা লইয়া। অরুণার ক্ষমতা নাই সে বেদনা দূর করে, তবে কতকটা প্রলেপের কার্য্যও যে না করিয়াছিল তাহা নয়, তাহাতে কিছুই হইল না, মোহিত সুহাসকে হৃদয়ের বেশী ভালবাসে, তাহা যখন সে তাহার মধ্যে ছিল ধারণা করিতে পারিত না, কিন্তু এখন সুহাস দুষ্প্রাপ্য হইয়া তাহা বুঝাইয়া দিল। সে তাহার সারা অন্তরে স্থান অধিকার করিয়া আছে, সুহাসহীন জীবন তাহার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ক্রমে ক্রমে হৃদয় তাহার ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, জীবনের শান্তি সে সুহাসিনীর কাছে রাখিয়া বিদগ্ধ প্রাণে অরুণার স্নিগ্ধ শীতল প্রেমে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার-তাপ-নিবারণে ব্যর্থ প্রয়াস পাইল, মুখে কখন সুহাসিনীর নাম না উচ্চারণ করিলেও অরুণার জানিতে বাকী রহিল না, সুহাসিনী তাহার অন্তরের কতখানি। যে দিন মোহিতের প্রেরিত মণি অর্ডার সুহাসিনীর নিকট হইতে ফেরত আসিল, সেই দিন মোহিত আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া অরুণাকে ইহা বুঝাইয়া দিল। সে অনেক দিনের কথা, তাহার পর সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। দিন দিন মোহিত হৃদয়ের সহিত দ্বন্দ্বে পরাস্ত হইয়াছে। আর সুহাস—তাহার দুর্দ্দশা অবর্ণনীয়, সমাজ তাহার দুঃখ, তাহার অভাব কিছুই বুঝিল না, বুঝিল তাহার দাবী। মোহিত যে সমাজের মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছিল, তাহাদের অনুগ্রহ সে চায় না, তাহারই প্রভাব বিস্তার হইল, অসহায়া অবলা নারীর ও নিষ্পাপ শিশুর উপর, সমাজ পেষণে তাহাদের পিষিয়া মারিবার কিছুই বাকী রহিল না। তিন বৎসরের শিশু পুত্র যখন কঠিন নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হইল, উপায় বিহীনা নিষ্কলা সুহাস তাহার জ্ঞাতি শ্বশুরশ্বশুরের পদে লুটাইয়া পড়িয়া

অবোধ শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য কাঁদিয়া, ভূমিতল সিক্ত করিয়া, সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কঠিন মৃত্তিকা সিক্ত করা যত সহজ, পল্লির সমাজের নেতাদের অন্তঃকরণ সিক্ত করা তত সহজ নয়। শ্বেত শ্মশ্রু বৃদ্ধ অম্লান বদনে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারায় তাহার কোন উপায় হইবে না, একটা মেথর যেটুকু করুণা পাইতে পারে সে টুকুও তাহাদের অধিকার নাই, তবে যদি সুহাস স্বামীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহা হইলে সমাজ তাহাকে আশ্রয় দিবে। সুহাস এ আঘাতে স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছিল, তাঁহার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিলে সমাজ বন্ধন দূর হয়, ঐশ্বরিক বন্ধন প্রায়শ্চিত্তে ছিন্ন হইবে? আমি তাঁহার সহধর্ম্মিনী, অসহায় শিশু তাঁহারই পুত্র, স্বামীর যে ধর্ম্মে আস্থা আমার তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সে অপরাধে যদি অসহায় পুত্র আমার মৃত্যুকোলে আশ্রয় নেয় তবু তাঁহার ধর্ম্মপত্নী তাঁহার ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া সমাজের কৃপা ভাজন হইবে না।

সেই সময়ে ঈশ্বর প্রেরিত দূতের ন্যায়, মোহিতের দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা ও আশৈশব সঙ্গী পুলিন সমাজকে উপেক্ষা করিয়া অসহায়ার ভরসারূপে অক্লান্ত পরিশ্রমের চেষ্টায় দুঃখিনীকে কৃতজ্ঞতা জালে বদ্ধ করিয়াছিল, তখন হইতে এ যুবক এই উৎপীড়িতাকে সম্ভব মতন উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়া নিজেকে বিপদাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। শ্বশুরের সঞ্চিত অর্থে নিজের কয়েকখানি অলঙ্কারে কত ক্লেশে এই সুদীর্ঘ কাল স্পর্দ্ধায় কাটাইয়া এখন সুহাস একান্তই নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে।

(৪)

"বৌ! কি রান্না হবে?

"রোজই কি তোমাকে বলে দিতে হবে নাকি? এমন হলেতো পোষাবে নাকো, আমি যদি তোমাদের ওসব নিয়ে থাকব, তাহলেই হয়েছে আর কি। নত মস্তকে সুহাস ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, গৃহিণী তীব্র স্বরে ডাকিলেন,—"তোমাদের সঙ্গে দেখ্‌ছি বুঝে কথা না বল্‌লে আর আমার চলে না, অত মুখ ভারাভারি কিসের বলত? সুহাস যেমন নীরবে ফিরিয়াছিল, তেমনই নিরুত্তরে চলিয়া গেল।

অন্য উপায় না দেখিয়া পুলিন সুহাসের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশকে

ধরিয়া তাঁহার আশ্রয়ে সুহাসকে আনিয়া ফেলিয়াছিল, উপায় বিহীনার যে অন্য উপায় নাই, অবিনাশের অবশ্য গৃহিণীর দরবারেই আর্জি পেস করিয়া ভগ্নীকে স্থান দিতে হইয়াছিল। বিচক্ষণা গৃহিণী দয়ার বশবর্ত্তিনী হইয়া যে সপুত্র ননন্দাকে আশ্রয় দেন নাই, তাহা সুহাস বাটী প্রবেশের সহিত বুঝিয়াছিল, রাঁধুনীর হাতের রাঁন্না ভাল নয়, ঝিটা বড় মুখরা, তাহার আবির্ভাবের সহিতই তাহাদের অন্তর্ধান হইল। আবার গৃহিণী বিনয়কে আদর করিয়া বলিতেন, "হ্যাঁ বিনু! তুই এক পয়সার জিনিস্ কিন্‌তে পারিস্‌নে, তার দেখ্‌তো চারক ছোঁড়া তোর চাইতে আর কত বড় বাবা! সব বাজার তো নিজেই করে, তুই যদি আমার তেমন হতিস তাহলে চুরির পয়সাটা বাঁচ্‌ত। ভ্রাতৃজায়ার আদরে কিন্তু সুহাসের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিত। শেষ অগ্রহায়ণের সন্ধ্যাটা খুব জমাট শীত এবং ঘন কুয়াসা লইয়া সে দিন খুব বিষাদ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। সুহাস গায়ে কাপড় জড়াইয়া উনুনের কাছে বসিয়া পুত্রকে পড়া বলিয়া দিতেছিল, সুহাসের মাস ছয়েক হইতে রাত্রে ঘুস্ ঘুসে জ্বর হয়, সুহাস তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে,—আর পারিয়া উঠে না,—কিন্তু না পারিলেও যে উপায় নাই, তাহার কৃতকর্ম্ম ফল তাহার হইয়া কে ভোগ করিবে, শুধু বিনুর জন্যই তাহার বাঁচিয়া থাকা, নচেৎ এতদিন সে ব্যর্থ জীবনের অবসান করিয়া দিত—গৃহিণীকে বিনয় জানাইয়াছিল, "মামি মা, রোজ রাত্তিরে মার জ্বর হয়, একটু ওষুধ আনিয়ে দিবেন না?" "সে কথা আমাকে কেন বাবা, আরও তো বাড়ীতে মানুষ আছে বল, আনিয়ে নিও," এই টুকুতেই তাঁহার গৃহিণী দারিদ্রের চরম হইয়া সে প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু একটু বেলায় চা তৈরী হইলে, তখন গৃহিণীর বাটীর লোকের ভাবনায় তাহাদের স্বাস্থ্যের দায়িত্বে অস্থির হইয়া পড়িতেন। বিনয় বই হইতে চকিতে মুখ তুলিয়া বলিল, "মা তুমি বসে থাকতে পারচ না? তবে তুমি শোওগে আমি ঘর আগ্‌লে বসে থাক্‌ছি, সবাই খেতে এলে তোমায় ডেকে দেব," বিনয়ের বাক্য শেষ না হইতেই নিধে আসিয়া বলিল, "পিসিমা? পুলিন বাবু এসেছেন! ব্যস্তভাবে সুহাস জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?" নিধে বলিল, "তোমার ঘরে।" মিনতি ভাবে সুহাস নিধেকে বলিল, "বাবা এখানে একটু বস না, বিনুর একলা ভয় করবে, আমি এখুনিই আস্‌ছি।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিধেকে বসিতে হইল, কেন না, ঠাকুরুণটী তাহার আহারের বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন বলিয়া তাহারও ঠাকুরুণের কথা গুলিতে

আপত্তি করা চলে না. নচেৎ সে উকিল বাবুর পেয়ারের চাকর কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। অপরিসর ছোট ঘর খানিতে ছোট একটী তক্তপোস পাতা তাহারই এক পাশে অর্দ্ধ মলিন একটী শয্যা গুঠানো, পুলিন সেই তক্তপোসের উপর বসিয়া বিস্ময় দৃষ্টিতে ঘরটা দেখিতেছিল, নিধে সাম্‌নে একটা কেরোসিনের ডিবা বসাইয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহারই ধুমে ক্ষুদ্র কক্ষটী পুলিনের নিকট আরো ভার হইয়া উঠিয়াছিল, সুহাস ধীরে ধীরে চৌকাঠের কাছে বসিয়া আলোকটা সরাইয়া দিয়া পুলিনের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রপাত করিল. সুহাসকে দেখিয়া পুলিন আরও বিস্মিত হইয়া বলিয়া ফেলিল, "একি শ্রী হয়েছে? উপরকার ঘরটার কি হয়েছে, এখানে থাক্‌লে যে মারা পড়বে, বৌ দি?" উপেক্ষায় একটু হঠাৎ হাসিয়া সুহাস জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের সব ভাল তো?" সক্ষেপে 'হু' বলিয়া পুলিন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বৌদি! তোমাকে মোহিত দাদা আবার ডেকেছে. দাদা শয্যাগত, তোমাকে আর খোকাকে দাদা একবার দেখ্‌তে চায়?" সুহাস পাংশুমুখে পুলিনের মুখের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিল, একটু চিন্তা করিয়া পুলিন আবার বলিল, "রোজই দাদার জ্বর হচ্ছে, আবার ডাক্তারে বলেছে, তাহার বুকের অবস্থাটাও নাকি ভাল নয়, কালই তারা বৈদ্যনাথ যাচ্ছে তাই তোমায় দাদা একবার ডেকেছে,—আমাকে বড় কাতর ভাবে বলেছে,—যাবে না বৌ দিদি?" বিচলিতা সুহাস তাহার দুর্ব্বল ঘুর্ণিত মস্তক দ্বারে রক্ষা করিয়া অজ্ঞাতেই বোধ হয় তাহার মুখ দিয়া অস্ফুট স্বরে "না" শব্দটী বাহির হইয়া গেল, একে ত এখানে আস্‌তেই তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে এই নিষ্ঠুর না তাহাকে আকুল আবেদন নির্ম্মম ভাবে অগ্রাহ্য করিল, তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, সে যে মোহিতকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে, আর এ হৃদয়হীনা বলে কি? পুলিনের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া গেল, "এতটা ভাল নয়, যার স্বামীর জাত নাই, তার আবার জাত কি" সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সুহাস ভাবিল, "তিনি আমায় ডেকেছেন, আর আমি যাব না? তিনি তো আজ এ নূতন ডাকেন নাই, এতো আমার কাছে নূতন দুষ্প্রাপ্য নয় যে, ছুটিয়া যাইব? কিন্তু তিনি যে পীড়িত. তাহাতে কি, তাঁহার সেবার তো অভাব হচ্ছে না? সুহাস অন্তরে শিহরিয়া উঠিল, তাঁহার পত্নী বলিয়া আমি কি শুধু অভিমানের ভাগিনী? আমার কর্ত্তব্যই বা আমি কি করিলাম? তিনি তো আমার স্বামী, আমি তাঁহাকে সুখী করিতে পারিনি. তিনি যেখানে সুখ

পেয়েছেন, সেখানেই আছেন, পত্নীর কার্য্যই কি ভোগ সুখে, ত্যাগে কি কিছুই পাওয়া যায় না, বাহিরে তাহাকে পাইনি, ভিতরে যে তিনি আমার সহিত সততই আছেন, সে সুখের তুলনায় কি বাহ্যিকটাই বড় হলো; কে বলে আমি তাঁহার নই! কে বলে,—তিনি আমার নয়, ত্যাগের প্রেম যে কত মধুর তাহা ভোগিরা কি বুঝিবে, স্বার্থান্ধ প্রাণী অন্ধতেই তুষ্ট বেশী, যে সে আয়াস-লব্ধ। তিনি তো সুখের সাগরে ভেসে আমায় তাঁহার বাহ্যিক সঙ্গিনী কর্‌তে ডাকেন নি, তিনি তাঁর সহধর্ম্মিণীকে তাহার কর্ত্তব্যে অগ্রসর হতে আদেশ করেছেন মাত্র। তাহার মনে পুলিনের কথাগুলি জাগিয়া উঠিল, তাহার ভক্ত ঠাকুরপোটী যে এখনো বুঝে নাই যে, তাহার জাতি নাই বলিয়াই তো সমাজ নিগ্রহ; এত—তাহার আর তাহার নিজেরও একটা বিড়ম্বনা। দ্বিপ্রহরে অবিনাশ আহারে বসিলে গৃহিণী স্থূল দেহখানি টানিয়া পাকা হাতে আহারের তত্ত্বাবধানে বসিলেন, অবিনাশ আহার শেষে তৃপ্তি উদ্গার তুলে বলিল, "সুহাস রাঁধে কিন্তু খাসা।" গৃহিণী পাখার ডাঁটটা মেঝের ঘসিতে ঘসিতে চিন্তিত মুখে স্বরটী খাটো করিয়া বলিল, "তোমার বোন যে আর থাক্‌তে চান না, ও গেলে কিন্তু আমার অসুখান্তির এক শেষ থাক্‌বে না।" বিস্মিত ভাবে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল, যাবে কোথায়?" তাচ্ছিল্য ভাবে গৃহিণী বলিল, "এত দিনের পর পতিপ্রেম মনে জেগে উঠেছে. পুলিনটে এসে নাকি খবর দিয়ে গিয়েছে ওর স্বামীর অসুখ, তাই বল্‌ছিলো সেবা কর্ত্তে যাবে।"

অবিনাশের এতটা সচ্ছন্দে ঘা দিয়া সে চলিয়া যাইবে, ভাবিয়া সে অসহিষ্ণু ক্রোধিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "বলে দিও যে সেখানে সেবাদাসী হয়ে যেতে হলে এখানকার ভরসা ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে, একেতো বাইরে মুখ পাইনে, হিন্দুর ঘরে একি কাণ্ড তাতে সেখানে খুটতে গেলে আর রক্ষে থাক্‌বে না, এটা বুঝিয়ে বলে দিও"—গৃহিণীকে আর কষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইল না, রন্ধনশালে বসিয়া যে বুঝিবার সে সমস্তই বুঝিল।

(৫)

সুহাসের বুকটা দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। দ্বারের নিকট গিয়া সুহাস আর অগ্রসর হইতে পারিল না, কি এক আশঙ্কায় অন্তর কাঁপিয়া তাহার গতি নিশ্চেষ্ট করিয়া দিল।

সশব্দে পুলিন বিজেতা যুদ্ধের ন্যায় বিনয়ের হাত ধরিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রফুল্ল ও অরুণাকে ডাকিয়া কহিল, দাদা বলুনতো ছেলেটী কে? ষ্টোভ জ্বালিয়া অরুণা মোহিতের জন্য দুধ গরম করিতেছিল, বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া বালকের অনিন্দ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া মোহিতের মুখের ছাপ দেখিয়া বুঝিয়া লইল, তাহার হৃদয়ে কিসের একটা স্পন্দন খেলিয়া গেল, পুলিনের কথায় মোহিতও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে নীরবে বিনয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার রোগশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ নয়ন দুটী আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অরুণা দুধের বাটী বিছানার পার্শ্বে রাখিয়া সস্নেহে বিনয়ের হাত ধরিয়া আদর মাখা স্বরে বলিল, "এক পাশে চুপটী করে দাঁড়িয়ে কেন মাণিক। এস আমার কোলে বস্‌বে এস।" অরুণা বালকের ভীত চকিত মুখে চুম্বন করিয়া মোহিতের নিকট লইয়া গেল, মোহিতও আরো কিছুর প্রত্যাশা করিতেছিল, কিন্তু কই? মোহিত শীর্ণ হাত দুটী বিনয়ের মাথার উপর স্থাপন করিল, বিনয় সে স্পর্শে কণ্টকিত হইয়া আকুল স্বরে ডাকিল, "বাবা!" আহা! কি মধুর সম্বোধন, এ সুখে সে কত দীর্ঘকাল বঞ্চিত রহিয়াছে. মোহিতের শুষ্ক গণ্ড বহিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অরুণ সজল নয়নে এ দৃশ্য দেখিতে ছিল, হঠাৎ পুলিনের স্বরে চমকিয়া উঠিল! পুলিন অনুযোগের সহিত সুহাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "বৌদি! বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?" সচকিতে মোহিত দ্বারের দিকে চাহিয়া অধৈর্য্য স্বরে বলিয়া উঠিল, "দেখ! অরুণ দেখ, পুলিন বোধ হয় বিদ্রুপ কচ্ছেন—"

প্রায় বিলুপ্ত চেতনা সুহাসকে আনিয়া অরুণা মোহিতের শয্যাপার্শ্বে বসাইয়া দিয়া সহজ স্বরেই বলিল, "তাহলে দিদি ওঁকে দুধটুকু তুমি খাইয়ে দেও, আমি খোকাকে খাবার দিই গে। হ্যাঁ দিদি, তোমার জন্য কি আলাদা রান্না চড়াবার কথা বল্‌ব?" সুহাসের উত্তরের পরিবর্ত্তেই মোহিত স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "হ্যাঁ তাই দাও গে! প্রস্থানোদ্যতা অরুণাকে ডাকিয়া মোহিত বলিল, "অরুণ! তোমার কাজ সেরে শিগ্‌গির এস।" তরল হাস্যের সহিত অরুণা বলিল, "কেন দিদি কাছে বসে আছেন, তোমারতো আর কষ্ট হচ্ছে না, আমার আজ ফুর্‌সত কই, রান্নার যোগাড়তো সব কর্‌তে হবে, সুহাসের মুখের উপর পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া মোহিত বলিল, "না—অরুণ! আমার আর বায়ু পরিবর্ত্তের দরকার হবে না, অন্তরের ক্ষত বাহিরের প্রলেপে কি শুষ্ক হয়?" মুহুর্ত্তে অরুণার মুখ খানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল, হঠাৎ

হৃদয়ের আবেগে অরুণার মুখের উপর কথাটা ভাল হয় নাই ভাবিয়া, মোহিত একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

ফাল্গুনে মেঘশূন্য আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতে ছিল, তাহার অম্লান উজ্জ্বল দীপ্তি মোহিতের মনে একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিল। শয়ন কক্ষের সম্মুখস্থ খোলা ছাদের টবের উপর নানা জাতীয় ফুলের গাছ, বাতাস গাছের পাতা দোলাইয়া অতি ধীরে বহিতেছিল। মোহিত অরুণার হাত খানি ধরিয়া জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল, চন্দ্র কিরণে অরুণার অতি সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল মধুরে হাসিয়া উঠিল; মোহিত এক দৃষ্টে অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল; মোহিতের আত্মহারা দৃষ্টির উপর অরুণার মুখখানি সঙ্কোচ নত হইয়া পড়িল, মোহিত তাহাকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া অস্বাভাবিক প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "আমায় ভালবাস কি অরুণা?" অরুণা একটু হাস্যের সহিত বলিল, "তোমার অ জ হয়েছে কি?" মোহিত ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "নূতন কিছু হয় নি অরুণ! ভাব্‌ছি আমার শান্তির জন্য এতটা অত্যাচার কি তুমি সহ্য করিতে পারিবে, আমার তাই ভয় হচ্ছে অরুণ!" ধীরে ধীরে মোহিতের বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ম্লান মুখে অরুণা বলিল, "সে কি এই সাত বৎসরেও বুঝ্‌তে পার নি, তাই আমায় তোমার আস্থা হচ্ছে না, তোমায় যে আবার ফিরে পেয়েছি, তাই বা কাহার করুণায়, তুমি কার বলত? যাহার উপর তোমার অত্যাচার সে খানের ভাবনাটাই ভাবা তোমার উচিত, আমায় অদেয় তোমার কি আছে?" খোলা জানালার মধ্য দিয়া রুগ্নশয্যায় সুহাস এ বিমল দৃশ্য দেখিতেছিল, সে দিকে সুহাস আর চাহিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া পুত্রের মুখ চুম্বন করিল। সুহাসের মনে পড়িল, সেই বহুদিনের কথা. এই শুভ ফাল্গুনে চন্দ্রমাশালিনী রজনীতে তাহার ফুলশয্যা এমনই করিয়া স্বামী তাহার ভয় চকিত সঙ্কোচ কম্পিত মুখ খানি স্বীয় বক্ষে তুলিয়া লইয়া ছিলেন—সুহাসের আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। সুহাস ভাবিতেছিল, ভগবানের দয়ায় স্বামী তাহার এখন রোগমুক্ত, এখন সে কি করিবে, যে কর্ত্তব্যানুরোধে সে সহস্র বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহাতো তাহার সম্পূর্ণ হইয়াছে, আর কেন, অরুণার সুখের পথে দুষ্ট ধূমকেতুর মতন আমি কখনই উদয় হইব না। অরুণার সকল ব্যবহারে সুহাসের হৃদয় তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সুহাস এক সপ্তাহ হইল আর উঠিতে পারে না, তাহার ঘুস্ ঘুসে জ্বর প্রবল হইয়া

মঙ্গল উপবেশন ভাবে থাকিলে জাতক নরাধম, ধনবান, ক্রুর, নিষ্ঠুর ও জ্ঞাতি বর্জ্জিত হয়।

মঙ্গল নেত্রপানি ভাবে থাকিলে জাতক চক্ষুহীন, দরিদ্র, ভূমিজীবী, সুখী ও ব্যাঘ্র সর্প কর্ত্তৃক ভীত হয়।

মঙ্গল প্রকাশক ভাবে থাকিলে জাতক ধনবান, সুখী, স্ত্রীহীন ও পাপী হয়।

মঙ্গল গমনেচ্ছা ভাবে থাকিলে জাতক গুহ্যরোগী, ধনহীন, অসুখী ও কুকর্ম্মা হয়।

মঙ্গল গমন ভাবে থাকিলে জাতক প্রবাসী, নিত্য দুঃখিত, পীড়িত, দদ্রু কুষ্ঠ প্রভৃতি ত্বকরোগী, তেজস্বী, সন্ধিস্থানে বেদনাযুক্ত, স্ত্রীবশীভূত ও বহু ভাষী হয়।

মঙ্গল সভায় বসতি ভাবে থাকিলে জাতক ধার্ম্মিক, বহু সম্পদযুক্ত, গুণবান, দাতা ও শিরঃরোগী হয়। কিন্তু মঙ্গল সভায় বসতি ভাবে নবম পঞ্চম স্থানে থাকিলে শুভ ফল হয় না।

মঙ্গল আগমন ভাবে থাকিলে জাতক খঞ্জ, কর্ণরোগী ও নরাধম হয়। বিশেষতঃ আগমন ভাবে দশমে থাকিলে দ্বিভার্য্যাযুক্ত ধার্ম্মিক হয়।

মঙ্গল ভোজন ভাবে থাকিলে জাতক মৎস্য, মাংস লোভী, ক্ষুদ্রাকার বিশিষ্ট মহাক্রোধী ও নিত্যোৎসাহী হয়।

মঙ্গল নৃত্যলিপ্সা ভাবে থাকিলে জাতক ধনবান দাতা, ভোক্তা ও সদা সুখী হয়।

মঙ্গল কৌতুক ভাবে থাকিলে জাতক পণ্ডিত নানাধর্ম্মযুক্ত, দ্বিভার্য্যা ও অনেক কন্যাযুক্ত হয়।

মঙ্গল নিদ্রাভাবে থাকিলে জাতক মুর্খ, ধনহীন, ক্রোধী ও বলবান হয়।

বুধের ভাব ফল।

বুধ শয়ন ভাবে থাকিলে জাতক ধনবান, ক্ষুধিত, খঞ্জ, দরিদ্র ও লম্পট হয়।

বুধ উপবেশন ভাবে থাকিলে জাতক বাগ্মী, কবি, গৌরবর্ণ বিশিষ্ট ও মহাশুচি হয়।

বুধ নেত্র পানি ভাবে থাকিলে জাতক শ্লীপদী, কোমলাঙ্গ বিশিষ্ট সুকেশযুক্ত, সত্যবাদী ও বিদ্যা এবং পুত্রহীন হয়।

বুধ প্রকাশন ভাবে থাকিলে জাতক ধার্ম্মিক, ধনী, ন্যায়গুণযুক্ত ও বেদজ্ঞ হয়।

বুধ গমনেচ্ছা ভাবে থাকিলে জাতক লম্পট, দক্ষ, স্ত্রীবশ, দুষ্টা পত্নীযুক্ত, কামুক, বহুভাষী, রোগী ও দুঃখী হয়।

বুধ গমন ভাবে থাকিলে জাতক বাণিজ্যপটু সর্প ও জলভীত, মূর্খ এবং গুণ বর্জ্জিত হয়।

বুধ সভায় বসতি ভাবে থাকিলে জাতক মূর্খ, ধনবান, ধার্ম্মিক, চিররোগী ও কৃপণ হয়।

বুধ আগমন ভাবে থাকিলে জাতক মূর্খ, পাপশীল, নরাধম ও গুহ্যস্থানে পীড়াযুক্ত হয়।

বুধ ভোজন ভাবে থাকিলে জাতক ধনহীন, পরদ্বেষী প্রবাসী, রোগযুক্ত, দদ্রু, বিচর্চ্চিকাদি পীড়ায় পীড়িত ও শিরঃ রোগী হয়।

বুধ নৃত্য লিপ্সা ভাবে থাকিলে জাতক ধনবান, পণ্ডিত, কবি, উৎসাহী, সুখী ও পুত্রবান হয়।

বুধ কৌতুক ভাবে থাকিলে জাতক লোকপ্রিয়, অর্শরোগী, দদ্রুযুক্ত ও ত্বকরোগী হয়।

বুধ নিদ্রাভাবে থাকিলে জাতক পরদুঃখ ভাগী ও অল্পায়ু হয়।

বৃহস্পতির ভাব ফল।

বৃহস্পতি শয়ন ভাবে থাকিলে জাতক বিদ্যাবুদ্ধিসমন্বিত, নানাগুণযুক্ত, দাতা ও সুখী হয়।

বৃহস্পতি উপবেশন ভাবে থাকিলে জাতক দুঃখী, বহুভাষী, রোগী, শিল্প-কার্য্যে নিপুণ ও শ্লীপদী হয়।

বৃহস্পতি নেত্রপানি ভাবে থাকিলে জাতক গৌরবর্ণ বিশিষ্ট ধনী ও শিরঃ রোগী হয়।

বৃহস্পতি প্রকাশন ভাবে থাকিলে জাতক নানারত্নসমাযুক্ত ও রাজপ্রিয় হয়। বৃহস্পতি গমনেচ্ছা ভাবে লগ্নে থাকিলে জাতক পণ্ডিত হয় অন্যান্য স্থানে থাকিলে লিঙ্গে পীড়া যুক্ত, মূর্খ, লম্পট, পাপী, শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট ও প্রবাসী হয়।

বৃহস্পতি গমন ভাবে থাকিলে জাতক সর্পভীত, উগ্রকর্ম্মকারী ও পরধনে ধনবান হয়।

বৃহস্পতি সভায় বসতি ভাবে থাকিলে জাতক বক্তা, দাতা, ধনবান রাজসেবী, পণ্ডিত ও সুন্দর হয়। কিন্তু উক্তভাবে বৃহস্পতি অষ্টমে থাকিলে জাতকের শুভফল হয় না।

বৃহস্পতি আগমন ভাবে থাকিলে জাতক—ধার্ম্মিক তীর্থবিহারী, মানী, উৎসাহী ও গর্ব্বিত হয়।

বৃহস্পতি ভোজন ভাবে থাকিলে জাতক মাংস লোভী, মহৎ, কামুক ও প্রিয়ভাষী হয়।

বৃহস্পতি নৃত্যেচ্ছা ভাবে থাকিলে জাতক বাগ্মী, ধনবান সাত্বিক ও ভাগ্যবান হয়।

বৃহস্পতি কৌতুক ভাবে থাকিলে জাতক ধনবান, ধার্ম্মিক, উৎসাহী, আনন্দিত ও সুখভোগী হয়।

বৃহস্পতি নিদ্রা ভাবে থাকিলে জাতক নেত্ররোগী, কৃপণ, বহুভাষী ও দুঃখিতচিত্ত হয়।

শুক্রের ভাব ফল।

শুক্র শয়ন ভাবে থাকিলে জাতক সুখী, বিদ্বান, ধনবান ও ধার্ম্মিক হয়।

শুক্র উপবেশন ভাবে থাকিলে জাতক ধনবান, ধার্ম্মিক, দক্ষিণাঙ্গে ক্ষতযুক্ত ও ধন পুত্রে সুখী হয়।

শুক্র নেত্রপানি ভাবে থাকিলে জাতক চক্ষুহীন, দরিদ্র, তীর্থবিহারী, সাহসী ও রাজসেবক হয়।

শুক্র প্রকাশন ভাবে থাকিলে জাতক, ধনবান, ধার্ম্মিক ও শুচি হয়। উক্ত, ভাবে শুক্র উচ্চ স্থানে থাকিলে জাতক রাজভোগী হয়।

শুক্র গমনেচ্ছা ভাবে থাকিলে জাতক মাতা ও ভ্রাতৃহীন হয়।

শুক্র গমন ভাবে থাকিলে জাতক পাদমূলে পীড়াযুক্ত, উৎসাহী, শিল্পপটু ও তীর্থসেবী হয়।

শুক্র সভায় বসতি ভাবে থাকিলে জাতক রাজমন্ত্রী, ধনী, কার্য্যপটু ও শূলরোগী হয়।

শুক্র আগমন ভাবে থাকিলে জাতক দুঃখিত, বহুভাষী, দদ্রুরোগী, পুত্র-শোকযুক্ত ও নরাধম হয়।

শুক্র ভোজন ভাবে থাকিলে জাতক বলবান ধার্ম্মিক, বাণিজ্য ও রাজসেবা-পটু, প্রবাসী, শিরঃরোগী, মন্দাগ্নি পীড়িত ও কষ্টান্বিত হয়।

শুক্র নৃত্যেচ্ছা ভাবে থাকিলে জাতক বাগ্মী, পণ্ডিত ও কবি হয়। কিন্তু নীচস্থ হইলে জাতক মূর্খ হয়।

শুক্র কৌতুক ভাবে থাকিলে জাতক ধনবান, সাত্বিক, মহাহৃষ্ট, বক্তা ও কৌতুকী হয়।

শুক্র নিদ্রাভাবে থাকিলে জাতক রুগ্ন ও দরিদ্র হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৭শ, বর্ষ। ১৩২৮ সাল, চৈত্র। ১২শ, সংখ্যা।

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

চতুর্থ অংশ।

কমলাকান্তের অম্বিকা গমন।

শুভুড়ের উৎসব শেষ হইল। কমলাকান্ত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার জননী তাঁহাকে সংসারের কর্ম্মে নিয়োগ করিবার উদ্দেশে তাঁহার সহিত অম্বিকায় যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "অম্বিকার ধনবান শিষ্য আমাদের সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার গৃহে গিয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আশীর্ব্বাদ করা কর্ত্তব্য। আরও অনেক শিষ্য আছেন, তাঁহারা তাদৃশ ধনশালী না হইলেও সকলেই ভক্তিমান, আমাদের দর্শনে তাঁহারা বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন। আমরা সংসারী, আমাদের অর্থ প্রয়োজন হইলেও শ্রদ্ধা, ভক্তি, পরম পদার্থ। ঐ সকল ধনহীন ভক্ত শিষ্য সকলকেও দর্শন দিয়া আশীর্ব্বাদ করা কর্ত্তব্য।" সাধক মাতৃবাক্য শিরে ধরিয়া অম্বিকা গমনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। চাম্না হইতে গো-যানে জননীর সহিত অম্বিকার

গমন করিতেছেন। চান্না হইতে অম্বিকা প্রায় বার ক্রোশ। সাধকের স্কন্ধে
উত্তরীয়, গলে রুদ্রাক্ষ মালা, প্রসন্ন বদন, পথের সম্বল কালী নাম। তিনি
নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামেই পরিচিত। পথে অবস্থানের জন্য অভ্যর্থনার অভাব
নাই। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে" "যেই জন ভজে কৃষ্ণ
সে বড় পণ্ডিত।" তাঁহার মত গুণবান, ভক্তিমান লোকের বার ক্রোশ পথ
বার দিনেও যাওয়া কঠিন। প্রতি গ্রামেই অবস্থিতির জন্য উপরোধ অনুরোধ
এড়াইয়া যাইতে হয়, বিশেষতঃ তৎকালে অতিথি সৎকার বর্ত্তমান অপেক্ষা
প্রবল মাত্রায় সমাজ মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, গৃহী মাত্রেই অতিথি সৎকারকে গৃহীর
পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিত। অতিথিশালা না থাকিলে ধনাঢ্য ব্যক্তি
সম্পত্তিশালী বলিয়া গণ্য হইতেন না। বর্দ্ধমান হইতে অম্বিকার পথে পুণ্যশ্লোক
বর্দ্ধমানাধিপতি দিগের তিন চার ক্রোশ অন্তর পান্থ নিবাস, শ্যামা মন্দির, ও
শিবালয়, উদ্যান ও দিব্য জলাশয় আছে। ওই সকল স্থান দেখিলেই অনুমিত
হয়, নিবাস সকল তাঁহাদের বিলাস ভবন নহে, প্রতি স্থানেই দেবালয় ও
অতিথিশালা আছে। দুই এক স্থানের দৃশ্যও অতি মনোহর ও চিত্রাকর্ষণ
উপযুক্ত। বর্দ্ধমান হইতে কালনা পর্য্যন্ত পাকা রাজপথ, কর্দ্দম রহিত, শিলা-
মণ্ডিত, অতি সুন্দর। এক স্থানের দেবালয় ও অতিথিশালার দৃশ্য এইরূপ
কোন রাজপথের কোলে দুইটী প্রকাণ্ড মন্দির, পান্থদিগের বহুদূর হইতে নয়ন
আকর্ষণ করে। পথ পার্শ্বেও মন্দির প্রবেশ দ্বারে তোরণ ও সিংহমূর্ত্তি,
রাজকীয় ভবনের চিহ্ন স্বরূপ। তোরণের নিচে দাঁড়াইলে সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত
ঘাট সংযুক্ত বিমল পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ঘাটের উভয় পার্শ্বে
দুইটী মন্দির। একটী মন্দিরে দুই হস্ত পরিমিত মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি। অন্যটীতে
নবজলধর বর্ণ অভয় বরদা করাল বদনা মূর্ত্তি। দুই মূর্ত্তি পরস্পরকে দৃষ্টি
করিতেছেন। দুই মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী স্থান শিলা মণ্ডিত ও পুষ্করিণীর ঘাটের
মুখে অবস্থিত। মন্দির দুইটীর পশ্চাৎ ভাগে পান্থ নিবাস ও রাজকীয় দাস
দাসীগণের বাসের উপযুক্ত ভবন। ঘাট ও মন্দিরের পার্শ্বে পুষ্করিণীর জল
সংলগ্ন স্থানে রাজগণের বাসের উপযুক্ত গৃহ। পুষ্করিণীর তিন ধারে উদ্যান।
এক ধারে কুসুম-কানন, অপর দুই ধারে আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষে পরিশোভিত।
তোরণ হইতে আরম্ভ করিয়া পুষ্করিণী ও তৎপার্শ্বস্থ উদ্যান ব্যাপিয়া ইষ্টক
নির্ম্মিত প্রাচীর। সকল স্থানেই দেব সেবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। অভ্যাগত
ব্রাহ্মণ ও অতিথি সকলের সৎকার ঐ সকল দেবালয় স্থাপনে মুখ্য উদ্দেশ্য।

সাধকের মত গুণবান লোকের অন্ততঃ একদিন অবস্থান ব্যতীত ঐ সকল
স্থান অতিক্রম করা নিতান্ত দুরূহ। যাহা হউক, তিনি পথে নানা স্থানে অতিথি
সৎকার গ্রহণ করিয়া অম্বিকায় উপস্থিত হইলেন।

সাধক অম্বিকায় শৈশব কাল অতিবাহিত করিয়া ছিলেন, যৌবনের উন্মুখ
অবস্থায় অম্বিকা হইতে চান্নায় আসিয়া বাস করেন। জ্ঞানের উন্মুখ অবস্থায়
শৈশবের লীলাভূমি, পরিত্যাগ করিয়া মানব স্থানান্তরিত হইলে শৈশবের
লীলাভূমি কল্পিত স্বর্গের সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। শৈশবে
ও যৌবনের আরম্ভে মানব সমুদয় জগতকে নবভাবে দর্শন করে। তৎকালের
প্রণয় বন্ধন গভীর ও সুদৃঢ়। মন আপনার থাকে না। মন জগতের হয়।
মানব সে সময় যাহা দেখে, তাহাকেই ভালবাসিতে চায়, পুরুষ হউক, আর
প্রকৃতিই হউক, তাহাতে আপনার মন মিলাইয়া দেয়। যৌবন উন্মুখ শৈশবের
লীলাভূমি তাহার প্রকৃতি পুরুষকে লইয়া স্থানান্তরিত ব্যক্তির প্রাণের অঙ্কে
অঙ্কে, স্তরে স্তরে নৃত্য করিতে থাকে। সেই স্থানের সম বয়স্ক ব্যক্তির সহিত
প্রেম, সেই স্থানের তরুরাজি, সেই স্থানের নদী, তড়াগ, জলাশয় সমুদয়,
সেই স্থানের পক্ষী কুলের কলধ্বনি, সেই স্থানের ভ্রমণ, শয়ন, ভোজন, সুখ
অনুভব স্থানান্তরিত ব্যক্তির মনকে অতিশয় বিচলিত করিয়া তোলে। স্থানা-
ন্তরে যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বৃদ্ধে মানব তদপেক্ষা সহস্র সুখ অনুভব করিলেও প্রকৃতির
শোভা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট হইলেও তাহাকে যৌবন প্রমুখ শৈশবের লীলাভূমি
ভুলাইতে পারে না। সেই সময়ের প্রণয় অতি পবিত্র, স্বার্থপরতা ও পাপের
লেশ মাত্র থাকে না। প্রাণ ভালবাসিতে চায়, কেন ভালবাসিতে চায়, প্রাণ
বুঝিতে পারে না ও বুঝিবার চেষ্টাও করে না। সেই জন্য শৈশব ও নব-
যৌবনের প্রণয় সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। প্রণয়ের জোয়ার ভাটা থাকে না,
প্রণয়ের ক্ষয় বৃদ্ধি থাকে না, চিরকালই নূতন, চিরকালই সমসুখদায়ী। সাধক
আজ সেই শৈশবের লীলাভূমি অম্বিকায় পুনরাগমন করিলেন। সাধক
জননীর সহিত প্রথমে তাঁহার ধনাঢ্য শিষ্যের গৃহে গমন করিলেন, শিষ্যমণ্ডলীর
দ্বারা পূজিত ও সম্মানিত হইয়া অম্বিকায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং
বাল্য-বন্ধুগণের সহিত সুখালাপ করিয়া সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

সাধক অম্বিকা কাল্‌নার কত নব ভাবের দর্শন করিলেন। সচ্চিদ্রুথে
বিনাশিনী সুরতরঙ্গিণীর সহবাসে অপার সুখ অনুভব করিতেন। এখন
তাঁহার দর্শনে সেই সুখের পুনরুদয় হইল। সকাল সন্ধ্যায় অপার সময় পাইতেন,

মায়ের কোলে আসিয়া বসিতেন। তীরে বসিয়া প্রতি তরঙ্গ বিক্ষেপে জলদ বরণী ভুবন-মোহিনীর নৃত্য দর্শন করিতেন। পণ্য পরিপূর্ণ তরণীর নাবিক গণের আনন্দ ধ্বনি, পারঘাটে জনতা, দেখিয়া মৃদু মধুর স্বরে হাস্য মুখে গাহিলেন :—

সংসার জলনিধি অনিবার, তরণী শ্যামাপদ সার কর রে মন।
তুরিত ভবার্ণব পারাবার, শ্রীগুরুদেব কর্ণধার রে।
ভুলেছ কি ভ্রান্তি বশে, দিন গেল মিছে আশে,
মন! না চিন্তিলে হিত আপনার।
নিয়ত চঞ্চল তুমি, যন্ত্রণা ভাজন আমি,
অনুচিত তোমার বিচার।
মন রে! মিনতি রাখ, কালী কালী বলি ডাক,
অনায়াসে হবে নদী পার।
কমলাকান্তের ইহ কালে পরকালে, কালী বিনা গতি নাহি আর॥

লোক অতি অল্প সময়ের মধ্যে নদী পার হইতেছে, কিন্তু সংসার সমুদ্র অনিবার, তাহার পার নাই, অবধি নাই। কত কত বার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, কত যোনী ভ্রমণ করিতে হইবে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া যাতায়াত করিতে হইবে। এই সংসার জলধি তরিবার সম্বল সামান্য অকিঞ্চিৎকর নহে, অমূল্য রত্ন চাই, সেই অমূল্য রত্ন কালী নাম, মহাশক্তি কালী নাম, বাসানা শূন্য মনে, উদার হৃদয়ে সেই মহাশক্তির উদ্দীপনে ভব যন্ত্রণা নিবারণ হয়। সাধক মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "মন! আমি তোমার জন্য যন্ত্রণা ভাজন।" মনকে সম্বোধন কেন? আমি আর মন কি এক বস্তু নয়? মনই ত আমিত্ব প্রতিবোধক। মনই নেতা, উপদেষ্টা, অতএব "আমি" মনের দাস। আমি ও মন প্রায় বস্তু, এক মতাবলম্বী। মনকে সম্বোধন করিবার কারণ এই মন বড় চঞ্চল, সর্ব্বদা এক ভাবে থাকে না। বিবেক বুদ্ধি মনেরই, সব জানে, কিন্তু মাঝে মাঝে চোরাগরুর মত পথ ছাড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে, আবার প্রকৃতিস্থ হয়। যখন মনের মত মন হয়, তখন "আমি" তাহাকে তিরস্কার বা নিন্দা করে সেই তিরস্কার বা নিন্দা আত্মগ্লানি। অনেক গানেই মনকে সম্বোধন করিয়া উক্তি আছে তাহা বিবেক বুদ্ধির উদয় বা মনের আত্মগ্লানি। সাধক কবি আবার বলিতেছেন, "কালীনাম ইহকাল ও

পরকালে একমাত্র গতি। সংসারের সুখ সম্পদ, পুত্র, পৌত্র ভোগ বিলাস, কালীনামে লাভ না হইতে পারে, কিন্তু কালীনামে আত্মার পবিত্রতা, আত্মার প্রসন্নতা, জ্ঞান, সর্ব্বজীবে দয়া জন্মে, কালীনাম মানবকে সংসারে স্বর্গের সুখ ভোগ করায়। কালীনাম রস পিপাসু আত্মা বিপুল পুণ্য লাভে সক্ষম হয়। বিশুদ্ধ আত্মার সংসার কানন পার হইবার পথ সহজে প্রশস্ত হয়।

সাধক নদীকূলে দাঁড়াইয়া প্রকৃতি পুঞ্জ, শ্যামল ক্ষেত্র, সমুদয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাদের সেই হাস্যময় ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, "আমার ভব ভাবিনীর ভাবের বিকৃতি কখনও দেখি না। সর্ব্বদাই এক এক ভাবে সজ্জিত। প্রকৃতি রূপিণী আমার সর্ব্বদাই হাস্যময়ী, আ মরি কি অনুপম দৃষ্টি। মায়ের আমার এ মূর্ত্তির দিকে যখন নিরীক্ষণ করি, তখনই পরমানন্দ ভোগ করি। মানব কি এই সকল প্রকৃতি ছাড়া কখনই নয়? তবে কেন মায়ের এত ভাবান্তর— হাহাকার, চীৎকার, রোদন, ক্রন্দন, বিভীষিকা দর্শন; শিরে করাঘাত, বাষ্পাকুল নয়ন। এ সকল কি ভব ভাবিনীর নাট্য মন্দিরের প্রহসন? যদি প্রহসনই হয় তবে কেন এই প্রহসন দর্শনে হাস্যের উদ্রেক না হইয়া হৃদয় অতি বড় দুঃখে ব্যথিত হয়? অথবা ঐ সকল মায়াময় জগতের রাক্ষসী মায়া। তত্ত্ব জ্ঞানের উদ্বোধক। সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মাইবার উপায়? যাহা হউক মানব প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ, অতি বিচিত্র। বিচিত্রের বিশেষত্ব থাকা অসম্ভব নহে।" সাধক এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নদীকূলে বিপণী শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, প্রায় সবই নূতন বুঝিলেন, "এ সংসারে পুরাতন থাকিবার অধিকার নাই। নূতন পুরাতনের স্থান অধিকার করিবে এই প্রকৃতির নিয়ম। এক মাত্র কাল চিরন্তন, তাহার ধ্বংস নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই। যেমন অনন্ত আকাশের নিচে সমুদয় দৃশ্যমান জগৎ পরিবর্ত্তন শীল, তেমতি অনন্ত কাল পরিব্যাপ্ত সমুদয় পদার্থই বিকার সম্পন্ন। সেই অনন্ত কালই কালীনামে অভিহিত; মহাশক্তি সম্পন্ন নির্ব্বিকার শবরূপ মহাকালের উপর সংস্থাপিত। হায় হায়, মায়ের আবার চতুর্ভুজ, করাল বদন, গলে মুণ্ডমালা, করে অসি। সাধক মৃদুস্বরে গাহিতে লাগিলেন :—

সদানন্দময়ী কালি! মহাকালের মন মোহিনী গো মা।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ আপনি দাও মা করতালি;
আদি ভূতা সনাতনী শূন্য রূপা শশী ভালী!

যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিলনা মা গো, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি।
তুমি যেমন রাখ, তেম্নি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি॥
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি।
এধার অসি ধরে সর্ব্বনাশি, ধর্ম্ম কর্ম্ম ছুটাই খেলি॥

সাধক জগন্ময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিতেছেন; "অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত দৃশ্যমান সমুদয় জগৎ হাস্যময়। মা তুমি সদানন্দময়ী! জগতের কোন পদার্থই তোমা হইতে পৃথক নহে। নিত্য নিরঞ্জন অনন্ত কাল তোমার অনন্ত লীলার বশীভূত। কই দুঃখ কই, কই ক্রন্দন কই, কই ভীষণ ভাব কই; সবই আনন্দময়, সবই নৃত্যশীল, সবই প্রেমানন্দ পরিপূর্ণ।" আবার অন্তরে ব্রহ্মময়ীর রূপ দর্শন করিয়া বলিতেছেন, "একি! গলে মুণ্ডমালা! হা, মা তুমি যে আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা, তোমার আগেও কিছু ছিল না, প্রলয়ের পরেও কেবল তুমি থাকিবে, তবে এ রূপ কোথায় পাইলে, এ রূপ কে কল্পনা করিল।" পাছে রূপ কল্পনার প্রতি দোষারোপ করা হয়, ভাবিয়া আবার বলিলেন, "ও মা আমার দুষ্টতা, আমি বুঝিতে পারি না, তুমি যেমনি বলাও তেম্নি বলি, তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার যন্ত্রের উপাদান মাত্র, যেমন করিয়া রাখিয়া যে নিয়মে চালাইবে সেইরূপ চলিব; কিন্তু মা মনের গোলমালও মিটাইতে পারিতেছি না, তোমাকে স্বরূপ বুঝিবার ক্ষমতা দাও নাই কেন? মা! তোমার প্রতি অভিমান করিয়া তোমাকে গালাগালি দিতে ইচ্ছা হইতেছে, যাহা হউক, তোমার মুণ্ডমালী রূপ সত্যই হউক, আর কল্পনা করাই হউক, কিন্তু কি মোহিনী শক্তি! তোমার এ রূপ ভাবিয়া আর কিছু ভাল লাগে না, ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ভুলিতে বসিয়াছি।" সাধক যখন তখন সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিনী জাহ্নবীর তীরে আসিয়া পরিতৃপ্ত হৃদয়ে তীরে বসিতেন এবং বালকের ন্যায় জননীর কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিতেন।

ক্রমশঃ

গুপ্ত কবির কাহিনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায়।

(বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক তাঁহার পূজ্যপাদ পিতা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়া ছিলেন।)

স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত এক সময়ে বঙ্গের প্রধান সাহিত্য সেবক ছিলেন, এবং অনেকের মতে তিনিই বঙ্গের শেষ বাঙালী কবি। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রভৃতি বঙ্গের মুখোজ্জলকারী সাহিত্য সেবকগণ তাহারই হাতে পড়া শিষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য,—গুপ্ত কবির জীবন চরিত প্রণীত হয় নাই; বঙ্কিম বাবু এক সময়ে বলিয়া ছিলেন যে, কবির রচনার সঙ্গে পরিচিত হইবার আগে কবিকে চেনা দরকার। বাস্তবিকই তাই। কিন্তু আমরা বঙ্গের প্রধান লেখকের এই অমূল্য উপদেশের প্রকৃত সমাদর করি না—করিতে জানি না। বাঙ্গলা ভাষায় কয়েকখানা জীবন-চরিত আছে? যাহা আছে, তাহার ভিতরে অধিকাংশই প্রকৃত জীবন-চরিত আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে না। গুপ্ত কবির নিবাস কাঁচড়া পাড়ায় ছিল, তাহা বোধ হয়, অনেকেই জ্ঞাত আছেন। যে সময়ের ঘটনাটী আমরা লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছি, সেই সময়ে গুপ্ত কবি প্রভাকর সম্পাদন করিতেন।

একদিন তিনি আহারাদি সমাপন করিয়া স্বীয় কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, আর কবি-গৃহিণী সাংসারিক কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন। তখন অপরাহ্ন কাল। তপনের ভীষণ কিরণ সন্তাপে সকলে তাপিত। বনরাজিনীলা, নানা পক্ষীকুলের কুজন মুখরিত, কাঁচড়াপাড়া যেন মধ্যাহ্ন প্রকৃতির শান্তিময় ক্রোড়ে গভীর সুপ্তিভরে ঢলিয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে বাহিরে মহাকলরব শ্রবণ করিয়া কবি-গৃহিণী কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে বাড়ীর বাহিরে ঘটনার মর্ম্ম জানিবার জন্য আগমন করিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অনেক গুলি ব্রাহ্মণ রুদ্রমূর্ত্তিতে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্বামীর উদ্দেশে নানা রকম কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন এবং কেহ কেহ পৈতা ছিঁড়িয়া শাপ দিয়া গুপ্ত কবিকে সবংশে ধ্বংস করিবার ভয় দেখাইতেও ছাড়িতেছেন না।

কবি-গৃহিণী ব্যাপার দেখিয়া মহা শঙ্কিতা হইয়া বাড়ীর অভ্যন্তরে পুনঃ

প্রবিষ্টা হইয়া গুপ্ত কবিকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া ঈষদ্ হাস্য বদনে বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আগমন করিলেন। তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ আরও রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র মিষ্ট কথায় ব্রাহ্মণগণকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া সকলকে বাড়ীর ভিতরে আনয়ন করিয়া একটী কক্ষে উপবেশন করাইলেন। তাহার পর তিনি ব্রাহ্মণগণের রাগান্বিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণগণের মুখে যাহা শ্রবণ করিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ:—ঈশ্বরচন্দ্র ঐ সময়ে ব্রাহ্মণগণের তদানীন্তন আচার ব্যবহারের প্রতিকূলে কোন পত্রিকায় তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপনাদের নামে কলঙ্ক প্রচারিত হইতে দেখিয়া, ব্রাহ্মণগণ মহা রাগান্বিত হইয়া ক্রোধানলে গুপ্ত কবিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবার জন্য তাঁহার সমীপে সদলবলে আগমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের মুখে সমস্ত রহস্য অবগত হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র প্রশান্ত, মিষ্ট বচনে ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ শান্তির জন্য প্রয়াস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে যেন জলন্ত ইন্ধনে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হইল। ব্রাহ্মণগণ অধিকতর কুপিত হইয়া উঠিলেন। ইতি মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ গবাক্ষ পথে পরিদৃশ্যমান কদলী বৃক্ষ দর্শনান্তর একটা মতলব আঁটিয়া গুপ্ত কবিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কবি ত ভারি! অমন কবি ঢের দেখেছি, আচ্ছা বাবু, তুই যদি কবি'ই হলি, তবে কলার ক্রন্দন সম্বন্ধে একটা পদ্য মুখে মুখে রচনা কর দেখি! তা হলেই তোর কবিত্ব বোঝা যাবে।"

ঈশ্বরচন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"আমি যদি কদলীর ক্রন্দন বিষয়ে একটা কবিতা এখনই রচনা করে দিতে পারি, তা হলে ত আপনারা আরও ক্রুদ্ধ হবেন না?" গুপ্ত কবির পক্ষে এ রকম পদ্য রচনা করা কোনরূপ আয়াস সাধ্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত না। তখন ব্রাহ্মণগণ একবাক্যে গুপ্ত কবিকে জানাইয়া দিলেন যে, তাহা হইলে তাঁহারা রাগান্বিত হইবেন না, অধিকন্তু সকলে কবিতা শ্রবণান্তরে বিনাবাক্য ব্যয়ে, শান্ত, সুবোধ, বালকের মতন স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন ব্রাহ্মণগণের এই নিদারুণ ক্রোধ শান্তির অমোঘ উপায় স্বরূপ একটী কবিতা হাস্য বিজড়িত কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন:—

গোলক বিহারী হরি ভৃগু পদ বক্ষে ধরি
তোদের মান বাড়িয়েছে।

শোন রে শোন লেড়ে লেড়ে গলায় দড়া ভেড়ে ভেড়ে
তাইতে তোদের প্রণাম করি—
(বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখাইয়া)
নইলে কলা কেঁদেছে॥"

ব্রাহ্মণগণ তখন মুখের মতন জবাব পাইয়া, আস্তে আস্তে সে স্থান ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

উপরি উক্ত কাহিনীটিতে আর কিছুই না হউক, গুপ্ত কবির প্রত্যুৎপন্ন মতিতার পরিচয় দিতেছে এবং তৎসাময়িক সমাজের একখানি উৎকৃষ্ট আলেখ্য সন্দেহ নাই।

রূপসী।

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী।

নয়নে কুসুমে ঢাকা শত তীক্ষ্ণবাণ,
অধরে অমৃত মাখা তীব্র হলাহল।
ও মুখে মধুর বাণী—বাঁশরীর গান—
নির্ম্মম ব্যাধির করে। অশ্রু তব ছল!
পাতিয়া রূপের জাল তুমি লো সুন্দরি,
রূপ মুগ্ধ দেখাইয়া প্রাণ-প্রলোভন—
পাশবদ্ধ কর নরে দিবা বিভাবরী!
কি কৌতুক তব ওই—কি সাধ সাধন?
করিয়া সদয় তুমি কোন্ দেবতায়,
লভিলে এ হেন রূপ কোন্ তপোবলে?
ফুটেছে অনল ফুল গহল লতায়—
দরশনে মোহ—পরশনে অঙ্গ জ্বলে!
ও মন্দিরে কি ক্ষুধার্ত্ত রাজে শয়তান—
নিত্য চাহে শত শত প্রাণ বলিদান!

সিদ্ধিলাভ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিদাস ব্রহ্মচারী।

যিনি শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, বিশ্বের বীজস্থানীয়, ঋক্ যজু সামবেদ যাঁহার প্রশংসা গান করেন, যিনি অদ্বিতীয় অবিনশ্বর, স্থূল, সূক্ষ্ম, নিত্য অনিত্য, বিশ্বস্বরূপ হইয়াও আবার বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র, যিনি চরাচর স্রষ্টা, জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত; সদা আনন্দময় ইন্দ্রিয়াদি মনঃ বুদ্ধি সত্য তেজঃ বল ধৃতি শ্রুতি স্মৃতি সেই অনাদি নিধন ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ লোকগুরু, জীবের দুঃখে কাতর হইয়া অবতার গ্রহণ করেন। কলির দুর্ব্বল মানবের ভিতর থাকিয়া, এই কালোপযোগী জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হায়! দুর্ব্বল আমরা ধরিতে পারি না, তাঁহাকে ধরিতে শক্তি চাই; যার সে শক্তি আছে, সেই ধরিতে সমর্থ হয়, যোগী ঋষিরা ধরেন; তাঁহাদের সে শক্তিরূপ ব্রহ্মচর্য্য আছে, তাহাতেই তাঁহাদের ভিতর ভগবানের আবির্ভাব, যেমন কাঁচে সূর্য্যের বেশী আভা; তিনি এই জীবের ভিতর আছেন, ধরা দেন না; ধরে তাহারা, যাহারা তাঁহার সন্ধানে ফেরে। মানুষ আর মানহুঁস; যে মানুষে হুঁস আছে, সেই মানব ধরে, সেই জন্য মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, মনুষ্যের ভিতর তিনি সমস্তই দিয়াছেন, এখন হুঁস হইলে হয়; কিন্তু সে হুঁস অর্থাৎ চৈতন্য হওয়া দুর্লভ। মনোরূপে জীবের ভিতর তিনি বাস করিতেছেন; আগে তাঁহাকে জান। সাধন-তপস্যা ভিন্ন তাহা হইবার উপায় নাই। এইরূপে নিয়ম পূর্ব্বক তপঃ জপ চলিলে সেই জ্ঞানময় গুণসিন্ধুর কণামাত্র কৃপা হইলে জীবের মুক্তি হইল। ব্রহ্মচর্য্য ধারণরূপ আচার হইলে শুদ্ধ মন শুদ্ধ আত্মা হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ নিমাই পণ্ডিত যখন টোলে পড়াইতে ছিলেন, কেহ তাঁহাকে বলিল, আপনি নিজে যখন শিক্ষা দাতা তখন আপনার ছাত্রেরা কেন অনুপযুক্ত? নিমাই পণ্ডিত উত্তর করিলেন, ছাত্রেরা অপব্যয় করিয়া ফেলে। মেধা কোথা হইতে হইবে। লক্ষণ চৌদ্দ বৎসর স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করেন নাই। সীতার মুখপানে চান নাই, সীতার অলঙ্কার শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণকে দেখানতে লক্ষণ বলিলেন, "আর্য্য! আমি কেবল পায়ের অলঙ্কার চিনি। অন্য অলঙ্কার জানি না।" ব্রহ্মচর্য্য ধারণ হলে মনঃ সংযত হয়, চিত্ত নিবৃত্তি লাভ করে; তখন বৈরাগ্য হয়! ঠিক্ যাহার বৈরাগ্য হয়, সেই শরণাগ হইতে পারে,

নহিলে মুখে শরণাগত হইলাম বলিলে হয় না। সেই ভগবান মনে ব'সে মন দেখেন, শরণাগত হইলে তাঁর কৃপা হবেই।

এ সংসারচক্রে জীব অহর্নিশ কর্ম্ম-বিপাকে ঘুরিতেছে; শান্তি পাইতেছে না, কেবল ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে; চুষিকাঠি ফেলিয়া মা বলিয়া কাঁদিবে, তখন মা আসিয়া স্তন্য মুখে ধরিবেন। কিন্তু চুষিকাঠি ফেলিয়া দেওয়া মুখের কথা নয়। গুরু শিষ্যকে বলিলেন, দেখ সংসার অনিত্য বুঝিতেছিস্ ত? দু'দিনের জন্য কেহ কাহারও নয়। জীব নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য পৃথক্ আসে, পৃথক্ যায়; এখানে আসিয়াই সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে, এ আমার স্ত্রী, এ আমার পুত্র; এ আমার মাতা এইরূপ কত কত! অতএব চল্ আমার সঙ্গে। শিষ্য উত্তর দিল, "গুরুদেব! কেমন ক'রে যাইব, স্ত্রী ভালবাসে—পিতা মাতা কত স্নেহ করেন! সংসারের কত আশা ভরসা" ইত্যাদি। তখন গুরুদেব বলিলেন, "বাছা! ও সকল কেবল মহামায়ার মায়া, আমি একটি বটিকা ঔষধ দিতেছি, তুমি এইটি রাত্রে আহারের পর খেয়ে শুয়ে থেকো; মরিবে না, ভয় নাই; আমি কাল তোমার বাড়ীতে গিয়া তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিব, কে কত তোমাকে ভালবাসে।" শিষ্য গুরু-আজ্ঞা পালন করিল। পরদিন বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল, শয্যায় অঙ্গ কাঠ মত হইয়া পড়িয়া আছে। বাড়ী শুদ্ধ রোদনধ্বনি; সকলের শোকালন উথলিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় এক ঘটনা ঘটিল। তেজঃপূর্ণ কলেবর এক সন্ন্যাসী মহাপুরুষ ঐরূপ রোদনধ্বনি শুনিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের রোদনের কারণ কি?' তখন বাড়ীর সকলে একবাক্যে বলিল, "আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" পিতা বলিলেন, "আমার পুত্রটি মারা গিয়াছে।"

সন্ন্যাসী। আমি কি একবার দেখিতে পারি?

পিতা আসুন। বলিয়া যে ঘরে মৃতদেহ রহিয়াছে, সেই ঘরে সন্ন্যাসীকে লইয়া গেল।

সন্ন্যাসী নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "এ মরে নাই। চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী ঝুলি হইতে একটি বটিকা বাহির করিয়া বলিলেন, "এই বটিকাটি যে কেহ খাইলে এ ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠিবে; কিন্তু যে খাইবে সে মারা যাইবে। তোমরা ত এত রোদন করিতেছ, ইহার মাতার ও স্ত্রীর রোদনটা বেশী—তা দু'জনের মধ্যে কেহ একজন খান্ না কেন?"

তখন মার ও স্ত্রীর মধ্যে কেহই যাইতে সম্মত হইল না। মাতা বলিলেন, "আমি সংসার না দেখিলে, সংসার চলিবে না।" স্ত্রী বলিল, "অমোঘ-পুত্র কন্যাদিগকে আমি না দেখিলে আর কে দেখিবে। ওঁর ত যা হবার হইয়া গিয়াছে।

গুরুর কৃপায়, সেই দেহ মৃতবৎ ছিল মাত্র। ভিতরে জ্ঞান ছিল। মাতার ও স্ত্রীর কথা গুলি শুনিয়া উঠিয়া বসিল, তখন গুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "গুরুদেব! এইবার চলুন, আপনার কৃপায় আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে।" সে তখন সংসার ত্যাগ করিয়া গুরুর সহিত চলিয়া গেল। ইহাকেই বলে—মা যদি কেশে ধরে তোলে।

কোন সময়ে অর্জ্জুন প্রভু ভগবান্‌কে বলিতেছেন, "সখা! সে ব্যক্তির ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ হইল, সে ইহ-পরকাল কিছুই পাইল না।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"সখা, সে ইহ জন্মে যাহা কিছু করিল, পরজন্মে তাহাকে এমন স্থান দি—যে তাহা হইতে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধিলাভ করে।" তা এ জন্মে এই ব্রাহ্মণ কুমার যে কার্য্য করিয়া ভগবান্‌কে পাইয়াছিল, সে কথা বলিতেছি। বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইলে, সেই ব্রাহ্মণ কুমারের মনে কেমন এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল যে, আমি ভগবানের উদ্দেশ করিব, মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিল এবং অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পিতা মাতা এখন হইতে তাহাকে কেমন এক প্রকার উদাসীনের ন্যায় দেখিতে লাগিল। ক্রমে তাহার ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইল। সন্ধ্যা গায়ত্রী উপাসনায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত করিত। এইরূপে কিছুদিন যায়; সংসারের ভিতর থাকিয়া তাহার এ সকল কার্য্যে অনেক বাধা বিঘ্ন হয় দেখিয়া একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া সে কোথায় চলিয়া গেল! তাহার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়াছে, তখন সে কি আর স্থির থাকে! আপন মনে ভাবে বিভোর হইয়া অনেক পথ অতিক্রম করিয়া এক নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া ধ্যানযোগ অবলম্বন করিল। সেই নিবিড় বনে একমাত্র ভগবৎ চিন্তায় থাকায় ভগবান্ তাহার সহায় হইলেন। এইরূপে কতদিন কত রাত্রি গেল তাহার ভ্রুক্ষেপও নাই। সে তখন এত তন্ময় হইয়া গিয়াছে! হৃদয়ে সেই প্রভু ভগবানকে দেখিয়া বিভোর হইয়া আছে। মহামায়ার মায়া। এদিকে তাহার পিতা মাতা পুত্রহারা হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল; পুত্র কোথায় ওদ্যোগন, জননী পাগলিনীর ন্যায় হইল, পিতা মাতার রোদন বিলাপে পাষাণ

বিগলিত হয়। পাড়া প্রতিবাসীরা আসিয়া কত সান্ত্বনা দিতে লাগিল; কিন্তু হায়! তাহাতে তাহাদের মনে কি শান্তি হয়? একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় গেল, রাত্রি দিন এই ভাবনা! সংসারে জীবন বিহীনের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিল। কোন উপায় নাই, দেখিয়া অবশেষে ভগবানে নির্ভর করিয়া রহিল। মনের বেদনা মনে চাপিয়া অতিশয় দীনের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিল।

এই সময় হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণকুমার এক বাধা প্রাপ্ত হইল, তাহাতে তাহার মন প্রাণ অবসন্ন হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, তাহার দীক্ষা মন্ত্র ত হয় নাই। কেমনে ভগবান্ লাভ হইবে! আবার মনে উদয় হইল যে, "গুরুব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুগুর্রুদেবো মহেশ্বরঃ" তিনিই আমার গুরু, এই প্রহেলিকায় পড়িয়া তাহার মন বিচলিত হওয়ায় উঠিয়া পড়িল। "কোথায় যাই, বাটী ফিরিয়া যাই" মনে হইতে লাগিল। এই বলিয়া ব্রাহ্মণকুমার বাটী ফিরিবার উপক্রম করিতেছিল। ভক্তবৎসল ভগবান্ দেখিলেন, আহা! ভক্ত আমার নিষ্ফলে বাটী ফেরে, তখন তিনি এক পূর্ণ ঘট হইয়া পথ মধ্যে রহিলেন। যেমন সেই ব্রাহ্মণকুমার সেই ঘটের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, অমনি সেই ঘট হইতে গভীর শব্দে দৈববাণী হইল, "হে ব্রহ্মন্! তুমি ভগবৎ উদ্দেশে বাটীর বাহির হইয়া এই অল্পকালের মধ্যে ঈশ্বর লাভ হইল না, বলিয়া বাটী ফিরিতেছ? কিন্তু ভগবান্‌কে কি, কেহ সহজে পায়? যোগী ঋষিরা কত যুগ যুগান্তর তপস্যা করিয়া তাঁহাকে পাইতেছেন না। আর তুমি এত অল্প আয়াসে তাঁহাকে পাইবে? দেখ! আমি এই ঘট; কুমারেরা মাটী কাটিয়া আনে, পা দিয়া চটকায়, তারপর কত পেটে, রৌদ্রে রাখে, পনে দেয়, পোড়ায়; এত কষ্ট সহিয়া তবে আমি কলসী ঘট হইয়াছি; তুমি এই মন্ত্র লও, অধ্যবসায়ের সহিত ধ্যানযোগ কর, অবশ্য ভগবান্ দর্শন পাইবে।" তখন পুনরায় সেই ব্রাহ্মণকুমার তথায় আসিয়া একাগ্রচিত্তে দৃঢ়তার সহিত পুনরায় ধ্যানে বসিল। এবার যেন হৃদয়ে এক অভিনব শক্তি অনুভব করিল। অচিরাৎ ভগবৎ কৃপায় সমাধি লাভ করিল; তখন ভক্তবৎসল প্রভু জ্যোতির্ম্ময় মুর্ত্তিতে সেই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়া দেখা দিলেন। শঙ্খ স্পর্শ মাত্রেই চৈতন্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণকুমার সম্মুখে দেখিল, যে অপূর্ব্ব তেজঃপুর্ণ জ্যোতির্ম্ময় মুর্ত্তিতে ভগবান্ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাহার মনে যে তখন কি আনন্দ প্রবাহ বহিতে লাগিল, তাহা বর্ণনাতীত। তখন যে ভাবে পরম যোগী যোগ

কবেন যুগ যুগান্তরে, এরূপ ভাব-তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তি গদ্‌গদ্ ভাবে প্রভুকে স্তব করিলেন, "হে দেব দেব! তোমাকে নমস্কার; তুমি জন্ম মৃত্যু বিহীন, তুমি আদিদেব, তুমি শাশ্বত, তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি পরম পুরুষ, তোমাকে নমস্কার।" ভগবান্ তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বৎস! বরং বৃণু, তোমার অধ্যবসায়ে প্রসন্ন হইয়া তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি।" ব্রাহ্মণ-কুমার বলিলেন, "হে বরদ প্রভু! আপনার দর্শনে আমি সমস্তই পাইয়াছি, আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, তবে যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন, যেন আপনার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি থাকে।" ভগবান্ "তথাস্তু" বলিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণকুমারকে বলিলেন, "ভক্ত! তুমি ইহকালে সুখে থাকিয়া বিবিধ পুণ্যকর্ম্ম সকল করিয়া অন্তে আমার কৃপায় বৈকুণ্ঠে যাইবে, তোমার কোন বিষয়ের অপ্রতুল হইবে না।" এই বলিয়া ভগবান্ সেইখানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ-কুমার প্রফুল্লচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিয়া পিতা মাতার চরণ বন্দনা করিয়া আনুপূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। পিতা মাতা পুত্রের মুখদর্শন করিয়া হারানিধি পাইলেন ও এমন গুণবান্ পুত্র পাইয়া ধন্য জ্ঞান করিলেন। তদবধি সেই ব্রাহ্মণকুমার ভগবৎ কৃপায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া অনেক পুণ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। তিনি দার পরিগ্রহ করিলেন না। তাঁহার যশঃসৌরভে দেশ দেশান্তর হইতে লোক সমাগম হইতে লাগিল। যে যাহা বাসনা করিয়া তাঁহার কাছে আসে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়; কাহারও বাসনা অপূর্ণ থাকে না। পণ্ডিতমণ্ডলী আসিয়া কত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করাইতেন! ব্রাহ্মণকুমার ভগবৎ কৃপায় সমস্ত বিষয়ের এমন সদর্থ করিয়া দিতেন যে, বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। সেই ব্রাহ্মণকুমার পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারগুণে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন; এ জন্মে এই অল্প অনুষ্ঠানে একেবারে শাশ্বতধাম পাইলেন। ঘুড়ি লক্ষ্যের মধ্যে একটা কাটে।

রহস্য যবনিকা।

(গল্প।)

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ।

(১)

বাল্যকাল হইতে চপলার সহিত অনিলকুমারের খুব ভালবাসা ছিল। সে ভালবাসা শুধু বাল্যের সখা-সখী সম্বন্ধেই পর্য্যবসিত ছিল না; তাহা অপেক্ষা আরও কিছু গোপনতর—নিগূঢ়তর রসসম্বন্ধে উভয়ে আবদ্ধ হইয়াছিল।

তখন উভয়ে বালক বালিকা মাত্র ছিল, বন্ধনটী তত ভালরূপে অনুভব করিতে পারে নাই—কিন্তু যেদিন চপলাকে তাহার বাপ মা, তাহাদের খেলাঘর হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়া, তাহাকে আর এক সংসারে যোগ করিয়া দিতে গেল, তখন উভয়েই উভয়ের অভাব অনুভব করিয়া বুঝিয়া লইল যে, দুজনে কি বন্ধনেই জড়িত হইয়াছিল।

খেলাচ্ছলে যে মায়াযষ্টিটা লইয়া শুধু কৌতুকই করিয়াছে, যাহাতে করিয়া শুধু সাগরের—এক এক বাঁও জলই মাপিয়াছে, সেটা যে এমন চিত্তোন্মাদকর হইবে, তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

মৃত্যু আসিয়া যেন জীবনের সাড়া জানাইয়া গেল—কিন্তু তখন কোন উপায়ই ছিল না। খুব জোরে সানাই বাজিতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, আর পৃথিবী তাহার বিপুল কর্ম্ম-প্রবাহ লইয়া আপনার ভাবে আপনি নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। এ সব তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করিবার আদৌ অবসর ছিল না।

বিদায়ের পূর্ব্বে খুব গোপনে একবার দুজনে সাক্ষাৎ হইল।

অনিল। তা হলে তুমি নিশ্চয়ই অপরের হ'লে?

চপলা। হ'লাম বৈ কি!

অনিল খুব জোরে মাথাটা সঞ্চালিত করিয়া কহিল, "তা হও, দুঃখ যে কেমন গোপনে রাখ্‌তে হয় তা আমি জানি। কিন্তু তোমার মনে থাক্‌বে ত?"

চপলার চক্ষু বহিয়া জল আসিল। কিন্তু সেটা এত গোপন করিয়া গেল যে, অনিলকেও জানিতে দিল না, তাহার হৃদয়ের ব্যথা কতখানি। নিতান্ত স্বাভাবিক স্বরে একটি "হাঁ" উত্তর দিয়া গেল।

অনিল। তা হলে আসি।

চপলা। হাঁ, এসো।

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও আর কোন কথা হইল না। ভাষার মুখে যেন একটা পর্ব্বতের বাধা আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

ভাবগুলো শরতের মেঘের মত খুব খানিকটা অশ্রুবাষ্প লইয়া বুকের কাছে ছুটিয়া আসে, কিন্তু তখনি একটা হাহাকারে প্রতিহত হইয়া, শূন্যে ছড়াইয়া পড়ে। যেন একখণ্ড আকাশের উল্কাপিণ্ড ওমনি একটু দীপ্তি হানিয়া বায়ুস্তরেই লীন হইয়া যায়, প্রকাশ হইয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না। তবু এই আধোছায়া এই আলো আঁধারের লুকোচুরিতে কখন তাহাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া—জীবনের উপর দিয়া একখণ্ড স্বপ্নজাল রচনা হইয়া গেল।

যাহা কল্পলোকেরই মত অমৃতে ভরা, কাব্যালোকেরই মত ঝঙ্কারে স্পন্দিত। কিন্তু তাহারা তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহারা অন্তরে অন্তরে কেবলি অনুভব করিতে লাগিল—জীবনটা যেন গীতিগন্ধহীন শূন্যতার গভীর গহ্বর মাত্র। আর কবিত্ব তাহার বুকভরা আর্ত্তনাদ, প্রাণভরা অশ্রুজল। ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তারে কেবল ঐ বাণীই উদ্গত হইতে লাগিল।

(২)

চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ঘেরা বৃহৎ বাড়ীর মধ্যেই চপলা আবদ্ধ হইল। আর অনিলকুমার বুকে হাত দিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিল। চপলার ভাই বলিয়া পরিচয় দিয়াও একবার মাত্রও ভিতরে প্রবেশাধিকারও পাইল না। দেখা ত দূরের কথা! সে বাড়ীতে বাহিরের পুরুষের প্রবেশাধিকার একেবারে নিষিদ্ধ—এমনি কঠিন নিয়ম।

কয়েকটা নিশি, কয়েকটা দিন ঊর্দ্ধের জানালাগুলার পানে তাকাইয়া কাটিয়া গেল—চপলাও তাহার কোন সাড়া জানাইল না—তখন হতাশ হইয়া অনিল বাড়ী ফিরিবার উপক্রম করিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশ জুড়িয়া মেঘ উঠিয়াছে; অনিল সেই মুহূর্ত্তেই আপনার পোষাক পরিচ্ছদ আঁটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাবুদের বাড়ীর নায়েব কারকুনা অনেকে বাধা দিয়া কহিল, "এত রাত্রে যাওয়া উচিত হয় কি? এসেছেন যদি, দুদিন বেড়াতে?"

অনিল কহিল, "আজই আমায় বাড়ী যেতে হবে। আজ রাতটা মাসীর বাড়ীতে থেকে কাটিয়ে দেবো।"

চপলার স্বামী রজনীকান্ত অন্দরমহল হইতে চটীজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে আসিয়া কহিল, "এটা ঠিক হয় কি অনিল বাবু? আমার শ্বশুরের পড়্শী লোক!"

অনিল একগাল হাসিয়া রজনীর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কোন শঙ্কা নাই রজনী বাবু। রাস্তায় দুর্য্যোগ হয়, একটু দাঁড়িয়ে গেলেই পারবো, আর এ কলকাতার রাস্তা ভয়ই বা কি?" বলিয়া রজনীর হাতটা ধরিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রজনী সাম্নের নারকেল বাগানটীর নিবিড় অন্ধকারের দিকে চাহিয়া কহিল, "হুঃ—ভারি দুর্য্যোগ হবে অনিল বাবু! না গেলেই ভাল হতো।"

অনিল মাথা নাড়িয়া কহিল, "না—কিছু ভয় নাই,—আমি আসি, কাল না গেলে কাজের বড্ডই ক্ষতি হবে। আর বল্‌ছিলাম কি, চপলাকে তাহলে বল্‌বেন। তার বাবাকে বলবো, সব ভাল আছে।"

রজনীকান্ত কহিল, "আচ্ছা, আসুন, নমস্কার" বলিয়া অনিলের প্রতি নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

অনিলও তাহার উতলা হৃদয়টীকে দুই মুঠার মধ্যে চাপিয়া রাস্তার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। রাস্তায় একটা লোকও ছিল না। শুধু দূরের গ্যাসপোষ্টটা নীরবে জ্বলিতেছিল। অনিল ভাবিল, চপলা নিশ্চয়ই বড় বাড়ীর মধ্যে পুড়িয়া তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার বুকভরা ভালবাসাটা এখন মাঠে পড়িয়া মাটী হইয়া যাইতেছে, তাহার জন্য ভারি অনুতপ্ত হইল। কিন্তু উপায় নাই। তবু সে যে ভালই বাসিয়াছে, চপলা আর যদি তাহার দিকে ফিরিয়া না চায়—তবু সে যে চপলার নাম লইয়াই মরিবে। দীর্ঘশ্বাসের মত একটা উষ্ণ বাতাস উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার বুকে আসিয়া লাগিল। চপলার হাসিটীর মত বিদ্যুৎও একবার খেলিয়া গেল। অনিল সেই বিদ্যুতালোকে আর একবার চপলাদের পাষাণ হৃদয়ের মত বাড়ীখানা দেখিতে পাইল। ওঃ সে কি প্রকাণ্ড! আস্ত একটা দৈত্যশিশুর মত ডানা মেলিয়া বুক ফুলাইয়া আছে। এমন সময় দেখিতে পাইল, দ্বিতলের উপর দিকের জানালাগুলা সহসা খুলিয়া গেল। আর তাহার মধ্য হইতে প্রদীপের ছায়াগুলা ছুটিয়া অন্ধকারের বক্ষে উধাও হইয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

অনিল মনে করিল, হয় ত চপলার এ মেঘ ঝঞ্ঝা ঘেরা জগতখানাকে একবার দেখিবার সাধ গিয়াছে, কিম্বা বাতাসের উদ্দাম প্রবাহে শরীরটা ঠাণ্ডা করিয়া লইবার জন্য একবারে সব জানালাগুলা খুলিয়া দিল।

হাঃ চপলা এ সময় যদি একবার ভ্রমেও জানিতে—তোমার ভক্ত এ সময় প্রান্তরে মেঘ ঝঞ্ঝার মধ্যে ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা হইলে, অন্ততঃ আর কিছু না হউক, ভক্তের এ সান্ত্বনাটা থাকিত, দেবতার পূজার জন্য সে কি আয়োজনই না করিয়াছে।

আপনাকে সম্পূর্ণ বাধা মুক্ত করিয়া দিয়া—বর্ষার সলিল প্রবাহের মধ্য দিয়া—সমস্ত রাত্রি ভিজিতে ভিজিতে অনিল আপনার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাড়ীতে আসিয়া পাকে প্রকারে সে জানাইল, এইবার সে বিবাহ করিতে প্রস্তুত।

প্রতিবেশিনীরা কহিল, "এত দিন কথাটা বল্‌লেই হতো। চেপে রাখার কোন দরকার ত ছিল না।"

অনিল হাসিয়া কহিল, "বলা হয় নাই যদিও, এইবার সুদে আসলে তার দাবী পুষিয়ে নেওয়া যাবে।"

আবার জগতে একটা নূতন বসন্ত রজনীর আয়োজন চলিতে লাগিল। বাতাস তাহার উচ্ছ্বাস লইয়া,—ফুল তাহার গন্ধ লইয়া,—এবং প্রকৃতি তাহার দূরান্তে ঝঙ্কৃত সঙ্গীত প্রবাহ লইয়া—দিনের পর দিন সেই বিকাশকেই ঘনাইয়া তুলিতে লাগিল।

অনিল স্ত্রীকে দেখিয়া কহিল, "একি, এ যে, আমারি সেই খেলার সঙ্গিনী! আমারি অন্তর লক্ষ্মী—একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিল, "সেই প্রীতি স্নেহ গভীর সঙ্গীততানে উঠিছে ধ্বনিয়া, "স্বর্ণ বীণাতন্ত্রী হতে রণিয়া রণিয়া অনন্ত বেদনা বহি"——

অনিলের হৃদয় ভরিয়া গেল—দেখিল, আর তাহার জীবন সে শুষ্ক মরু নয়—কবিত্বের অমৃত প্রবাহ আপনি যেন উৎসারিত হইতে লাগিল।

(৩)

সহসা দেশে অত্যন্ত কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। কে কাহার যত্ন করে,—যে বাড়ীতে রোগ একবার প্রবেশ করে—সে বাড়ী উজাড় করিয়া

তবে যায়! এখন কে কাহার মুখে জল দেয়—কে কাহার মৃত দেহের সৎকারই বা করিয়া আসে? আর চারিদিকে শ্মশানের বিভীষিকা জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

প্রেমিক অনিলকুমার—সে কি আর স্থির থাকিতে পারে? দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে মৃতের সৎকার, আর ব্যথিতের বক্ষে অমৃত সিঞ্চন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কয়েক দিন অবিশ্রাম পরিশ্রম করিল, রোগ তাহাকেও নিষ্কৃতি দিল না। একদিন তাহার ঘাড় মুড় ভাঙিয়া, রোগ তাহারও স্কন্ধে আবির্ভূত হইল।

স্ত্রী বিজলী—কাঁদিয়া কহিল, কেন এত খাটতে গেলে? রোগ যদি আর না সারে?

"না সারে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন কর্ব্বো" বলিয়া স্মিত দৃষ্টিতে অনিল বিজলীর পানে চাহিল। বিজলী মাথায় হাত দিয়া কহিল, "আমার গতি?"

অনিল। যে পথে আমি চলেছি—সেই পথে তুমিও যাবে?

বিজলী। মৃত্যু যদি আমায় সে অনুগ্রহ না করে?

অনিল। না করে—বিশ্ব তোমার—বিরাট গৃহ, তুমিও বিশ্বের জীব।

বিজলী আর কাঁদিল না, স্বামীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া গেল। কিন্তু তৃতীয় দিন রাত্রে রোগ আরও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া দাঁড়াইল—অনিলই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আর তাহার চিকিৎসার কোন প্রয়োজন নাই। অনিলের আসন্ন সময় দেখিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিল। বিজলী স্বামীর পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল।

অনিল কহিল, "বৃথা অনুশোচনা বিজলী!—মৃত্যু একদিন সকলকেই তার কুক্ষি মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে। কিছুতে নিষ্কৃতি দেবে না—তবে দুদিন আগে আর পিছে, এমন সময় চপলা বাপের বাড়ী আসিয়া অনিলকে দেখিতে আসিয়াছিল। দৃশ্য দেখিয়া আর থাকিতে না পারিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অনিল চপলার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "চপলা তুমি এসেছিলে?"—চকিতে তাহার বুকের উপর দিয়া যেন একটা স্বর্গের ঢেউ খেলাইয়া গেল। উচ্ছ্বাসের আলোক ছটায় তাহার মৃত্যু কলঙ্কিত শীর্ণ মুখের উপরও যেন একটা স্বর্গের ভাব জমাট হইয়া জমিতে লাগিল। আস্তে আস্তে অনিল বিজলীর

হাতটা টানিয়া কহিল, "বিজলী, এত বড় একটা শাস্তি নিয়ে যে মর্ব্বো, তা আমি কল্পনাও কর্‌তে পারি নাই, ভগবানকে ধন্যবাদ। আমার শেষের বাসনা তিনি পূর্ণ করেছেন, বলিয়া আর একবার স্মিত দৃষ্টিতে চপলার মুখের দিকে চাহিল।

চপলা একবার একটী মর্ম্মান্তিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তারপর চোখ মুছিতে লাগিল।

প্রতিবেশীরাও বিস্মিত হইয়া অনিলের এই অস্পষ্ট মৃত্যু দেখিতে লাগিল—অনিল ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

(৪)

চপলার স্বামী রজনীকান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, "আচ্ছা চপলা, এবার বাপের বাড়ী হতে এসে অবধি তোমাতে যেন কেমন একটা কি লক্ষ্য কর্‌ছি, থাকো থাকো কিন্তু মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে পড়ো। এক একবার চম্‌কে উঠে, যেন চক্ষু মুছতে বাহিরে চলে যাও।"

চপলা কঠোর ভাবে স্বামীর হাত ধরিয়া বসিয়া রহিল। একটা কথাও উত্তর দিতে পারিল না। রজনীকান্ত আবার কহিল. "আচ্ছা চপলা এর উত্তর দেবে না, আমি তোমার স্বামী, বল না, অন্তরে অন্তরে কি ব্যথায় পীড়িত হচ্ছো ?"

চপলা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "না ওমন ধারা যদি বল্‌বে তবে আমার মরণই মঙ্গল" বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। আর একবারও উত্তর দিল না।

রজনীও চপলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু চপলা বারান্দায় দাঁড়াইল না। একেবারে নীচে গৃহকার্য্যে চলিয়া গেল—রজনী ভাবিল, তাইত আমার এমন সাধ্বী স্ত্রী—তবু তাকে আমি কি সন্দেহের চক্ষেই না দেখ্‌ছি। বলিয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পায়চারি করিয়াও তাহার ললাটের স্বেদ বিন্দু অপনীত হইল না। আবার ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

তখন ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। রজনী খাটের উপরে খানিক বসিয়া জান্‌লার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, মেঘ ইতস্তঃ ভাবে আকাশের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, বর্ষার বাতাস পাইয়া ক্রমেই তাহা যেন স্ফুরণের দিকে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে, অন্ধকার গাঢ়তর হইবার পূর্ব্বেই জগত খানি একেবারে কালী

মোড়া হইয়া গেল—আর আকাশ জুড়িয়া মেঘের উদ্দামে নৃত্য পড়িয়া গেল।

রজনী ঘরের সব জানালা বন্ধ করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। আর শুনিতে লাগিল—বাহিরের সে হাহাকার আর্ত্তনাদ, "বেদনায় তরু বল্লরী বীথি এ পাশ ও পাশ নড়া!" কল্পনায় এই ছিন্ন বসন, রিক্ত ভূষণ দুর্দ্দিনের মূর্ত্তিটার পানে চাহিয়া রজনীকান্ত ভীত হইয়া পড়িল—হায়, মানুষের জীবনে এই দিন যে কি গাঢ়তর, যাহা শোকের মাদক রসেই ডুবিয়া আছে।

সহসা বাতাসের একটা উচ্ছ্বসিত প্রবাহ জানালার রন্ধ্রপথ গুলিয়া ঘরের মধ্যে ক্রন্দনের সুরে গুমরিয়া উঠিল। রজনী কান্ত চমকিয়া উঠিয়া ডাকিল, "চপলা! চপলা!"

চপলা ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রজনী কান্তকে জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে আর্ত্তস্বরে কহিল, "শুনিতে পাচ্ছো! একটা রুদ্ধ আর্ত্তনাদ গুম্‌রে গুম্‌রে আমার দিকে ছুটে আস্‌ছে, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না একি, তবু আমার মাথার উপরে একটা হাহাকার ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে।" বলিয়া সবলে রজনীর বক্ষ আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রহিল।

রজনী তাড়াতাড়ি করিয়া আলো জ্বালাইয়া দেখিল, চপলার দেহ একেবারে হিম, যেন স্পন্দন বিরহিত, অনেকক্ষণ শুশ্রূষার পর যদিও চেতনা সঞ্চার হইল তথাপি পূর্ব্বাবস্থা কিছুতে পাইল না।

দিনের পর দিন গেল—তবু চপলার এ গুপ্ত বেদনার প্রতিনিবৃত্তি হইল না। প্রতিবেশীরা রজনীকান্তকে উপদেশ দিল—ওঝা দেখাও, এ ভূতে পাওয়া ব্যাধি সহজ নয়।

রজনীকান্ত যদিও কঠোর বৈজ্ঞানিক, এ সব ব্যাপারের উপর একেবারেই বীতশ্রদ্ধ ছিল—তবু রোগটা নিজের ঘাড়ের উপরেই বলিয়া এ সব মানিতে হইল। ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসা, ও ওঝা ডাকাইয়া ঝাড়ান, চলিতে লাগিল। একজন বিজ্ঞ ওঝা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "কোন ব্যক্তি মরিবার সময় তাহার সূক্ষ্ম আত্মাটী নিতান্ত স্নেহ বশতঃ জীবিতের কাছে রাখিয়া যায়—তা যদি হয়, তবে চপলার বিশেষ রকম চিকিৎসার দরকার।

রজনীকান্ত দু এক খানা ইংরাজী পুস্তক খুলিয়া দেখিল, তাও ত বটে, কথাটা ত নেহাৎ মিথ্যা নয়।

প্রকৃতি স্থির সময়—চপলাও এক একবার ভাবিতে চেষ্টা করে—তাই ত এ আমি হচ্ছি কি? তাহার এমন প্রেম বিহ্বল স্বামী তাঁর পূজা করতে পাচ্ছি না।' চক্ষে জলও সঞ্চিত হয়—কিন্তু তখনই কেমন একটা উৎকট চিন্তায় তাহার সব চেতনার রাজ্যে কেমন ওলট পালট বাঁধিয়া যায়। তখন তাহার মনে হয়, যেন সে সংসারের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধ চ্যুত, কেবল সে এখন এই রহস্য রাজ্যের দ্বারে একটা ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এ'লো চুল উন্মুক্ত করিয়া, বাতাসের দিকে ছড়াইয়া দেয়—রুদ্ধ যাতনার রুঢ় তাড়নায় গাহিয়া উঠে,—"আমায় টেনে নাও,—আমায় টেনে নাও"—ক্রন্দন একটা উদ্দাম হাহাকারে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

বর্ষা যত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল—চপলার চাঞ্চল্যও তত দ্বিগুণতর হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল—এত চিকিৎসাতেও একটু উপশম দেখা গেল না, রোগ ক্রমে হিষ্টিরিয়ায় পরিণত হইবার উপক্রম হইল।

তখন রজনীকান্ত হাল ছাড়িয়া দিলেন, কহিলেন, "যাহা হয় হউক। এ রোগ চিকিৎসায় যে সারিবে না, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, এখন প্রকৃতির নিয়মে যদি ভাল হয় ত হইবে। নচেৎ মানুষের আর সাধ্য নাই।"

বহুদিন রোগ শয্যায় থাকিয়া, চপলার দেহ নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল—এদিকে চপলাকে লইয়া রজনী কান্তেরও সংসারের কাজে যথেষ্ট ক্ষতি হইতে ছিল।

বৃদ্ধ মাসিমাতার হাতে চপলাকে সঁপিয়া দিয়া একদিন কর্ম্ম স্থানে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, মাসিমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল—"আমি দুদিন পরেই আসিব, তুমি রাতের বেলাটা চপলার বিশেষ একটু তত্ত্ব নেবে।

মাসিমা দুইচক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া কহিলেন, "যাট্ যাট্ হাঁরে রজনী বলিস্ কিরে, তোর স্ত্রী আমার কি কেউ নয়। এমন সতী লক্ষ্মী মা আমার"—বলিয়া খানিকটা কাঁদিয়া রজনীর যাত্রার পক্ষে বোঝাটা হাল্কা করিয়া দিলেন।

রজনী স্ত্রীকেও কহিয়া গেল—"দেখ চপলা, একটু সাবধানে থেকো, যন্ত্রণাটা চাপ্‌লে যেন উঠে হেঁটে যেতে যেও না।"

চপলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "এতদিন ত আমি বেশ ভালই আছি—মনে হচ্ছে, ওষুধ ছেড়ে দিয়ে ভালই হয়েছে, গরমটা অনেকটা কেটে গেছে, মনে হচ্ছে যেন সেরে যাবে।" রজনী নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রা করিল।

(৫)

রাতের বেলায় কাছে শুইয়া চপলার গায়ে হাতটী দিয়া মাসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ মা?"

চপলা কহিল, "বেশ ভাল আছি মাসিমা।"

মাসিমা কহিলেন, "তাই বলো মা—বেশ বল্লেই প্রাণটা জুড়োয় যেন। আর রোগ সেরে যাচ্ছে, কি বলো বউমা, রোজ শোবার সময় তিনবার করে শ্রীরাম শ্রীহরি বলো দেখি,—কি করবে বৈদ্যে যা করবে দৈবে। যখন আমরা ছোট ছিলাম, তখন আমাদের গাঁয়ের নাপিত বৌয়ের ওমনি হয়েছিল। তখন ত আর এখনকার মত ডাক্তার টাক্তার বড় ছিল না। আমাদের মুখুজ্যে মশয় কুনিয়ানের বড়ি করে রাখ্‌তেন—তাই খেয়ে কত জনাকার রোগ সেরে যেতো,—এখন যত রোগ, তত ওষুদ। নাপিত বউএর কি হলো কুনিয়ানের আর বেলপাতার রস খেয়েই সব ভাল হয়ে গেল, শুনছো বউমা।"

চপলা ঘুমের ঘোরে উত্তর দিল, "হাঁ।"

মাসিমা বুঝিলেন, বউমার ঘুম আসিয়াছে, তবে আর অধিক বকা কিছু নয়—এখন একটু ঘুমুক। কহিলেন, 'ঘুমোও মা ঘুমোও—কিছু ভাবনা নাই—ঠাকুর দেবতার নাম নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, সব আপদ বালাই কেটে যাবে—রেতে যদি জল তোমার তেষ্টা পায় আমায় ডেকো, আমি তোমায় জল দেবো—নিজে উঠ্‌তে যেয়ো না, আমার ঘুম খুব সজাগ। বুঝ্‌লে! বলিয়া বালিশটায় হাতটা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন।

নিদ্রাবেগে উভয়েই নিমগ্ন, এমন সময়—মাসিমার হঠাৎ মনে হইল কে যেন ঘরের কবাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। মনে করিলেন, চক্ষু মেলিয়া দেখি,—কিন্তু ঘুমটা তখন এমনি চোখের উপর চাপিয়া ধরিয়াছিল, চোখটা মেলা আর তাঁর ঘটিয়া উঠিল না। একবার আস্তে আস্তে ডাকিলেন, "বউমা!" কাণে চুড়ির একটা টুং টাং শব্দবৎ আসিল। যেন তারপর নিদ্রার কোলে গাঢ় রূপে হেলিয়া পড়িয়া ভাবিলেন, তিনি একটা স্বপ্নই দেখিলেন। কোথাও কিছু নাই, হরি হরি বলিয়া গাঢ়তর রূপে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে যখন নিশাচরদের চীৎকারে মাসিমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—তখন আলো জ্বালিয়া চপলাকে সরবত খাওয়াইতে গিয়া দেখেন,

চপলা ত বিছানায় নাই। কম্পিত হস্তে প্রদীপটা দীপগাছার উপর রাখিয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, "বউমা!" সেখানেও কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না। বাড়ীর প্রত্যেক স্থান খুঁজিয়া খিড়কীর দরজার কাছে আসিয়া দেখিলেন, খিড়কীর দরজা খোলা। মাসিমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই পথ দিয়াই চপলা রোগের যন্ত্রণায় কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

চীৎকার করিয়া পাড়া প্রতিবেশিকে ডাকা ডাকি করিতে লাগিলেন। "তোমরা শীগ্‌গীর করে এসো আমাদের চপলা কোথায় চলে গেছে।"

নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পাড়ারলোক সকলে রজনীকান্তের উঠানে আসিয়া জমায়েত হইতে লাগিল।

সকলের মুখেই এক কথা "কি হলো কোথায় গেল।"

বৃদ্ধ রামশঙ্কর হুকা হাতে করিয়া কহিলেন, "তখনি বলে ছিলাম, রজনী বাবু ভাল করে চিকিৎসা করান, ভূত-প্রেত আবার আছে নাকি, বলে অগ্রাহ্য কর্‌লেন, এখন বুঝুন।"

চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়িয়া গেল। কিন্তু কোথায় চপলা! প্রান্তর, কানন, পাঁতি পাঁতি খুজিয়া কোথাও চপলাকে মিলিল না। তখন নদী তীর দিয়া লোক ছুটিল এবং রজনীকান্তের কাছেও টেলিগ্রাম পৌঁছিল।

রজনী কান্ত আর বাড়ীর পথে না যাত্রা করিয়া, একেবারে চপলার বাপের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। পথে যাইতে যাইতে তাহার কত কথাই মনে হইতে লাগিল, তাহার এমন স্ত্রী আজ কোথায় চলিয়া গেল, আর যদি দেখা না হয়,—অশ্রুধারা বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া যাইতে লাগিল। মাসিমার উপরেও খুব রাগ হইতে লাগিল। কিন্তু তখনি ভাবিল, মাসিমার উপরে রাগ ত বৃথা—নিয়তিকে কে, লঙ্ঘন করিতে পারিবে, যদি আমিই থাকিতাম, তবু আমাকেও ফেলিয়া চপলা চলিয়া যাইত।

শ্বশুর বাড়ীর পথে শুনিল—চপলা সেখানেও যায় নাই। আর শ্বশুর বাড়ীর দিকে না যাইয়া রাস্তার ধারে গাছ তলায় সেই খানেই বসিয়া পড়িল। সমস্ত পৃথিবীটা যেন চোখের সাম্‌নে একটা প্রলয় বিভীষিকা তুলিয়া মাথা ঘুরিয়া যাইতে লাগিল।

শরতের শিশির সিক্ত মাঠের উপর দিয়া প্রভাত সূর্য্য তাহার সোণালী আভা লইয়া নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছিল। রজনীকান্তের চক্ষে সব যেন কালী মোড়া ঠেকিতে লাগিল—পাশ দিয়া নদীটি বহিয়া যাইতে ছিল।

তাহার লহরী কল কল ধ্বনি, তাহার ক্ষুব্ধ বক্ষে আর্ত্তনাদ তুলিয়া ছুটিয়া যাইতেছে।

মাঠের উপরে রৌদ্র বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—তবু রজনী উঠিল না। তেমনি উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বসিয়া রহিল।

সহসা একদল রাখাল ছুটিয়া আসিয়া রজনীকে কহিল, "বাবু মজা দেখুন, একটি মেয়ে মানুষ শ্মশানের উপরে প'ড়ে আছে, আর একটা মেয়ে মানুষ দূরে বসে আছে, আমাদিগকে কাছে যেতে দিলে না।" প্রথমটা যাইতে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু তখনি ভাবিয়া দেখিল, যদি তাহার চপলা হয়, তাহা হইলে—এই ভাবিয়া একবারে ছুটিয়া শ্মশান প্রান্তরের দিকে চলিয়া গেল।

গিয়া যাহা দেখিল,—তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। একি, এ যে চপলা। রজনী উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে চপলাকে জড়াইয়া ধরিয়া চপলা বলিয়া ডাকিয়া উঠিল—"চপলা! আমার জীবনের মরণের চপলা!"

পার্শ্বের রমণী বাধা দিয়া কহিল, ব্রহ্মতত্ত্বের সাধনা, ভাব্‌বেন না। চপলা নিরাভরণা যন্ত্রণায় এ শ্মশান ভূমিতে এসে ধরা দিয়েছে,—রজনী স্থির ভাবে এই রোগের বিধবার দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি কে?"

রমণী উত্তর করিল, আমি চপলার সই!

চপলার সই? কে সে রমণী! কিন্তু পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার কোন অবসরই ঘটিয়া উঠিল না। শুধু একটি প্রকাণ্ড রহস্য রাজ্যের উদ্যত যবনিকার দ্বারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সারাদিনই এমনি বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বেলাবসানে সূর্য্য যখন অস্তে গেল, তখন তাহার মনে হইল, দিবাকরও যেন তাহার দিকে একটা রহস্যময় দীপ্তি হানিয়া দিনের খেলা শেষ করিয়া চলিয়া গেল।

আকাশের আধোছায়া-আধো লইয়া চাঁদ জাগিয়া উঠিল। তখনও রজনীর মুখে কোন কথা নাই। কারণ সই বারণ করিয়া দিয়াছে—চপলাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।

এমন সময় ধীরে ধীরে চপলা মন্দির প্রাঙ্গন হইতে উঠিয়া ডাকিল, "সই! বিজলী সই সাড়া দিল, কি ভাই সই।" সেই জ্যোতি দেবতা—তিনিই আজ আমায় দয়া করে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া চপলা আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সই চপলার মুখটী ধরিয়া কহিল, "ওকি বলছ সই!"

চপলা ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "আমি আর কিছু কি বলছিলাম, সই —তা নয়—বলছিলাম কি আমার বুকের ব্যথাটা এইবারে সারিয়া গেছে, দেবতাকে ধন্যবাদ। আমি বেঁচে উঠেছি এখন।"

সই হাতটা চাপিয়া কহিল, "বাঁচলে না, আবার দেখেছো কে এসেছেন, এই যে তোমার স্বামী।"

"আমার স্বামী" বলিয়া চপলা যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া গেল। সম্মুখে রজনী কান্তের দিকে চাহিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া রজনীর পা জড়াইয়া ধরিল। রজনীকান্ত বাধা দিয়া কহিল, "ছিঃ চপলা তুমি যে, আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব। তোমায় পেয়েছি, এই ঢের, তোমায় আমার কাছে ক্ষমা চাইবার কোন কারণই নাই।"

চপলা অশ্রু বিগলিত নেত্রে কহিল, "না, তথাপি আমি ক্ষমা চাহিব। আমার মত ভণ্ড, আমার মত পাতকিনী জগতে আর কেউ ছিল কি? ওঃ কি সে ব্যাপার, নাও নাথ।" বলিয়া আর চপলা স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার শূন্য হৃদয়ে যেন একটা রুদ্ধ আর্ত্তনাদ নেশার মত চাপিয়া ধরিল—চপলা তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না। স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়া কহিল, "নাও নাথ,—আর এ কলঙ্ক লাঞ্ছিত হৃদয় নয়। আমি সে মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছি। শুধু একটু জ্যোতিঃ পীড়া দিচ্ছিল, আজ তাও হারালাম। বড়ই হতভাগিনী হয়ে আমি জন্মেছিলাম নাথ! কিন্তু তবু আমায় দোষ দিও না। এ দোষ একলা আমার ছিল না। আমি সেধে সে বিষ বুকে ঢেলে লই নাই। জন্মান্তরের ভালবাসা, আমায় পাগল করেছিল। তাই ছুটে বেরিয়ে ছিলাম—তাই উন্মাদিনী হয়েছিলাম।"

রজনী চপলার মুখে হাত দিয়া কহিল, "কি বলছো কি বল ল চপলা। এসো রাত্রি গভীর হয়ে আসছে। তুমি বলছো আমি তা বুঝেছি তোমায় অনুরোধ কচ্ছি—তুমি আর বকোনা।"

চপলার নেশা তখনও কাটিয়া যায় নাই—কহিল, "না বকবো না। শুধু তোমায় খুলে বল্‌বো আজ জীবনের ইতিহাস আমার—অতীত জীবনের নিগূঢ় কাহিনী। আর তোমার চক্ষে অবিশ্বাসিনী হইব না। অন্যায় মত মুক্ত কণ্ঠে বল্‌বো। নাথ, আমি বাহিরে ভালই ছিলাম, কিন্তু অন্তরে কীট বসেছিল। কিন্তু আজ আবার তারই মত আমি সাধনায় রুদ্ধাত্মা হতে চেষ্টা পেয়েছি। বন্ধন হতে মুক্তিও পেয়েছি—এখন, পায়ে রাখো, না নাই রাখো, আমি খুলে

বল্লাম, সব কথা খুলে বল্লাম।" বলিতে বলিতে একেবারে অজ্ঞানের মত বিহ্বল হইয়া পড়িয়া গেল—রজনীকান্ত কঠোর শীতল হলেও চপলাকে দুই বাহুর মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাহার মুখের উপর চাদরের বাতাস দিতে দিতে কেবলি মনে মনে প্রশ্ন করিতে লাগিল, "কে সে;" কিন্তু সব কেমন গুলট পালট হইয়া যাইতে লাগল।

চপলা একটু সুস্থ হইলে রজনীকান্ত সইএর দিকে চাহিয়া কহিল, "আচ্ছা ভাই সই! তুমি বলতে পার। তোমাকে ত চপলা সব কথা খুলে বলেছে, "কে সে?"

সিজলী একটু সরিয়া আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কহিল; "জানেন না? তা জানবেনই বা কেমন ক'রে সে যে আমারও হৃদয় দেবতা, আমার স্বামী! কিন্তু তিনি এখন স্বর্গে।

রজনীর মুখে ঝাঁ করিয়া একটা নাম মনে পড়িয়া গেল—কহিল, "কে অনিল কুমার!" সই কহিল, "হাঁ।"

রজনীর পাংশু শীতল মুখে আর কোন কথা বাহির হইল না।

সমালোচনা।

স্বর্গীয়া রাজকুমারী দেবী।—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে প্রণীত; মূল্য দুই আনা মাত্র।

আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। স্বর্গীয়া রাজকুমারী ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা সহধর্ম্মিণী। রাজকুমারী হিন্দু প্রথামত দ্বাদশবর্ষ বয়সে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। হিন্দুপ্রথানুসারে একবৎসর পরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে শ্বশুরালয়ে আগমন করেন। রাজকুমারী অশিক্ষিতা ও প্রচলিত পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার অচলা বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, প্রতি দিন প্রাতঃকালে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেন, বেলা ১১টা কি ১২টার পূর্ব্বে নিত্য বাহির হইতেন না। এ দিকে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৮টা ৮৷৷০টার সময় কর্ম্মস্থলে গমন করিতেন, সুতরাং রাত্রিকাল ব্যতীত উভয়ের সাক্ষাৎ হইত না, শিক্ষা ব্যতীত মানসিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব ভাবিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, রাজকুমারীকে লেখা পড়া শিখিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথমে তিনি রাজি না হইলেও শেষে লেখাপড়ায় তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়া ছিলেন; স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া সমাজ-

সংস্কার, বিলাত গমন করিয়া ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের অনেক গুলি সংকল্পিত আচার অনুষ্ঠানের সংস্কার ও পোষাক পরিচ্ছদের উন্নতি করিয়াছিলেন।

পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসের অনেক তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায়। আমরা "স্বর্গীয়া রাজকুমারী দেবী" পুস্তকখানি আধুনিক উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কথকথার সাফল্য।—বর্ত্তমান দেশ কাল ও পাত্রের রুচি অনুসারে প্রাচীন কালের কথকথায় প্রথা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে বঙ্গের সর্ব্বত্র স্বধর্ম্ম পরায়ণ আবাল বৃদ্ধ বণিতা কথকথার সার্থকতা অনুভব করিয়া আগ্রহ সহকারে কথকথা শ্রবণ করিতেন। বর্ত্তমানকালে পল্লীস্থ ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকের বাটীতে আর পূর্ব্বের ন্যায় কথকথা হয় না, যদিও প্রাচীন বংশধরগণের বাটীতে অথবা দেবালয় প্রভৃতি স্থানে সময় সময় কথকথা হয় বটে, কিন্তু শ্রোতার সমাগম অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য বহু কথক শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য সঙ্গীতের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকেন, মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যার সহিত কোনই সংশ্রব থাকে না; কৃতির কামনাও পূর্ণ হয় না। উৎসাহের অভাবে কথকথাও লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সম্প্রতি ১৩২৮ সালের গত রাসপূর্ণিমার দিবস হইতে কলিকাতা হাটখোলা ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট নিবাসী স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে পূর্ব্ব বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কথক স্বর্গীয় রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলরতন শিরোমণি মহাশয়ের কথকথা শ্রবণ করিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি; ইনি কথকথার ছলে সমগ্র শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত যে ভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারায় সমবেত শ্রোতামাত্রেই শিরোমণি মহাশয়ের প্রস্তাবগুলি সাজাইবার কৃতিত্বে মূলশ্লোক ও ব্যাখ্যার পাণ্ডিত্যে, তাঁহার পিতৃদেবের বিরচিত সুমধুর আধ্যাত্মিক সঙ্গীত ও দেব দেবীর রূপ বর্ণনা মূলক স্তব স্তুতি প্রভৃতি রাগ রাগিণী সংযুক্ত সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া ছিলেন।

স্বধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইলে ইহলোকে ও পরলোকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। বর্ত্তমান সময়ে আমরা বক্তৃতা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হই, কিন্তু পুরাণাদির কথকথা যে স্থানে হয়, সেই স্থানেই শ্রোতার অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ শ্রবণ করিলে বক্তৃতা অপেক্ষা মানবের ঐহিক পারত্রিক অশেষ মঙ্গল হয়, তাহা হিন্দুশাস্ত্রকার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

"তুলসীকাননং যত্র, যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণ পঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরি॥"

যে স্থানে তুলসীবন এবং যেস্থানে পদ্মবন ও যেস্থানে পুরাণ পাঠ হয়, সেস্থানে সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীহরি স্বয়ং আগমন করেন; পুরাণাদি পাঠে কথকথার সফলতায় গৃহীর যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ হইয়া, শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী নারায়ণের কৃপায় ঐহিক ও পারলৌকিক অপূর্ব্ব মঙ্গল হইয়া থাকে।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং